সৌরভ

সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচন।

—সম্পাদক—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

—নবম বর্ষ—

কার্ত্তিক ১৩২৭ হইতে আশ্বিন ১৩২৮।

ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য—দুই টাকা।

PUBLISHED FORM
RESEARCH HOUSE—MYMENSINGH,

বিষয় সূচী

সৌরভ

নবম বর্ষ। ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩২৭। প্রথম সংখ্যা।

ছুটীর কথা।

আমার কর্ম্মহীন জীবনের মর্ম্মদ্বারে আলস-মন্থর পবন মন্দ মন্দ সঞ্চারে আমার এই উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়ে বয়ে আসচে। আমার চারধারে কোকিলের কলকাকলী ও দোয়েলের সুললিত স্বরলহরী ধ্বনিত হয়ে উঠেচে। আজ্‌কে আমার ছুটীর দিন। তাই আজ্‌কে জলে, স্থলে, আকাশে একটি রং বেরঙের নিমন্ত্রণ লিপি প্রত্যক্ষ কর্‌চি— নানান্ কর্ম্মের নিবিড় ভিড়ে যা এতদিন দেখেও দেখিনি। এ নিমন্ত্রণ ত সেই বিশ্বজোড়া ছুটির মহোৎসব লীলায় যোগ দিবার জন্যে নিমন্ত্রণ, যার চলচঞ্চল উৎস উৎসারিত হয়ে উঠেচে বিশ্বের রোমে রোমে, তৃণে তৃণে।

এর জন্যে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুতই ছিলাম—এবং এই উৎসব স্রোতে আপন অন্তরতম প্রাণকে বইয়ে দিবার জন্যে আমার ঘরের বাইরে কুঞ্জবন প্রাঙ্গনে প্রয়ান কর্ত্তে শুরু করেইছিলাম কিন্তু আমার এক বন্ধু হঠাৎ আমার গতিরোধ করে দাঁড়ালেন—বল্লেন—"তোমার মাথা খারাপ হয়েচে না কি—পাগলের মত যাচ্চ কোথায় —দিশাহারা ক্ষ্যাপার মত ?"

"আমার হৃদয় দ্বারে আজ সেই আহ্বান এসে পৌঁছেচে।"

"কোন্ আহ্বান ?"

"সেই চিরপুরাণো অথচ চিরনূতন আহ্বান—সেই ছুটীর আহ্বান।"

"ছুটী! ছুটী আবার কোথায় ?"

"সেই ছুটী! যার চলচপল নৃত্য লীলায়িত হ'য়ে উঠেচে —শ্যামল বল্লীবিতানে—পল্লবে পল্লবান্তরে! যার আগমনী গাইচে বনবনান্তের বিহঙ্গকোবিদবৃন্দ দিগ্‌দিগন্ত পরিপূর্ণ করে!"

"আজ যে হঠাৎ তোমার হৃদ্‌কূল ছাপিয়ে কবিত্ব উথ্‌লে উঠ্‌ল! ব্যাপারটা কি! কবিরাজ ডাক্‌তে হবেনাত— মহানারায়ণ তেলের ব্যবস্থা কর্‌বার জন্যে!"

"আর তুমি যে রাতদিন 'কাজ' 'কাজ' করে, করে, উন্মত্তের মত পাক্‌খেয়ে বেড়াও—আমার ত মনে হয়— সে ব্যবস্থা তোমার পরেই করাটা শোভনীয় ও সুসঙ্গত!"

"একথাটা বল্‌তে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিৎ। তোমরা তোমাদের জীবনটা নিয়ে যেমন করে—ছিনি মিনি খেল, তাতে তোমাদের মুখে কথা ফোটে কি করে, তাই ভেবে পাইনে। আমরা যদি অমনতর নেচে, গেয়ে, আর কবিতা লিখে কাল কাটাতুম, তা হলে পৃথিবীতে এতদিন একটা প্রলয় কাণ্ড বেধে যেত—একটা মন্বন্তর— মহামারীতে পৃথিবীটা ছারখার হয়ে যেত! এটাও ভেবে দেখা উচিত যে—আমরা যে রাতদিন তোমাদেরই হিতের জন্য খেটে বেড়াচ্চি—তাতেই ত তোমরা খেয়ে দেয়ে বেঁচে আছ—নৈলে এতদিন শুষ্কজলা নদীর সিঁড়িগুলোর মত বুকে হাড় মাত্রই অবশিষ্ট থাকৃত—সব রস এতদিন শুকিয়ে যেত।"

এস্থলে আমার বন্ধুর পরিচয় দেওয়াটা দরকার হয়ে পড়েচে! ইনি হচ্চেন্ একজন লোকহিতৈষী। কর্ত্তব্য-পালনকেই ইনি সংসারের সেরা বলে জেনেচেন, সকলের হিতসাধন করাই এঁর উদ্দেশ্য—এইরূপ ইনি প্রচার করে থাকেন এবং তাতে তাঁর কোনো স্বার্থ নেই কিন্তু তলে তলে ইহকালে খ্যাতি প্রতিপত্তি ও পরকালে স্বর্গ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও যে গোপন ভাবে পোষণ করেন—

তা অতি বড় নিন্দুক ছাড়া আর কেউ বল্‌তে সাহস কর্‌বে না, কেননা—এঁর সঙ্গে তর্কে ও কণ্ঠের জোরে পেরে ওঠা সুকঠিন। এঁর আর একটি প্রধান গুণ হচ্চে এই যে—সারাটা জীবন খাটুনিকেই ইনি পূজা করে এসেচেন—ছুটির নামও শুন্‌তে পারেন না, কিন্তু সম্প্রতি একটি অদ্ভুত প্রশ্ন আমায় জিজ্ঞাসা করে বসেচেন্ যে—ছুটী কথাটার মানে কি?

যা বোঝা সব-চেয়ে সহজ, তা বোঝানো সব-চেয়ে কঠিন। এই ছুটীর তত্ত্বটী তেম্‌নি করেই দেখেচ, এই যেমন ক'রে পদ্মফুল তার একটী একটী পাঁপড়ি বিকশিত করে তুলে—তরুণ সূর্য্যের রক্তিম সৌন্দর্য্যকে দেখে। "কিন্তু, বন্ধুহে—বলিহারি তোমার বুদ্ধি! এত নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ, রসায়ন, বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে এতই পরিপক্ক হয়েচ—যে কাঁচা বুদ্ধির এই কথাটা পর্য্যন্ত ধর্‌তে পার্‌লে না। এমন জলের মত সরল..."

আমার বন্ধুর ইতিমধ্যে আর তর সইচে না—পাগলের সঙ্গে আলাপক'রে কাজ ও সময় নষ্ট করা তাঁর কোষ্ঠিতে লেখে না—তাই তিনি আমার কথায় বাধা দিয়েই বল্লেন্—"সরলই হোক্ আর তরলই হোক্ বলেই ফেল না—কি বল্‌তে চাও।"

"তবে শোনো—বল্‌চি—সংসারে এসে এত যে কর্ম্ম কর্‌চ, এত যে ভীমবেগে পাব্লিক্ ওয়ার্ক্‌সএর চক্রটা ঘুরাচ্চ—এগতি তোমার আস্‌চে কোথা থেকে? তুমি দাঁড়িয়ে আছ কিসের জোরে? বল্‌তেই হবে প্রাণের জোরে। এই প্রাণ তত্ত্বটী যদি সমস্ত শক্তিগুলোকে বিধৃত করে না রাখ্‌ত, তবে সে-সব এতক্ষণ একদিকে ঠিক্‌রিয়ে পড়ে চক্‌মকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গের মত দেখ্‌তে না দেখ্‌তে নিরুদ্দেশ হয়ে যেত—সবগুলো অণু-পরমাণু দানা বেঁধে একটা শক্তিকে সৃজন কর্‌তেই পার্‌ত না—যদি তার পিছনে একটা স্থির পদার্থ না থাক্‌ত। সেই পদার্থটাকেই আমরা 'সত্য' বলে থাকি। সেই সত্যই সমস্ত শক্তিগুলো চালনা কর্‌চে এবং সেগুলোকে সম্মুখের দিকে গতিদান কর্‌চে—এবং তারই দ্বারা সে আপ্‌নাকে প্রকাশ কর্‌তে পার্‌চে। এই জন্যই দেখ্‌চ জগতের কোনো শক্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে উদ্ধত ভাবে আস্ফালন কর্‌চেনা—সমস্তই আপ্‌নাকে সংবৃত করে কেবলি কায়া বদল কর্‌চে, কেবলি চল্‌চে—সেই অবিরত চল্‌তি থাকাতেই সেই সত্য বস্তুর প্রাণময় প্রকাশ সম্ভব হয়েচে। নৈলে সব শক্তিগুলো জগদ্দল পাষাণের মত প্রাণের বুক্ চেপে থাক্‌ত—তাকে বাইরের দিকে সার্থক কর্‌তে পার্‌তনা—। সত্য জিনিষটাই হচ্চে প্রাণ। একদিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে তা যদিচ স্থির—অপরদিক্ থেকে দেখ্‌লে তা নিয়তই চল্‌চে ও সব শক্তিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্চে—এই চল্‌তি থাক্‌চে বলেই সে মুক্ত—না চল্লেই সে আবদ্ধ। এখন হয়ত তোমার বোঝা কঠিন হবে না যে—যাকে তোমরা 'বেঁচে থাকা' বলো, তা এই প্রাণেরই প্রকাশ। আর মৃত্যু তাকেই বলে, যখন প্রাণের বাইরের দিগে গতির বেগটা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। তখন দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলো একাগ্র উগ্র হয়ে উঠে, একই জায়গায় ঘুর্‌পাক্ খেতে থাকে—চলে না। এই জন্যই পাপকে মৃত্যু বলা হয়ে থাকে। স্বার্থ এবং সুখ মানুষের ইন্দ্রিয় ও মনকে চলার দিকে লীলায়িত না করে—একটা অচল ঘূর্ণাপাক তৈরী করে বসে—এইজন্যেই সেটাও মৃত্যুরই প্রতিরূপ। কিন্তু আমরা চাই বেঁচে থাক্‌তে—আমাদের সমস্ত শক্তির পিছনে যে একটি উদার শান্তি, মহৎপ্রাণের একটি সুবিশাল অবকাশ আছে, সেইটেকেই বাহিরের দিকে সত্য ক'রে তুল্‌তেই আমরা চাই—এবং তাতেই আমরা সম্মিলিত হব—বিশ্বের সেই প্রাণ-প্রস্রবণ-ধারার সঙ্গে, যা সমস্ত চরাচর প্লাবিত করে বয়ে যাচ্চে। এবং তাতেই আমাদের ছুটী! আমাদের মুক্তি!

এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য হতে পারে যে—এই প্রাণের ধারাটীর মূল উৎস কোথা থেকে বেরিয়েচে এবং এই উৎস ক্রমাগত আমাদের হৃদয়, মন, শরীর প্রবাহিত করে কোথায় গিয়ে প্রবেশ কর্‌চে। এর উত্তর উপনিষদ্ যেমন সহজভাবে দিয়েচেন্ এমন কোনো শাস্ত্রই দিতে পারেন নি—এই আমাদের বিশ্বাস।

তাতে বলা হয়েচে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে;
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি॥

আনন্দ থেকেই নিখিল চরাচর উৎপন্ন হয়েছে, আনন্দ দ্বারা তারা জীবনধারণ কর্‌চে এবং আনন্দেই তারা প্রবেশ কর্‌চে। আশ্চর্য্য এই যে—এই সমস্তই একই কালে ঘট্‌চে। কোন্ সত্যি কালে আমরা জন্মেচি, তারপর এখন আমরা জীবন ধারণ কর্‌চি, অতঃপর বহু যুগান্তে আমরা লোপ পেয়ে আনন্দের মধ্যে মিশে থাক্‌ব—এ কথা যারা বলে—তারা বুদ্ধিকে ভ্রান্ত কর্‌বার জন্যেই জন্মেচে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই সেই বিরাট্ আনন্দ থেকে একটি ধারা নিখিল জগতের জন্মদান কর্‌চে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তা নিখিল জগতকে আনন্দে প্রকাশিত করে তাকে জীবনদান কর্‌চে এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, তা সমস্ত জগত চরাচর পরিপ্লাবিত করে, সেই অখণ্ড আনন্দের মধ্যে প্রবেশ কর্‌চে। সেই জন্যই জগত চিরনবীন—চির—যৌবন—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এর নব নব জন্ম প্রাণে, যৌবনে, স্বাস্থ্যে বিকশিত হয়ে উঠ্‌চে।

আর একটি জিজ্ঞাস্য এই যে, আনন্দের সেই মূল উৎসটী কোথায় অবস্থিত? এর উত্তর এই যে আমাদের হৃদয়, দেহ ও নিখিল-বিশ্ব-দেহকে আচ্ছাদিত করে সেই আনন্দ চিরবিরাজিত—সেই আনন্দ বিশ্বের কেন্দ্রস্থলেই অধিষ্ঠিত—অর্থাৎ এই আকাশে অবস্থিত। সেখানে যে একটি অসীম আনন্দ নিত্যকাল সমুৎসারিত হচ্ছে, তারই একটি ধারা সসীম বিশ্বজগতে ও মানবলোকে প্রবাহিত হয়ে আমাদের পাত্রটীকে পূর্ণ করে তুল্‌চে—তাই ত বলা হয়েচে—

কঃ হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশো
আনন্দোনস্যাৎ।

অর্থাৎ কেইবা জীবনধারণ কর্‌ত ও শরীর ধারণের চেষ্টা কর্‌ত, যদি এই আকাশ আনন্দ প্লাবিত না হ'ত।

আমাদের কথাটা আর কিছু নয়, যা-কিছু কাজ কর্‌বে তা ঐ প্রাণকে—আনন্দকে উপলব্ধি ক'রে, তারই নিগূঢ় যোগে আপন অন্তরতম সত্যকে বাহিরে উদ্ভাসিত কর্‌বারই জন্য; তাই সমস্তই আমাদের কাছে প্রাণের লীলা বৈ আর কিছু নয়, তা কি বাঁশী বাজানো, কি পাব্লিক্ সার্ভিস্—এতদুভয়ে কোনো ভেদই আমার মনে মানে না। আমাদের কবিশেখরও গাইচেন—

"যোদের, যেমন খেলা তেম্‌নি যে কাজ
জানিস্‌নে কি ভাই।"

আমাদের যত কর্ম্মই থাক্‌না কেন—সে সমস্তই আমাদের অন্তরস্থিত বিশ্বকর্ম্মার মুক্তির বাহন মাত্র। সে সকলের ভিতর দিয়েই আমাদের অন্তরতম আত্মা আপ্‌নাকে ক্রমাগতই ছুটী দিচ্চে। সেই অচিন পাখী দেহ-মন পিঞ্জরের মধ্যে থেকে ক্রমাগতই ছাড়া পাচ্চে।

তবেই দেখ্‌চি বাইরের দিকে আমাদের শত কর্ম্ম বন্ধনের মধ্যেই অন্তরের দিকে অন্তবিহীন ছুটী—অপর্য্যাপ্ত অবকাশ। অন্তরকে বাদ্ দিয়ে বাহিরের কর্ম্মকে একান্ত করে তুল্‌লেই ছুটীর সেই রসটুকু নিংড়ে একেবারে শুক্‌নো আঁটি চিবুতে হয়—তাতেই আত্মার মুক্তি লীলায়িত হতে উঠ্‌তে পারে না। কর্ম্মকে উদগ্র করে ফেল্‌বার অনিবার্য্য দুর্য্যোগটা দেখেই কেহ কেহ আবার ও পথই মাড়ানো পছন্দ করেন না—অন্তরের ছুটীটুকু নিয়েই ভুলে থেকে বাহিরের কাজকে একেবারে অগ্রাহ্য কর্‌তে চান—তাঁরা এ কূল ও কূল দুকূলই হারান—লাভের মধ্যে একটা অন্ধ তামসিকতার জগদ্দল পাষাণে চাপা হয়ে জড়তাগ্রস্ত জীবন অতিবাহিত করেন। এঁরাই জগতের সব চেয়ে দুঃখী ও কৃপার্হ। এঁরাই হচ্চেন্ মায়াবাদী। কর্ম্মসংসারটা অবিদ্যার সৃষ্টি মনে করে, একান্ত নিভৃতে অন্তরের মধ্যে সমস্ত প্রবৃত্তিগুলোকে সংহরণ কর্ত্তে চান—। চান—কিন্তু পারেন না—অবশেষে আলস্যে, আরামে, নিষ্কর্ম্মণ্যতায়, জড়তায় বাসনাগুলো আরো উদ্ধত হয়ে ওঠে—তামসিক ভাবে। এম্‌নি করে, পলে পলে শুকিয়ে মর্‌তে থাকেন। যারা একান্ত ভাবে বাইরের সমৃদ্ধিকে নিয়ে থাক্‌তে চায়—সত্য, তারা অন্তরে অন্তরে একেবারে রিক্ত; সত্য, তাদের সুখদুঃখক্ষোভবিক্ষোভ তাদের কর্ম্মচক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলরাশি পৃথিবীকে আবর্জ্জনায় পূর্ণ করেচে—তাদের রথচক্রঘর্ঘরনির্ঘোষে মেদিনীর বক্ষ কম্পান্বিত হয়ে উঠেচে—তাদের উচ্চ চীৎকার-কলরবে আকাশের নিস্তব্ধ নিভৃত পরিব্যাপ্ত শান্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেচে—কিন্তু তাদের এই রাজসিক জড়তা, মানুষকে ততটা পঙ্গু করে দেয় না, যতটা করে তামসিক আরাম ও নিষ্কর্ম্মণ্যতা;

সে যেন হিমানীর স্পর্শে প্রাণের সমস্ত তেজকে একবারে দমিয়ে মানুষকে বরফপিণ্ড তৈরী করে ফেলে—সে জড়তা আরো মারাত্মক।

বস্তুতঃ বাহিরের সঙ্গে অন্তরের বিচ্ছেদ যখনি বিপুল হয়ে উঠেচে তখনি মানবজাতির দুর্গতি নিদারুণ আকার প্রাপ্ত হয়েছে। অন্তরের বোধকে বাদ দিয়ে বাইরের অনুভূতি একেবারে প্রাণহীন, আবার বাইরের উপলব্ধি ব্যতীত অন্তরের দিকে একান্ত উন্মুখতা জড়তারই নামান্তর। কর্ম্মবন্ধনকে বাদ দিয়ে যে মুক্তি সে ত অলস নির্জীবতা ছাড়া আর কিছু নয়! "শারদোৎসব" নাট্যে কবিগুরু দেখিয়েছেন্, যে অলস নিষ্কর্ম্মা হয়ে পড়ে থাক্‌লে একটি তৃণও সত্যে ও সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ত না, প্রত্যেকটি ঘাস নিরলস চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আপন অন্তরতম আনন্দের ঋণ শোধ করুচে। তিনি দেখিয়েছেন, যে বিশ্বপ্রকৃতির এই উৎসবের সঙ্গে সেই বালক উপানন্দের সত্যকার যোগ আছে—যে আপনার প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যে বই চিত্রিত করুচে—কিন্তু তার এই কর্ম্মই চরম এবং পরম কথা নয়—এই কর্ম্মেই তার নিরন্তর আত্মোৎসর্জ্জন ঘটুচে—তাতেই তার মুক্তি।

এই জন্যেই বলা হয়েচে তাকে, "তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখ্‌চ আর ছুটীর পর ছুটী পাচ্চ।" আমরা তাই বলি কর্ম্মকে নির্ম্মূল করোনা—নিয়ন্ত্রিত কর,—যাতে তা ঐকান্তিক আস্ফালনের দ্বারা হৃদয়ের সমুদায় অবকাশ, সমুদায় স্নিগ্ধ শান্ত ছুটীর আনন্দের মধ্যে ক্ষুব্ধ আক্ষেপ উত্তোলন ক'রে তাকে ব্যস্ত ক'রে না দেয়। সেই সংযমের সিংহদ্বারই হচ্চে আত্মার অহৈতুক আনন্দ বিকাশের তোরণ দ্বার।

আমাদের কাছে ঐ জন্যেই সমস্ত কর্ম্মই খেলা। এর একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখানো যেতে পারে আমাদের কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে। এই অবকাশরসসঞ্চারবিকশিত কবির হৃদয় যে আনন্দে বিশ্বোৎসবের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে মুগ্ধবংশীরবে দিক্‌ দিগন্ত গুঞ্জিত করেচে, সেই আনন্দেই দেশের জন্যে, বিশ্বের জন্যে, অজস্র কর্ম্মকে, দুঃখকে, বিপদ্‌কে নির্ভীক সাহসের সহিত বরণ করে নিয়েচে। এঁর বাঁশী শুধু যে আরাম নিকুঞ্জের ছায়ায় খেলার গান অনুরণিত করেচে তা নয়—বীর্য্যবান্ আত্মত্যাগের প্রদীপ্ত ঐশ্বর্য্যে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেচে, বিশ্বমানবের দুঃখের আহবক্ষেত্রে, বজ্রের বিদ্যুল্লেখালোকে, মৃত্যুর অধিদেবতার সঙ্গে এঁর মুখোমুখি পরিচয় হয়েচে—তাই ত তিনি শুনিয়েচেন—প্রাণের মহীয়সী বাণী—মৃত্যুর বক্ষের উপরে; যৌবনের জয়গান মন্ত্রিত করেচেন্ দেশে দেশান্তরে।

বস্তুতঃ সকল কর্ম্মই যাদের কাছে খেলা বৈ আর কিছু নয়, মৃত্যুও ত তার কাছে খেলাই। মৃত্যুর করাল রূপ তার প্রাণে অপর্য্যাপ্ত আনন্দেরই সঞ্চার করে দেয়। বিশ্বব্যাপী এই ছুটীর মূল তত্ত্বটী যে একবার অবগত হয়েচে—দিকে দিগন্তে যত সব বুদ্ধিমানের দল তাদিগকে পাগল বলে উড়িয়ে দিয়েছে—কিন্তু সেই পাগলেরাই ত জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে সব অত্যাশ্চর্য্য সম্পদ দান করে গেল; যুগে যুগে সেই দান অক্ষয়-অমর হয়ে বিশ্বচিত্তাকাশে বিভাসিত হয়ে রৈল।

আর বিশ্বহিতের যে তারস্বরে এত বক্তৃতা কর, বিশ্বের দুঃখ দূর কি তারাই করে নি? তাই ত কবি বলেচেন—"মহারাজ! আপনার দরজার বাইরে ঐ যে কান্না উঠেচে, ঐ কান্না থামায় কারা! যারা বৈরাগ্য বারিধির তলে ডুব দিয়েচে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে রয়েচে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েচে তারা নয়, যারা কর্ত্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপ্‌ছে তারাও নয়—যারা অপর্য্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েচে বলেই জগতে যাদের কিছুতে উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগও করে তারাই। বাঁচ্‌তে জানে তারা মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখপায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে—সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র— সবচেয়ে বড় বৈরাগ্যের মন্ত্র।" অতএব হে বিশ্বহিতৈষী! সেই পরম-আনন্দকে যে-হেতু তোমরা কেহই পাওনি—তোমরা এই অবকাশের মর্ম্ম কি বুঝ্‌বে? এই প্রাণের তত্ত্ব কি ক'রে জান্‌বে? অতএব দোহাই তোমার আজ্‌কের এই নবযৌবনের—আনন্দ লীলাটিকে বার্দ্ধক্যের-চশ্‌মা-পরা ভ্রূকুটি-কুটিল-কটাক্ষ নিক্ষেপে ক্ষুদ্র করে দেখোনা।

তোমরা একে যা-খুশী তাই বল্‌তে পারো, কিন্তু আজ্‌কে আমার নয়নের সমস্ত মোহাবরণ খুলে গেচে। যা-কিছু পর্দ্দা ছিল উড়িয়ে নিয়ে গেচে এই নৃত্যচঞ্চল খোড়ো হাওয়া! দিব্যজ্ঞানালোকিত দৃষ্টিতে তাই স্পষ্টই দেখ্‌চি এত কাঙালের মতো ভিক্ষাপাত্র হাতে লয়ে যেখানে দ্বারে দ্বারে ফিরতুম্‌—সে জগৎ কি এই জগৎ! সে-কোন্‌ কৃত্রিম জগৎ তৈরীকরে উর্ণনাভের মতো আপন মায়াজালে আপ্‌নি আবদ্ধ ছিলুম—আজ আমি মুক্তিবেগের উন্মত্ত লীলায় ঐ আকাশ বিহারী বিহগটীর মতই অবাধ। এতদিন যা-কিছু সঞ্চয় করেছিলুম—সে সমস্তই চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেচে, আজ আমি মুক্ত। এই মুক্তির, এই ত্যাগের উদার সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে একী অপূর্ব্ব অভাবনীয় জগৎ দেখ্‌চি—এই ঐশ্বর্য্যে, মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে ভূষিত প্রাণবান্‌ বিশ্বজগৎ! ভোগীর মত যখন একে গ্রহণ করেছিলুম, তখন এ আমাকে কতই অনল-দহনে জ্বালিয়েছিল—তখন কি হৃদ্‌বিদারণ ক্রন্দন মর্ম্মগ্রন্থি বিদীর্ণ কর্‌ছিল। কিন্তু আজ? সর্ব্বত্রই দেখ্‌চি কোন মহাপুরুষের পুণ্য-আরতি-বর্ত্তিকা জ্বলেচে—গ্রহ-শশাঙ্ক-রবি মণ্ডলে—নগণ্য তারকারাজিতে শান্তি শঙ্খ বেজেচে—পূর্ণ বিরতির সুরে!

একী অক্লান্ত তপস্যায়, অকৃপণ ত্যাগে, অনন্ত আত্মোৎসর্জ্জন! এই ত বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মক্ষেত্র! এই ত অবকাশ-রসের উচ্ছ্বসিত ধারাসার! এই খানেই ত আমার—ছুটী! আমার উদার ছুটী! আজ আমি দেখ্‌চি—বিশ্বমানবের সমস্ত ভাঙা চুরা ওঠা-পড়ার মাঝখানেই একটি সুবৃহৎ ছুটীর অধিষ্ঠান! তাই অসীমের বিশাল সিংহাসন! সেখানেই জীব ও ভগবানের অন্তহীন মালা বদলের লীলা চলেচে। আজ এই দেখেই আমার মন অকারণ পুলকে উথ্‌লে উঠেচে, যে এই শুভ্র মেঘমালাখচিত আকাশে, এই হরিৎ রাগরঞ্জিত কাননে, এই শস্যশ্যামল ধরণীতলে, এই কলকোলাহল কল্লোলিত লোকালয়ে, সর্ব্বত্রই একটি বিপুল অবকাশের হিল্লোল বয়ে যাচ্চে। এই দেখেই আজ উচ্ছ্বসিত হয়েচি যে—সজনে, নির্জ্জনে, লোকালয়ে ও নির্জ্জন অরণ্যে সর্ব্বত্রই একটি মুক্তপ্রাণের সঞ্চরণ বিশ্বকে রেখাঙ্কিত কর্‌চে—এই কলকাকলী মুখরা কোকিলাগণ এই বিশ্বপ্রাণী-উৎসব সভায় যোগদিবার নিমন্ত্রণ সর্ব্বত্র বর্ষণ কর্‌চে—অশ্রুত সঙ্গীতে!

দিনের পর দিন শুষ্ক জড়তার অবসাদে ভিতরটা হাহাকার কর্‌চে! এখন চল, সেই প্রাণের—রসসাগরে অবগাহন ক'রে হৃদয়ের গভীর তলদেশ পরিপূর্ণ করে নিতে!

শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী।

—ছবি—

—'বড়লোক'—

বেলা ন'টায় শয্যা ছাড়া,
কাজের মোটেই নেইকো তাড়া;
ডাগর ভুঁড়ি, তাকিয়া, ভুড়ি,
চাকর বাকর গণ্ডা কুড়ি;
পরের কথায় ওঠা-বসা,
বৃহৎ উকুন, মাছি, মশা,
'খোষামুদের' মস্ত জড়,
আজ যে আপন, কাল সে পর!

—'ছোটলোক'—

খুব সকালে লাফিয়ে ওঠা,
কাজের তাড়ায় ভীষণ ছোটা;
চালাক চতুর, বুদ্ধি সরু,
চেনে আপন জোরু, গরু;
ঘুমায় সুখে ছোট্ট ঘরে,
খায় না দাওয়াই মরণ-জ্বরে;
খাচ্ছে চষে ভিটে-মাটি,
হাত-পা-ফাটা মানুষ খাঁটি।

—মধ্যবিত্ত—

পড়ে শুনে দুঃখ ভোগা,
নাগাড়-অভাব, নেহাৎ রোগা!
লম্বা কোঁচা, সব কেরাণী,
বস্তা মেয়ের, টানাটানি!
ফন্দি ফিকির আঁটছে নানা,
শাস্ত্র বিয়েয় শাস্ত্র মানা।
আয়ের চেয়ে ব্যয়টি বড়,
পেটের দায়ে জড়-সড়!

—টিকেট্‌ কলেক্টার—

"টিকেট্‌ দেখাও, টিকেট্‌ কোথায়?"
কালা সাহেব, ধুচ্‌নি মাথায়;
"তুম্‌কো টিকেট্‌?—তোমার কি চাই?"
"হয়নি টিকেট্‌ বাবু মশাই!"
"ফ্যালো এখন ডবল্‌ ভাড়া।"
"দয়া করুন্‌, যাব মারা!"
"বক্‌ছো কেন? পাঁচসিকে দাও!"
"ধরুন্‌ বাবু!" "এখন পালাও!"

—'সভ্য'মেয়ে—

পুরুষের মতো বাঁকা টেড়ি,
ছোঁয় না হাঁড়ি হাতা বেড়ি;
চক্ষু বসা, চশমাও চাই,
খোঁপা বাঁধা আপদ বালাই!
শাড়ীটি বেশ ঘুরিয়ে পরা,
নাটক নভেল সাবাড় করা;
চরণ কমল জুতায় ঢাকা,
ঠোঁটটি শাদা, জীবন ফাঁকা!

—'শিক্ষিত'বর—

মাথার উপর চুলের ঝুঁটি,
চশমা-ঢাকা চক্ষু দুটি;
নাইকো দেহে মাংসপেশী,
বাবু-য়ানি বেজায় বেশী!
বই পড়েছে গাদা গাদা,
বিবেক বিহীন নিরেট গাধা!
ভিজে বেড়াল, চরণ-চাটা,
ক'নের বাপের কেনা পাঁঠা।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সমস্যা।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর একটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। শৈলেনের বেতন বৃদ্ধি হইয়া দুইশত টাকা হইয়াছে; সে বিবাহ করে নাই। বৌ'দি শৈলেনের নিকট হার মানিয়াছেন, সে মুখে বলিতেছে, দেশের সেবার জন্য চির-কুমার থাকিবে, কিন্তু কার্য্যতঃ গোলামীই করিতেছে, আর কল্পনায় স্বর্গ মর্ত্ত্য গড়িতেছে।

পারুল ও দুঃখিনীর যৌবনে প্লাবন ধরিয়াছে। পারুল মেট্রিকুলেসন পাস করিয়া ইডেন ফিমেল হাস-পাতালের নার্সিং ক্লাসে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ঠাকুরমার ৺কাশী প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

দুঃখিনীর জন্য বিধুবাবু উমেদার। বিধু আগরতলার পাহাড়ে তুলার চাষে ব্যস্ত, তথাপি ঘন ঘন চিঠি লিখিয়া নগেনকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।

বাঙ্গালার জলবায়ুতে জীবনী-শক্তির বান ডাকিয়াছে—ঘরে ঘরে যুদ্ধযাত্রার সাড়া পড়িয়াছে; যুবকেরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে উৎসাহে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

স্বদেশী শিল্পেও নব জাগরণের লক্ষণ ফুটিয়া উঠি-য়াছে। স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট রাজ-কোষ হইতে অর্থব্যয় করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন সুতরাং দেশীয় জন সাধারণ ও দেশীয় শিল্পে উৎসাহ দান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলে নগেনদের হৌসের কাজ খুব আশা-প্রদ। সে এখন হৌসের প্রধান কর্ম্মচারী।

পীরপুরের সামাজিক দলাদলি 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং' অবস্থায়ই আছে। শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ সেজন্য শরীরের রক্ত জল করিয়া খাটিতেছেন।

নগেনের পিতা শ্যামগ্রামের বিবাহের দিন পরিবর্ত্তন করিতে লিখিলে পাত্রীপক্ষ সম্মত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা দেড় হাজার টাকা পণ দিয়া একজন এম. এ পাস করা অধ্যাপকের সহিত সেই ফাল্গুন মাসেই কন্যার বিবাহ করাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং তারাচরণ সেই পাঁচ শত টাকাতো দেনই নাই, এখন শ্যামগ্রামের জমিদারের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী করিতেছেন। এদিকে তাহার স্ত্রী—নগেনের বিমাতা নিজ বোন ঝিকে পুত্রবধু করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। নগেনের সম্মুখে এখন ইহা একটী গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ বিষয়ে নগেন তাহার পিতার নিকট হইতে এক চিঠি পাইয়াছিল। সে চিঠি পাওয়া অবধি নগেনের মন সুস্থ ছিল না। নিজের শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া ও পিতার সম্মান বজায় রাখিয়া কিরূপে পত্রের উত্তর দেওয়া যায়, নগেন কাগজ কলম লইয়া আজ তাহারই জবাব লিখিতেছিল।

এমন সময় দুঃখিনী আসিয়া বলিল—"চা'ল নাই যে, গজা চা'ল কিনিতে পারিবে না।"

নগেন কলম রাখিয়া হাসিয়া বলিল—"মাটি করিলে,

আমার দোষ নাই ; তোমার কথাই ভাবিতেছিলাম, ভগবান তোমার উপর সন্তুষ্ট নন।"

দুঃখিনী হাসিয়া বলিল—"আমার ভগবান সন্তুষ্ট থাকিলেই আমার কল্যাণ। আমি অন্য ভগবান জানি না।"

"তবে এইখানে বসো, তোমার রূপ-সুধা পান করিয়াই আজ ভাতের ক্ষুধা দূর করিব।" বলিয়া নগেন কলম রাখিয়া দিয়া একদৃষ্টে দুঃখিনীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

দুঃখিনী জড়িতস্বরে বলিল—"১০টায় আফিসে তো পাঠাইতে হইবে, বসিলে চলিবে কেন ?"

"যতক্ষণ চা'ল না আসে ততক্ষণ তো অবসর, বসো না খানিক—দেখি তোমার হাত ?" নগেন দুঃখিনীর বাম হস্ত টানিয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া কলম দিয়া হাতের রেখার উপর টানিয়া বলিল "এ আয়ুরেখা—তুমি দীর্ঘায়ু হইবে, এই দুটী বিবাহের রেখা—" বলিয়া দুঃখিনীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল "তোমার দুই বিবাহ—"

দুঃখিনী কপট ক্রোধে হাত টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নগেন উচ্চ হাস্য করিয়া কলম কাগজ রাখিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

দুঃখিনী বলিল—"আপনি ভারি—"

নগেন বলিল—"পাজি, নাকি ? যাক, চা'ল খাইবেতো টাকা দাও।"

দুঃখিনী টাকা খুলিয়া দিলে, নগেন বাজারে চলিয়া গেল।

শৈলেন 'কলে' গিয়াছিল। আসিয়াই দেখিল, টেবিলের উপর তাহার ডাকের চিঠিখানা তাহার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া আছে, যষ্টি ও টুপিটী রাখিয়া সে খাম খানা খুলিয়া ফেলিল। চিঠি বাড়ী হইতে তাহার বউদিদি লিখিয়াছেন। চিঠিতে অনেক নূতন সংবাদ আছে। শৈলেন চিঠিখানা পড়িয়া তাহা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া পোষাক খুলিতে খুলিতে ডাকিল "পাখি! নগেন কোথায় ?"

দুঃখিনী আসিয়া পাখা খানা নিকটে রাখিয়া বলিল—"তিনি চা'ল আনিতে দোকানে গেলেন।"

শৈলেন পোষাক রাখিয়া পাখায় বাতাস দিতে দিতে শয্যায় পড়িয়া চিঠিখানা আর একবার পড়িল।

শৈলেনের বৌদি লিখিয়াছেন :—

"আপনি নিজে না লিখিলেও শুনিতে পাইলাম—আপনার চিত্তাকাশে বসন্তের সাড়া পড়িয়াছে, আপনি নাকি একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে প্রস্তুত হইয়াছেন! এ সংবাদ শুনিয়া বাড়ীর সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। শেষটায় আপনি চাঁদের লোভে জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন, সে জন্য আকাশের চাঁদ ভূক্রে পাইবার চেষ্টা চলিতেছে। রাজনগরের রাজার মেয়ে—সুরমা সুন্দরী, শুনিলাম প্রতিমার চেয়েও রূপসী—একেবারে ডানাকাটা পরী। এখন আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া পছন্দ হইলেই এ সম্বন্ধ স্থির হইতে পারে। বিবাহ বিলাতি ধরণে আলাপ পরিচয় করিয়াই হইতে পারিবে ; ইহাতে তাঁহারা অসম্মত নহেন।

আর এক কথা। কাশীতে ভাল কুল পাওয়া যায়, পাথর বাটী এবং কাশীর পেয়ারাও প্রসিদ্ধ ; কাশীতে যে ঘরকন্না করিবার গিন্নীও মিলে তাহা শুনি নাই। আপনাদের ভাগ্যে শুনিলাম, তাহাও মিলিয়াছে। ইহাকেই বলে—ফাটা কপাল। যাই হউক, আর এদিক ওদিক ছুটিয়া কপাল ফাটাইতে হইবে না। বাবা জানিতে চাহিয়াছেন, কবে আপনি আসিতে পারিবেন * * "

স্পষ্ট কথায় রাগ না হয়, এমন লোক জগতে খুবই বিরল। শৈলেন তার বৌদির চিঠিতে এই সকল অপ্রিয় সত্যের আভাস পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গেল। চিঠির লিখিত প্রত্যেকটী কথা যেন অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের ভিতরের দুর্ব্বলতা গুলিকে জন-সমাজে ব্যক্ত করিয়া দিতেছিল। এমন লজ্জা যে অসঙ্কোচে দিতে পারে দুর্ব্বল মানব তাহাকে কখনও নিতান্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না।

শৈলেন রাগে চিঠিখানা জড়াইয়া টেবিলের নীচের ঝুপড়ীতে ফেলিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া রহিল। চিঠির আর কোন লেখাই তাহার মনে ক্রিয়া করিল না—কেবল 'ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া' ও 'কাশীর গিন্নী'—এই শ্লেষ বাক্য দুটী ব্যতীত।

নগেন আসিয়া দেখিল শৈলেন, চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, তাহার এক পা টেবিলের উপর আর এক পা দেয়ালে ঠেস দেওয়া। শয়নের ভঙ্গি দেখিয়া নগেন বলিল—"আজ কিছু পাও নাই নিশ্চয়!"

"কি করিয়া বুঝিলে?"

"উদ্ভট রকমের শয়ন ও নিরাশ ব্যঞ্জক চাহনি দেখিয়া।"

"অনুমান বিদ্যা সিদ্ধ হয় নাই; দুটা কলে ষোল টাকা পাইয়াছি।"

"তোমার বাড়ীর চিঠি এখানেই ছিল, পাইয়াছ কি?"

শৈলেন বলিল—"অত্যন্ত বিশ্রী সে চিঠি, পড়িয়া মনটা বড়ই স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া গিয়াছে।"

নগেন বলিল—"কি লিখিয়াছেন বৌদি? এমন কি বিশ্রী কথা তিনি লিখিতে পারেন?"

শৈলেন দুঃখ করিয়া বলিল—"তাঁরা না করিতে পারেন—এমন কাজই নাই, না বলিতে পারেন—এমন কথা নাই। জীবনটার কোন দিকেই শান্তি পাইলাম না, নগেন, তুমি তবু আছ ভাল। একটা আকর্ষণে দিন কাটাইয়া দিতেছ। আমার বর্ত্তমানও নাই, ভবিষ্যৎও নাই।

শৈলেনের দুঃখটা নগেন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে মাত্রা মধ্যমে রাখিয়া বলিল—'আমিই বা কি শান্তি লইয়া আছি, আর তুমিই বা এমন কি অশান্তিতে দিন কাটাইতেছ, ভাল বুঝিতে পারিলাম না। সমস্যা দেখিতেছি আমি, উভয়েরই তুল্য। প্রেমে পড়া ব্যাধিটা যে মানুষের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়া দেয়, সেতো প্রত্যক্ষই অনুভব করিতেছি—তোমার কষ্টের কারণ আজ আবার এমন বিশেষ ভাবে কি দেখা দিল হে?" .

শৈলেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"থাক্ তবে, ভাই, আর বর্ত্তমানকে নষ্ট করিব না, চির আকাঙ্ক্ষীত ভবিষ্যতের স্বর্গখণ্ড গড়িতেই যত্ন করিব।"

নগেন হাসিয়া বলিল "সে কেমন, সন্ন্যাসী হইবে নাকি?"

শৈলেন হঠাৎ উঠিয়া বলিল "যুদ্ধে যাইব।"

নগেন করতালি দিয়া বলিল—"সাবাস। চির-আকাঙ্ক্ষীত ভবিষ্যতের স্বর্গখণ্ড—বেশ বলিয়াছ ভাই। সে কবে, কাল থেকেই কি? গাধা ঘোড়া কিনা, তাহার পরীক্ষা কিন্তু পগার ডিঙ্গাইবার বেলায়, এইবার তাহার পরীক্ষা হইবে।"

শৈলেন নগেনের বিদ্রূপের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিল—"ফ্রান্সে ও মেসোপটেমিয়ায় মেডিকেল এইড্ চাহিয়াছে—চেষ্টা করিলেই যাইতে পারি।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"পারুল দিদির সম্মতি চাইতো! না আজকার অধিবেশনে চা পেয়ালায় কোন খণ্ড প্রলয় হইয়া গিয়াছে?"

শৈলেন শ্লেষ বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়া বলিল—"সকলেরই সম্মতি চাই—তোমার মত কি?"

নগেন বলিল—"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার এই প্রস্তাবে সম্মতি দান ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। এখন চল স্নানের যোগাড় করি।"

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পারুলের মন কিছুদিন হইতে বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার জন্য তাহার মা ও বাবা বিশেষ উদ্বিগ্ন।

পারুল শৈলেনের নিকট ক্রমে তিন খানা চিঠি লিখিয়াছে, এক খানারও লিখিত জবাব পায় নাই; শৈলেন অনুরোধ রক্ষা করিয়া আসিয়া একদিনও সাক্ষাৎ করে নাই। প্রথম দিনের চিঠির উত্তরে শৈলেন দারোয়ানের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিল—'সন্ধ্যায় যাইব।' পারুল সারা সন্ধ্যা অপেক্ষা করিয়া হতাস হইয়া রাত্রে পুনরায় চিঠি পাঠাইয়াছিল। দারোয়ান রাত্রিতে যাইয়া তাহাকে পায় নাই, চিঠি রাখিয়া আসিয়াছিল। পারুল আশায়, আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল—তবে তিনি রাত্রে আসিবেন বলিয়াই বাহির হইয়াছেন, অবশ্যই আসিবেন; আজ কতদিন—এদিকে তিনি আসেন না!"

রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত পারুল ছটফট করিয়া কাটাইল; তারপর একটা ছল ধরিয়া বকুলের সঙ্গে ঝগড়া করিল, এবং কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিল। ইহার পরও শৈলেন আসিল না।

প্রাতে পারুল আশাকে পাঠাইল। আশা কলেজ হাসপাতালে গিয়া ১০টা পর্য্যন্ত এদিক ওদিক ঘুরিয়াও শৈলেনের কোন খোঁজ করিতে পারিল না। তাহার বাসায়ও তাহাকে পাইল না। সে স্কুলের বেলা করিয়া বাসায় চলিয়া আসিল।

পারুল আশার পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। আশাকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে দেখিয়া তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। আশা যখন উপরে আসিয়া চিঠিখানা পারুলের হাতে ফেরত দিয়া বলিল—"না দিদি; তাঁহাকে পাইলাম না।" তখন পারুল আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না; সে তাহাদের কোঠার দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া চোখ মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পারুলের অবস্থা বকুল খুব লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার মাতার নিকটও তাহা গোপন ছিল না। মেয়ের অবস্থা ভাবিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন।

স্নানের সময় পারুল দরজা বন্ধ করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া তিনি দরজায় বারংবার আঘাত করিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন। পারুল "যাই মা" বলিয়া উঠিয়া চোক মুখ যথা সম্ভব সতর্ক যত্নে মুছিয়া বাহির হইয়া আসিল।

মা দেখিলেন—মেয়ের মুখ ফুলিয়া লাল হইয়া গিয়াছে, চোখের অবস্থা বড়ই অস্বাভাবিক।

মা বলিলেন—"তোর কি হইল পারুল, এরূপ করিলে কি শরীর থাকে?"

পারুলের লজ্জা বোধ হইতেছিল। সে আত্ম রক্ষার জন্য বলিল—"কিছুতো হয় নাই মা, একটু ঘুম পাইয়াছিল।" বলিয়া সে কলের কোঠায় চলিয়া গেল।

বকুল দিদির পাছে পাছে স্নানের কোঠায় যাইয়া বলিল—"চল না দিদি, বারটায় গিয়া তাঁহাকে বাসায় ধরি—পাখী দি তো কতদিন যাইতে খবর দিতেছিল; ঘরে বসিয়া কাঁদিলে কি কোন কাজ হয়, না ওই ছেলে ছোকরা দিয়া কাজ হয়। গরজ বড় বালাই—ডাক্তার মানুষ অর্থ-পীপাসু—তাঁর কি পরের দরদ বুঝিবার অবকাশ আছে? আজ রবিবার দ্বিপ্রহরে নিশ্চয় ধরিতে পারিব।"

বকুলের কথায় সহানুভূতি ছিল, একটু রসিকতাও ছিল; পারুল তাহা প্রীতির ভাবেই গ্রহণ করিয়া বলিল—"তবে চল্, সইকে দেখিয়া আসি। শৈলেনদার এখন আর আমাদের প্রতি মোটেই টান নাই, সাত দিনের মধ্যে একবার আসিলেন না—কথাবার্ত্তাও ঠিক রাখিতে চেষ্টা করেন না।"

বকুল বলিল—"কাজের লোকের পক্ষে কথাবার্ত্তা ঠিক রাখা সকল সময় হইয়া উঠে না দিদি! তোমার গরজ তো আর তাঁর গরজ নয়।"

পারুল বলিল—"তবে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া নে বকুল।"

বকুল বলিল—"চল।"

নাইট্রোজেন চয়ন।

অম্লজান (অক্সিজেন—oxygen) প্রতিনিয়ত আমরা শ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া তবেই বাঁচিয়া থাকি। পাঁচ মিনিট অক্সিজেন না পাইলে সর্ব্বত্রই অন্ধকূপ হত্যার অভিনয় দেখা যাইত। সকল প্রাণীরই জীবন ধারণ জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন; সকল প্রকার জ্বলন ক্রিয়ার জন্যও ইহারই প্রয়োজন। এইরূপ নানা ভাবে বায়ু হইতে অক্সিজেন সর্ব্বদাই কাজে লাগান হইতেছে। কিন্তু বায়ুর অন্যতর উপাদান নাইট্রোজেনের কোন ক্রিয়াই আমাদের লক্ষ্যভূত হয় না। বায়ুর নাইট্রোজেন (যবক্ষারজান) জীবন ধারণ জন্য কোনরূপ সাহায্য করে না। দাহাদি ক্রিয়ায়ও ইহার কোন কার্য্য নাই। এজন্য ইহাকে নিষ্ক্রিয় আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

বিশ্লেষণ দ্বারা ও অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে যদিও বায়ু হইতে ইহা গ্রহণ করা হয় না, অন্যভাবে ইহা আমরা শরীরে সর্ব্বদাই গ্রহণ করিতেছি। এবং জীব শরীর সংগঠনে ও ইহার পুষ্টিবিধানে অক্সিজেনের মতই ইহা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য। এই নাইট্রোজেন আমরা উদ্ভিদ শরীর হইতে গ্রহণ করি। উদ্ভিদ সকল নাইট্রোজেনের প্রধান পদার্থ মাটি হইতে রসরূপে গ্রহণ করে এবং কোন কোন উদ্ভিদ একপ্রকার জীবাণুর

(Symbiotic Bacteria) সাহায্যে বায়ু হইতেই নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে। যে সকল উদ্ভিদের শিকরে ছোট ছোট গণ্ড দেখা যায় (যেমন আলু, মুগ, চনা প্রভৃতি) তাহারা অত্যধিক পরিমাণে ঐ সকল গণ্ডস্থিত জীবাণু সাহায্যে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া পুষ্টি লাভ করে। বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে পুষ্টিকর ফলাদি ও মাংস ঘৃতাদিতে এই নাইট্রোজেন বহুপরিমাণে বিদ্যমান আছে ; এবং ইহার সংশ্রবেই ঐ ঐ পাদার্থ সকল পুষ্টি জনক। যে সকল পদার্থ জমির সার রূপে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে নাইট্রোজেন-প্রধান-পদার্থই বহু প্রচলিত।

নাইট্রোজেন এইরূপে বায়ু হইতে উদ্ভিদ শরীরে উদ্ভিদ্ শরীর হইতে প্রাণীশরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু কোথাও স্থিত বা সঞ্চিত থাকেনা। মূত্র ও পুরীষের সঙ্গে নাইট্রোজেন বহুপরিমাণে বাহির হইয়া যায়। এই মূত্র পুরীষাদি পচিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হয় এবং নাইট্রোজেনের উপাদান পচন ক্রিয়ার সাহায্যে পুনঃ বায়ুতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্য একপ্রকার জীবাণু আবার এই পচন ক্রিয়ার খুব সাহায্য করে। পচন ক্রিয়াদ্বারা যে সকল নাইট্রোজেনই নাইট্রোজেন রূপে পরিণত হয় ; তাহা নহে ; ইহাদ্বারা অন্যান্য পদার্থও প্রস্তুত হয়। সোড়া (Nitre) এই জাতীয় পদার্থ মধ্যে প্রধান। যে সকল স্থানে গোমূত্র ও গোময়, অশ্ব ও মহিষাদির মূত্র পুরীষাদি রাখা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে মাটির উপর এক প্রকার সাদা লোণার মত পদার্থ দেখা যায় ; উহাই সোড়া। নালা, নর্দ্দমা ও গোমূত্রাদি রক্ষার স্থান হইতে সাদা পদার্থ কুড়াইয়া জলে দ্রব করিয়া, ঐ জল ছাঁকিয়া পুনঃ শুকাইলে যে সাদা দানাদার গুঁড়া পাওয়া যায়, তাহাই সোড়া। বিহারে সোড়াওয়ালা বলিয়া এক জাতীয় লোক এই কাজ দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সোড়া বহু প্রয়োজনে আইসে। মাটির সার, বিস্ফোরক ও নাইট্রিক এসিড্ প্রস্তুত জন্য ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। কলিকাতার চতুষ্পার্শে সোড়া প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকটী ছোট ছোট কারখানা আছে।

যে পরিমাণ সোড়া জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন, এই প্রণালীতে প্রস্তুত সোড়ায় তাহার শতাংশেরও সরবরাহ করিতে পারে না। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের বৃষ্টিহীন প্রদেশে, প্রধানতঃ—পেরু, বলিভিয়া এবং চিলিতে ও তারাপাকা মালভূমির মধ্যস্থ বিস্তৃত ভূভাগে—বহু পরিমাণ সোড়াজাতীয় পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। এই সোড়াই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এখন রপ্তানি হইতেছে। এই সোড়ার ভাণ্ডারও অফুরন্ত নয়, অথচ ইহার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। সুতরাং যেরূপ ভাবে খরচ হইতেছে আগামী ৫০ বৎসর মধ্যেই হয়ত এই ভাণ্ডার ফুরাইয়া যাইবে। তখন নাইট্রোজেন প্রধান এরূপ কোন পদার্থ অন্য কোথাও যে পাওয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না ; এজন্য বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার বায়ুমণ্ডলকেই ইহার জন্য আশ্রয় করিতে বলেন। তাঁহাদের মতে বায়ুমণ্ডল স্থিত নাইট্রোজেনকে বিদ্যুৎ—স্ফুলিঙ্গ সাহায্যে অম্লজান অথবা অন্য পদার্থের সহিত যুক্ত করিয়া সোড়া জাতীয় পদার্থের বিকল্পসাধন করাই যুক্তিযুক্ত। এই পরিকল্পে সাইমেনস (Siemens) এবং হাল্‌স্‌কে (Halske) ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এক প্রকার কল কৌশলের উদ্ভাবন্ করেন যাহার সাহায্যে প্রথমতঃ বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনকে যুক্ত করাইয়া, পরে চুণের জলের সহিত সংযোগ দ্বারা, সোড়ার বিকল্প পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই বিকল্প পদার্থ বহুপরিমাণে জমির সাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান (নাইট্রোজেন) চয়ন বিষয়ে নরওয়ের বার্কলেণ্ড ও আইড্ (Birkeland and Eyde) কোম্পানির কল কারখানা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এমেরিকা এবং ইটালীতেও এই জাতীয় কল কারখানা বহু পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছে। ব্রিটিশ যুক্ত রাজ্যেও ঐরূপ কল কারখানা স্থাপন জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল ; ঐ কমিটী সম্প্রতি তাঁহাদের উদ্ভাবিত প্রণালীর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ।

দুঃখ রাত্রি।

আজি, অমাবস্যার রাতি।
　বাদলের ঘায়ে, ঘন ঘোর বায়ে,
　　নিবিয়া গিয়াছে বাতি।
　　　নিবিড় আঁধারে বিলুপ্ত পথ,
　　　কাঁপিছে তরাসে বিশ্ব জগত,
　　　একাকী গহনে চলেছি বিজনে
　　　　হারায়ে সঙ্গী সাথী ;
　　　আজি, অমাবস্যার রাতি।
এযে, দুঃখের নিশীথিনী।
　নাহি উৎসব, হাসি কলরব,
　　রুণু রুণু রিণীঝিণী।
　　　সমুখে মৃত্যু দুর্দ্দমকাল,
　　　ভীমভৈরব ভীষণ করাল,
　　　হাঁকিছে সরোষে, ঘোরনির্ঘোষে,
　　　　ঝলসে সৌদামিনী ;
　　　এযে, দুঃখের নিশীথিনী।
তবু, করে যাত্রা সুরু।
　দিগম্বরালে, ঘন করতালে,
　　বাজুকরে গুরু গুরু।
　　　ফুঁকারি দৃপ্ত বিজয় শঙ্খ,
　　　হাঁকরে রুদ্র মহা আতঙ্ক,
　　　প্রলয়ের দুঃখে কাঁপুক বক্ষে
　　　　সংসয় দুরু দুরু ;
　　　তবু, যাত্রা করো রে সুরু।

শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী

স্বামী সেবা।

(১)

তখন পাটের কারবার করিতাম। ভাদ্রের অপরাহ্ন। চাপরার হাটে পাটের অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মস্থলে ফিরিতেছিলাম। সন্ধ্যার ‘মৌতাতের’ পর সামান্য একটু গব্যরসের প্রয়োজন হয়। একটা পাটের ফাড়িয়া দয়ার্দ্র চিত্তে একটু দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল, তাহাই একটী মাটির ঘটে লইয়া—ঘটের গলদেশে দড়ি—ঝুলাইয়া বাইকের পৃষ্ঠে চড়িয়া ধীরে ধীরে রওয়ানা হইয়াছিলাম। অর্দ্ধ পথেই বৃষ্টির সহিত তুফান দেখা দিল। বৈশাখের ভীষণ ঝড় ও শ্রাবণের মুষলধারা এই অসময়ে এক সঙ্গে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম না ; সুতরাং গ্রাম্য সড়কের কর্দ্দমাক্ত পথে দুর্ভোগের একশেষ ভোগ করিতে হইল। রেল ষ্টেশন তখনও এক মাইল দূরে ছিল। এই অল্প পথও দুর্য্যোগে ভয়ানক দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এ অবস্থায় নিরালম্ব উচ্চাসন ত্যাগ করিয়া চলাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিলাম।

মাথার ফিরিঙ্গি টুপিটী ঝড়ের দাপট সহ্য করিয়া থাকিয়া তাহার প্রভুর পৈত্রিক মস্তকটী আর আগুলিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না—আমিও আমার বাহনটীর মায়া এবং মৌতাতের সম্বল ত্যাগ করিবার প্রলোভন বর্জ্জন করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে পারিলাম না। বেচারা মস্তকচ্যুত হইয়া যাইয়া আছাড় খাইতে খাইতে রাস্তার ধারের নর্দ্দমায় গড়াইয়া পড়িল।

ভবিষ্যতের অবস্থা আরো শোচনীয় বুঝিয়া আমি আর সে দিকে তাকাইতেই পারিলাম না। বাম দিকে একখানা গৃহস্থের বাড়ী ছিল, সে দিকেই বাইক ফিরাইয়া চালাইলাম। তারপর অতি কষ্টে আপাদ মস্তক ধারা-সিক্ত করিয়া যাইয়া সেই গৃহস্থ গৃহে আশ্রয় লইলাম।

গৃহস্থের খড়ের ঘরে বাইকটী খাড়া করিয়া রাখিয়া তাহার পার্শ্বেই দুগ্ধপূর্ণ মৃন্ময় পাত্রটী রাখিলাম, তারপর কোটের বুক পকেট হইতে রুমাল লইয়া বৃষ্টিসিক্ত ললাট ও মুখমণ্ডল মুছিতে চেষ্টা করিলাম। এই সময় আরো একটু জোড়ে বাতাস বহিতে লাগিল এবং থাকিয়া থাকিয়া খড়ের ঘরখানা মেলেরিয়া রোগীর মত কাঁপিতে লাগিল। আমি বাইকের সহিত আবদ্ধ পাত্রিকায় মোড়ান আমার দ্বিতীয় ধুতি ও গামোছা খানা খুলিয়া লইয়া এবং দুগ্ধের পাত্রটী তুলিয়া লইয়া একদৌড়ে খড়ের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া বাহিরের দ্বিতীয় ঘরখানায় যাইয়া আশ্রয় লইলাম। বাতাসের সহিত বৃষ্টি তখন উগ্রভাবে ছুটিয়াছিল।

(২)

গৃহস্থের একটী যুবতী মেয়ে সেই ঘরে গরুর জাব কাটিতেছিল—আমি পূর্ব্বে তাহা লক্ষ্য করি নাই; তেমন সকল খুটিনাটি লক্ষ্য করিবার অবসর বা সুবিধাও ছিল না। ঝড়ের তাড়নায় আত্মরক্ষার ছুটাছুটিই ছিল আমার লক্ষ্য। আমি সেই ঘর খানায় আসিয়া নিজে যেমন সঙ্কোচিত হইয়া পড়িলাম—সেই বালিকাটীকেও তেমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম।

সে প্রথমে ভীত-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া অতি ত্রাস্ত জাবগুলি ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল এবং বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজার পৈঠাতে নামিয়া দাঁড়াইল। যেন আমি আর এক পা অগ্রসর হইলেই সে চীৎকার করিয়া ঝড় বৃষ্টির মাঝেই ছুটিয়া পলাইতে পারে।

নিরাশ্রয়ের সঙ্কোচ ও লজ্জা থাকে না। আমি এ দুটীকে তখনকার মত মন হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিলাম—"মা তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি বুড় মানুষটী—খানিকটা এখানে দাঁড়াইব—ঝড়টা থামিয়া গেলেই চলিয়া যাইব; তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি পাটের বাবু, গ্রামে-বাজারে পাট দেখিতে আসিয়াছিলাম।

মেয়েটীর যেন সাহস হইল। আমার মস্তকের পক্ক কেশগুলি দেখিয়াই হউক অথবা যোলায়েম সম্ভাষণটী শুনিয়াই হউক, মেয়েটীর পূর্ব্বকার চঞ্চলভাব যেন তিরোহিত হইল। সে ভিতর বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি শরীরের কোটটী খুলিয়া লইয়া দরজার উপর রাখিয়া সংবাদপত্রে মোড়া পুটুলিটী হইতে গামছা খানা লইয়া তাহা দ্বারা আপাদমস্তক মুছিয়া ফেলিলাম। বলা বাহুল্য আমি রৌদ্র নিবারণ জন্য মাথায় একটা ফিরিঙ্গি টুপি ব্যবহার করিলেও পরিধানে পেণ্ট ব্যবহার করিতাম না। ক্ষিপ্রহস্তে কাপড়খানা বদলাইয়া লইলাম। মেয়েটী ততক্ষণ একভাবেই দাঁড়াইয়া থাকিয়া বৃষ্টির অবিরল বর্ষণের ভিতর বোধ হয় কোন ভাবচিন্তা করিতেছিল।

বৃষ্টি থামিল না। আমি একটা কাঠের আলিসার উপর সেই সংবাদপত্রখানা বিছাইয়া তাহাতে উপবেশন করিয়া মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ তোমাদেরি বাড়ী মা?"

মেয়েটী বাহিরের বৃষ্টির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া পুনরায় নীচের দিকে চাহিয়া হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে তাহার নিজ মাথাটী বার দুই উপর হইতে নীচে ঝাঁকিয়া সম্মতি জানাইল—তাহার মুখ হইতে কোন শব্দ বাহির হইল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা ব্রাহ্মণ, না কায়স্থ?"

মেয়েটী খুব সঙ্কোচের সহিত বলিল—"ব্রাহ্মণ।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"তবে মা, আজ আমি তোমাদের অতিথি, আজ আর বৃষ্টি ছাড়িতেছে না, ভালই হইল—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণই গতি।"

মেয়েটি একধাপ উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "তুমি জাব কাটিতেছিলে, কাট; কোন চিন্তা নাই। আমি এই সরিয়া বসিতেছি—"বলিয়া আমি আলিসাটা বাহিরের দরজার দিকে একটু টানিয়া বসিলাম। মেয়েটি ধীরে ধীরে আসিয়া জাবগুলি পাছের দরজার দিকে টানিয়া লইয়া আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া কাটিতে লাগিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"গরু কটি মা—"

মেয়েটী বলিল—'একটী।'

"কোথায়? দেখিতেছিনা যে?"

"ছাড়া থাকে—এখনো আসে নাই—"

"দুধ দেয় কত খানি?"

"অল্প দেয়—আধসের, এক পোয়া।"

"এই বৃষ্টিতে যদি না আইসে,—তোমাদের চাকর আছে কি?" মেয়েটী বলিল—"না চাকর নাই, আমরা বড় গরীব, গাই না আসিলে বাবার জন্যই ঠেকা। এখনই তাঁহাকে একটু দুধ দিতে হইবে।"

মেয়েটীর মুখ হইতে দুঃখের দীর্ঘ নিশ্বাসের মত একটা দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইয়া গেল। আমি বলিলাম—"তোমার বাবার কি হইয়াছে, তিনি কোথায়?"

মেয়েটী উত্তর করিল—"বাবার শেষ অবস্থা—"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"চিকিৎসা করাইতেছ তো?"

মেয়েটীর স্বর ক্রমেই ভার হইয়া উঠিতেছিল—সে ভারাক্রান্ত স্বরে বলিল—"না।"

বাড়ী ঘরের অবস্থা দেখিয়া আমি সেখানা সাধারণ গৃহস্থ বাড়ী বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। এই মেয়ের কথাগুলি শুনিয়া এবং বাহিরের ঘরখানার অবস্থা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের অবস্থা বুঝিতে আমার কিছুই বাকী রহিল না। আমি তখন আরও দুই একটী কথা জানিবার জন্ম জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমাদের পরিবারে লোক কজন?"

বালিকাটী বলিল—'পাঁচ জন।"

আমি বলিলাম—'তুমি. তোমার মা, তোমার বাবা—আর কে?"

"আমার আর একটী ছোট বোন ও ছোট ভাই।"

"দিন চলে কি রূপে।"

"নিত্য ভিক্ষা,"—বলিয়া মেয়েটী নিজ বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

মেয়েটীর কোমল প্রকৃতি ও অভাব বোধের তীব্র জ্ঞান আমার হৃদয় দ্রবকরিয়া দিল। বৃষ্টি তখনও পড়িতেছিল; আমি বলিলাম—তোমার তো জাব কাটা হইয়াছে, এখন এই দুধ টুকু ঘরে নিয়ে জাল দাও দেখি!—তাই তোমার বাবাকে কিছু দাও; আর তোমার মাকে বল, একজন অতিথি আছেন; আমি তোমার বাবাকেও একবার দেখিব।

আমার কথায় মেয়েটী উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুধের পাত্রটী আমি নিজ হাতে তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিলাম। আমার মৌতাতের সময় উপস্থিত, সুতরাং দুধের লোভ আমি একেবারেই ত্যাগ করিতে পারিলাম না,—বলিলাম "এই নাও, লইয়া যাও মা, ভিতরে নিয়া জাল দিয়া, তোমার বাবাকে দাও। একটু বরং আমার জন্তও একটা বাটিতে করিয়া এখানে আন। আমি এখনই খাইব।"

মেয়েটী ধীরে ধীরে চক্ষের জল মুছিয়া মাটির ভাণ্ডটী গ্রহণ করিল, তারপর বৃষ্টিজলে ভিজিয়াই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

আমার এই সামান্ত দুগ্ধটুকু যে একটী রোগ ক্লিষ্ট দরিদ্রের কিঞ্চিৎ মাত্রও উপকারে আসিবে—ইহা ভাবিয়া আমি সেদিনকার আমার সেই দুর্ভোগ ও বিপদ একেবারে ভুলিয়া গেলাম—আমার তখন আত্মগ্লানীর পরিবর্ত্তে বেশ আত্মপ্রসাদই অনুভূত হইতেছিল! এই অসময়ে অতিথি হইলে এইরূপ দরিদ্র পরিবার যে অতিথি সৎকার জন্ম কিরূপ নিরুপায় ও বিপন্ন হইতে পারে এবং এমন স্থলে সেই অতিথিরইবা কি করণীয়, অবশু এসকল চিন্তাও আমার তখন মনে বেশ পরিস্কার ভাবেই উদয় হইতে লাগিল।

পীড়িত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া—প্রয়োজন হইলে কিছু সাহায্যও করিয়া রাত্রি দশটার গাড়ীতে কর্ম্মস্থলে পঁহুছিব, ইহাই স্থির করিয়া ধীরে ধীরে 'মৌতাতের' কৌটা খুলিলাম।

(৩)

মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ সেই দুর্য্যোগ রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভবের লীলা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পক্ষের সেই ষোড়শী কন্যা লক্ষ্মী আছাড় খাইয়া আমার পায় পড়িয়া কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী কান্নাই কাঁদিয়াছিল! তাঁহার স্ত্রীর কান্নাও ভুলিবার নয়। ছোট ছেলেটা ঘুম হইতে উঠিয়া বাবা বাবা বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল; বার তের বৎসরের মেয়ে অমিয়া মায়ের সঙ্গে পিতার পায়ের নীচে পড়িয়া কাঁদিতেছিল—আমি এই বিষম অবস্থার কিরূপে সমাধান করিয়া, বৃদ্ধের মৃত দেহের সৎগতি করিয়া, সেই অসহায় পরিবারের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি—বিস্তৃত ভাবে তাহা আমাদের আফিসের কেরাণী রজতের নিকট বলিলাম।

রজত দরিদ্রের ছেলে—সে দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট খুব প্রাণের সহিত অনুভব করিত। আমি তন্ন তন্ন করিয়া সেই বিপন্ন পরিবারের সকল কথা খুলিয়া বলিয়া শেষ বলিলাম "বাবা, দেখদেখি—এ মেয়েটার একটা—পাত্র চেষ্টাচরিত্র করিয়া না দেখিয়া দিলে আর হবে না। মেয়েটা নামেও লক্ষ্মী কাজেও লক্ষ্মী; তোমাকে ইহার জন্ম—আমার খাতিরে কিছু চিন্তা করিতে হইবে—তারপর তাদের যা কুলে-কপালে আছে, সে তো হইবেই।"

রজত উৎসাহের সহিত বলিল—"দেখিতেই হইবে, বিপন্নের সাহায্যই মনুষ্যত্ব প্রকাশের উপায়—দরিদ্রের কুটীরেই ভগবানের বাস। অবশ্য দেখিব, খুড়া মহাশয়।"

রজতের কথায় আমাদের সকলেরই খুব বিশ্বাস ছিল। বিপন্নের উদ্ধারে, রোগীর সেবায় রজতের সহানুভূতির কথা আমাদের আফিসে আফিসে সকলের মুখেই প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইত। সুতরাং সকলেই একবাক্যে বলিল—"ও ছোকরা একটা ব্যবস্থা ঠাওরাইয়া দিতে পারিবেই।"

(৪)

আমি রজতের উপর বিপন্ন পরিবারের এই ভারটুকু চাপাইয়া রাখিয়া এবং তাহাকে লইয়া তারপর দুইদিন তথায় যাইয়া বিশেষ করিয়া আলাপ পরিচয় করাইয়া দিয়া আসিয়া কিছুদিন পরে হেড্ আফিসে নারায়ণগঞ্জ চলিয়া যাই; সুতরাং বহুদিন আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই বিপন্ন উপায়হীন পরিবারের কোন তত্ত্ব খবর রাখিতে পারি নাই। তবে, রজতের উপর আমাদের এতখানি বিশ্বাস ছিল যে, সে নিশ্চয় তাহার স্কন্ধে অর্পিত দায়িত্যের সাধ্যানুসারে সদ্ব্যবহার করিবে।

রজত তাহা করিয়াছিল। কিছু দিন পরেই রজত আমাকে চিঠি লিখিয়া জানাইল, তাহার এক বন্ধু তাহার নিকট স্বর্গীয় যদু ভট্টাচার্য্যের বিপন্ন পরিবারের অবস্থা অবগত হইয়া সেই পরিবারের গৃহ রক্ষিত জামতা রূপে তাঁহাদিগের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে। ভট্টাচার্য্যের বিধবা ব্রাহ্মণী এই প্রস্তাবের 'লক্ষ কথা' শেষ করিবার জন্য আমাকে এক বার তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি যাইতে পারি নাই।

ইহার মাস দুই পর ভট্টাচার্য্য-ব্রাহ্মণীর নিকট হইতেও আমি তাঁহার মেয়ের শুভ বিবাহের সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থে যোগ দান জন্য এক অনুরোধ পত্র পাইয়াছিলাম; সেবারও—কি কারণে স্মরণ হইতেছেনা—শুভ বিবাহে যোগ দান করিতে পারি নাই, তবে যৎ সামান্য কিছু আশীর্ব্বাদ নব দম্পতির জন্য পাঠাইয়াছিলাম; এবং রজতকে চিঠি দ্বারা তাহার এই গুরুতর কর্ত্তব্য জ্ঞানের জন্য ধন্য বাদ প্রদান করিয়াছিলাম।

রজত বিবাহের পর আমার পত্রের উত্তর দিয়াছিল। তাহাতে সংক্ষেপে শুভ বিবাহ সুসম্পন্নের সংবাদটী ছিল।

এই ঘটনার কিছু কাল পরেই আমার স্ত্রী বিয়োগ হয়, বৃদ্ধকালে স্ত্রী বিয়োগের শোক যে কি কঠোর ও মর্ম্মান্তিক, তাহা যাঁহাদের এই দুর্ভাগ্য না ঘটিয়াছে তাঁহারা বুঝিবেন না; আমি যখন এই কঠোর দুঃখ বুকে লইয়া লক্ষ্মীছাড়ার মত গৃহকোণে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তখন রজত তাহার সমবেদনা জানাইয়া যে দীর্ঘ পত্র আমাকে লিখিয়াছিল, সেই দীর্ঘপত্রের শেষ অংশ ছিল এইরূপ ঃ—

* * *

স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্রাহ্মণীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। শিশু পুত্রটীলইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার নিজ ক্রটীতেই যে তাঁহার এই অবস্থা, তাহা এতদিনে মাত্র আমি বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার এই অবস্থার জন্য আমিও কতক পরিমাণে দায়ী; সে জন্য আমার এখন অনুতাপ হইতেছে। আপনাকে সে বিবরণ না জানান পর্য্যন্ত আমি মনে সান্ত্বনা পাইব না। সেজন্য আপনার এ দুঃসময়েও সে কথাটী আপনাকে বলিতে হইতেছে।

আমি আমার বন্ধু উপেনের সহিত যদু ভট্টাচার্য্যের প্রথম পক্ষের কন্যা লক্ষ্মীর বিবাহ স্থির করিয়াছিলাম—আপনিও তাহার জন্যই আমাকে অধিক দায়িত্ব পূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যত তাহা হয় নাই; আমিও তখন তাহা জানিতে পারি নাই।

বিবাহের পর উপেনের নিকট শুনিলাম, ভট্টাচার্য্য গৃহিণী তাহার নিজ গর্ভ সন্তান অমিয়াকেই তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছেন—উপেন অমিয়াকে লইয়া তাহার কার্য্য স্থলে চলিয়া গিয়াছে। সে আমাকে এতৎ সম্বন্ধে আর কোন কথাই জানায় নাই। অবশ্য ইহার ভিতর আরো কিছু রহস্য ছিল—তাহা এখনও আমার নিকট অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে।

ইহার পরও লক্ষ্মীর জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম। খুড়া মহাশয়, বলিতে কি—ইহার পর লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।

আমি আপ্রাণ চেষ্টায় খাটিয়া একটী সৎপাত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার বিমাতার তাহাতে সম্মতি পাইলাম না। আমি তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম—বিধবা সপত্নী-কন্যাটীর বিনিময়ে প্রচুর অর্থলোভ পোষণ করিতেছিলেন।

কিছুদিন পরে শুনিলাম, কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে—পিতৃ তুল্য এক কৃপণ ধনীর হস্তে লক্ষ্মীকে সমর্পণ করিয়া বিধবা প্রচুর অর্থ পাইয়াছেন। খুড়া মহাশয়, এমন পাষাণীও জগতে আছে! আমার স্কন্ধে আপনি দায়িত্ব রাখিয়া গিয়াছিলেন, আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। আর পরের সম্পত্তি ধরিবার করিবারই বা ন্যায়তঃ কি অধিকার আমার আছে? তথাপি প্রথম হইতে অবহেলা না করিলে বোধ হয় আমাকে প্রাণে মনে এত অশান্তি ভোগ করিতে হইত না। এজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। সবই অদৃষ্ট! তবে আজ কয়েক দিন যাবৎ মনে বেশ শান্তি পাইতেছি।

অমলার মা লক্ষ্মীর বিনিময়ে কত মুদ্রা পাইয়াছিলেন, জানিনা। কিন্তু এখন শুনিতেছি—তিনি কিছুই পান নাই, অথবা যাহা পাইয়াছিলেন—হাতে কিছুই নাই—

'বিধবার হাতের কাড়—
কলস আর দাড়—'

অপমৃত্যু না হউক—অপব্যয়ে বা অপচয়ে যে নষ্ট হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। তাঁহার এখন 'নিত্যভিক্ষা তনুরক্ষা' অবস্থা।

লক্ষ্মীর কথা লোকের মুখে শুনিলে দুঃখ হয়, কিন্তু স্বচক্ষে দেখিলে চক্ষু স্বার্থক হয়—ইহা আমার হৃদয়ের একটী সান্ত্বনা। আমি লক্ষ্মীকে আজ কয়েকদিন হইল তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া দেখিয়া আসিয়াছি। বোনটী আমার—আমাকে কত আদর করিল, কত অনুরোধ করিয়া বলিল—তাহাকে যাইয়া সময় সময় দেখিতে। এখন তাহার কি প্রফুল্ল মুখ! মনের কি অসীম স্থিরতা!

আমি দুঃখ প্রকাশ করিয়া যখন বলিলাম—"দিদি, তোমার এই দুঃখের কারণ আমি, আমি যদি প্রথম হইতেই সতর্কতা লইতে পারিতাম, তবে কি আজ তোমার এই অবস্থা!"

লক্ষ্মী প্রফুল্ল মুখে বলিল—"আমার তো কোন দুঃখ মনের ভিতর নাই দাদা, আমি পরম সুখে আছি—আশীর্ব্বাদ করিও রুগ্ন স্বামীর সেবা করিয়াই যেন আমি মনে শান্তি-সুখ অনুভব করিতে পারি।"

রুগ্ন বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করিয়া পূর্ণ যুবতী লক্ষ্মী আজ মনে প্রাণে সুখী! প্রাণের ভিতর কত উচ্চ ভাব ও সান্ত্বনা আশ্রয় লইলে মানুষ এরূপ মনে করিতে পারে—আজ আপনিও তাহা একটু চিন্তা করিবেন। * * *

রঞ্জতের পত্র পাঠ করিয়া ও লক্ষ্মীর অবস্থা এবং তাহার অটল স্বামী ভক্তির কথা চিন্তা করিয়া মনে বাস্তবিকই কতকটা শান্তি লাভ করিলাম।

(৫)

কারবারের সকল ভার ছেলেদের হাতে ন্যস্ত করিয়া আমি যখন ৺ কাশীধামে আসিয়া বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম—তখন আর কোন চিন্তাই আমাকে ক্লান্তি দিতে পারিল না। যে দিন ইচ্ছা হইত ঘরে চারটী রাঁধিয়া খাইতাম; ইচ্ছা না হইলে অন্নাহারেরও প্রয়োজন বোধ করিতাম না—ব্রাহ্মণ ভোজনের আহ্বানে যাইয়া অথবা ফল মূল প্রসাদ খাইয়াই দিন কাটাইতাম।

পাশের বাড়ীর যাত্রীরা সেদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। পাণ্ডা ঠাকুরের এক ব্রাহ্মণ চেলা আসিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন। আমার একটু বিলম্ব হইবে, বলিয়া দিয়াছিলাম। ফলেও তাহাই হইল; —এক ব্রহ্মচারীর নিকট যাইবার কথা ছিল—তাঁহার নিকট হইতে ফিরিতে ফিরিতে অনেকটা সময় অতিরিক্তই ব্যয় হইয়াছিল।

আমি যাত্রী বাসে গিয়া উপস্থিত হইলে পুণ্যকামী মেয়েরা পরম আগ্রহের সহিত আমাকে বরণ করিয়া লইলেন।

আমি হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া বেশ সুস্থ চিত্তে আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। অন্ন পাত্রের দিকে চক্ষু নিবিষ্ট রাখিয়াই আহার করিতেছিলাম। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বল্প অবগুণ্ঠনবতী একটী যুবতী স্ত্রীলোক আমাকে পরিবেশন করিতেছিলেন; চক্ষু নত করিয়া রাখিবার আমার ইহাও

একটী কারণ। পরিবেশন কারিণী এক একটী ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছিলেন, আর আমি পাত্রাবশিষ্ট রহিত করিয়া তৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিতেছিলাম। দেশত্যাগী হইয়া বাঙ্গালীর মেয়ের হাতের এমন অন্ন ব্যঞ্জন যেন আর কখন খাইয়াছি বলিয়াই মনে হইতেছিল না।

আমার এই রূপ নিপুণতায় মেয়েটীর যেন অপরিসীম তৃপ্তিবোধ হইতে ছিল, সে পাতে ব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া একটু পরেই বলিত—এটা আরও একটু দেই বাবা, আর একটু খান—ইত্যাদি।

আমি নিবিষ্ট চিত্তে খাইতেছিলাম, এমন সময় একটী বর্ষিয়সী বিধবা আসিয়া বলিলেন—লক্ষ্মী, মা যাও দেখি, আমিই এখানে দেই, কিজানি কিসের জন্য ডাকিতেছেন?

যুবতী উত্তর করিল "অমিয়া কোথায় মা—তাকেই বলনা, আসিয়া বাবাজীকে দিতে, বাবাজী কিন্তু বেশ খান মা—খাওয়াইতে আমার ভারি সুখ বোধ হইতেছে।"

বিধবা বলিলেন—"অমিয়া নীচে ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা দিতেছে। এখানে আমিই দিতেছি।"

যুবতী হাত ধুইল। আমি উভয়ের মুখের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উভয়কে দেখিয়া লইলাম। তারপর আমার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কৈফিয়ত স্বরূপ বলিলাম—"বড়ই তৃপ্তির সহিত খাইলাম।"

যুবতী তাড়াতাড়ী চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—"দাও মা, বাবাজীকে; আমি না আসিলে যেন উঠেন না তিনি।"

আমি বলিলাম—"এসো মা লক্ষ্মী, আমি তোমার হাতেই খাইব।" আমি অপেক্ষা কৃত ধীরে ধীরে খাইতে লাগিলাম। আমার কথায় ও আচরণে লক্ষ্মীর মা যেন কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন, তিনি আর আমাকে কোন কথা বলিলেন না, পার্শ্বেই আজ্ঞা প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যুবতী স্বামীর আহ্বানে গিয়াছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আর একটু দেই বাবা—"

আমি বলিলাম—"দাও মা—তোমার ইচ্ছা মিটাইয়া খাইব।"

আমার এইরূপ ঔদরিকতা বোধ হয় যুবতীর মাতার মনঃপুত হইয়াছিল না; তিনি মেয়ে আসিলেই চলিয়া গেলেন।

আমি আহার শেষ করিয়া উঠিয়া আমার সন্দেহ মিটাইবার চেষ্টা করিলাম। আমি লক্ষ্মীর লক্ষ্মীস্বরূপা মূর্ত্তি দেখিয়াই চিনিয়াছিলাম; কিন্তু সে আমাকে চিনিতে পারে নাই। আমার চুলগুলি তখন একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর দীর্ঘ সাদা দাড়ি—পরণে গেরুয়া ধুতি, গলায় বৃহৎ বৃহৎ রুদ্রাক্ষমালা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"লক্ষ্মী, তোমার মা আর অমিয়া কি তোমার সঙ্গেই থাকেন, না তীর্থযাত্রার সঙ্গে আসিয়াছেন?"

সে অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আপনি মাকে ও অমিয়াকে চিনেন দেখিতেছি, আপনি এই পাশের বাড়ীতেই থাকেন তো?"

আমি বলিলাম—"তাহারও আগে জানি, আমি তোমাদিগকে অনেক দিন জানি মা, তোমরাই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ। তোমার মাও আমাকে দেখিতেছি, চিনলেন না।"

লক্ষ্মী আমার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"ক্ষমা করিবেন কাকা, আমি চিনিয়াছি; আপনার যে চেহারা হইয়াছে! রজত দাদা, আপনার অবস্থার কথা বলিয়াছিলেন—"

লক্ষ্মী থামিয়া গেল—তাহার গলা ভার ও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছিল।

আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—"বিশ্বেশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। এখন তোমার কথা বল—তোমার মা বোন—তোমার সঙ্গেই থাকেন কি?"

লক্ষ্মী বলিল—"অমিয়া বিধবা হইয়া আসিয়া মার গলায় পড়িয়াছে, মাও নিরুপায়, ভাইটা মূর্খ হইতেছে, ইঁহাদিগকে এই অবস্থায় রাখিয়া পেটে ভাত যায় কি কাকা? আজ এক বৎসর যাবৎ সকলকেই আনাইয়াছি?"

আমি মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম—"তুমি কেমন আছ? তোমার কথা ভাবিয়া অনেক দিন কষ্ট পাইয়াছি মা।"

লক্ষ্মী অম্লানবদনে বলিল—"স্বামীর সেবা করিয়া চিত্তে পরম সুখ পাইতেছি; কাকা, আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত সেবা করিয়াই মরিতে পারি।"

দেখিলাম—লক্ষ্মী তাহার রুগ্ন ও বৃদ্ধ স্বামীর সেবাকেই জীবনের সুখের নিদান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। তৃপ্তিই সুখ, লক্ষ্মী মা প্রকৃতই সুখী!

আমাদের ভবিষ্যৎ।

বিশ্ববিধাতার বিধানই দেখিতেছি, এই যে মানুষকে প্রতিকূল অবস্থার বন্ধুর দুর্গমতার মধ্যদিয়া পথ কাটিয়া চলিতে হইবে। তাই মনুষ্যজাতি যতই জীবন পথে অগ্রসর হইতেছে ততই যেন সংখ্যাতীত দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্ন আসিয়া তাহার গন্তব্য পথে পুঞ্জীকৃত হইতেছে—দিন দিন কত অভাবিতপূর্ব্ব নূতন নূতন সমস্যা জাগিয়া উঠিয়া আধুনিক মানবের জীবন-সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিতেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা যত বাড়িতেছে সঙ্গে সঙ্গে ততই তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব বর্দ্ধিত হইয়া আধুনিক সমাজের জীবন-পথকে কণ্টকিত করিতেছে। আর, বর্ত্তমান যুগের এই সমস্যাগুলি—রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, চারিত্রনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্ম্ম বিষয়ক জটিল প্রশ্নগুলি আমাদের দেশে, এই মহামানবের সঙ্গম-স্থল ভারতবর্ষে যেরূপ বিশালকায় হইয়া উঠিয়াছে অন্যত্র বোধ হয় তদ্রূপ হয় নাই। কারণ, সমুদায় সভ্যজগতের যত পণ্যরাশি যেমন আজ ভারতবর্ষের হাটে বিকাইবার জন্য প্রেরিত হইতেছে, তেমনি বিশ্বের সমুদায় জীবন-সমস্যাগুলিও আমাদের সমষ্টিগত সমাজ-জীবনেরকেন্দ্র স্থলে সঞ্চিত হইয়া সুসম্পূর্ণ মীমাংসার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। এই ব্যথিত পীড়িত বর্ত্তমান জগৎ তাহার পণ্যের বিনিময়ে ভারতের নিকট এমন কিছু চাহিতেছে যাহার বলে সে দারুণ দুঃখদৈন্য শোক, মোহ প্রলোভনের ঝঞ্ঝাবাতের ভিতরে অটল-অটুট থাকিয়া, পথের জড় ধূলিকণার মত বাহ্য অবস্থা পরম্পরার ক্রীড়া সামগ্রী না হইয়া, উন্নত মস্তকে বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে। আর, ঐ বস্তুটি অন্য কিছুই নহে,—তাহা এক অতীন্দ্রিয়, সর্ব্ব-শক্ত্যাধার মঙ্গলময় সত্তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং তদনুযায়ী কর্ম্মচেষ্টা।

২

কিন্তু আধুনিক জগৎ ভারতের নিকট যে ব্যাধির প্রতিকার ভিক্ষা করিতেছে সেই সর্ব্বব্যাপী সংক্রামক নাস্তিকতা নব্যভারতকেও আক্রমণ করিয়াছে। আমরা নিজেদের হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম, প্রাচীনপন্থী কিম্বা নবীনপন্থী বলিয়া পরিচয় দিই না কেন,—পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে ও যুক্তি-প্রিয়তার বশে আত্ম-অনাত্ম বিষয়ক তর্কজাল আমরা যতই বিস্তার করিনা কেন, আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের শতকরা অন্ততঃ নিরানব্বই জন প্রকৃত আস্তিক্য বুদ্ধি কি তাহা জানিনা। যাহাকে আমরা ধর্ম্মানুষ্ঠান বলি, অনেক স্থলেই তাহা হয় গতানুগতিকতা; নয় ধর্ম্ম বিষয়ক যুক্তিমূলক সিদ্ধান্তের নামান্তর অর্থাৎ intellectual assent মাত্র,—অন্তরগত অনুভূতির সঙ্গে তার বড় কিছু সম্বন্ধ নাই। তাই যদি আমরা কখনো আত্মপরীক্ষা করিবার অবকাশ পাই তাহা হইলে বুঝিতে পারি আমাদের চিত্তের ভিতরে আমাদের অগোচরে কি দারুণ দহন দিবারাত্র চলিতেছে, কি নীরব ক্রন্দন আমাদের অন্তরের ভিতর হইতে নিঃসৃত হইতে চেষ্টা করিতেছে। তাই আজ সমগ্র জগৎ তাহার আত্মার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য আধুনিক ভারতবর্ষের নিকট যে অমৃত যাচ্ঞা করিতেছে তাহা বিতরণ করিবার সামর্থ্য আমাদের আছে কিনা গভীর সন্দেহের স্থল। যে নিজে আলোকের সন্ধান ভুলিয়া গিয়াছে সে অন্ধকে কি করিয়া হাত ধরিয়া আলোকের পথে চালিত করিবে?

৩

এই যে এক সর্ব্বব্যাপী নাস্তিকতার হাওয়া আধুনিক ভারতবর্ষকে আপাদমস্তক ছাইয়া ফেলিয়াছে ইহার অন্যতম কারণ আধুনিক জড়বিজ্ঞানসম্ভূত জড়বাদ (materialism) হইলেও, তার নিকটবর্ত্তী কারণ আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অস্বাভাবিকতা। যুক্তিপ্রধান জড়বিজ্ঞানের শিক্ষা আমাদের বহুকালসুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু এই নব শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে আমাদের বহুশতাব্দী-সঞ্চিত, পূর্ব্বপুরুষাগত প্রাচীন সাধনার সঙ্গে আবাল্য গভীর পরিচয়রূপ জাহ্নবীবারিস্পর্শে আমাদের চিত্ত-ক্ষেত্রকে সরস সজীব করিয়া তবে তাহাতে আধুনিক শিক্ষার বীজ বপন করিতে হইবে। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক জাতির প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা আছে

যাহা প্রত্যেক জাতির প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফল। এই ব্যক্তিগত বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা Heredity (বংশানুক্রমিকতা) দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চান, আর আমাদের দর্শনাচার্য্যেরা ইহাকে জন্মান্তরের কর্ম্মফলপ্রসূত সংস্কার বলেন।

এই প্রকৃতিগত বিশিষ্টতাকে উপেক্ষা করিয়া কোন শিক্ষাপদ্ধতিই কোন জাতির প্রকৃত অভিব্যক্তির সহায় হইতে পারে না, পক্ষান্তরে তাহার পরিপন্থী হইয়া থাকে —ইহার অভ্রান্ত প্রমাণ আধুনিক শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়গণ। জন্মান্তরাগত সংস্কারের বশে আমাদের অন্তর-প্রকৃতি যাহা চায় আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা তাহা দিতে পারে না, অথচ বিদ্যালয়ের পুঁথির চাপে আমাদের গৃহের প্রভাবও আমাদের মনের উপর কোন কাজ করিবার অবসর পায় না। তাই এই শিক্ষা আমাদের যাহা দিতে পারে তাহাও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। শিক্ষার যাহা অব্যবহিত উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জ্ঞানস্পৃহার উদ্বোধন, তাহাও আমাদের প্রচলিত শিক্ষাদ্বারা সিদ্ধ হয় না। দু'চার জন সৌভাগ্যবান বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে বলা যায়, এই শিক্ষা গ্রহণের তথ্যের বোধ অপক্ক অবস্থায় আমাদের মনের পাকস্থলীতে ইংরাজী ভাষার কৃত্রিম যন্ত্রমুখে পূরিয়া দেয় মাত্র, এবং ঐ সকল অজীর্ণ তথ্যরাশি আমাদের মানসিক পথ্য না হইয়া মনের ভিতর বিষাক্ত রসের সৃজন করিয়া একটা মানসিক অস্বাস্থ্য জন্মাইয়া দেয়। এইরূপ মানসিক রোগগ্রস্তের নিকট হইতে কোনরূপ মৌলিক চিন্তা বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই মনীষী শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার স্বামী আধুনিক ভারতবর্ষীয়গণের যে স্বরূপ চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত বলে করিতে পারি না। তাঁহার মতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ এক অদ্ভুতপ্রকৃতির জীব ; জগতে আর কোথাও ইহাদের তুলনা মেলে না। ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ইহারা জ্ঞানের অন্তস্তল হইতে কোনরূপ রসসঞ্চয় করিতে না পারিয়া নিতান্ত পল্লবগ্রাহী ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। স্বভাব চরিত্রে বিদ্যা বুদ্ধিতে ইহারা প্রাচ্য ও নহে প্রতীচ্য ও নহে। অতীতের সঙ্গে ইহাদের কোনও যোগ নাই, এবং ভবিষ্যৎও ইহাদের নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে না। জ্ঞান-জগতে ইহারা অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতি স্বরূপ, সেখানে ইহাদের কোনরূপ প্রবেশাধিকার নাই (Non-descript and superficial beings deprived of all roots—a sort of intellectual *pariaws* who donot belong to the East or West, the past or the future.").

৪

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় হইলেও নিরাশ হইবার কারণ নাই। গত এক হাজার বৎসরের মধ্যে নানাবিধ কারণ পরম্পরার সমবায়ের ফলে আমরা সর্ব্ববিষয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি সত্য ; কিন্তু আমরাত সেদিনের অর্ব্বাচীন জাতি নাহি, আমাদের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে কালের কালের ব্যাপকতায় এবং কৃতিত্বের গৌরব-গরিমায় আর কোন্ সভ্য জাতির ইতিহাসের তুলনা হয়? তাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক হাজার বৎসর খুব একটা দীর্ঘকাল নহে। আমাদের বর্ত্তমান অবনতির সূচনার প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কাল। তার কত শত শতাব্দী পূর্ব্বে উপনিষদযুগ, এবং ঐ যুগের কতশত শতাব্দী পূর্ব্বে বৈদিক যুগের সূচনা ও পরিণতি ঘটিয়াছিল তাহা তোমার তথ্য-কথিত ইতিহাস এ পর্য্যন্ত সঠিক গণনা করিয়া উঠিতে পারে নাই। মোটকথা, আধুনিক ইতিহাসের অনায়ত্ত অগণিত যুগযুগান্তে হিন্দু প্রতিভার উদ্ভাবিত সাধনার সামান্য জেরও, গত হাজার বৎসরের অবনতির ভিতর দিয়া, আমাদের মস্তিষ্কভাণ্ডের কোণে কিম্বা সুপ্তআত্মার নিস্তরে কোথাও গুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান নাই—ঐরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত কিম্বা মনোবিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। পক্ষান্তরে, কবীর, তুলসীদাস, নানক, রামদাস, তুকারাম, চৈতন্যদেব, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির আবির্ভাবের দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে ভারতের অধ্যাত্ম প্রতিভা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় শুধু লোকচক্ষুর অগোচরে

আছে এবং যখনই উপযুক্ত সুযোগের বায়ু প্রবাহের স্পর্শলাভ করে তখনই তাহা উজ্জ্বল শিখা মেলিয়া আত্ম-প্রকাশ করে। তাই আমাদের ইতিহাসের সেই তামস যুগেও (খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে) রামানুজাচার্য্যের ন্যায় ধর্ম্মাচার্য্য ও দার্শনিক-প্রবর আবির্ভূত হইতে পারিয়াছিলেন।

আমাদিগকে ইহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে হইবে যে ভারতের অন্তরাত্মা এখনো জীবিত আছে—ইহা শুধু বাহ্যিক প্রতিকূল অবস্থার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন আছে, এবং যখনই আত্মচেষ্টার দ্বারা ঐ সাময়িক মায়াজাল ছিন্ন হইবে তখনই আমরা আমাদের দেশের চিরন্তন আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিব।

৫

কি উপায়ে আমরা এই মোহজাল ছিন্ন করিতে পারিব,—স্থূল জড়বাদের ও নাস্তিকতার অপমৃত্যু উত্তীর্ণ হইব, ইহাই আমাদের প্রধান সমস্যা। আমাদের এই জাতীয় সমস্যা যে প্রধানতঃ শিক্ষা-সমস্যা এবং তাহা পূরণের উপায় কি তাহা মহাত্মা রামমোহন রায় হইতে আমরা আধুনিক শিক্ষিত প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর বুঝিয়াছি, যদিও কার্য্যতঃ আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আজ আমরা দায়ে পড়িয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি সেই প্রাচীন ঋষির ধ্যান-গম্ভীর আশ্বাস বাণীর আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই :—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্,
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পুরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

আজ আমরা আত্মপরীক্ষা করিয়া বুঝিতেছি যে আমাদের বর্ত্তমান দারুণ অশান্তির মূল কারণ, আমাদের অন্তরাত্মা যাহা চাহিতেছে তাহা হইতে আমাদের বাহ্যানুষ্ঠান-বহুল শূন্য-গর্ভ শিক্ষা আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে—আমরা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, সেই প্রাচীন ঋষির ধ্যান-লব্ধ পরম সত্যের অঙ্কুর যুগ যুগান্তের অভ্যস্ততা ও শিক্ষার ফলে বংশপরম্পরায় আমাদের মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, দেহের শোণিত বিন্দুর কেন্দ্র স্থলে অনুবিদ্ধ হইয়া আছে। আজ আমরা চাই সেই শিক্ষা যাহা আমাদিগকে আত্ম-প্রতিষ্ঠ করিবে, আমাদের ভিতরকার সত্যের বীজকে আলো ও বাতাসের সাহায্যে পূর্ণ বিকসিত করিয়া অমৃতময় ফলে পরিণত করিবে। অর্থাৎ আমরা চাই সেই শিক্ষা যাহা শুধু ভৌতিক জগতের স্থূল জ্ঞানদানে কিম্বা শুধু অন্নসংস্থানের ও অর্থাগমের উপায় নির্দ্ধারণে নিঃশেষ হইবে না, কিন্তু যাহার ফলে আমরা অসংশয়ে ঘোষণা করিতে পারিব—

"ওগো দিব্য-ধাম-বাসী দেবগণ যত
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মত।"

৬

প্রাচীন ভারতীয় সাধনার অটল ভিত্তির উপর আধুনিক ও ব্যবহারিক জীবনের উন্নতিবিধায়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হলে তাহা হইতে আমরা কি শুভ ফল প্রত্যাশা করিতে পারি তার অনেকটা প্রমাণ পাই বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্র ও জীবনে। ত্যাগে ও জ্ঞানের জন্য তপশ্চর্য্যায় তাঁহারা ভারতীয় ঋষির যোগ্য বংশধর। তাঁহাদের বিজ্ঞানানুশীলনের উদ্দেশ্য জাতি বিশেষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপর জাতির ধ্বংস সাধনের সহজ উপায় উদ্ভাবন নহে, কিন্তু সমগ্র মানব জাতির হিতসাধন। বস্তুতঃ জগদীশচন্দ্রের হস্তে জড়বিজ্ঞান যেন এক অভিনব চেতনা, এক নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছে যাহার ফলে অন্তঃসার জড়বিজ্ঞান কালক্রমে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে পরিণত হইবার সূচনা হইয়াছে। তাই আশা করা যায় যে আমাদের জগদীশ ও প্রফুল্ল চন্দ্রের শিষ্য প্রশিষ্যগণের চেষ্টার ফলে জড়বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের (metaphysics) বস্তু একের ও বহুর মধ্যে এত কালের বিরোধ ঘুচাইয়া দিবে—আত্মা ও অনাত্মবিষয়ক জ্ঞান রেষারেষি ছাড়িয়া দিয়া হাত ধরাধরি করিয়া যমজ ভ্রাতার ন্যায় এক পরম সত্য-স্বরূপের জয় ঘোষণা করিবে।

যদি সুশিক্ষার ফলে ভারতবর্ষ এই আশা ফলবতী করিতে পারে তবেই সমগ্র জগৎ তাহার নিকট যে

অমৃতের দান ভিক্ষা করিতেছে তাহা বিলাইতে পারিবে, এবং তাহা হইলেই তার বর্ত্তমানের সর্ব্ববিধ দৈন্য ও ভিক্ষাবৃত্তি ঘুচিবে নতুবা তাহার সকল রাষ্ট্র নৈতিক সুখ-স্বপ্ন চিরকাল অলীক স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। স্বদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা যে আশা পোষণ করিতেছি তাহা যে দুরাশা মাত্র নহে সেই আশ্বাস ধ্যান-মগ্ন বঙ্গীয় কবির নিকট হইতেও পাইতেছি।

"হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজি কি বেশে!
দেখিনু তোমারে পূর্ব্বগগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে!

* * *

নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানিনা
কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গল শঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে!
ডুবায়ে ধরার রণ হুঙ্কার,
ভেদি বণিকের ধন ঝঙ্কার,
মহাকাশতলে উঠে ওঙ্কার
কোন বাধা নাহি মানি!
ভারতের শ্বেত হৃদি-শতদলে
দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে,
সঙ্গীত তানে শূন্যে উথলে
অপূর্ব্ব মহাবাণী!
নয়ন মুদিয়া ভাবীকাল পানে
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গল বিজয় শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে।"

ভগবান্ করুন, কবির এই শিব কল্পনা সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

বিবিধ সংগ্রহ।

চন্দ্রে মানুষ।

বাল্যকালে চন্দ্রের মধ্যে চরকা হস্তে সূতা কাটীতেছে এরূপ এক বৃদ্ধাকে আসীনা দেখিয়া পুলকিত হইতাম। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারিলাম, চন্দ্র মণ্ডলে অবস্থিত পর্ব্বত গুহাদির দ্বারা চন্দ্রের কলঙ্কের সৃজন হইয়া থাকে। তখন আরও জানিলাম যে চন্দ্রে জল বায়ুর অভাব হেতু তথায় জীব জন্তু বৃক্ষ লতাদি পাওয়া সম্ভব নহে।

সম্প্রতি আমেরিকার হার্ভাডের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ অধ্যাপক পিকরিং (W. H. Pickaring) জেমেইকা দ্বীপ হইতে চন্দ্র মণ্ডল পরীক্ষা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে চন্দ্র লোকে মানব হইতে উচ্চ শ্রেণীর জীবের অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায়। তিনি বলেন, চন্দ্রে বৃক্ষ লতাদি বর্ত্তমান আছে। এবং উহা চন্দ্র মণ্ডলের নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরির শিখরে বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে কেবল মাত্র একটী স্থানের বৃক্ষাদি মাত্র হরিৎ বর্ণের মনে হয়, অপর স্থলে অন্যরূপ রং। গ্রীষ্ম কালে বিষুবরেখার নিকটস্থ উদ্ভিদাদির বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ঈষৎ কৃষ্ণাভ পাটকিলা রং ধারণ করে। চন্দ্রের মধ্যে যেদুইটী কৃত্রিম খালের মত দৃষ্ট হয় তাহাদের তীর দেশেই যেন উদ্ভিদাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। মঙ্গল গ্রহে যেরূপ কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী দৃষ্ট হয়, চন্দ্রের পয়ঃপ্রণালী ঠিক ঐরূপ কৃত্রিম। এই সব নানা কারণে মনে হয় চন্দ্রলোকে যে জীব আছে, তাঁহারা মানব হইতে শ্রেষ্ঠ হইবারই সম্ভাবনা।

ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু।

এখন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে মানবের মত বৃক্ষকেও ঔষধের দ্বারা অসার অজ্ঞান করা যায় এবং নিদ্রাভিভূত করা যায়। বৃক্ষের উপরে যে ঔষধের ক্রিয়া আছে, ইহা আমরা জানি কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঔষধের দ্বারা বৃক্ষকে অচেতন করিয়া তাহাতে অস্ত্র চালনা করা যায়। এই তথ্যের আবিষ্কর্ত্তা আমাদের ভারতের গৌরব ডাঃ

জগদীশচন্দ্র বসু। তিনিই আবিষ্কার করিয়াছেন যে বৃক্ষ বিনাতারে টেলিগ্রাফের সংবাদ গ্রহণ করিতে পারে এবং ইহা ব্যতীত তিনি আরও একটী যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যাহার দ্বারা বৃক্ষাদি কিরূপ ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা দেখা যায়। বৃক্ষ ও ধাতব জিনিসের জীব জন্তুর মত বোধ শক্তি আছে, এই আবিষ্কারও তাহার জীবন ব্যাপি সাধনার ফল। তিনি ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে স্বর্ণ লৌহাদি ধাতুর ও একরূপ মরজি আছে। তাহাদিগকে কখন উৎফুল্ল কখন বিমর্ষ করা যায় এবং বিষ প্রয়োগ দ্বারা জীবন নষ্ট করা যায়।

তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে কোন বৃক্ষ গুল্মকে ঔষধের দ্বারা অজ্ঞান করিয়া অনায়াসে স্থানান্তরিত করা যায়। নূতন স্থানে নীত হইলে উহা ক্রমে জাগ্রত হয় এবং উহাতে এক আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখা যায়। আমাদের অনেক বৃক্ষই কিছু সময়ের জন্য ভেকাদির মত নিদ্রা যায়। সে সময়ে উহাদের পাতা ঝাড়িয়া পড়ে। বৃক্ষকে অজ্ঞান করিয়া স্থানান্তরিত করিলে উহারা জাগ্রত হইয়া বুঝিতে পারে যে উহাদের শরীরে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহার ফলে গ্রীষ্ম কালে উহাদের পাতা ঝড়িয়া পড়ে। এই অসময়ে পাতা পড়া কেবল একবারই হইয়া থাকে। পরে উহা পূর্ব্ব স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

ভেক প্রভৃতি যে সমস্ত জীব কুম্ভকর্ণের মত দীর্ঘকাল নিদ্রা যায় তাহাদিগকে ঐ নিদ্রিতাবস্থাতে কোন বিষাক্ত দ্রব্যের মধ্যে ফেলিয়া দিলেও কোন রূপ কষ্ট অনুভব করেনা। সেইরূপ মনুষ্যকে অচেতন করিয়া অস্ত্র করিলে কিম্বা বৃক্ষকে অচেতন করিয়া তাহার মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ মূল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিলেও তাহারা কোন রূপ কষ্ট বোধ করেনা। অচেতন অবস্থায় মানুষের উপর অস্ত্র চালনা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি; কিন্তু বৃক্ষকে অচেতন অবস্থায় মূলোৎপাটন করিয়া অন্যত্র লাগাইলে জবা প্রভৃতির ডাল যেরূপ বাঁচিয়া উঠে সেই রূপ উহাও বাঁচিয়া উঠে। জন্তু ও উদ্ভিদ জগতে এরূপই সাদৃশ্য দেখা যায়। অধিকন্তু ডাক্তার বসু বলেন, জীবগণের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মত বৃক্ষের তন্তুতেও স্পন্দন হইয়া থাকে। তিনি মৃত কল্প বৃক্ষকে উত্তেজনার দ্বারা সজীব করিয়া তুলিতে পারেন এবং সজীব বৃক্ষকে অজ্ঞান করিয়া এমনকি মারিয়া ফেলিতেও পারেন। বৃক্ষ যেরূপ জীবগণের হৃদস্পন্দনের মত উত্তেজক ঔষধে উত্তেজিত এবং বিষাক্ত ঔষধে নিদ্রিত কম্বা মৃত্যু মুখে পতিত হয়, সেইরূপ উহাদের উচ্চ শ্রেণীর জীবের মত মৃত্যুকালে শারীরিক আক্ষেপও উপস্থিত হয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু ইহা এত মৃদুগতিতে হয় যে প্রবল শক্তি সম্পন্ন অনুবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও এই গতি উপলব্ধি করিবার সাধ্য নাই কিন্তু স্যর জগদীশ চন্দ্রের যন্ত্রে ইহা ধরা পড়ে। এই যন্ত্রের দ্বারা আমাদের গতি অনুভূতি-শক্তি লক্ষ লক্ষ গুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে আমরা যদি একটী শম্বুকের গতি যন্ত্রের অনুপাতে বৃদ্ধিকরিতে পারি তবে উহা এক ঘণ্টায়-একবার পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া আসিবে।

এই যন্ত্রের দ্বারা আমাদের কৃষি বিভাগের এক মহোপকার সাধিত হইবে। কারণ বর্ত্তমানে কোন বীজের উপরে সারের ক্রিয়া দেখিতে হইলে একবার ফসল হওয়ার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু এই যন্ত্রের দ্বারা বীজ বপনের কিছুকাল পরেই সারের দ্বারা বীজের উপরে কিরূপে ক্রিয়া হয় তাহা দেখা যাইবে।

ডাঃ জগদীশচন্দ্র আরও আবিষ্কার করিয়াছেন, জীব জগতে যে রূপ কোন কোন বিষ ও যাহাতে জীব মারা (যায়)—জীবের যেরূপ পুষ্টি সাধন করে, বৃক্ষের উপরেও তাহার বিষের তদনুরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে।

এল-কেমিষ্ট।

বর্ত্তমান রসায়ন শাস্ত্রের পূর্ব্বে একশ্রেণীর লোক ছিল যাহারা স্বর্ণেতর ধাতু হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিত। তাহাদের নাম ছিল এল কেমিষ্ট। (Al Chemist) এত দিনে বোধ হয় তাহাদের সেই চেষ্টা ফলবতী হইতে চলিল। অধ্যাপক সডি (Soddy) এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্ত্তন করা কিছুই অসম্ভব নহে। তিনি বলেন, পারদকে স্বর্ণে পরিণত করিতে হইলে পারদের অণু হইতে এক বিটা (Beta) পরিমাণ অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেল, তাহা হইলে উহা থেলিয়ামে (Thallium) পরিণত হইবে। এখন থেলিয়াম হইতে এক এলফা (Alpha) পরিমাণ অংশ

উড়াইয়া দেও, তবেই উহা স্বর্ণে পরিণত হইবে। সীস হইতে স্বর্ণ করিতে হ লে সীসের অণু হইতে এক এলফা (alpha) পরিমাণ অংশ উড়াইয়া দাও, তবেই উহা পারদে পরিণত হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পারদকে স্বর্ণে পরিণত করাইবে।

রেডিয়ামের মূল্য।

যদিও পৃথিবীর উপরিভাগে বহু রেডিয়ম (Radium) মজুত আছে তথাপি ১৮৯৬ সনে ইহা আবিষ্কারের পর হইতে এই ২৪ বৎসরে মাত্র কতিপয় আউন্স রেডিয়াম সংগৃহীত হইয়াছে। বাজারে রেডিয়ামের দাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে প্রতি আউন্স রেডিয়ামের মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা। এই টাকার অঙ্ক শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে এই দরে রেডিয়াম বিক্রয় করিয়া কতই যেন লাভ হয়। ইহাতে বস্তুতঃ লাভের কিছুই নাই। এক আউন্স রেডিয়াম বাহির করিতে ঐরূপ খরচ পড়ে।

বিশুদ্ধ রেডিয়াম রৌপ্যের মত একরূপ ধাতু কিন্তু সাধারণতঃ ইহা শাদা রেডিয়াম ব্রোমাইড কিম্বা ক্লোরাইড (Radium Bromide or Chloride) রূপে পাওয়া যায়। একটী বড় আলপিনের মাথায় যতটুক ধরে ততটুক রেডিয়াম সংগ্রহ করিতে নিম্নলিখিত জিনিষের প্রয়োজন। ইহাতে ৫৪০ মনের অধিক পিচ্‌ব্লেণ্ডি (Pitchblendi) ৮১ মনের অধিক হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrochloric acid) ২৭॥ মন সলফিউরিক এসিড্ এবং ১৩৫ মনের অধিক কার্ব্বনেট অব সোডার (Carbonate of Soda) প্রয়োজন হয়।

এই সকল উপাদান ভিন্ন আরও বহু লোকের এক এক মাসের অধিক কাল পরিশ্রম করিতে হয়। কারণ ইহা প্রস্তুত করিতে ৫০০ বার দানা (Crystallisation) বাধাইবার প্রয়োজন। পাঠক ইহা দ্বারাই অনুমাণ করিতে পারিবেন যে রেডিয়াম প্রস্তুত করিতে কিরূপ খরচের প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।

গত ১১ই জুলাই অপরাহ্ন ৯ ঘটিকার সময়ে যে সব লোক ফকস্‌টোনে (Falkestone) সমুদ্র তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন তাঁহারা এক অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন। আকাশ পরিষ্কার থাকাতে ফ্রান্সের পর্ব্বত শৃঙ্গ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। ইহাদের রং ক্রমে শ্বেতবর্ণ হইতে লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং ইহার ৫ মিনিট পরে এই লোহিত বর্ণ অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং ইংলিশ চেনেলের মধ্যে রামধনুর নানারূপ বিচিত্র বর্ণ দেখা যায় এবং মধ্যে একস্থানে একটী অগ্নি গোলকের মত দৃষ্ট হয়। কিছু সময় পরে এই দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া পাহাড়গুলি ঘন কৃষ্ণ মেঘ জালে আচ্ছাদিত হয়। উপরস্থ মেঘ যাহা ক্ষুদ্র বরফ কণায় পরিণত ছিল তাহাতে সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় এই রূপ বিচিত্র দৃশ্যের উদ্ভব হইয়াছিল।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

অজগরের প্রায়োপবেশন।

অজগরের প্রকাণ্ড দেহ এবং সেই দেহে প্রচণ্ড শক্তি। এই প্রচণ্ড শক্তিতে সে অন্য জীব জন্তু ধরিয়া তাহার সেই প্রকাণ্ড উদরে নিক্ষেপ করে এবং ধীরে ধীরে হজম করিয়া ফেলে। ময়মনসিংহের উত্তরে অসভ্য পার্ব্বত্য ভূমিতে যে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের অজগর দেখিতে পাওয়া যায় সে গুলিই এক একটা আস্ত হরিণ শিশু গিলিয়া ফেলে। আফ্রিকায় অজগর সেখানকার অরণ্যের বিশাল কায় মহিষকেও সজোরে আকর্ষণ করিয়া হতচেতন করিয়া ফেলিতে শোনা গিয়াছে। অজগর বেজায় রাগী, কিন্তু বিষ বিহীন।

নিউইয়র্কের চিড়িয়া খানায় একটী ২৫ ফুট লম্বা অজগর আছে। সে বড়ই বদমিজাজী; সময় সময় তাহার মেজাজ এত দূর চরমে পঁহুছে যে সপ্তাহ কাল আহার না করিয়া কাটাইয়া দিতে চায়। তখন তাহার এই প্রায়োপবেশন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য চিড়িয়া খানার অধ্যক্ষকে বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয়। সম্প্রতি তিন জন কর্ম্মচারী এই গোঁয়াড়ের প্রায়োপবেশন ভঙ্গের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা আহারের সময় জোর করিয়া তাহার বিশাল মুখ গহ্বর বিস্তৃত করে এবং চারিটী শশক গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া লম্বা বংশ দণ্ড দ্বারা তাহা তাহার উদরের ভিতর ঠেলিয়া দেয়। ক্রোদ্ধ অজগর তখন রাগে

ফুঁকাইতে থাকে। এবং সেই রাগের ফলে বেচারা শশক দিগের ক্ষুদ্র দেহ সমষ্টি অজগরের রক্ত মাংসে পরিণত হইয়া যায়। এই অজগরটীর নাম জানিনা।
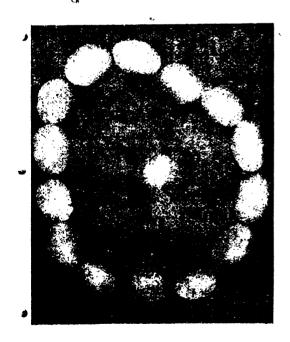
তিনসেরের আলু।

ল্যাণ্ড্রেথের ৶৬ সের ওজনের বেগুনের কথা এখন পল্লিগ্রামের চাষাদিকের নিকটও আজগুবি বাক্যের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ময়মনসিংহে উৎপন্ন বেগুনের ন্যায় বড় ও উৎকৃষ্ট বেগুন অন্য কোথাও হয় না, তাহার কারণ বোধ হয় এজেলার মাটি বেগুন ফলনের পক্ষে খুব উপযোগী। কিন্তু এই উপযোগী ভূমিতেও ল্যাণ্ড্রেথের বীজ খুব সতর্ক যত্নের ফলে ছয় পোয়ার অধিক ওজনের বেগুন প্রসব করিতে পারে নাই। পরীক্ষার ফলে এখন আর কেহ ছয় সের বেগুনের কথা বিশ্বাস করিতেছে না। এখন বেড্‌ফোর্ডের আলু ল্যাণ্ড্রেথের বেগুনের স্থান অধিকার করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে। বেড্‌ফোর্ড সায়ারের এক একটী আলুর ওজন হয়—৫ পাঃ ১১ আউন্স অর্থাৎ প্রায় তিন সের। পাছে ল্যাণ্ড্রেথের বেগুনের ন্যায় ইহারও দুর্নাম অবি-

শ্বাসের কারণ হইয়া দাঁড়ায় সেজন্য ইহার বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে। আলুটীর চতুর্দ্দিকে চৌদ্দটী মুরগীর ডিম গায়ে গায়ে লাগাইয়া রাখিয়া দিয়া ইহার প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। বিলাতের রয়াল মেগাজিন হইতে আমরা সেই চিত্রটী সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আলুটী লম্বায় ৯½ ইঞ্চি প্রস্থে ৭½ ইঞ্চি এবং উচ্চে ৩½ ইঞ্চি।

বামন-রহস্য।

পুরুষটী যদি বামন হয়, তার স্ত্রীটীও যে সেক্ষেত্রে বামনই হইবে, এমন প্রত্যাশা কেহ কখন করেন না। সেরূপ হইলে কিন্তু বেশ যোগ্যজুটকই হয়। দাক্ষিণাত্যের এক মুদাবার পরিবারে এইরূপ এক জুটক মিলিয়াছে। ইহা খুব সচরাচর ঘটে না, তাই তাহাদিগের বিষয় সভ্য জগতের একটী রহস্য-জনক আলোচ্য-বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতি মাসিকের চিত্র সংগ্রাহকগণ সাগ্রহে তাহাদিগের চিত্র লইয়া গিয়া প্রকাশ করিতেছেন। বামন পুরুষটীর নাম শিবশঙ্কর মুদাবরা; তাহার বয়স ২৬ তাহার বামন স্ত্রীটীর বয়স ২১। দাক্ষিণাত্যের এক রেলষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর সম্মুখে ইহাদের ফটো গৃহীত হইয়াছিল।

ঘড়ী পরিস্কার

ঘড়ী একটু বন্ধ হইলেই আমরা ঘড়ীর দোকানের দিকে দৌড়াই। যাহারা ঘড়ী মেরামতের কাজ করে তাহারা অনেকেই, তাহাদের যন্ত্রাদির মতই যন্ত্রবিশেষ। কোথায় কি জন্য ঘড়ীর এরূপ গতিভঙ্গ দোষ জন্মিয়াছে, তাহা ইহারাও ঠিক বলিতে পারে না। প্রথম যখন ঘড়ী বন্ধ হয়, তখন 'অয়েল' করাইবার কোন প্রয়োজনই হয় না। সাধারণতঃ বড় ঘড়ীর (clock) কল কব্জার ছিদ্র মধ্যে ধূলি পড়িয়া ঐসকল ছিদ্র প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। চাকাগুলি অনায়াসে ঘুরিতে পারে না। কাপাস তুলা ভাল করিয়া পিঁজিয়া, কেরোছিন তেলে অল্পক্ষণ ভিজাইয়া তেলটা একটু চাপিয়া ফেলিয়া দিয়া, ঐ সকল ছিদ্রোপরি রাখিয়া দিতে হয়। কেরোছিন যেটুকু থাকে তাহাতে তৈলাক্ত পদার্থ গলাইয়া দেয় এবং ধূলিকণাগুলি তুলাতে আটকাইয়া লয়। তুলা সরাইয়া লইলে, ঘড়ী বেশ চলিতে থাকে। কেরোছিনের পরিবর্ত্তে Benzene (বেন্‌জিন্) ব্যবহার করাও চলে। ঘড়ীর দোকানে এই Benzene দিয়াই ঘড়ীর সকল অংশ খুলিয়া ধুইয়া লয়। আবার যথাস্থানে উহাদের সন্নিবেশ করিয়া দিয়া "অয়েল" করা হইল বলিয়া পারিশ্রমিক দাবী করে।

ল্যাম্পের আলোর উজ্জ্বল্য

যে সকল কেরোছিনের বাতি (ল্যাম্প) সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, সময় সময় সেগুলি কিছুতেই ঠিক হয় না এরূপ মনে হয়। সামান্য বিষয় একটু না জানার দরুণ সেই ল্যাম্পকে অব্যবহার্য্য বলিয়া রাখিয়া দিতে হয় না, হয় অনুজ্জ্বল আলোকের বিরক্তি হজম করিতে হয়। দীপ শিখার ঔজ্জ্বল্য প্রধানতঃ উপযুক্ত বায়ু প্রবাহ ও শিখার চারিদিকের বায়ুর উত্তাপের উপর নির্ভর করে। তেলের উপাদান গুলিকে উপযুক্ত রূপ পোড়াইতে যে পরিমাণ,বায়ুর প্রয়োজন, তৎপরিমিত বায়ু পাওয়ার জন্য বায়ুপ্রবাহ নিয়মিত করা আবশ্যক। যাহাতে চিমনির মধ্যের উত্তপ্ত বায়ু সত্বর চলিয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য এই বায়ুপ্রবাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। বায়ুর বেগ বেশী হইলে উত্তপ্ত বায়ু সত্বর সরিয়া পড়ে এবং দীপশিখার চারিদিক একটু শীতল হইয়া পড়ে, এজন্য শিখার উজ্জ্বল্য তত থাকেনা। উহার চারিদিক যত বেশী উত্তপ্ত থাকে শিখার ঔজ্জ্বল্য তত বাড়ে। চিম্‌নি দেওয়ার পূর্ব্বে দীপশিখা মিট্ মিট্ করে, কিন্তু চিম্‌নি দেওয়ার অব্যবহিত পরেই উহা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহার কারণ চিম্‌নি দেওয়াতে উত্তপ্ত বায়ু সেখানে থাকিবার অবসর পায়। প্রত্যেক ল্যাম্পের সলিতার চুঙ্গীর চারিদিকে ও তাহার নীচে যে সকল পিতলের পাত দেওয়া থাকে, তাহা সর্ব্বদাই ছিদ্রবহুল। ঐ সকল ছিদ্র এরূপ ভাবে বিন্যস্ত যে বায়ু প্রবাহের বেগ অত্যধিক হইতে পারে না, এবং কেবলমাত্র উপযুক্ত পরিমাণ বায়ু, শিখার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। কিছু দিন পূর্ব্বে Hinks এর হ্যারিক্যান্ ল্যাম্পের খুব প্রচলন ছিল; কিন্তু Ditz ডীজ্ লণ্ঠন তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। ইহার কারণ ডীজ্ লণ্ঠনের আলোর উজ্জ্বল্য অধিক ও ইহার কলকব্জার সন্নিবেশ সুন্দর। ডীজ লণ্ঠনের বায়ু পথ একটু উন্নততর প্রণালীতে করা হইয়াছে, যে পরিমাণ বায়ুর প্রয়োজন; সেই প্রবাহের বেগ যেরূপ হওয়া উচিৎ এই ছিদ্রপথ দ্বারা তাহা ঠিকমত নিয়মিত হয়। চিমনিও এভাবে তৈরী যে ইহার ভিতরকার বায়ু একটু বেশী উত্তপ্ত থাকে। আলোর উজ্জ্বল্য যখন কিছুতেই উপযুক্ত মত হয় না, তখন অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়; ঐ সকল বায়ু পথের কতকগুলি ছিদ্র তেল কালিতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে অথবা নীচের সচ্ছিদ্র পাতের সঙ্গে উপরের বাটী বা অন্য কোন পাত এভাবে লাগিয়া আছে যে বায়ু চলা চলে সুবিধা হইতেছেনা। ঐ পাতগুলিকে বিভক্ত করিয়া, বন্ধ ছিদ্রগুলিকে পরিস্কার করিয়া দিলে, পুনর্ব্বার শিখার উজ্জ্বল্য সম্পাদন করা যায়।

পুস্তক রক্ষণ।

যাঁহাদের পুস্তক সংগ্রহের আগ্রহ অধিক, তাঁরা কীটের উৎপাতে যে কিরূপ নিপীড়িত হন, তাহা শুধু তাঁহারাই বুঝিবেন। অথচ একটু সামান্য চেষ্টাতে এই কীট নিবারিত হইতে পারে। এক বোতল মিথিলেটেড্ স্পিরিট এ (Methylated spirit) আট আনি অনুমান রসপুষ্প (Perchloride mercury) ও এক তোলা কি ১॥০ তোলা চাঁচ গলাইয়া, একটী তুলি দ্বারা পুস্তকের প্রচ্ছদ পাটে (cover page) এবং স্থানে স্থানে পুস্তকের মধ্যে, ইহা লাগাইয়া দিলে, পুস্তক আর কীটদষ্ট হইবেনা। পুস্তকের মধ্যে নিম পাতা শুকাইয়া রাখিলেও কীটাদির দৌরাত্ম একটু কমিয়া থাকে।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, Dacca
and Published by Kedar Nath Mozumdar Research House, Mymensingh.

নবম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭। { দ্বিতীয় সংখ্যা।

আমার কাজ ও তাঁহার কাজ।

কাজ মানুষকে করিতেই হইবে। পৃথিবীতে জীবন যাপন, ইহার অর্থই কোনও না কোনও কাজে তাহার নিয়োগ। উপদেশ পরামর্শ না দিলেও, মানুষ কোনও না কোনও রকম কাজে ব্যস্ত থাকে। ইহা সে তাহার সহজ জ্ঞানদ্বারা (instinctively) বুঝিয়া লয়। বড় হউক ছোট হউক, বিদ্বান হউক মূর্খ হউক, সাধু হউক অসাধু হউক, কাজ মানুষ ছাড়িতে পারে না। জন্মহইতে আমরণ তাহাকে কাজের একটা ইতিহাস রচনা করিয়া যাইতেই হইবে। ইহার যদি কোনও ব্যত্যয় কখনও দেখা যায়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে স্বভাব নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, মানুষ প্রকৃতিস্থ নাই, মানুষের জীবনী শক্তি বদ্ধ হইয়া যাইতেছে অথবা হ্রাস পাইতেছে? সাধারণভাবে ইহা প্রকৃতির নির্দ্দেশ ও নিয়মরূপে মানিয়া লইতেই হইবে যে প্রত্যেক মানুষই কোনও না কোনও কাজ লইয়া জীবন কাটাইতেছে। তবে অনেক সময় দেখা যায় মানুষ কাজের চক্রের মধ্যে পড়িয়া অনেকটা উদ্দেশ্য হীন হইয়া যায়, সে তখন নিজের কাজের অর্থ নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে কাজ করে, কেননা সে কাজ করে যেমন অপর পাঁচজন দশজনও কাজ করিতেছে; সে কাজ করে, কেননা ভিতর হইতে কে যেন তাহাকে জোর করিয়া চোখ বাঁধা বলদের মত কাজের ঘানিতে নিয়ত চালাইতেছে। অনেক কর্ম্মীর এই অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়; তাহাদের কার্য্যশীলতার আর কোনও কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় না। শুধু প্রথাগত অভ্যাস প্রণোদিত, সংস্কার বদ্ধ, অন্ধ, গভীর উদ্দেশ্য বর্জ্জিত কাজের আমরা অনেক নমুনাই জগতে দেখিতে পাই। এইরূপ কাজের ফল এই যে ইহা দ্বারা জীবনের কোনও মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটে না, ইহা দ্বারা জীবনে কোনও গভীর প্রভাব প্রবেশ করে না, ইহা দ্বারা জীবনে প্রকৃত শক্তির সঞ্চার হয় না, ইহা দ্বারা জীবন একটা স্থায়ীভূমি প্রাপ্ত হয় না, ইহা দ্বারা জীবন সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হয় না. সঙ্ক্ষেপতঃ ইহা দ্বারা জীবন একটা প্রকৃত সামঞ্জস্যীভূত বিকাশের বা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নয় যে জীবনের জন্য, যে জীবনের স্ফূর্ত্তি বা সিদ্ধির জন্য, যে জীবনের শক্তি ও সৌন্দর্য্যবিধানের জন্যই আমাদের কর্ম্মরূপ মহাবিধান নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতা, তাহার চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা, তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে উদাসীনতা বা সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাব।

আমরা যে এই জগতে আপনা হইতে আসি নাই, এই জগৎ ও ইহার মধ্যে আমাদের আবেষ্টন, এই যে পরিবার পরিজন, এই যে বন্ধু বান্ধব, জীবনের নানাবিধ উপকরণ, কিছুই যে আমরা সৃষ্টি করি নাই, আমাদের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, দৈহিক ও অন্যবিধ শক্তি সামর্থ্য, জ্ঞান বুদ্ধি, প্রভৃতি কিছুই যে আমাদের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় হয় নাই, তাহা আমরা অনেক সময়ই ভাবি না ও স্মরণ রাখি না। আমাদের শক্তি বা ইচ্ছাতে যে আমাদের জীবন যাত্রা বা জীবনের কার্য্য সম্পাদন কোনও রকমেই সম্ভব নয়, তাহা আমরা অনেক সময়ই ভুলিয়া যাই। আমাদিগকে এই জগতে আমরা আনি নাই, আনিয়াছেন আর একজন, আমাদের জীবনের উপযোগী কোনও উপকরণই আমরা নিজের শক্তিতে সংগ্রহ করি নাই, তাহা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া

দিয়াছেন অন্য একজন, আমাদের জীবনের কর্ম্মও আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া নির্দ্ধারণ করি নাই, করিতে পারিও না; নির্দ্ধারণ করিয়াছেন অপর একজন। যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, যিনি আমাদের জন্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জগতে জীবন যাপন করিবার জন্য সর্ব্ববিধ উপায় যিনি করিয়া দিয়াছেন, তিনি আমাদের জন্য উপযোগী কাজও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত জীবন দ্বারা, তাঁহার প্রদত্ত হস্তপদাদি শারীরিক সকল যন্ত্রদ্বারা, তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা, তাঁহারই রচিত এই জগতে তাঁহারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহারই অভিপ্রেত কাজ জীবনে আমাদিগকে করিতে হইবে। আমাদের জীবনের আর স্বতন্ত্র কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না, স্বতন্ত্র কোনও কাজও থাকিতে পারে না। "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি," —তিনি যেমন করান, যেমন করিতে বলেন, আমি তেমনি করিব। এই গোড়ার কথাটা মানুষ যদি না বুঝে, তাহা হইলে সব দিক দিয়াই তাহাকে নানা ভ্রম প্রমাদের মধ্যে পড়িতে হয়। সে অনেক রকম কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকিতে পারে; দশের কাছে সে খুব কাজের লোক বলিয়া বাহাবাও পাইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক সে কাজের বড় বেশী মূল্য নাই; সে কাজের ফল বড় বেশী স্থায়ী ও দূর প্রসারী হয় না; সে কাজের দ্বারা তাহার নিজের ও তাহার সংসৃষ্ট অপরাপরের অন্তর্জীবন বড় বেশী প্রভাবান্বিত হয় না। ঐ যে আসল কথা, তাহা ভুলিয়া গিয়াই মানুষ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যায়; তাই সে মনে করে "ইহা আমার কাজ," "ইহা আমার প্রচেষ্টা" "ইহা আমার কৃতিত্ব।" এইরূপ অহঙ্কার আসিলেই মানুষ অন্ধ হইয়া পড়ে, এবং তখন তাহার শক্তিহীনতাও আসে। কজের কুহকে পড়িয়া তাহার অন্ধতা আসায় সকল প্রকার শক্তির মূল প্রস্রবণের দিকে তাহার আর দৃষ্টি পৌঁছে না। সে কাজের নামে ভূতের বেগার খাটিয়া মরে; শুধু জাঁকজমক পূর্ণ শূন্য কোলাহলের মধ্যে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি সমুচ্চয়ের ক্ষয় হইতে থাকে। যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়,মানুষের কত বড় বড় কাজ, কত বড় বড় প্রোগ্রাম, কত বড় বড় আন্দোলন, বৃথা হইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে বিবিধ হিতকর সামাজিক প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা দেখিয়া চিন্তাশীল জন রাস্কিন বলিতেছেন:—"All effort in social improvement is paralysed, because no one has been bold or clear sighted enough to put and press home this radical question:— "What is indeed the noblest tone and reach of life for men; and how can the possibility of it be extended to the greatest numbers?" —অর্থাৎ সামাজিক উন্নতির সকল চেষ্টা শক্তিহীন হইয়া থাকে এই জন্য যে কাহারও এই মূল ও মুখ্য প্রশ্ন উপস্থিত করিবার উপযুক্ত সাহস ও উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখা যায় না; বস্তুতঃ মানুষের পক্ষে জীবনের মহত্তম স্বরূপ দৌড় কি? (আর ইহা ঠিক না হইলে) সর্ব্বাধিক সংখার নিকট ইহার সম্ভাবনা কিরূপে প্রকটিত করা যায়?" কথাগুলি সকলেরই গভীর প্রণিধানযোগ্য। সমাজ সংস্কারের কথাই বল, আর রাজনৈতিক আন্দোলনের কথাই বল, শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টার কথাই বল, আর নৈতিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতির কথাই বল, যে কোনও হিতকর অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের কথাই বল, সকল বিষয়েই ঐ মনীষীর মন্তব্য প্রযুজ্য। আমরা যে কোনও কাজের ভিতরেই থাকি না কেন, যে কোন মহদনুষ্ঠানের গর্ব্বই করি না কেন, আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না— "There is a divinity that shapes our ends, Rough hew them how we will,"—একজন মহাশক্তির বিধাতৃত্ব আমাদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা গুলিকে নিয়মিত করিতেছে, আমরা সেগুলি লইয়া যতই নড়াচাড়ি করিতে চাই না কেন? আমরা যখন বুঝি আমাদের জীবন এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের বিধাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত, আমাদের সকল শক্তি তাঁহারই প্রদত্ত ও তাঁহার ইচ্ছায় সঞ্জীবিত ও নিয়মিত, আমাদের জীবনের কাজ তাঁহারই অভিপ্রেত ও নির্দ্ধারিত, তখনই বাস্তবিক আমাদের জীবনের একটা সঙ্গত অর্থ পাই, আমাদের জীবন সংক্রান্ত সকল সমস্যার কতকটা সমাধান পাই, আমাদের দৈনিক কাজের একটা সহজ ব্যাখ্যা ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য

দেখিতে পাই। তাঁহার বিধাতৃত্বকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার প্রভুত্বকে স্বীকার করিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া, যদি আমরা আমাদের জীবনের কাজগুলিকে বুঝিয়া লই এবং সেই অনুসারেই যদি আমরা আমাদের শক্তি সামর্থ্যকে নিয়োগ করি, তাহা হইলেই আমাদের জীবন ও ইহার কার্য্য সত্য, সহজ, সুন্দর ও শক্তিশালী হয়। পাশ্চাত্য সাধক সত্যই বলিয়াছেন :—"Sudden and unforseen helps and continued encouragment are vouchsafed to the devout worker. For God is every where, having His will, and He can not be baffled. Make His business yours, as did His son. The man who works with Him is constantly assured of achievement,"—অর্থাৎ ঈশ্বরানুরাগী কর্ম্মী যিনি, তিনি আকস্মিক ও প্রত্যাশিত সহায়তা এবং অবিরাম উৎসাহ লাভ করিয়া থাকেন। যে হেতু ঈশ্বর সর্ব্ব স্থানেই তাঁহার অমোঘ ইচ্ছা লইয়া রহিয়াছেন, এবং তিনি কখনও প্রতিহত হইবার নহেন। তাঁহার কাজ তোমার করিয়া লও, যেমন তাঁহার ভক্তপুত্র খ্রীষ্ট করিয়াছিলেন। যিনি তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া কাজ করেন, তিনি সর্ব্বদাই কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকেন। আমরা যদি তাঁহার সঙ্গে সকল কার্য্যে যুক্ত হই, সকল ব্যাপারের মধ্যে যদি তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে বাস্তবিকই জ্ঞানে ও শক্তিতে আমরা তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়া আমরাও অনেক পরিমাণে তাঁহার ঈশ্বরত্বের অংশী হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হই। মানুষ তখন সত্যসত্যই তাহার ক্ষুদ্রতা ও দারিদ্র্য ভুলিয়া গিয়া, তাহার সসীমতাকে অনেক পরিমাণে অতিক্রম করিয়া মহাকবি সেক্সপিয়ারের কথাগুলির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে :—"What a piece of work is man ! how noble in reason ! how infinite in faculty ! in form and moving how express and admirable ! in action how like an angel ! in apprehension how like a god !—মানুষ ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি ! জ্ঞানে কি মহান্ ! শক্তিতে কি অসীম ! আকৃতি ও গতিবিধিতে কি মনোমুগ্ধকর ! কার্য্যে কেমন স্বর্গীয় দূতের মত ! বুদ্ধিমত্তায় কেমন দেবতার মত !

আর তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হওয়াই মানুষের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঞ্ছনীয় বস্তু। সাধুপল বলিয়াছেন :—"We are fellow—labourers with God,"—অর্থাৎ, আমরা ঈশ্বরের সহকারী। এই সহকারীত্ব উপলব্ধি করা ও তদনুসারে জীবন যাপন করাই মানুষের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য ও কর্ত্তব্য ; ইহাই মানুষের পরম অধিকার ; এখানেই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা। একজন বর্ত্তমান ইংরাজ ধর্ম্মযাজক বলিয়াছেন :—"It is inspiration more than all else that England wants today,"—অর্থাৎ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু যাহা আজ ইংলণ্ডের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা অনুপ্রাণনা। শিল্প বাণিজ্যোন্নতির চিন্তা ও চেষ্টায় মত্ত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মোহে মুগ্ধ, অভিনব সময় কুশলতার কুহকে অন্ধ বর্ত্তমান ইংলণ্ডের একজন প্রতিনিধি ঘোষণা করিতেছেন :—অনুপ্রাণনাই এখন ইংলণ্ডের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু। যুদ্ধের ভীষণ শিক্ষায় পাশ্চত্য জগতের একটু চৈতন্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ইতিহাস আলোচনা করিয়াও বলা যাইতে পারে :—"It is inspiration more than all else that India needs to-day,"—এই অনুপ্রাণনা আমাদেরও চাই, তাহা না হইলে আর সবই তো কৃত্রিম, সবই তো নির্জ্জীব, সবই তো নিষ্প্রভ, সবই তো নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই অনুপ্রাণনা লাভ করিতে হইলে, পরম পিতা পরমেশ্বরের সহিত যোগ অনুভব করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের মধ্যে সত্য, শক্তি ও আলোক সঞ্চারিত হইবে। সেই আলোকে আমাদের কাজগুলি যদি দেখি, তাহা হইলে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনাই করিব :—

যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে,
যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে।
হসি মিছে, কান্না মিছে,
সামনে এসে এ ভুল ঘুচাও।

মার্কিন ঋষি এমার্ষণ উপদেশ দিয়াছেন :—"Place yourself in the middle of the stream of power

and wisdom, which animates all whom it floats, and you will without effort be impelled to truth, to right and to perfect contentment,"—সকল শক্তি ও জ্ঞানের স্রোতঃস্বিনী, যাহা ইহার উপরিস্থিত সকলকে সঞ্জীবিত করে, তাহারই কেন্দ্রস্থলে নিজকে নিক্ষেপ কর, দেখিবে অনায়াসে তুমি সত্য, ন্যায় ও পরাশান্তিতে উপনীত হইবে। আমাদের আজ তাঁহারই কাজে যুক্ত হওয়া, আমাদের লক্ষ্য তাঁহারই ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা মিলিত করা, এবং আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা তাঁহার সত্য, তাঁহার আলোক, তাঁহার প্রেম ও তাঁহার পুণ্য লাভ করিয়া জীবনকে সর্ব্বাংশে সমুন্নত করা। আমাদের প্রাচীন ঋষির চিরসত্য অনুশাসন সকল কাজে সকল অবস্থায় আমাদের নিয়ামক হউক :—"যৎযৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমস্যা।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নগেন বারান্দায় একটী ছোট টোলের উপর বসিয়াছিল, গজা তাহার শরীরে তেল মাখাইতেছিল; এমন সময় হেট্-কোট্ ধারী শৈলেন ডাক্তার ঝড়ের মত আসিয়া কোঠার ভিতর চলিয়া গেল। তারপর যষ্টিটী আলনায় ও হেট্‌টী ব্রেকেটে রাখিয়া কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে বারান্দায় আসিয়া বলিল—"চলিলাম নগেন!"

নগেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কোথায় চলিলে, বাড়ী যাইবে নাকি?"

শৈলেন বলিল—"মেসোপটমিয়া চলিলাম।"

নগেন হাসিয়া বলিল "সাধু! সাধু!"

দুঃখিনী রান্নার কোঠা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। শৈলেন কোন "কলে" যাইতেছে ভাবিয়া বলিল—"রান্না তো কখন হইয়াছে, স্নান করিয়া আসিলেই যে হয়।"

শৈলেন বলিল—"অবিশ্বাস করিলে না কি?

নগেন হাসিয়া বলিল "ষোল আনা বিশ্বাসও করিলাম না।"

শৈলেন—"কেন, এ জাতির দুর্ব্বলতা দেখিয়া কি?"

নগেন হাসিয়া বলিল—"যাহাই হইক, বিষয়টা কি, বলিয়াই ফেল না!"

শৈলেন গম্ভীর ভাবে কোটটি রৌদ্রে ঝুলাইয়া রাখিয়া জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল—

"মেসোপটমিয়া যাইতে হইবে বলিয়া আদেশ হইয়াছে, এই বুধবারই যাইতে হইবে।"

শৈলেন পোষাক ছাড়িয়া পাখা হাতে লইয়া আসিয়া বসিল।

নগেন বলিল—"হাসি ঠাট্টায় কি কাজই করিয়া ফেলিলে?"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"কি করি ভাই, কেবল অতীতের আধ্যাত্মিকতার গর্ব্ব লইয়া থাকিলে কি আর এখন চলে? মানুষ এখন অতীতের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া তার বর্ত্তমানের শান্তি ও ভবিষ্যতের বৈকুণ্ঠাবাস প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত, এমন সময়—

নগেন বলিল—"থাক্ থাক্ ও সকল বড় কথা থাক; তোমার বাবা, মা—ওঁরা কি মত দিবেন? নিতান্ত ছেলেমি করিলে।"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—"জাতির ভিতর ছেলেমি, পাগলামি না ঢুকিলে কোন কাজ হয় কি? জাতিকে জাতিটাই তো আর আমার ছেলেমির জন্য অধঃপাতে যাইবে না। কিন্তু যদি কাজ করিতে পারি, এই ক্ষুদ্র লোকটার ছেলেমিই তখন দেশের গৌরবের সামগ্রী হইবে। যাক, ওই গৌরব ভাবিয়াও করি নাই। প্রিন্সিপ্যালের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তিনি ডাঃ ব্যেরোর পরিবর্ত্তে আমারই নাম লিখিয়া লইয়াছেন।"

নগেন—"ও পাগলামি ছাড়িয়া দাও, আমি আজই টেলিগ্রাম করিয়া জেঠা মহাশয়কে জানাইব। তোমার বীরত্বে দেশ জাগিবে—আর রাজ্যে মানুষ নাই, কাশী ঠাকুর চিড়া খাও—দেখিতেছি সেই কথা।"

শৈলেন বলিল—"দেখ ভাই এ সব বড় কথা বটে,

কিন্তু এ গুলিতে চিন্তার বিষয় কি কিছুই নাই? আমরা খুব আধ্যাত্মিক জাতি ছিলাম, বলিলেই কি আমাদিগের রাজা আমাদিগকে সম্মান করিয়া কর মর্দ্দন করিবে, না, সভ্যজাতিরা তাঁহাদের এক সঙ্গে বসিতে স্থান দিবে? যে জাতির বর্ত্তমান নাই, সে জাতির অতীতের দোহাইর প্রতি কেহ কখন কর্ণপাত করে না, সুতরাং ভবিষ্যত ও সে জাতির নাই—সে খাতায় সে দেউলিয়া। ভারতের ও গ্রীসের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ। সক্রেটীসের ধর্ম্ম উপদেশ ও মুনি ঋষিদের ধর্ম্ম কথায় এদুটা জাতিই অতীত অতীত জপিয়া বর্ত্তমান সভ্যজগতের নিকট নিতান্ত নগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার পরিবর্ত্তন চাই। সে সুযোগও দ্বারে উপস্থিত। এমন সুযোগ কি আমাদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।"

নগেন বলিল—"বিধাতা বলিয়া যে একজন পুরুষ আছেন,তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিলে তো চলিবে না, তাহারও approval দরকার; যাক, এখন মাথা ঠাণ্ডা কর, তেল দাও, তারপর বক্তৃতা শুনা যাইবে; যাইতে হয়, বেশ, যাইও। গজা, শৈলেনকে বাতাস দে!"

নগেন গজাকে বাতাস দিতে বলিয়া নিজেই নিজের শরীরে তেল দিতে লাগিল।" গজা হাত পাখা লইয়া শৈলেনের উপর বাতাস করিতে লাগিল।

শৈলেন থামিল না, সে বলিতে লাগিল—"তুমি বিষয়-টাকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিতে চাও, নগেন!"

নগেন"—না, হাসিয়া উড়াইতে চাই না; তবে এ সকল কার্য্যে ভগবানেরও যে কিছু হাত আছে, তাহা মানিয়া চলা উচিত; আর তোমারপক্ষে কার্য্যটা ভাল হইয়াছে কিনা তাহার বিচার করা উচিত।"

শৈলেন হাসিয়া বলিল— আমার পক্ষে ভাল নহে, তোমার পক্ষে ভাল নহে, শ্যামের পক্ষে ভাল নহে, রামের পক্ষে ভাল নহে, তবে কাহার পক্ষে ভাল হে?

নগেন "দেখ ভাই, ঝড়ে কলা গাছের মত লোক ক্ষয় হইতেছে, উহাতে তোমার আমার মত লোকের ঢাল নাই তরোয়াল নাই, নিধিরাম সরদার সাজা কি স্থির মস্তিষ্কের কার্য্য?"

শৈলেন বলিল "এই যে ম্যালেরিয়া কলেরা প্লেগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়া বাঙ্গালা উজার হইয়া যাইতেছে, কোন শুভ কার্য্য সিদ্ধির জন্য এই লোক ক্ষয় হইতেছে? দেশের বা জাতির কোন উপকার এই জীবন গুলি দিয়া হইতে পারে না কি? যদি হইতে পারে? তবে এই সেই কর্ম্ম। অনর্থক এ জীবনকে রোগ শয্যায় ভুগিয়া মরিতে দিব না, দেশের স্বার্থক কার্য্যে, মানুষের মত মরিব—ইহাতে তুমি পাগলই বল, আর যাহাই বল।" শৈলেন থামিল না, বলিতে লাগিল—"এ জগতের সভ্যতার মানমন্দির গঠনে ভারতের দান কত খানি ছিল, তাহা জগতের ইতিহাস হইতে মুছিয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান এই পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধে ভারতের কর্ম্ম ও তাহার শক্তির নিদর্শন জগতের সমক্ষে স্থাপন না করিলে সভ্যতার যে নূতন ইতিহাস লিখিত হইবে, তাহাতে তাহার স্থানই থাকিবে না।"

নগেন—"আদার ব্যাপারি হইয়া জাহাজের খবর কেন ভাই? জগতের সভ্যতা গঠনে ভারতের এমনই কি দান আছে, আর এই বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারত এমনই বা কি দিতে পারে, বা তাঁর দিবার আছে এ গুলি, ক্ষুদ্র কল্পনায় আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আর তুমিই বা আজ এই অসম সাহস বা দুঃসাহস করিয়া জগতের বিশেষ কি উপকার করিবে?' আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

শৈলেন—'বড়ই দুঃখিত হইলাম। দেশকে এত অবহেলার চক্ষে দেখিলে কি জাতিকে কখনও বড় করিয়া দেখিতে বা দেখাইতে পারিবে? জাতিকে বড় করিয়া না দেখাইতে পারিলে, বিশ্বের বিরাট সভ্যতার অনুরেণুতে নিজের দানকে স্পষ্ট করিয়া না দেখাইতে পারিলে—মানুষ বলিয়া যে জগৎ তোমাকে গ্রাহ্য করিবে না। আজ আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, সকলি ভারতের প্রাচীন গৌরবকে স্বীকার করিতেছে; তার কারণ বিশ্বের সভ্যতা গঠনে ভারতের দান—ধর্ম্ম-দর্শন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান। মিসরের শিল্প সম্ভার, গ্রীসের ভাস্কর্য্য, রোমের বিধি ব্যবস্থা, ফ্রান্সের সাহিত্য চিন্তা, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র, জার্ম্মেনীর বিজ্ঞান—ভারতের ধর্ম্ম-দর্শনকে মাথায় লইয়া এই সভ্যতার মানমন্দির গড়িয়া তুলিয়াছে; তুমি তাহা অবহেলা করিলে চলিবে কেন?"

নগেন হাসিয়া বলিল—"ভাই চল স্নান করি, ১টা যে বাজিয়া গেল। ভারতের জন্য যদি কাঁদিতে হয়, তবে তাহার জন্য লোকের অভাব হইবে না। আর আমাদের যে বিরাট দানের তালিকা তুমি দিলে, তাহা যদি মানমন্দিরের শীর্ষ দেশেই স্থাপিত হইয়া থাকে, তবে আর কোন চিন্তা নাই; তাতেই যথেষ্ট হইবে।"

শৈলেন বলিল—সে তোমার ভুল ধারণা। এই যুদ্ধে সভ্যতার সেই প্রাচীন মানমন্দির চূর্ণ হইয়া তাহা নূতন ভাবে গঠিত হইবে, সুতরাং ভারতের শক্তি ও চিন্তার সাহায্য ইহাতে থাকা আবশ্যক। ইহার ফল ভারতের প্রতিষ্ঠার পথে সাহায্য করিবে এবং—

এই সময় পারুল ও বকুল আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিয়া শৈলেন বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিল এবং পারুলকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল "ক্ষমা চাই দিদি, আমার একেবারে মরিবার অবসর টুকু নাই। এই তো একটা বাজে, এখনও স্নানই হয় নাই। বসো তোমরা, এই আমরা আসিতেছি" বলিয়া পারুল ও বকুলকে ঘরে যাইতে বলিয়া শৈলেন নীচে চলিয়া গেল। নগেন ও তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া স্নানে গেল। দুঃখিনী তাহাদের ভার গ্রহণ করিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পারুল শৈলেনের সহিত কোন কথাই কহিল না কথা বলিবার ভার ছিল বকুলের উপর। আহারের পর বকুল বলিল—"শৈলেন দা আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে।"

শৈলেন বলিল "বড় অসময়ে খাইয়াছি, বসো একটু বিশ্রাম করিয়া নেই।"

বকুল হাসিয়া বলিল—"আপনার মরিবার অবসর নাই বলেন, হঠাৎ অবসর দেখিয়া—

শৈলেন বকুলের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"যম যদি আসিয়া লইয়া যায়, তবে আর যাওয়া হইবে না এই তো? তবু যাইব।"

বকুল খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শৈলেন বলিল—"তথাপি আজ তোমাদের দণ্ড না লইয়া যাইব না। যমরাজকে দরজায় বসাইয়া রাখিয়া হইলেও আজ বিকালের চা পানটা তোমাদের বাড়ীতে যাইয়াই হইবে।"

বকুল বলিল—"বিশ্বাস করি না, এখনই যাইতে হইবে।"

শৈলেন বলিল—"খাড়া ওয়ারেণ্ট?"

বকুল—"সুতরাংই।"

শৈলেন অম্লান বদনে বলিল—"চল।"

গাড়ী দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। শৈলেন একটা সার্ট গায়ে দিয়াই চলিল।

বকুল বলিল "যাইতে হইবে কিন্তু টালিগঞ্জে?"

শৈলেন—"তবে শুনাইতে হইবে কিন্তু গান।"

বকুল "সে তো অবশ্যই।"

বকুল, শৈলেন ও পারুলকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিল "আমি এখানেই থাকিব, পাখী দি যাইতে দিলেন না, বাড়ী ফিরিবার সময় আমাকে লইয়া যাইও দিদি।"

পারুল শব্দ করিল না।

দুই বৎসর পরে, তেমনি আর এক বসন্তের বিকাল বেলায়, পুষ্পের সুগন্ধি নিশ্বাসের মাঝখানে, সেই সুনির্ম্মল শষ্পাসনে বসিয়া যুবক যুবতীকে বলিল—"আজ তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি পারুল, শেষ ভিক্ষা বলিয়া হাসিমুখে, প্রাণ খুলিয়া ক্ষমা করিতে হইবে।"

যুবক এইরূপ অনেক কথাই বলিয়াছে, যুবতী কিন্তু একটী কথারও এ পর্য্যন্ত উত্তর দেয় নাই। এইবার তাহার গণ্ড বহিয়া দু ফোটা অশ্রু যুবকের বাহুর উপরে পড়িয়া গেল।

শৈলেন বলিল "ছিঃ পারুল, আমাকে অকারণ দুঃখ দিও না, তোমার চক্ষের জল আমার মঙ্গল করিবেনা, কখনও কল্যান করিবে না; আমাকে অভিসম্পাতেই দগ্ধ করিবে।"

শৈলেনের কথা শুনিয়া পারুল চখের জল বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া ফেলিল। কোন কথাই বলিল না।

শৈলেন বলিল—"এই কয়দিন আমাকে ফোর্টে যাইয়া দুইবেলা 'পেরেড্' করিতে হইতেছে। আমাদের একেবারে মেসোপটমিয়াতেই চলিয়া যাইতে হইবে।

সময় একেবারে পাই নাই, আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মায়া বৃদ্ধি করাও এই সময় ভাল মনে করি নাই।"

পারুল শৈলেনের হাত দুখানা টানিয়া ধরিয়া বলিল "তুমি যাইতে পারিবে না।"

তাহার মুখে আর কথা বাহির হইল না—সে চখের জলও রাখিতে পারিল না। সেই প্রেমাশ্রু শৈলেনের বাহু যুগলকে অভিষিক্ত করিয়া দিল।

শৈলেন বলিল—"অসম্ভব, পারুল, অসম্ভব। আমি যে সব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি।"

পারুল বলিল—"আমি তোমার সব বেঠিক করিয়া ফেলিব—যাইতে দিব না।"

পারুল ছেলে মানুষের মত কথা বলিতেছিল,। শৈলেনকে সে যাহা বলিবে বলিয়া ঠিক করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল—শৈলেনের নুতন বন্দোবস্ত তাহার সে সব কথা পণ্ড করিয়া দিয়াছে। তাই সে সেই এক কথাই পুনঃ পুনঃ আওড়াইতে ছিল।

শৈলেন বলিল—"পারুল, এই স্থানে বসিয়া একদিন তুমি ফুলের জীবন ধারণের স্বার্থকতার কথা বলিয়াছিলে, তোমার সেই মহামূল্য উপদেশ আমাকে এখন আমার জীবনের স্বার্থকতার সীমায় উপনীত করিয়া দিতে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে—আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত। দেশ মাতৃকার পূজার নির্ম্মাল্য হইয়া যদি ভক্তের কোটায় সযত্নে রক্ষিত হই, মরিয়া, ঝরিয়া পড়িবার চেয়ে তাহা মহা গৌরবের মনে করিব। ইহা তোমার শিক্ষা, আমার নহে।"

পারুল বলিল—"সেই দুই বৎসর পূর্ব্বে কোন দিন যে ভাবের উন্মাদনায় কোন কথাটী বলিয়াছিলাম, আমারতো তা কিছুই মনে নাই—তাই মনে রাখিয়া কি আজ আমার উপর প্রতিশোধ লইবে শৈলেন দা? তুমি বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দ্দয়, আমার কি কোন প্রেম প্রীতি ভালবাসার কথা তোমার স্মৃতির কোণে স্থান পায় নাই?"

শৈলেন বলিল—"জীবন ভরিয়া তোমার প্রীতি-স্নেহ প্রেম ভালবাসার ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছি পারুল! তাহাকি আমি অস্বীকার করিতেছি। কোন কথায় আজ তুমি আমার নিষ্ঠুরতার প্রমাণ পাইলে?"

পারুল বলিল—"তোমার অবহেলা তোমার নিকট অতি সামান্য হইলেও আজ কদিন যাবৎ আমি তোমার সেই কঠোর ব্যবহারে যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছি,—তা তুমি বুঝিতেছ না—তোমার এই অবহেলায় আমার জীবনের স্পন্দন অসার হইয়া গিয়াছে, যেন বক্ষের সমস্ত রক্ত বরফ হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, আমাকে এরূপ নির্জ্জীব অসার করিয়া তুমি সুখী!"

শৈলেন—"তোমাকে অবহেলা করিয়া, আসার করিয়া, নির্জ্জীব করিয়া আমি সুখী! এ ধারণা তোমার হইতে পারে, আমি কল্পনাও করিতে পারি না পারুল! তুমি আমাকে এতখানি অপদার্থ, এতখানি স্বার্থপর মনে করিতেছ?"

পারুল চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"আমি মনে করিতেছি, শৈলেন দা! আমার কি মন আছে? আমার যে সব তুমি কাড়িয়া লইয়া আমাকে ফতুর করিয়া চলিয়াছ। আমার গতি কি হইবে, মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতেছ না। যাও, শৈলেন দা, কিন্তু মনে রাখিও—

শৈলেন ব্যস্ত হইয়া বিলল "ছিঃ, পারুল, আমাকে অভিসম্পাত করিতেছ—তোমাকে দুঃখ দিয়া, ফতুর করিয়া আমি কি কোথাও যাইয়া সুখে থাকিতে পারিব?"

"মঙ্গল ময় ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন—ইহাই আমার এক মাত্র প্রার্থনা। তোমার কোন প্রকার—এমন কি অতি সামান্য দুঃখও আমার কল্যাণের কারণ হইবে না। তুমি মনে রাখিও—আমি তোমারই।" বলিয়া পারুল উঠিয়া দাঁড়াইল।

শৈলেন পারুলের হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল। তারপর বলিল—"আমার নিকট তোমার কি বক্তব্য পারুল, আমি যে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।"

পারুল—যে, মানুষের দুঃখ বুঝেনা, বরং দুঃখের উপর দুঃখ দিয়াই আমোদ উপভোগ করে, সে ব্যক্তি কৃপা প্রার্থীর প্রার্থনা বুঝিতে, তাহার প্রতি এইরূপ বিড়ম্বনাই করিয়া থাকে।"

শৈলেন দুঃখিত হইয়া বলিল "আমার গত কয়েক দিবসের ব্যবস্থায় তোমার হৃদয়ে দারুণ আঘাত দিতে পারে, তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব পারুল?

আমিতো চিরদিন তোমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, ঠিক সেই রূপই এখনও করিতেছি। সেদিন অনুরোধ রক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিলাম, এমন আরও অনেক দিন আসিয়াছি। এই সপ্তাহে এক দিনও যাই নাই, তেমন টীও বহুবার হইয়াছে—তুমি চিঠি লিখিয়া ছিলে, আমি যে কেমন বিভ্রাটে পড়িয়াছি—তাহা যদি তুমি বুঝিতে, তবে সেজন্য আমাকে ক্ষমাই করিতে।"

পারুল—"তোমাকে এরূপ বিভ্রাট ডাকিয়া আনিবার জন্য কি কেহ অনুরোধ করিয়াছিল ?"

শৈলেন—"কেহ অনুরোধ করে নাই, নিজেই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি।"

পারুল—"বেশ, ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন।"

শৈলেন—"তবে, হাসিমুখে প্রাণ খুলিয়া ক্ষমা কর।"

পারুল শৈলেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—প্রাণ নাই শৈলেন দা, হাসি কোথা হইতে আসিবে? আমাকে সঙ্গিনী কর, আশ্রয় দাও, ঘরে বসিয়া থাকিতে আমি আটকাইয়া রাখিব না :—

আর সে বলিতে পারিল না, মুখে আটকাইয়া গেল, চক্ষু জল ভারাক্রান্ত হইয়া নত হইয়া পড়িল।

শৈলেন বলিল—"সে কি সম্ভব পারুল ?"

পারুল—"অসম্ভব কিসে ?"

শৈলেন—"আমার পিতা নিষ্ঠাবান হিন্দু; তিনি কি তোমাকে গ্রহণ করিবেন ?"

পারুল "তবে সেই এক দিন আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া ছিলে কেন ? আমার জন্য তোমার এমন কি দরদ ছিল ?"

শৈলেন "সেদিন আমি বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মতই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমি তোমাকে কুলত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিব—এমন বলিয়াছিলাম কি ?"

পারুল—'কি বলিয়াছিলে আমি তাহা স্মরণ করিয়া রাখি নাই; সে তুমিই জান, আর অন্তর্য্যামী প্রভুই জানেন!"

শৈলেন—"এখন আমি তোমার কি করিতে পারি পারুল ?"

পারুল—"যুদ্ধক্ষেত্রে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব, আহতের সেবা করিয়া যদি জীবন দেই, আর কুলের ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

শৈলেন "সেকি হইতে পারে ?"

"স্থান নাই, স্থান নাই ক্ষুদ্র সে-তরি,
আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।"

উভয়েই চমকিয়া উঠিল। বকুল পশ্চাতের গন্ধরাজ গাছের পিছন হইতে হাত তালি দিতে দিতে বাহির হইয়া আসিল।

বকুল বলিল—"দিদি তোমারও আর কাজনাই সাধা সাধিতে কি প্রেম হয় ? বসোদিদি ঠিক হইয়া, দেখি এখন আমরা তোমার কতদুর কি করিতে পারি।" বলিয়া বকুল উলুধ্বনি করিল।

উলুধ্বনি শুনিয়া নগেন দুইছড়া ফুলের মালা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বকুল মালা লইয়া উভয়ের গলায় পরাইয়া দিল। তারপর একের গলার মালা অন্যের গলায় দিয়া পুনরায় উলুধ্বনি করিল।

তারপর বলিল—"এখন যাও সাগর ডিঙ্গাইয়া কুল ধুইয়া আসিয়া দিদিকে কোল দাও।"

মা বাপ কিছুই বলিতে পারিবেন না, সমাজও কিছু করিতে পারিবে না।"

মিলন।

তোমার সনে আমার মিলন
চিরদিন এ হৃদয় মাঝে,
তোমার সুরে হৃদয় ভরা
তোমারি গান্ প্রাণে বাজে।
নিত্যি সকাল সন্ধ্যা বেলা,
তোমার সনে আমার খেলা,
হেমন্ত কি শীত বসন্তে
তুমি আমার কাছে কাছে।
শিশির হয়ে চোখে থাক
শীতের হাওয়া বুকে মাখ,
ফুল বসন্তে তোমার হাওয়া
মলয় হয়ে হৃদে রাজে,
তোমার সনে আমার মিলন
চির দিন এ হৃদয় মাঝে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়।

যৌবনের বাণী।

জগতের মধ্যে একটি দ্বৈত আছে। তাহার একদিকে স্তরে স্তরে সজ্জিত অজস্রবৈচিত্র্যপুঞ্জ, যাহা ক্ষণিক; অপরদিকে সেই সমস্ত বাহুল্যকে সম্মিলিত করিয়া একটি সুমহান্ ঐক্য আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, যাহা নিত্য। একদিকে তার গণনাহীন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সুবিশাল ব্যাপ্তি, অপরদিকে একটি আনন্দময় পরম পরিসমাপ্তি। একদিকে সরূপ, অপরদিকে অরূপ। এই অরূপ অমরাবতীর সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া যে লোকাতীত অশ্রুত সঙ্গীতের ঝঙ্কার প্রাণ উতলা করিয়া তোলে—যৌবনের মর্ম্মনিহিত বাণী সেই খানেই সমুচ্ছ্বাসিত! সেই খানেই অসীমের অসীম সমূর্ত্ত প্রকাশ, সেই অমর যৌবনের মধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, যিনি অচল তাঁহারি চির-চঞ্চল রুদ্রবেগ; যিনি চিরস্থির, চিরধ্যানরত তাঁহারি সলীল শোভন উদ্দাম গতি।

বাহিরের যে যৌবন বসন্তের ক্ষণিক সৌভাগ্যের মত দেখিতে দেখিতে কালের স্রোতে বিলীন হইয়া যায়, সেইটিকেই যখন একান্ত করিয়া দেখি, অন্তরের অন্তরতম সেই চিরযৌবনের অনন্ত অফুরন্ত লীলার সজীব প্রবাহকে তাহার স্বভাবসচল আবেগকে তখনি আমাদের হৃদয়ের বদ্ধ আগারে প্রবেশ করিতে দিইনা; তখন সেই দ্বৈতের গৌণটীকেই অত্যন্ত নজরে আনিয়া মুখ্যটীকে নির্ব্বাসিত করিয়া তবে ছাড়ি! সেজন্যই তখন বাহিরকার যৌবনের প্রকৃতি ও গতি আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়া ভিতরকার পরম রহস্যময় প্রাণের স্বভাব ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের চেতনাকে- বিজ্ঞানকে জাগ্রত করে না! যৌবনের সমস্ত নিদারুণতা ও উদ্দামতা আমাদিগের চোখে এত বেশী করিয়া ঠেকে, যে তাহাকে হয়, বিধাতার একটা বৃহৎ অভিশাপ ভাবিয়া নানান্ কৃত্রিম বাঁধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাই অথবা বাহিরের সেই যৌবনেরই অত্যুগ্র প্রলোভনে উন্মত্ত হইয়া ভোগীর মতন তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে চাই।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে এমন অবস্থা আসিয়াছিল। সেকালকার ইতিহাসে হয় দেখিতে পাই, যৌবনের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযোগ ও সংগ্রাম—একেবারে তার সমস্ত চাঞ্চল্যকে দমাইয়া দিয়া নির্জ্জীব নিশ্চল রসাতলের আলোকহীন অন্তরায়নে পাঠাইবার জন্য মোহমুদ্গরের বিচক্ষণ উপদেশ, নয়ত তাহার অতিচাপল্যের আতিশয্যকে লুব্ধ ভাবে ভোগ করিবার জন্য বাল্যবিবাহের অস্বাভাবিক প্রহসনে ও "সকৃৎ কৃত প্রণয়" নাগরিক বৃত্তিধারী রাজন্য বৃন্দের উৎকট কামাক্ষেপে সংসার ও পরিবার কলুষিত করিয়া অবশেষে আধ্যাত্মীকরূপকের অছিলায় তাহারি একটি উগ্রগন্ধ উন্মাদক উদ্গার সেকালকার সাহিত্যে ও জীবনে কি প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। এবিষয়ে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার "যৌবনে দাও রাজটীকা" নামক প্রবন্ধে অতিসুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। সত্যের খাতিরে তাঁহার সহিত সমস্বরেই একথাটা কবুল করিতেছি, যে "সংস্কৃত কবিরা এসত্যটী উপেক্ষা করে ছিলেন, যে ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরি ধর্ম্ম। বার্দ্ধক্য কিছু অর্জ্জন কর্‌তে পারেনা বলে কিছু বর্জ্জনও করতে পারে না। বার্দ্ধক্য কিছু কর্‌তে পারেনা বলে কিছু ছাড়্‌তেও পারে না।"

আসল কথা এই যে সেকালকার ভোগী ও যোগী কেহই যৌবনের সেই সত্যস্বরূপটীর সহিত পরিচিত ছিলেন না—সেই জন্যেই তার বাহ্যরূপটিকে লইয়া তাঁদের এত আস্ফালন বা বৈরাগ্য।

মানুষের গৃহপ্রাঙ্গনে এমন একটি শয়তান আছে যে বাহিরের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবার মূলসূত্রটিকেই একেবারে উচ্ছেদ করিয়া তবে ছাড়ে। আমাদের সেই দুর্ব্বিনীত, দুর্ব্বাধ্য প্রবৃত্তির লীলা দুইমুখীন্। একটি রাজসিক, অপরটি তামসিক। একটি আমাদিগকে বাহিরের দিকে একেবারে আকৃষ্ট ও আসক্ত করিয়া উন্মত্ত করিয়া প্রলয়তুফান তোলে ও অপরটি তাহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আপনার মধ্যেই অনন্ত ঘুরপাক খাওয়াইতে থাকে—একটি জগৎকে আপন ভোগের দাসা বলিয়া উচ্চ-চীৎকারমন্ত্রে মেদিনী কম্পান্বিত করিয়া তোলে, অপরটি জগৎ মিথ্যা বলিয়া লেজ গুটাইয়া আপন অন্তরের অন্ধতমকূপে ব্রহ্মানুসন্ধানে নিরত থাকে। সুরা ও রূপযৌবনের তরঙ্গে তরঙ্গে একটি মৃতবৎ

তরঙ্গায়িত ; অধ্যাস, মুদ্রা ও কৃচ্ছ্র সাধনে অপরটি স্থাণুবৎ মৃতপ্রায়

শয়তানের এই দ্বিমুখীন লীলাই জড়তা ও বার্দ্ধক্যের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। বার্দ্ধক্যের মধ্যে আমাদের অহঙ্কারই একান্ত উগ্র হইয়া ওঠে। তাহা আমাদিগকে সামনের দিকে মুক্ত ভাবে অগ্রসর হইতে দেয় না—একটা অচল কেন্দ্রের মধ্যে ক্রমাগত অতি প্রবল আবর্ত্তনে আপনাকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে।

অতি প্রবল দুঃখের মধ্যে মৃত্যুর প্রলয়াভিঘাতেই এই জড়তার ঘোর কাটে, নহিলে ইহা জীবিত মৃত্যুরমত আমাদের চৈতন্যের স্ফূর্ত্তিকে অহরহ ব্যাহত করিতে থাকে।

বস্তুত এই যে মৃত্যু, এযে প্রতিমুহূর্ত্তের প্রতিনিমিষের বিনাশ। এই মহাবিনাশই ত মানুষের অন্তর্দ্দেবতাকে কাঁদাইয়াছে—যে ক্রন্দন গগণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া সাগর-গিরি বিদীর্ণ করিল। মৃত্যু ত কণ্ঠের মণিহার ; কিন্তু এই প্রতি পলের মৃত্যুই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে অসহনীয়। কেননা, এ মৃত্যু যে আমাদিগকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একমাত্র আপনার মধ্যেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে! এর চারিদিকে কোথায় সেই মুক্ত আলোক বাতাসের দূরদিগন্ত প্রবাহিত সজীব আশ্বাস—কাননকুঞ্জের মঞ্জরিত বল্লীবিতানের নিয়ত মুখর মর্ম্মরধ্বনি—কোথা সেই বৃদ্ধ বনস্পতিদের নীরব আশীর্ব্বাদ—এত সবকে খাইয়া ও আপনাকেও খাইয়া কেবল একটা একঝোঁকা প্রবৃত্তির জোরে জগত মাৎ করিবার উৎকট চেষ্টা! ইহাতে কোথায় সেই আত্মার সুবিশাল ব্যাপ্তি যাহা বিশ্বে ও মানবে বিস্তীর্ণ হইয়া আপনাকে সফল ও সার্থক করিয়া তোলে। এযে এক প্রাণহীন, গতিহীন, নির্জীব জীবন, বিশ্বের কল্যাণ-লোক হইতে চির নির্ব্বাসিত!

আমাদের চিরকালকার সমস্যাও এই একটি মাত্র! যে আলস্য জড়তার ঘোরে আমাদিগের শক্তিগুলিকে মূক ও মূঢ় করিয়া ফেলে, তাহার অন্ধ জওতা হইতে উদ্ধার করিয়া সে গুলোকে বিশ্বের কর্ম্মক্ষেত্রে ও ভোগ-ক্ষেত্রে বিচিত্ররূপে সফল করিয়া তুলিতে পারে কোন্ কল্যাণ! যে প্রবৃত্তি অসীম ও অপরিমিত উত্তেজনায় নিমেষমধ্যে আমাদের বীর্য্যকে পরাজিত করিয়া উদ্দামবেগে উল্কার মত বিশ্ব হইতে ছুটিয়া সমস্ত বন্ধন ছিনিয়া বাহির হইতে চায় তাহাকে শান্তির মধ্যে সংযত করিয়া আনিতে পারে, কোন বীর্য্যবান্ প্রাণ!

একমাত্র মানুষের অন্তরাত্মার মধ্যেই এই চিরন্তন সমস্যার চরম সমাধান ; কেন না সেই হচ্ছে চির যৌবনের অফুরান প্রবাহ - যাহার দুর্ব্বার আবেগ মানুষকে অবিরাম ও দুর্ণিবার চলার মধ্যে, গতির মধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির একটি সুমহৎ সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়া তোলে!

এই যে নবীনতা, ইহাকে মারিলেও ইহা মরে না, আঘাত করিলেও আহত হয় না। কেন ন,া এযে অমর। মানুষ যেমন করিয়াই ইহাকে মৃত্যুর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখুক্—অন্তিমে ইহাই জয়ী! বারবার মানুষ আপন রচিত জালে ইহাকে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছে কিন্তু তবুত ইহাকে স্থির করিয়া শাসাইয়া রাখিতে পারিল না—কোনো রাজশক্তি না, কোনো সমাজশক্তি না, কোনো তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতা না। সকল আঘাত ও সংঘাতে ইহা আরো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—গৌরব গরিমায় ইহা দ্বিগুণতর বীর্য্যে সমস্ত সফলতা ও নিস্ফলতার বুক্ চিরিয়া ঘোর প্রলয় ঝটিকা ক্ষুব্ধ প্রলয়ের পথে বিশ্ব-অভিসার যাত্রায় ছুটিল।

সমস্ত বৃদ্ধের দল যখন ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষ হানিয়া বিকট দৈত্যের প্রতাপ দেখাইয়াছে, যখন বিশ্বব্যাপী প্রবীনের অট্টহাস্য বিশ্বাকাশ ভেদ করিয়া তুলিতেছে তখনো যৌবন সর্ব্ব অবসাদজয়ী আশায় গাহিতেছে—

"এ আঁধার হবে ক্ষয় হবে ক্ষয় রে, ওহে বীর হে নির্ভয়!"

সুখকে সে তুচ্ছ করিয়াছে, আরামের দ্বারে সে তার চিরক্ষুধিত ভিক্ষাঝুলি লইয়া ফেরে নাই, "মৃত্যুর ফেনিল উম্মত্ততা" সে আকণ্ঠ পাম করিয়াছে, ঘরের কোণে সে তার সঙ্কীর্ণ হিসাবের ভগ্নাংশ কষিতে বসে নাই, আবার কূপমণ্ডুকের মত আপন জীর্ণ অন্তঃপুরের অন্তরালে বৃদ্ধ পিতামহীর শীর্ণ আঁচলটিতে গা ঢাকা দিয়াও সে নাই। সে কেবলি চলিয়াছে—সেই প্রাণের লীলাপথে—যে

যাত্রার আনন্দাবেগে সে সমস্ত সঞ্চিত কৃত্রিম বিধিবিধান সমস্ত স্বরচিত আচার ব্যবহার নির্ম্মমভাবে দলিয়া চলিয়াছে—প্রাচীনতা, পুরাতনতা কিছুতেই তাকে আবদ্ধ করিতে পারিতেছেনা। এক কালের রীতিনীতি তাই শুষ্ক কুসুমের মতো অন্য কালে পরিত্যক্ত হইতেছে—এ পথ চলিবার, পথ থামিয়া থাকা চিরনিষিদ্ধ—কেননা,থামিবার দিকেই প্রলোভন চলিবার দিকে বাসনাক্ষয়!

মুখে হাজার অস্বীকার করি না কেন অন্তরের মধ্যে এই যৌবনের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারিনা—কৃত্রিম কত কৃপণতা দ্বারা অতিসূক্ষ্ম হিসাব ফলাইয়া সঞ্চয়কে সযত্নে বাঁচাইতে চাই, কোথা হইতে অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিয়া ঝোড়ো হাওয়ার রুদ্রমাতন এক নিমেষেই সব হিসাব-কিতাপ লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়।

কত পথ, কত প্রণালী ভাবিয়া চিন্তিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখি অকস্মাৎ ইহার উন্মাদক তুফান আসিয়া সমস্ত কল্পনা জল্পনা পণ্ড করিয়া দিয়া প্রচণ্ড বেগে কোথায় কোন্ সুদূর মুক্তির দিকে লইয়া যায়, বন্ধন হারা আনন্দের মঞ্জীর বাজাইয়া! ভাবিয়া চিন্তিয়া বিচার করিয়া অগ্রসর হওয়া যৌবন বিরুদ্ধ! এই যৌবনের স্পর্শমণি একবার যার মনে আসিয়া ঠেকিয়াছে, সেই ত সমস্ত ভাবনা চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া অটল নির্ভয়ে চলিতে পারে—মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের ক্ষুরধার নিশিত দুঃখের পথে!

যৌবনের মূলমন্ত্রই হচ্চে ভোগে ও ত্যাগে, কর্ম্মে ও নিবৃত্তিতে কেবলি চলা—উদ্দাম বেগে চলা। Revealation এর চতুর্থ অধ্যায়ের একটী শ্লোক মনে পড়িতেছে,—"After this I looked, and behold, a door was opened in heaven; and the first voice I heard was as it were a trumpet talking with me; which said, come up hither, and I will show thee things that shall be hereafter."

সেই hereafter এর message যে শুনিয়াছে, সেই ত কোনো ভোগের গণ্ডীতে বা কোনো সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিল না; সেইত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল,

"পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়
আমার, ঘরে থাকাই দায়।"

এই যে কান্না, ইহাই ত মানুষের মর্ম্মগত ক্রন্দন—এই কান্নাই ত জানাইয়া দেয় যে—সে অনন্তের যাত্রী! যে তার অন্তরতর স্বভাবই হচ্চে অনন্ত উন্নতির উন্নততম সিধা সড়কে কেবলি অশ্রান্ত প্রয়ান! যৌবনের বৈরাগী তাই ত বলিতেছে—

"ওরে ভাই! ঘরের কোণে তোদের থলি থালি আঁকড়ে বসে থাকিস্‌নে, বেরিয়ে পড়, প্রাণের সদর রাস্তায়—ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল!"

সে গাহিতেছে, "আমরা পথের বিচার করিনি,—আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেচি, ফুটে বেরিয়েচি!"

আজ্‌কের দিনে য়ুরোপ ও ভারতবর্ষ যুগপৎ যে রজঃ ও তমের মধ্যে বার্দ্ধক্যের দাসত্বে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে, এই নবীনতার আহ্বানে জাগিবার, এই যৌবনের পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হইবার দিন আজ উভয়েরই আসিয়াছে। একথা তাদের বুঝিতে হইবেই হইবে, যে কোনো বাহ্য উপকরণ উপভোগে আপনাকে ঝুঁকিয়া দিয়া অথবা কোনো বিশেষ বিশেষ আচার নিয়মে আপনাকে জড়াইয়া পরিত্রাণ পাওয়া মরীচিকাগ্রস্তের নিষ্ফল আশ্বাস মাত্র। আপনার মধ্যে যে অমৃত, ভূমা, যে চিরযৌবন চিরবিরাজিত তাহাকেই বাহিরে মুক্তি দান আমাদের চিরকালের সফলতা! একটানা ভোগ বা ত্যাগ দুইই দৈন্য ও দুর্ব্বলতারই নিদর্শন! সেই নবীনতার মধ্যেই এ দুইই সঙ্গত সামঞ্জস্যীভূত! চলিবার জন্য কৃত্রিম রাস্তা চাই না—চলিবার বেগে আপন রাস্তা আপনিই নির্ম্মিত হয়, সেজন্য পাঁজিপুঁথি খুলিবার আবশ্যক নাই?

এ কথা আজ বুঝিবার দিন আসিয়াছে যে—বিশ্বে ও মানবে যৌবনের চিরন্তন লীলা—সে হচ্চে অন্তরাত্মার অনন্ত আনন্দময় ক্রমবিকাশের লীলা। বিশ্বপ্রকৃতিতে যাহা সরল ও অবাধ, মানব প্রকৃতিতে তাহাই অতি কুটিল ও জটিলতায় পরিপূর্ণ; কিন্তু তবু সমস্ত বাধা বিদীর্ণ করিয়া মানুষকে জাগিতে হইবে, সেই নবজাগ্রত মানুষের কণ্ঠে যে নবীনের জয়গান ধ্বনিত হইবে,তাহা সপ্তলোককে স্পর্শ করিবে; বিশ্ববিধাতার চরণতলে তাহারি তরঙ্গউচ্ছ্বাস মূর্চ্ছিত হইবে—অন্য সকল কল্লোলের ঊর্দ্ধে উল্লসিত হইয়া!

আজ বুঝিবার দিন আসিয়াছে। স্বাধীন জীবনে লোক জাগিবার জন্য দিগদিগন্ত হইতে আহ্বান আসিতেছে—বিশ্ব যুগযুগান্ত ধরিয়া সেই আগমনীর মহোৎসব রাগিণী গাহিতেছে—অনন্ত নবীনতার মধ্যে সমস্ত যুগব্যাপী নিরানন্দ অন্ধকারকে বিসর্জ্জন দিয়া তবেই সেই চিরসুন্দরের জাগরণ হইবে—সেই অমল-জ্যোতিরালোকিত প্রভাতের জন্য আজকেকার অভিসপ্ত জগত অনন্ত আশায় সুদীর্ঘ রজনী স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।

জয় জয় জয় হে জয়, বিশ্বেশ্বর মানব-ভাগ্যবিধাতা।

শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী।

ইয়ুরোপীয় দ্বন্দ যুদ্ধ বা 'ডুয়েল'।

কোন গোপনীয় বা প্রকাশ্য ঘটনা লইয়া দুই ব্যক্তির মধ্যে উভয়ের সম্মতিক্রমে যে অপ্রকাশ্য দ্বন্দযুদ্ধ হয়, তাহাকে ইয়ুরোপে 'ডুয়েল' বলে। এই ডুয়েল অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানীর ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের সহিত ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা নগরীতে আসিয়া উহাকেও কিছু কালের জন্য কলঙ্কিত করিয়াছিল। বাস্তবিক সে কালের বঙ্গীয় ইংরেজ সমাজের মধ্যে উহা একটী গুরুতর কলঙ্কজনক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বঙ্গীয় ইংরাজ সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া ডুয়েল সম্বন্ধে যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহারই সামান্য আভাস প্রদান করা গেল মাত্র।

আমরা ইয়ুরোপীয় 'ডুয়েলের' আলোচনার পূর্ব্বে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতে দ্বন্দ যুদ্ধের ভাব কিরূপ ছিল, তাহার সামান্য আলোচনা করিব।

রামায়ণে বালি ও সুগ্রীবের দ্বন্দযুদ্ধের উল্লেখ আছে এবং পুরাণে সুন্দ উপসুন্দের দ্বন্দ যুদ্ধের কথা আছে। ইহাদের দ্বন্দের কারণ প্রায় তুল্য।

মহাভারতের জরাসন্ধ ভীম, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ভীমের সহিত দ্বন্দ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

ভবভূতির বীরচরিতে বালী ও রামে এবং পরশু-রামে ও রামে এবং ভারবীর কিরাতার্জ্জুনীতে মহাদেব ও অর্জ্জুনে দ্বন্দ যুদ্ধর অবতারণা আছে।

ইয়োরোপীয় ডুয়েলের কারণ ও কার্য্যের সহিত শেষোক্ত গুলির কোন সম্বন্ধ নাই।

সাহিত্য সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দুর্গেশ নন্দিনীতে ইয়ুরোপীয় "ডুয়েলের" আভাস দেখাইয়াছেন—ওসমান ও জগৎসিংহের দ্বন্দ যুদ্ধ দ্বারা। যে কারণে বালীর সহিত সুগ্রীবের ও সুন্দের সহিত উপসুন্দের যুদ্ধ হইয়াছিল, ওসমানের সহিত সেই কারণে জগৎ সিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল। ইয়ুরোপীয় 'ডুয়েল' প্রথাও সাধারণতঃ এই একই কারণে উদ্ভূত।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—ইহা পৃথিবীর সকল জাতিই স্বীকার করিয়া অসিতেছেন। সভ্যজাতি এই স্বেচ্ছাচারী নীতিকে অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতে দিতে পারেন না; তাই তাঁহারা যথা সম্ভব বিধি ব্যবস্থা দ্বারা শক্তিহীন দুর্ব্বলকেও জগতে স্থান প্রদান করিতে এবং কিঞ্চিৎ অধিকারও দান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেই আইন বা দুর্ব্বল রক্ষার বিধি-ব্যবস্থা আজও এত উন্নত প্যর্যায়ে স্থান পায় নাই যে মানুষের মনের যে কোন ক্ষত সেই আইনের শক্তির প্রলেপে শান্তি লাভ করিতে পারে।

যে সমাজের লোক দুর্ব্বল, আইনের প্রতিকারে বা রাজার বিচারে যাহারা অন্তরের ঘা ডাকিতে পারে না, সে সমাজের লোক, প্রতিকার না পাইয়া দুরদৃষ্টের ধিক্কার দিয়া নীরবে অশ্রুত্যাগ করে; ভগবানকে উদ্দেশে ডাকিয়া শাক্ষী করে, তারপর নিজের দুর্ব্বল্যের জন্য অনুতাপ করিয়া কাল কাটায়। আর যে সমাজ শক্তির উপাসক—ধমনিতে স্বাধীন রক্ত যাহাদের সকল সময় সমানে প্রবাহিত হয়, তাহারা আইনকে দুর্ব্বলের আশ্রয় বলিয়া উপেক্ষা করিয়া স্বীয় শক্তির পরিচয় দিতে উদ্যত হয়। এই সমাজের জন্যই "ডুয়েল" প্রথা সৃষ্ট হইয়াছিল।

বীরপ্রসূ ফরাসীদেশই বোধহয় এই প্রথার জন্ম স্থান। ফরাসীদের ১ম রাজা সাধু লুডিগ (Ludig the Pious) ফরাসী দেশকে বীরের দেশ করিয়া তুলিবার জন্য প্রকাশ্য দ্বন্দযুদ্ধ প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তিনি বিচারালয়ে বিচার মীমাংসায় দ্বন্দযুদ্ধের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া বাদী ও প্রতিবাদীকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান

করিতেন। দুর্ব্বলের পক্ষে অত্যাচার সহ্য করাই বিধেয়, ইহাই বোধ হয় তাঁহার নীতি ছিল। ইহার ফলেই বোধ হয় ফরাসীজাতি ক্রমে বীরজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এবং এজন্যই ক্রমে দুর্ব্বল অত্যাচারিত সমাজ আইনের ন্যায্য আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া শত্রুকে গোপনে প্রতিশোধ লইবার উপায় স্বরূপ এই গোপনীয় ডুয়েল প্রথার আবিষ্কার করিয়াছিল।

অতঃপর এই গোপনীয় ডুয়েল প্রথা এতদুর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ৪র্থ হেনরির রাজত্বকালে প্রায় চারি সহস্র ভদ্রলোক এইরূপে নিহত হন। অবস্থা অবগত হইয়া হেন্‌রী এই প্রথার প্রতিবাদ করেন। তাঁহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করার জন্য Comte de Boutteville and Marquis de Beuronকে গিলোটিন দেওয়া হয়। চতুর্দ্দশ লুইর সময়ও অপ্রকাশ্য ডুয়েল চলিয়াছিল, তিনি তাহা আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেন।

ফ্রান্স হইতে এই প্রথা ইংলণ্ডে আমদানী হয়। উইলিয়ম দি কঙ্কারার ইংলণ্ডে এই প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি নিয়ম করিয়া দেন ১৫ হইতে ৬০ বৎসর বয়সের পুরুষ অপরাধীরা প্রতিনিধি (Proxi) নিযুক্ত করিয়া শক্তির পরীক্ষা দেখাইয়া নিজকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিতে পারিবে। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে এই প্রথা প্রবল ছিল।

ফরাসী নাগরীকগণ যে কারণে গুপ্ত যুদ্ধের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল ইংলণ্ডেও ঠিক সেই কারণেই ডুয়েলের প্রচলন আরম্ভ হয়। অবশেষে ১১১২ অব্দে Duke of Himilton এবং Lord Mohanএর ডুয়েলে, ডিউক মারা গেলে বৃটীশ পার্লামেণ্টে এই প্রথা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য এক বিল উপস্থিত করা হয়। সেইবিল অগ্রাহ্য হয়; ডুয়েল চলিতে থাকে।

১৭৬৫ অব্দে লর্ড বায়রণ ও মিঃ চোয়ার্থ (Mr Chaworth) এর মধ্যে ডুয়েল হয় ও চোয়ার্থ হত হন। পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত হয়।

এক পক্ষ বলেন—এ গুপ্ত দোষাবহ জঘন্য প্রথা আইন করিয়া উঠাইয়া দেওয়া হউক। ইহা সমাজের কলঙ্ক, সভ্যতার কলঙ্ক, খৃষ্ট ধর্ম্মের কলঙ্ক। অন্য পক্ষ বলেন—দেশের আইন যখন প্রতিকার প্রার্থীর মনে সান্ত্বনাদান করিতে পারে না, সমাজের রীতি যখন মানীর মান রক্ষা করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উদাসীন, তখন ডান গালে চর খাইয়া বাম গাল ফিরাইয়া ধরিবার উপদেশ মূলক ধর্ম্মনীতির দোহাই ধৃষ্টতা। মানীকে মান রক্ষা করিতেই হইবে অথবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে; এই উভয় পন্থাই ডুয়েল নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সুতরাং আন্দোলন ফলদায়ক হইল না।

১৮০৮ অব্দে মেজর কেম্বেল ও কাপ্তেন বয়েডএর মধ্যে ডুয়েল হয়। বয়েড হত হন। মেজর হত্যার অভিযোগে ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বিত হন। ইহাতেও ডুয়েল থামিল না। অতঃপর ১৮৪১ অব্দের ৩১মে মহাসভার কতিপয় সভ্য এই কুপ্রথাকে আইন করিয়া উঠাইয়া দিবার জন্য মহাসভায় এক আবেদন উপস্থিত করেন। ইহাতেই ফল হইল না। আইন হইল কিন্তু ডুয়েল উঠিল না। ১৮৪৪ অব্দে কর্ণেল মনরো ও কাপ্তান ফসেটের মধ্যে ডুয়েল হয়। কর্ণেল হত হন। ফসেট পলায়ন করিয়া কিছুদিন প্রাণ রক্ষা করেন, অবশেষে কারাগারে প্রেরিত হন। ঐ অব্দেই আইনের শক্তি প্রবল করিয়া দিয়া ইংলণ্ড হইতে গুপ্ত ডুয়েল উঠাইয়া দেওয়া হয়।

আমরা ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে যে ডুয়েল সংঘটিত হইয়াছিল তাহারই ২।১টা মাত্র উল্লেখ করিলাম। এ গুলির অধিকাংশই স্ত্রীঘটিত ব্যাপার লইয়া সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য।

যে সময় ইংলণ্ডের রাজকবি লর্ড বায়রণ আত্ম সম্মান রক্ষার্থ কাব্য চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন—সেই সময় বর্ত্তমান সাম্রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা লর্ড ক্লাইভও কলিকাতায় জুয়া-খেলায় ব্রিত থাকিয়া কথায় কথায় প্রতিযোগীর প্রতি বিরক্ত হইয়া একেবারে তাহার প্রতি পিস্তল চালাইয়া বসেন। ক্লাইভের গুলি ব্যর্থ হইয়া যায়। তখন তাঁহার প্রতিযোগী তাহার নিজ পিস্তল ক্লাইভের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া বলেন "এইবার জীবন ভিক্ষা চাও।" ক্লাইভ তাহাই করিলেন।

প্রতিযোগী বলিলেন—"শুধু ক্ষমা প্রার্থনাতেই হইবে না; ক্ষমা চাহিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ক্রটীও স্বীকার করিতে হইবে।"

ক্লাইভ বলিলেন—"তুমি আমাকে খেলায় ঠকাইয়াছ—এখনও বলিতেছি ঠকাইয়াছ—আমি ক্ষমা চাহিব না, গুলি করিতে হয় তাহাই কর।"

প্রতিযোগী ক্লাইভের দিক হইতে বন্দুক উঠাইয়া লইয়া বলিলেন—"পাগল"।

ক্লাইভ রক্ষা পাইলেন। ইহাই বোধ হয় কলিকাতার ইংরেজ সমাজে ডুয়েলের সূচনার আভাস।

কলিকাতার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ডুয়েল—প্রধান সেনাপতি ক্লেভারিং ও রিচার্ড বারওয়েলের মধ্যে, গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও কাউন্সিলের সদস্য স্যার ফ্রেন্সিস ফিলিপ্সের মধ্যে এবং এইরূপ আরো কতিপয় প্রধান রাজপুরুষদিগের মধ্যে হইয়াছিল। এই জঘন্য আচরণ ভারতীয় ইংরেজ সমাজে এত প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে গবর্ণর জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণকেও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিদিগের আহ্বানে তাহাদের সহিত আস্তিন গুটাইয়া মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইতে হইত। আমরা অতি প্রাচীন ইংলিসম্যান, ক্রনিক্যাল, কলিকাতা রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকা এবং Echos from old Calcutta, Good Old Days of John Co. প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এইরূপ কতিপয় ঘটনার বিবরণ নিয়ে প্রকাশ করিলাম।

ইংরেজ জাতির ন্যায় আইনের সম্মানকারী জাতি পৃথিবীতে আর নাই। ব্যক্তিগত ভাবে দুই চার জন এই রীতির অপব্যবহার করিলেও জাতির হিসাবে এই গুণের জন্য ইংরেজ পূজিত। রাজাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইবার সময়ও ইহারা সেই রাজারই দস্তখত লইতে ব্যস্ত হইয়াছিল; কোন বিরাট অন্যায় করিতেও ইহারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ডুয়েল ব্যাপারও তাহার একটী প্রমাণ।

ডুয়েল অন্যায় এবং দুষণীয় হইলেও ইহার রীতি রক্ষায় ইংরেজের বিবেক খুব জাগ্রত। এক পক্ষ অপর পক্ষকে ডুয়েলে আহ্বান করিলে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতেই হইত এবং আহ্বানকারীর পিস্তলের সম্মুখে শান্তশিষ্টের মতধৈর্য্য ধারণ করিয়া অপেক্ষা করিতেই হইত। ইহা বিধি, সুতরাং অন্যথা হইবার উপায় নাই। ইহা মারাত্মক খেয়াল হইলেও এ মারাত্মক বিবিধ সম্মান রক্ষা করিতে ইংরেজ ইতস্ততঃ করিত না। এজন্যই ইহারা জগতে অজেয়।

জেনারল ক্লেভোরিং বনাম মিঃ রিচার্ড বারওয়েল।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কোন একদিন কাউন্সিল সভায় প্রধান সেনাপতি জেনারেল ক্লেভারিং নিমক বিভাগের কর্ম্মচারী রিচার্ড বারওলকে বলেন—আপনি কিরূপে এরূপ অমার্জ্জনীয় কার্য্য করিয়াও সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া নিজকে পরিচিত করিবার অধিকার রাখেন—লজ্জার কথা।

বারওয়েল তৎক্ষণাৎ বলিলেন—যে বলে আমি সরকারের অহিতাকাঙ্ক্ষী বা আমি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, সে বদমাইস (rascal and a scoundrel)

জেনারেল অপমানে জ্ঞান হারাইয়া কোষ হইতে তরবারি টানিয়া লইলেন। বারওয়েল মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৌনভাবে তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সেদিন প্রকাশ্য সভায় আর কিছুই হইল না। জেনারেল অপমান ভুলিলেন না।

৪র্থ দিন জেনারেল ক্লেভারিং বারওয়েলকে ডুয়েলে আহ্বান করিলেন। ৫ম দিন প্রাতে ৫ ঘটিকার সময় উভয়ে বজবজের জনশূন্য রাস্তায় যাইতে যাইতে বারওয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন—আর কত দূর নেওয়া আপনার পছন্দ ?

জেনারেল বলিলেন—"যত কাছে হয় ততই ভাল"।

উভয়ের সম্মতিতে ৮ গজের মধ্যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া উভয়ে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া জেনারেল বলিলেন—"আপনি এখন পিস্তল ছুড়িবেন কি মহাশয় ?" (will you fire sir ?)

বারওয়েল বলিলেন—'না মহাশয়, আপনিই

অনুগ্রহ করিয়া প্রথম ছুড়িবেন। (No sir, you will please to fire first.)

জেনারেল—"আপনার পিস্তল কি ঠিক আছে, মিঃ বারওয়েল?"

বারওয়েল—"হাঁ, মহাশয়।"

জেনারেলের মনে বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছিল, যে বারওয়েলের পিস্তত ঠিক মত ভরা হয় নাই; তিনি বলিলেন "আমাকে সময় দিন, আপনার পিস্তলটী যে ঠিক আছে, তাহা দেখিয়া নি।"

জেনারেল বারওয়েলের পিস্তল দেখিয়া তাহা ঠিক আছে বুঝিয়া পুনরায় যাইয়া নিজ স্থানে দাঁড়াইলেন এবং বারওয়েলের প্রতি পিস্তলের লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলি ছুড়িলেন। গুলি বারওয়েলের দুই উরুর ফাঁক দিয়া এক উরুর ভিতরের দিকে একটু আঘাত করিয়া চলিয়া গেল। বারওয়েল দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জেনারেল বলিলেন"—এখন আপনি গুলি করুণ!"

বারওয়েল "না মহাশয়, আমি আপনাকে গুলি করিতে এখানে আসি নাই, আপনি আহ্বান করিয়াছেন, আপনার আদেশ পালন করিতে এবং আমার নিজ চরিত্র যে নির্দ্দোষ, তাহা দেখাইতেই আসিয়াছি। আপনার সহিত আমার কোন সক্রতা নাই, যাহা সেদিন ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য আমি দুঃখিত।"

জেনারেল উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"তা হইবে না, আপনাকে গুলি ছুড়িতেই হইবে; যদি আপনি পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করেন, তবে আমি পুনরায় আপনাকে গুলি করিতে বাধ্য হইব।"

বারওয়েল তথাপি পিস্তল ছুড়িলেন না।

শেষ বারওয়েলকে দিয়া বিশেষ সর্ত্তে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়াইয়া জেনারেল তাহাকে নিস্কৃতি দিলেন।

এই ঘটনার কেহ সমর্থন না করিলেও ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন—মৃত্যু লীলায় যে সৎসাহস ইংরেজ পুরুষেরা এই ডুয়েলে দেখাইয়াছেন, তাহা কেবল স্বাধীন-প্রাণ বীর জাতিতেই সম্ভব!

ফিলিপ ফ্রেন্সিস বনাম ওয়ারেন্ হেষ্টিংস।

স্যার ফিলিপ ফ্রেন্সিস সে কালের বঙ্গীয় ইংরেজ সমাজের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ দিলেন। ইনি গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের একজন মেম্বর ছিলেন। এই ফিলিপ ফ্রেন্সিস ও বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের মধ্যে যে ডুয়েল হইয়াছিল, তাহা সেকালের ইংরেজ সমাজ-সমালোকগণের মধ্যে একটী প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। হিকির জার্নাল ও বাষ্টিডের গ্রন্থ এই ঘটনার বিস্তৃত সমালোচনায় ও বিবরণে পূর্ণ। আমরা তাহাই নিয়ে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম।

হেষ্টিংস যে কার্য্যই করিতেন বা কাউন্সিলে যে কোন প্রস্তাবই উত্থাপন করিতেন, ফ্রেন্সিস তাহারই প্রতিবাদ করিয়া তাহা পণ্ড করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। ফলে ইহাঁদের উভয়ের আচরণ উভয়ের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং গবর্ণর জেনারেল রূপে হেষ্টিংস পদে পদে অপমান বোধ করিতেছিলেন। ১৭৮০ অব্দে ৩রা জুলাই তারিখে হেষ্টিংস ফ্রেন্সিসের বিরুদ্ধে এক তীব্র মন্তব্য-পূর্ণ মিনিট লিখেন। এই সময় ফ্রেন্সিস একটু অসুস্থ ছিলেন; হেষ্টিংস এই সময় উক্ত মিনিট পাঠ না করিয়া তাহা রাখিয়া দেন, এবং এই মিনিট পাঠ করিলে যে একটা অঘটন ঘটিবে তাহা চিন্তা করিয়া স্বীয় পত্নীকে চুচুঁড়া পাঠাইয়া দেন। *

১৬ই আগষ্ট হেষ্টিংস সেই মন্তব্য কাউন্সিল সভায় পাঠ করেন। সেইদিন অপরাহ্নে ফ্রেন্সিস হেষ্টিংকে ডুয়েলে আহ্বান করেন। পরদিন ভোরে ডুয়েলের সময় নির্দ্ধারিত থাকে।

ফোর্ট উইলিয়মের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল ওয়াটশনকে লইয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে ফ্রেন্সিস যাইয়া আলিপুর বেলভেডিয়ারের নিকট অপেক্ষা করিতে থাকেন। সেনা বিভাগের কর্ণেল পিশার্সিকে লইয়া হেষ্টিংশ আসিয়া অতঃপর সেই স্থানে উপস্থিত হন। ওয়াটশন একটা বৃক্ষের ছায়া দেখাইয়া বলেন, ইহাই ডুয়েলের স্থান, এই হত্যা বৃক্ষের ছায়ায় (in the shed of the tree of destruction) বহু ডুয়েল হইয়া গিয়াছে, সে দিন ও মিঃ

* বাষ্টিড লিখিয়াছিলেন—হেষ্টিংস মনে মনে বুঝিয়াছিলেন যে এরূপ তীব্র মন্তব্যের পরিণামে জীবন মৃত্যুর প্রশ্নের সমাধান হইবে। তাই তিনি কোন দেশীয় ধনীর নিকট হইতে তাঁহার পত্নীরভবিষ্যৎ সংস্থান জন্য তিন লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। Echoes from old Calcutta.

ফক্স এবং মিঃ এডাম এইস্থানে লড়িয়াছিলেন।" ওয়াটসন চৌদ্দ ধাপ স্থান মাপিয়া দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুখামুখী দাঁড়া করাইয়া স্ব স্ব পিস্তলের লক্ষ্য স্থির করিতে উপদেশ দিলেন।

এই স্থানে একটী কথা অনাবশ্যক হইলেও উল্লেখ যোগ্য যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের কেহই পিস্তল ধরিতে অভ্যস্থ ছিলেন না।* ফ্রেন্সিস কম্পিত হস্তে পিস্তল লইয়া গুলি ছাড়িতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। তাঁহার পিস্তল বদলাইয়া দেওয়া হইল। তারপর মধ্যস্থ দ্বয়ের ইঙ্গিতে এক সঙ্গে একে অন্যকে গুলি ছুড়িলেন। ফ্রেন্সিসের দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। হেষ্টিংস তখন দৌড়াইয়া আসিয়া ফ্রেন্সিসকে ধরিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"আঘাত যদি গুরুতর হইয়া থাকে, তবে আমি নিজকে সেরিফের হস্তে সমর্পণ করিব।"

পিয়ার্সে দৌড়াইয়া গিয়া লম্বা নেকড়া আনিলেন ও আঘাতের রক্ত বন্ধ করিবার জন্য ঐ নেকড়া দ্বারা তাহা বাঁধিয়া দিলেন। হেষ্টিংও বেণ্ডেজ বাঁধিতে সাহায্য করিলেন। ওয়াটসন পাল্কির জন্য চলিয়া গেলেন। পাল্কি বেহারা আনীত হইলে ফ্রেন্সিসকে প্রথমে কলিকাতায় নেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল, তৎপর অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বেলভেডিয়ারেই লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে ডাঃ কেম্বেল ও হেষ্টিংসের চিকিৎসক ডাঃ ফ্রেন্সিস তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে নিযুক্ত হন।

গুলি স্কন্ধের নীচ দিয়া মাংসপেসি ভেদ করিয়া পৃষ্ঠের দিকে গিয়াছিল। কোন হাড় স্পর্শ করে নাই।

হেষ্টিংস বেলভেডিয়ার ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রাসাদে চলিয়া যান। ১৭ই হইতে ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ফ্রেন্সিস বেলভেডিয়ারে অবস্থান করেন।

এই সময়কার ফ্রেন্সিসের দৈনিক ডাইরিতে এইরূপ লেখা আছে।

* Col. Pearses narrative says :—when the pistols were delivered by the seconds Mr Francis said he was quite unacquainted with these matters and had never fired a pistol in his life. Hastings told he could not recollect that he had ever fired a pistol above once or twice.

১৭ আগষ্ট—মিঃ হেষ্টিংস জানিতে ইচ্ছা করেন, কোন সময়ে তিনি আমাকে আসিয়া দেখিতে পারেন?

১৮ই আগষ্ট - এই দুইদিন বেদনা খুব বেশী ছিল।

১৯ আগষ্ট—কর্ণেল ওয়াটসন দ্বারা যতদূর সম্ভব ভদ্রতার সহিত মিঃ হেষ্টিংসকে জানাইতে চাই—আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার ইচ্ছা করি না।"

২৪ আগষ্ট—কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলাম।

স্যারজন মেক্‌ফার্সন বনাম মেজর ব্রাউন।

ওয়ারেন হেষ্টিংসকে যেমন ফ্রেন্সিস ডুয়েলে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই রূপ স্যারজন মেকফার্সন যখন গবর্ণর জেনারেল সেই সময় (১৭৮৭-৮৮) একদিন মেজর ব্রাউন মেক্‌ফার্সনকে ডুয়েলে আহ্বান করেন। এই ডুয়েল সম্বন্ধে কোন লেখকই বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন নাই। বিলাতের ডিরেক্টার সভা ভারতীয় সংবাদ পত্রে এই কলঙ্ক জনক বিবরণ পাঠ করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতা গেজেটে উদ্ধৃত হইয়াছিল। আমরা প্রাচীন কলিকাতা গেজেট হইতে তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম।

১৭৮৮ অব্দের ২৮ মার্চ্চের লিখিত কোর্ট অব ডিরেক্টারের চিঠিতে লিখিত হইয়াছে সংবাদ পত্রে স্যার জন মেকফার্সন এবং মেজর জেমস ব্রাউনের মধ্যে ডুয়েলের বিবরণ পাঠ করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টার নিম্ন লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। "মেজর ব্রাউন কর্ত্তৃক স্যারজন মেকফার্সনকে যে কোন কার্য্যে ক্ষমা চাহিতে বলা অন্যায় হইয়াছে। কেন না স্যারজন যে কোন কার্য্য করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালার গবর্ণর জেনারেল রূপে করিয়াছেন. বিশেষ কোম্পানীর অধীন কর্ম্মচারীগণের অভিযোগ যখন ডিরেক্টার সভা সকল সময়ই শ্রবণ করিতে প্রস্তুত।"

এই ডুয়েল সম্বন্ধে ইহার অধিক বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। প্রাচীন কলিকাতা গেজেটে আরও অনেক ডুয়েলের সংবাদ আছে, তাহা পাঠক দেখিবেন।

আমরা এই সকল বিভৎস ঘটনা উল্লেখ করিয়া কাহাকেও উত্তেজিত করিতেছি না; শুধু সমাজের অবস্থাই প্রকাশ করিলাম।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলিসম্যান পত্রের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ষ্টকুলার (J. H. Stockquler) ও কলিকাতা জার্ণালের তেজস্বী সম্পাদক সিল্ক বাকিংহাম এক যোগে পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফের সহিত ডুয়েলে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাদ্রি ডাফ এক জন ধর্ম্ম ভীরু লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রক্তও ডুয়েলের নামে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথার আলোচনায় নিবৃত্ত হইলাম।

এখন সভ্যদেশ সমূহ হইতে এই পাপ অভিনয়ের উচ্ছেদ হইয়াছে, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে ফরাসী দেশের গবর্ণমেণ্ট এই প্রথার উপর এক নূতন কর ধার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল।

ফরাসী রাজ্যে ডুয়েল কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথম শ্রেণীর উপর ৮০ পাউণ্ড বা ১২০০৲ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর উপর ৩০০৲ টাকা এবং ৩ য় শ্রেণীর উপর ১০০৲ টাকা কর ধার্য্য হইবে স্থির হইয়াছিল। সরকারী ডাক্তার এবং একজন মধ্যস্থ থাকিবার ও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীমতীর আক্ষেপ।

(১)

সখিলো সখি, শুনলো কহি—
দহি যে মনাগুনে
যে লাগি জীবন বহিয়ে মরি
একলা ঘরের কোণে.
যে'তে নাপারি যমুনা ঘাটে,
যে লাগি আমার পরাণ ফাটে,
বাটের দিকে চাহিয়ে থাকি
সজল নয়নে,
শুন্‌লো শুন্ সেই দুঃখের কথা
কহিলো তোর সনে।

(২)

শাশুড়ী ননদী যেদিন অবধি
হইয়াছে মোরে বাম,
সে দিন হইতে প্রাণের ভিতর
জুড়িয়া বসেছে শ্যাম,
নইলে সেতো আসিত যাইত
হাসিত খেলিত নাচিত গাহিত,
উহার পানে কে আর চাইত
কে লইত ওর নাম?
সে দিন হইতে প্রাণের ভিতর
জুড়িয়া বসেছে শ্যাম।

(৩)

আজ সে তারা বেঁকে বসেছে
চিকণ কালার পানে!
আজ সে এত বিষ নয়নে
দৃষ্টি তারা হানে!
আপন চ'খে দেখেছি তখন
দিতে ক্ষীর সর, দিতে সে মাখন—
আদর ক'রে ডেকে এ'নে
আমার সাম্‌না খানে,
আজ সে এত বিষ নয়নে
দৃষ্টি তারা হানে!

(৪)

আজ সে আমি হ'য়েছি সখি,
তাদের চখের বালি!
আজসে সখি, কুটিলা আমায়
কটুই কহে খালি!
রাখিয়ে নবনী আমারি হাতে
বেড়া'তে যাইত প্রদোষে প্রাতে
কহিত "দে'খো, ভুলনা দিতে
আসলে বনমালী,"
আজ সে সখি, কুটিলা আমায়
কটুই কহে খালি!

(৫)

আজ সে এত আটক ফাটক
আজ সে এত গালি!
আজ সে মাথায় তু'লে দিছে
শ্যাম কলঙ্কের ডালি!

আমার কি আর নাইলো দেখা,
কালা এ'লেই হতো যে ঠেকা ;
দেখান হতো কত না ঢঙ
কত না চতুরালী !
আজ সে মাথায় তু'লে দিছে
শ্যাম কলঙ্কের ডালি ?

(৬)

আমারি কি সই, দেখ্‌লে কাণু
স্ফূর্ত্তি মনে জাগে ?
আমারি কি সই, বেণুর আওয়াজ
মধুর মতন লাগে ?
দেখেছিলো—এই বড়াই যত,
ঘরের কাজ সব পড়ে রইত,
গোষ্ঠ-বিহার দেখতে যে'ত
ছুটে সবের আগে,
আমারি কি শুধু বেণুর আওয়াজ
মধুর মতন লাগে ?

(৭)

ওরা যে আমায় মজেছি ব'লে
নিতুই এত কয়,
ঐ হাসি ঐ মোহন চূড়া
নতুন তো তার নয় !
আসতে যে'তে সকাল বিকাল
ঐ নয়নেই চায় চির কাল
ঐ ভঙ্গী তার সঙ্গের সঙ্গী
কার না জানা রয় ?
ঐ হাসি ঐ মোহন চূড়া
নতুন তো তার নয় !

(৮)

কালা কালা কালা কালা ক'রে
এত যে হ'তেছে খুন,
তবু তারা ভেবে না দেখে—
কালার কি যে গুণ ?
যে ভাবেই যে লউক না শরণ,
কালার পেঁচে পড়্‌লেই মরণ,
কালার কারণ নির্ম্মল কুলে
পড়্‌বেই কালী চূণ।
তবু তারা ভেবে না দেখে
কালার কি যে গুণ !

(৯)

নাদেখে নাদেখে, দুঃখ নাই তাতে,
দুঃখ র'ল মনে ঐ—
কালার প্রেমে লাভ হ'ল সই,
কেবল বিরহই
জীবন যৌবন চরণে বেচে
নয়নের জল মরলাম সেচে
'আসব' ব'লে ব'লে গেছে
আসবে না নিশ্চয়ই,
কালার প্রেমে লাভ হ'ল সই—
কেবল বিরহই !!

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

পুত্র-স্নেহ।

'মা, গোপীনাথের রথযাত্রায় যাইব মা, কি বল মা ?'

"যাইতে চাস্ যা।"

"সেই যে ছোট বেলায় গিয়াছিলাম,—সে প্রায় ১৫।২০ বছরের কথা ; মিঠা পুকুরের জল—যেন চিনির সরবৎ—ঢুকে ঢুকে খাইয়া পেট ভরিয়াছি ; হেঁ মা, এখনও কি সেই মিঠা পুকুরের জল মিঠাই আছে ?"

মা হাসিয়া বলিলেন "ভক্তিই মূল বাবা, যার ভক্তি আছে, তার নিকট পেনা পঁচা জলও মিশ্রীপানা।"

"তবে যাব মা, তুমি বাবাকে বলিয়া ঠিক কর, আমি শম্ভুকে নৌকা দেখিতে বলি।"

"তাঁর কি তাতে অমত হবে, তবে একা যাইতে তিনি মত দিবেন না ; ঝড় বৃষ্টির দিন, গাঙ্গ বিলের পথ, জলে ভাসা দেশ—"

সুধা মার নিকটে বসিয়া তরকারী কুটিতে ছিল—দাদার রথযাত্রার প্রস্তাবে তার আনন্দের সীমা ছিল না, তার জন্মের পর আর মা রথযাত্রায় যান নাই ; সুতরাং

সুধার ভাগ্যে আর রথযাত্রার লোকারণ্য ও মহা ধুমধাম দেখা ঘটে নাই। অনেক বার যাইবার কথা হইয়াছিল, না না অবান্তর ঘটনায় এ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এবার পূরা বর্ষা দেখা দেওয়ায় বহুলোক রথযাত্রায় যাইবে বলিয়া গ্রামে পূর্ব্বেই রটনা হইয়াছিল। সুধাও মার নিকট ইতিমধ্যে দুই চারবার যাইবার প্রস্তাব করিয়াছে কিন্তু বিশেষ সন্তোষ জনক উত্তর পায় নাই। এবার তাহার দাদা কলেজের পড়া শেষ করিয়া বাড়ী আসিয়াছে, সুতরাং লইয়া যাইবার লোকের অভাব হইবে না; তবু মা সুধার কথায় সদুত্তর দিতে পারিতেছিলেন না।

মা জানিতেন, গিরীন্ লোক জন সঙ্গে লইয়া যাইবার পাত্র নহে, তাই সুধার কথায় তিনি তেমন মন খুলিয়া সায় দিয়া বালিকাকে ক্ষণিক উৎসাহ দিয়া পরে নিরাশায় ফেলিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি গিরীন্‌কে বলিলেন —'একা যাইতে তিনি মত দিবেন না।'

মা'র কথা শুনিয়া সুধা দাদার মুখের দিকে তাহার উত্তর প্রতীক্ষায় উৎগ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিল।

গিরীন্ বলিল—"না মা, তাহা হইবে না, আমার সঙ্গী আমার কবিতার বই, খাতা, আর পেন্সিল ছাড়া কিছু হইতে পারিবে না। গোপীনাথ দর্শন উপলক্ষ্য মাত্র, আমি এই উপলক্ষ্যে—এই ভাসান বর্ষায় বিলে খালে একটু ভ্রমণ করিব—এ আমার বহুদিনের খেয়াল— এমন টল্‌টল্ ছল্‌ছল্ বর্ষা আমাকে একা উপভোগ করিতে হইবে। আমি মেয়েছেলের হাঙ্গামা সঙ্গে লইয়া তীর্থ করিতে যাইব না—তেমনটী হইলে আমার যাওয়া হইবে না।"

সুধা দাদার কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মার মুখের দিকে চাহিল।

পুত্রের কথা শুনিয়া মা কোন উত্তর দিতে সাহস পাইলেন না। গিরীন্ মাতা পিতার অবাধ্য ছিল না; তবু মা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এ কথার উত্তরদিতে পারিতে ছিলেন না।

উপযুক্ত পুত্রকে বিবাহ করাইয়াও মা আজ বধু দেখিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত; পুত্রও সেই বিরহ অন্তরের সহিত অনুভব করিতেছিল; মার মনে পুত্রের এই অনুভূতির ভাব প্রতি মুহূর্ত্তে বেদনা দিতেছিল। তাই তিনি পুত্রের কথার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না, সুধার অনুরোধ আব্দারগুলিও সেজন্য তাহার নিকট খুব লক্ষ্য যোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল না।

"মা বলিলেন—একা যাইতে ইচ্ছা হয় একাই যা।"

গিরীন্ বলিল—"তবে তুমি বাবাকে জানাইও, আমি নৌকা দেখিব।"

মা বলিলেন—"আচ্ছা।"

গিরীন্ চলিয়া গেলে সুধা অশ্রু ভারাক্রান্ত স্বরে বলিল—"আমিও যাইব মা?"

মা বলিলেন—"সে কাকেও সঙ্গে নিবে না, তুই কার সঙ্গে যাবি, এত বড় মেয়ে?"

সুধা তবু বলিল—"হাঁ আমি যাইব, দাদার সঙ্গেই যাইব।"

মা মেয়েকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"গিরীনের বিবাহ হইলে আগামী বছর নূতন বউকে লইয়া যাইস।"

সুধা বলিল—"সেবার আর এত জল হইবে না, দাদাও আর বিবাহ করিবে না—আমি এবারই যাইব।"

"বিবাহ করিবেনা কি রে, নিশ্চয় করিবে।" বলিয়া মেয়ের উত্তরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মা উঠিয়া গেলেন।

(২)

কবিতার খাতা, পেন্সিল ও কয়েকখানা কাব্য গ্রন্থ সাথে লইয়া গিরীন্ গোপীনাথের রথযাত্রা দর্শন উদ্দেশে নৌকাযাত্রায় বাহির হইয়াছিল: 'বিলের পদ্ম', 'অস্ত গামী সূর্য্য', 'পল্লবধু,' 'নৌকাবিহার,' 'বরষার বিল', 'স্রোতস্বিনীর কূল ত্যাগ; ইত্যাদি সাময়িক ও প্রাকৃতিক খণ্ড কবিতাতে তাহার খাতাখানা অর্দ্ধ সমাপ্ত করিয়া সে আসিয়া রথের দিন গোপীনাথের ঘাটে উপস্থিত হইল।

তাহার ছেলে বেলার স্মৃতি তাহাকে 'মিঠা পুকুরের' দিকে প্রচুর পরিমাণে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল। কি মিষ্টি সে পুকুরের জল! কি সুন্দর সে বাঁধাঘাটের সোপান শ্রেণী! সে মাঝিকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া রাখিয়াছিল—মিঠা পুকুরেই নৌকা বাঁধিতে হইবে। মাঝিও তাহাই করিল। অগণিত নৌকার ভিড় ঠেলিয়া মাঝি

গিরীনের নৌকা খানি আনিয়া একেবারে সিড়ির ঘাটে লাগাইয়া দিল।

গিরীন্ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"এই কি মিঠা পুকুর?" মাঝি উত্তর করিল—"হয় কর্ত্তা এইডাই মিডা পুস্কুন্নি।

"এই তার জল! এই তার ঘাট!"

গিরীন ছৈয়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বড়ই লজ্জা বোধ করিতে লাগিল; অগণিত মেয়ে যাত্রীর ভিরে সেঘাট সঙ্কুলিত। তাহার ন্যায় নির্জ্জন প্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সেঘাটে তিল পরিমাণ সময়ও অপেক্ষা করা সে সমীচীন বোধ করিল না। সে লাফাইয়া তীরে উঠিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। মিঠা পুকুরের সে লনা ধরা জল ও কঙ্কাল সার সোপান দেখিয়া তাহার প্রাচীন স্মৃতিকে নবীন রুচি ধিক্কার দিতেছিল।

গোপীনাথের রথযাত্রা এ অঞ্চলের একটী প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান। বর্ষার নৌকা চলার সুবিধা হইলে এই উৎসবে এত নরনারীর সমাগম হয় যে দেখিলে মনে হয়, যেন দেশের বাড়ীতে আর স্ত্রীলোক কেহ গৃহে বসিয়া রহে নাই, পুরুষের তো কথাই নাই!

এবার আষাঢ় মাসেই পুরা পূরি বর্ষা দেখা দিয়াছিল সুতরাং নৌকা যাত্রীর সংখ্যার আর অবধিই ছিল না। গিরীন্ মিঠাপুকুর পাড়ের সেই নারী-মহা-সঙ্ঘ ঠেলিয়া আসিয়া পুরীর সম্মুখের খোলা ময়দানে দাঁড়াইয়া হাঁফ ছাড়িল।

এখানে পুরুষ লোকই ছিল বেশী। নৌকা রাখিবার পক্ষেও সেদিকটা বেশ মুক্তস্থান; গিরীন্ তাহার নৌকা এই খোলা মাঠে রাখিবার বিষয়ই মনে মনে ভাবিতে ছিল, এমন সময় রথ টানিবার হৈ চৈ শব্দ উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে লোকের চঞ্চলতা ও তৎপরে ছুটাছুটী দেখা যাইতে লাগিল। তারপর সেই বিশাল রথ চূড়া ধ্বজা উড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল পুণ্যকামী নরনারী 'রথেন বামনং দৃষ্টা' পুনর্জ্জন্মের আসক্তি ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অর্ঘ স্বরূপ বিবিধ ফল-শস্য গোপীনাথের চরণে দুর হইতে নিক্ষেপ করিয়া ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

হটাৎ রথের টান থামিয়া গেল; একটী বালক রথের চাকার নীচে পড়িয়া গিয়াছে—মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংবাদ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন নারী মহালে এক বিরাট আশঙ্কার ভাব প্রকাশ পাইল, সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন রোলে গগন পবন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলেই স্বীয় স্বীয় বালকদিগের জন্য অস্থির চিত্তে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

গিরীন্ যখন শুনিল ছেলেটী পানহাটীর চৌধুরীদের ছেলে, তখন তার শোক ও দুঃখ পরিপূর্ণ সহানুভূতি লইয়া ছেলেটীর সাহায্যের জন্য ছুটিয়া চলিল। এ ছেলে যেই হউক, তাহার পরিচয়টাই আজ গিরীনের অন্তরের লুকা-ইত একটী মৌন-সমাহিত ভাবকে তীব্র করিয়া ফুটা-ইয়া তুলিয়াছিল। এই পানহাটীর এক চৌধুরী পরি-বারেই যে তাহার যৌবনের সকল ভাব ও আকাঙ্ক্ষা অকস্মাৎ পিতা-মাতার কঠোর অনুশাসনে সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

গিরীন্ তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই আহত ছেলের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিল।

(৩)

পুরীর বাহিরেই সাময়িক চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল। গিরীন্ অগ্রগণ্য হইয়া বালককে সেইখানে লইয়া গেল। তখন সেই হাসপাতালের চারিদিক লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। পুলিশ পুনঃ পুনঃ লোকের ভিড় সরাইয়া দিতে লাগিল।

বালকের আত্মীয় স্বগন ও গ্রামস্থলোক যাহারা রথ-যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন—সংবাদ পাইয়া সকলেই আসিয়া একে একে বালককে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। বালকের পরেই সকলের দৃষ্টি গিরীনের উপর পড়িতে লাগিল। গিরীন্ নিঃসঙ্কোচে সেই সহানুভূতিশীল নর নারীর উৎসুক দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পা-দন করিতে লাগিল।

বালকের আঘাত খুব গুরুতর ছিল না। আহত স্থান বাঁধিয়া দিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বালককে ডাক্তার মুক্তি দিয়াছিলেন। তাহার কোন কোন আত্মীয় ব্যক্তি তাহাকে এক খানা পৃথক নৌকায় লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পানহাটীর বাব্রিকে-পূর্ব বহু নৌকা মিঠা পুকুরে বাঁধাছিল। গিরীন্ আহত বালকের জাতি খুল্লতাত কাব্যকান্ত চৌধুরীর নিকট বিদায় লইতে যাইয়া ধরা পড়িয়া গেলেন।

গিরীনের পরিচয় পাইয়া সকলেই বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মহিলাগণের আনন্দ ও ঔৎসুক্যের আর অবধি রহিল না। গিরীনের শ্বশুর বাড়ীর সকলেই কাব্যকান্ত বাবুর নৌকায় রথযাত্রা দর্শনে আসিয়াছিলেন। তখন একদিকে গিরীনের পরিচয়ের সমালোচনা হইতে লাগিল, অপরদিকে তাহার এইরূপ সাধুকার্য্যের প্রশংসা কীর্ত্তন হইতে লাগিল।

কেবল ভাণ্ডারী বলিল—"জামাই বাবুর দিকে চাহিয়াই আমার—মুখখানা যেন চিনা চিনা বলিয়া ঠেকিতেছিল। বাবুর সেই চেহারা আর নাই; আড়াই বছর তিন বছরের কথা—।"

রামনাথ বলিল—"বিবাহের সময় বাবুর চোখে কিন্তু ঠুলি ছিল না—আমারও এখন—চেহারাটা ধূয়া ধূয়া মনে পড়িতেছে—"

কাব্যকান্ত চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—"বাবাজির চেহারারতো খুবই পরিবর্ত্তন হইয়াছে—মুহূর্ত্তমাত্র দেখিলেও আমারতো সহজে কোন চেহারা ভুল হয় না—"

গিরীনের শাশুড়ী নাকের জলে চোখের জলে ভাসিয়া গিরীনের মনে ব্যথা ও সহানুভূতি জাগাইয়া তুলিতেছিলেন। নিরীহ গিরীন্ নতমস্তকে নির্ব্বাক থাকিয়া সে সকল তীব্র বাক্যবাণ সহ্য করিতে লাগিল।

গিরীন্‌কে নীরব দেখিয়া তাহার শাশুড়ী তাহাকে তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। এইবার গিরীন্ অতি বিনীতভাবে উত্তর করিল—"বাবার অনুমতি ছাড়া আমি কেমন করিয়া যাইতে পারি—আপনিই তাহা বিবেচনা করুন।"

শাশুড়ী বলিলেন—"এ পর্য্যন্ত বিবেচনার কার্য্য তোমরা কি করিয়াছ যে বিবেচনার দোহাই দেও! মন্ত্র পড়িয়া গ্রহণ করিয়া নিয়া, মেয়েটাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবার বেলায় তোমাদের বিবেচনা কোথায় ছিল?"

গিরীন মাথা নত করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

গিরীনের শাশুড়ী বাষ্প জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আমি তো আমার মেয়েকে ভদ্রলোকের ছেলের হাতেই তুলিয়া দিয়াছিলাম, আমার কি মনেছিল বাবা, যে তোমার বাপ চণ্ডালের মত এরূপ কাজ করিবেন! তুমি শিক্ষিত স্বামী, তোমারও কি স্ত্রীর প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই? আমি বিধবা—নিরাশ্রয় হইয়া আমার এখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার মত অবস্থা হইয়াছে, এই অবস্থায় তোমার স্ত্রীকে আমি আর কত কাল ভরণ পোষণ করিব? কেমন করিয়াইবা করিব, তাহার বিবেচনা কি তোমার করা উচিত নয়?"

গিরীন্ শব্দ করিল না।

গিরীনের শাশুড়ী বলিতে লাগিলেন—"তোমার শ্বশুর যদি বর্ত্তমান থাকিতেন, আর তিনি যদি তোমার পড়ার খরচ বন্ধ করিতেন, তবে তোমাদের রাগ করিবার যথার্থ অধিকার ছিল, বিবেচনারও দোহাই দিতে পারিতে। তিনি যে অবস্থায় আমাদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন, তোমরা পিতাপুত্র তাহার বিষয় না ভাবিলেও দেশের লোক আজ তাহা না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছে না। তোমার বাবা আমাকে আমার সেই সদ্য শোকের সহানুভূতি প্রকাশচ্ছলে লিখিয়াছিলেন—"মেয়ে পেটে ধরিলে অনেক ব্যবস্থাএই সংস্থান রাখিতে হয়—" বাবা ইহা কি মানুষের কথা; শোকে দুঃখ প্রকাশই মানুষের ধর্ম্ম, আত্মীয় স্বগণের কর্ত্তব্য; বিশেষ তোমাদের অবস্থা আমার তুলনায় রাজার অবস্থা, তুমিও ঈশ্বর ইচ্ছায় এখন উপযুক্ত হইয়াছ, এখনও কি তোমার পক্ষে এরূপ তুচ্ছ বিষয়ে জেদ খাটে?"

গিরীন্ ধীরে ধীরে বলিল—"এ বিষয়ে আমি কি করিতে পারি? আমার ক্ষমতা কি?"

শাশুড়ী বলিলেন—"ক্ষমতার সংস্থান না করিয়া বিবাহ করিয়াছিলে কেন? তোমার স্ত্রীর অন্ন বস্ত্রের জন্ম তুমি দায়ী; তুমি তাহার কিছু করিতে পার কি না পার, তাহার বিবেচনা আমি নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোক কেমন করিয়া করিব? তুমি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াও যদি জিদে পড়িয়া এরূপ অন্যায় কাজ কর, তবে সাধারণ ছোট লোকের আর দোষ কি? এই নিরপরাধ মেয়েটার জন্ম কি তোমার একটুও কষ্ট হয় না?"

শাশুড়ী নৌকার এক কোণে অবগুণ্ঠনে আবৃত একটী মেয়েকে দেখাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

গিরীনের মন তাহার শাশুড়ীর কথায় নরম হইয়া গিয়াছিল। পিতার অন্যায় জেদ যে তাহার স্ফুটনোন্মুখ জীবনকে শুষ্ক ও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, সে তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ করিত; সেই নির্দ্দয় স্মৃতি তখন তাহার মুহূর্ত্তগুলিকে নিদারুণ করিয়া তুলিত। পিতা তাহার আর এক বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন; ইহা যে তাহার জীবনকে আরও দুর্ব্বিসহ ভারগ্রস্ত করিয়া তুলিবে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যও তাহার মনের ভিতর এই কয়দিন ধরিয়া তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। এখন এখানেও এই চিন্তাই প্রবল হইয়া দেখা দিল।

এই সময় তাহার শাশুড়ী তাহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"আমার খরচে না হউক, তোমাদের নিজ অর্থেই তোমার শিক্ষা এখন শেষ হইয়াছে, তুমি শিক্ষার শেষ সীমায় গিয়া এম,এ পাশ করিয়াছ; শিক্ষিত বলিয়া সুনামও অর্জ্জন করিয়াছ—এখন তোমার কর্ত্তব্য কি? তোমার স্ত্রীকে তুমি কাহার সহিত রাগ করিয়া বা জেদ করিয়া ত্যাগ করিতে পার? কি অপরাধ এই অবোধ বালিকার? তোমার উচ্চ শিক্ষা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিতে পারে, তাহা আজ না বলিলে, তোমার পরিত্রাণ নাই। বাবা, আমি তোমাকে আজ হাতে পাইয়াছি। আর ছাড়িব না।"

এই কথার উপর কাব্যকান্ত বাবু বলিলেন—"না বৌঠান, আপনার জামাইর শিক্ষার দোষ দিতে পারিবেন না; বাবাজী শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের যথেষ্ট পরিচয় আজ দিয়াছে। আপনার জামাইর কোন দোষ নাই; যত দোষ আপনার ঐ কর্ত্তাই নন্দঘোষ—বৈবাহিকের। ঘুষখোর ও পরখাউকা লোক এমনই হইয়া থাকে। নিজের শত থাকিতেও ঐ সকল প্রকৃতির লোকের দৃষ্টি পরের মুখের দিকে লুব্ধভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকে। বাবাজীর প্রকৃতি তেমন হইবে না—এ তার মাতুল হলধর বাবুর প্রকৃতি পাইয়াছে—নরাণাং মাতুলক্রম—বেশ শান্ত, বেশ ভদ্র। এখন আপনারা গোপীনাথজীর ভোগের প্রসাদ দ্বারা বাবাজিকে আপ্যায়িত করুন, তারপর মেয়েকে জামতার নৌকায় তুলিয়া দিন; উপযুক্ত ছেলে, মেয়ের দোষ থাকে—বাড়ীতে লইয়া গিয়া বিচার করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করুক। ত্যাগ করিতে হয়—ত্যাগ করুক, হত্যা করিতে হয়—হত্যা করুক; বিবাহ করিয়া পরের অন্নে···আত্মসম্মান জ্ঞান যাহার আছে···।"

গিরীন নতমস্তকে বসিয়া থাকিয়া সকল ব্যবস্থা শুনিল, প্রতিবাদ করিবার তাহার কিছুই যুক্তি মিলিল না।

(৪)

গিরীন্ বিরহের কবিতায় অর্দ্ধ খাতা ভরিয়া গোপীনাথ দেবের বাড়ী পঁহুছিয়াছিল। মিলনের কবিতায় খাতার বাকী অর্দ্ধেক শেষ করিয়া আজ আসিয়া ঘাটে পঁহুছিল।

সুধা ঘাটে গিয়াছিল। পর্দ্দা খাটানো নৌকাখানা তাহাদেরই ঘাটের দিকে আসিতেছে দেখিয়া সে ঘাটেই দাঁড়াইয়া রহিল। নৌকা আসিতেছে দেখিয়া এক দুই করিয়া ক্রমে আরও মেয়ে ছেলে আসিয়া মিলিল।

নৌকা যখন ঘাটে লাগিল, তখন সুধার হাতে নৌকার ভার রাখিয়া নিমেষের মধ্যে গিরীন্ সরিয়া পড়িল।

সুধা দাদার খাতা পত্র আনিতে গিয়া পর্দ্দা তুলিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল—"ওমা এ আবার কেগো?" সে আকুল কৌতূহলের বশে সেই সঙ্কুচিত নব বধুটীর ঘোমটা তুলিয়া আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল।

সরকারদের বড় বউ গিরীনের ইঙ্গিতে তৎক্ষণে নৌকায় আসিয়া হাজির হইল, মেয়ে ছেলেও অনেক জুটিল। তখন সকলে মিলিয়া নূতন বউকে নৌকা হইতে উঠাইয়া বাড়ীতে লইয়া চলিল।

সুধা ঘাটের পথ হইতেই ডাকিয়া বলিল—"ওমা, দাদা নূতন বৌ লইয়া আসিয়াছে জুকার দাও।"

মা অবাক হইয়া ঘোমটা পরা মেয়েটির ধীর মন্থর গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তিনি তখনও কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার প্রথমে মনে হইয়াছিল, মেয়েরা নিত্য যেমন বউ বউ খেলে, ইহাও তাহারই একটা কিছু; কিন্তু যখন সরকারদের বড় বউ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল যে গিরীন তাঁহার

স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছে, তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাড়াতাড়ি ধান্য দূর্ব্বা সংগ্রহ করিয়া পুত্রবধূকে আপন কোল পাতিয়া সাগ্রহে বরণ করিয়া লইলেন। গৃহে উলুধ্বনির লহর ছুটিল।

(৫)

পিতা বলিলেন—"বর্ত্তমান শিক্ষা পুত্রকে পিতার, কন্যাকে মাতার, ভৃত্যকে প্রভুর কার্য্য কলাপের বিচার করিতে শিক্ষা দেয়, এ শিক্ষা কু শিক্ষা—এমন শিক্ষায় ধিক্!"

গিরীন্ কোন উত্তর করিল না; মাথা নত করিয়া ফরাসের এক কোণে বসিয়া রহিল।

পিতা পুনরায় বলিলেন—"তুমি কাহার কথায় শ্বশুর বাড়ীতে গেলে এবং কাহার পরামর্শে এই স্ত্রীকে লইয়া ঘরে আসিলে?

গিরীন্ অতি ধীরে উত্তর করিল—"আমি শ্বশুর বাড়ী যাই নাই। তবে যাকে সমাজের সম্মুখে ভার বহনের প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে—প্রতিজ্ঞা কারীর কি তাহার সম্বন্ধে কোনই কর্ত্তব্য নাই? অনুমতি না লইয়া ত্রুটী করিয়াছি; এখন যাহা আপনি সঙ্গত মনে করেন, অনায়াসেই তাহা করিতে পারেন। তাহাই করুন।"

পিতা ক্রুদ্ধ অজগরের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তুমি এ বাড়ীতে এ স্ত্রী লইয়া থাকিতে পারিবে না। মাথা কাটিয়া গুঁড়ায় জল—এই নীতি আমি বর্ত্তমান শিক্ষার কুফল বলিয়া মনে করি। লজ্জাহীন—হতভাগা—ছেলে কোথাকার—কর্ত্তব্য জ্ঞান—প্রতিজ্ঞা গ্রহণ—"

গিরীন্ অনেক ক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এখন আমার কি করিতে হইবে অনুমতি করুণ।"

পিতা উগ্র কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"তোমাকে এ মেয়ে এখনি ত্যাগ করিতে হইবে!"

গিরীন্ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"আজ্ঞা আচ্ছা।"

(৬)

সুধা আসিয়া তাহার মায়ের কানে কানে বলিল—"বাবা বলিয়াদিয়াছেন, তিনি কিন্তু বৌদির হাতের রাঁধা খাইবেন না। এ কেমন হইল মা?"

মা বলিলেন—"রাগের মাথায় এমনই হয়, তুই একথা আর কাউকে বলিস না; আজ না খাইলেন, কাল খাইবেন; রাগ চলিয়া গেলে সব ঠিক হইয়া যাইবে।"

বাড়ীর সকলকে আহার করাইয়া মা পুত্রের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। সুধা তাহার বৌদির সহিত শুইয়া তাহাকে কথা বলিবার জন্য নানা রূপে মিনতি করিতেছিল এবং এক এক বার রাগ দেখাইয়া নিজেও কথা বন্ধ করিবার ভয় দেখাইতেছিল;—ঠিক এই সময় গদা মাঝি আসিয়া বাহির হইতে ডাকিল—"খুকী ঠাইন্, বাবুর চিঠি আছে।"

ডাকের চিঠি আসিয়াছে ভাবিয়া সুধা ওরফে খুকী ঠাকুরাণী বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিল।

গদা তখন চিঠি খানা উড়াইয়া দরজায় ফেলিয়া দিল। সুধা প্রদীপের আলোর কাছে আসিয়া চিঠি পড়িয়া বলিল—"ওমা, দাদা যে কলিকাতা রওয়ানা হইয়া গেল, তুমি কাহার জন্য বসিয়া আছ।"

মা চিৎকার করিয়া বলিলেন—"কিরে গদা, কি, খবর কি?"

গদা বলিল—"তেনি জাজের টিকস্ কিনিয়া কৈলকাতা রওনা হৈছেন। কুনু ডরের কারণ নাই, মা ঠাইন্।"

বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। কর্ত্তা আসিয়া সকল অবস্থা শুনিলেন। ছেলে রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়াছে—শুনিয়া ক্রোধে একেবারে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া উঠিলেন।

কর্ত্তা রাত্রিতেই এক উইল করিয়া গিরীনকে ত্যাজ্য পুত্র করিলেন। বর্ত্তমান শিক্ষাই যে এই যুগের যুবকদিগকে উন্মার্গগামী করিতেছে, তৎসম্বন্ধেও উইলের মুখবন্ধে প্রচুর মন্তব্য লিখিলেন। নিরপরাধ বধুটী তাঁহার চক্ষে মহাকাল স্বরূপ হইয়া রহিল।

দুই সপ্তাহ পরে গিরীনের এক চিঠি আসিল। গিরীন মাকে লিখিয়াছে—

বাবা তোমার পুত্র-বধুকে ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া স্ত্রী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; যাহাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া একদিন

গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহাকে আমি ত্যাগ করিতে ধর্ম্মতঃ পারি না; তাই নিজেই চলিয়া আসিয়াছি। তোমাদের নিকট এখন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা তোমরা অনায়াসেই করিতে পার। সেরূপ কোন কার্য্য করিবার সময় সে প্রাণীর ভরণ পোষণের ব্যবস্থাও যে তোমাদের করা উচিত, তাহা একবার চিন্তা করিও।

স্ত্রীর জন্য আমার যে দায়িত্ব, সে দায়িত্ব তোমরা জন্মাইয়া দিয়াছ, তাহা রক্ষার জন্য আমাকে এখন উপার্জ্জন করিতে হইবে।

আমি মাতৃভূমির সেবা কার্য্যে সৈন্য বিভাগে যোগ দান করিয়াছি। আগামী কল্য করাচি যাত্রা করিব। তিনমাস কাল সে স্থানে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিব, তারপর সরকারের আদেশ মত যেখানে যাইতে হয় যাইব। আশীর্ব্বাদ করিও যেন দেশের সেবা করিয়া আসিয়া শীঘ্রই তোমাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারি। বাবার রাগ হয়ত তখন আর থাকিবে না। মনি অর্ডারে টাকা পাঠাইলাম। মাসে মাসেই পাঠাইব।

পত্র-পাঠ শুনিয়া গিরীনের মা চিৎকার করিয়া লুটাইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। সুধা ও গিরীনের স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। কর্ত্তার ক্রোধ জল হইয়া গেল।

কর্ত্তা অলক্ষ্যে চক্ষু মুছিয়া সুধাকে সান্ত্বনা করিলেন এবং বধূর কান্না থামাইতে বলিলেন। মঙ্গলী ঝি গিন্নীর মাথায় জল ঢালিতে লাগিল। গিন্নী সংজ্ঞা লাভ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"গিরীন্ কোথায় গেলি রে?"

কর্ত্তা নিকটে আসিয়া বলিলেন—"কোন চিন্তা নাই—এই আমি শম্ভুকে পদার নৌকা আনিতে পাঠাইলাম। এখনই আমি কলিকাতা যাত্রা করিতেছি। সুধা, বউকে বল্ আমার জন্য এখনি তাড়াতাড়ি আলুভাতে—চারটা বেঁধে দিক্! দুর্গা, দুর্গা বল! ছিঃ ছিঃ এমনও করে! যুদ্ধ যাত্রা—আত্মহত্যা—মহাপাপ!

আয়না

—বঙ্গদেশ—

চাউল প্রচুর, মরণ-কাঁদন!
জলপ্লাবন কি সব ভীষণ!
চতুর্দ্দিকেই বাগান-বাটি,
শ্যামল ঘাসে পরিপাটী!
সকল রোগের আবাস স্থান,
তাবিজ পাঁজি টিকির মান!
মৃত্যুলীলা চমৎকার,
একটা জমাট অন্ধকার!

—হিন্দুসমাজ—

মূর্খ টিকির মিথ্যাভীতি,
পর্দ্দা প্রথা, কোথায় প্রীতি?
মেয়ের পিতা হুতোম প্যাঁচা,
বরের বাপের মাংস ব্যাচা!
কাঁচের মতো ঠুন্‌কো জাৎ,
বিধ্‌বা ছুঁড়ীর অশ্রুপাত!
বিলাত্-ফেরৎ, দলাদলি,
ভণ্ডামি খুব, অন্তর্জলী!

—গুরুঠাকুর—

টাক-পড়া শির, মাথার'পরে
সূর্য্যকিরণ পিছ্‌লে পড়ে!
গোঁপ-কামানো, তিলক ফোঁটা,
মাথায় বেড়ে তর্মুজ বোঁটা!
বিরাট ভুঁড়ি, বিশাল কটি,
নস্যি ট্যাঁকে, চাদর, চটি;
শিষ্যবাড়ী সন্ধ্যে-ঘটা,
সদ্ উপদেশ, কথার ছটা!

—নব্যযুবা—

চাম্‌ড়া-ছাঁটা ঘাড়ের চুল,
চক্ষু ঢাকা চক্ষুঃশূল!
চাঁছা ছোলা মুখটি খাসা,
নাকের ছ্যাঁদায় বারুদ ঠাঁসা!
মুচি মেথর চাঁড়াল চীনা—
সব্‌কে ছুঁয়ে খানাপীনা;
ঘৃণ্য বেজায় কলম-পেষা,
'নেশন' গড়ার ভুমূল নেশা।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, DACCA
and Published by Kedar Nath Mozumdar Research House, Mymensingh.

সৌরভ

নবম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩২৭। | তৃতীয় সংখ্যা।

শিশু চরিত্র গঠনে ভালবাসার স্থান।

শিশুচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে এই সন্দেহ আসিয়া আপনা হইতেই উপস্থিত হয় যে মানুষ জন্মাবধই বুঝি তাহার দুষ্ট প্রেরণা গুলি পায়। "খোকা তোমার একখানা বিস্কুট আমায় দেওতো।" বলিতেই খোকা তাহার ভরা বিস্কুটের হাতটী জামার নীচে লুকাইয়া খালি হাত খানা দেখাইয়া বলে "নাই, নাই।" ইহাতো কেহ উহাকে শিখাইয়া দেয় নাই। একটী এক বৎসর পাঁচ মাসের শিশুকে দেখিয়াছি, যখনই কাহারও নিকটে খাবার কিছু দেখিয়াছে, তখনই সে তার গা ঘেসিয়া মুখের কাছে মুখ নিয়া "এঁওএঁ" করিয়া আদর জানাইতেছে এবং সেই তোষামোদের ফলে সে ঐ আহার্য্য দ্রব্যের ভাগ পাইবার প্রত্যাশা করিতেছে। অপরকে এইরূপে সন্তুষ্ট করিবার প্রবৃত্তি—তোষামোদ করিয়া নিজের কাজ উদ্ধার করিবার বুদ্ধি ইহার কোথা হইতে আসিতে পারে? সেই শিশুটীরই মধ্যে দুইমাস পরে আর একটী বৃত্তির বিকাশ দেখিতেছিলাম—তাহা তাহার অসহিষ্ণুতা ও রোষ প্রকাশ। সাধারণতঃ প্রত্যেক ছেলেপেলেকেই দেখা যায়, যাহাকিছু তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহাই তাহাদের পাওয়াচাই। বিশেষতঃ সমবয়স্কদের কাহারও নিকট কিছু থাকিলে সেরূপ একটা জিনিষ না পাইলে তার বিরাগের অন্তইথাকেনা। এই শিশুটীর মধ্যে সেই শিশু সাধারণ লোভ যথেষ্ট আছে; তদুপরি দুর্জ্জয় অভিমান একমাস কি দেড়মাসের মধ্যে কি করিয়া এতটা বলবতী হইল? অভিলষিত দ্রব্য না পাইলেই সে ধড়াস্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া পা দুটী ভীষণ ভাবে ছুড়িতে থাকে; সেই জিনিষটী দেওয়া মাত্রই তাহার সকল বিক্ষোভের শান্তিহয়। আরো কোথাও কোথাও এরূপ অভিনয় দেখিয়াছি কিন্তু এত অল্প বয়স্ক শিশুদিগের মধ্যে এই রূপ শুইয়া পড়িয়া হাত পা ছোড়ার তাণ্ডব দেখিনাই। ওই অতটুকু শিশুর লাঠি লইয়া কুকুর ও বিড়ালকে তাড়না করার উৎসাহ দেখিয়া একবার ভাবিতে হইয়াছিল, এই দৌরাত্ম্য করিবার প্রবৃত্তি কি তাহার স্বভাব জাত? অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার সহজ প্রেরণাই কি এসকলের কারণ নহে?

ছোট ছোট পোকা দেখিয়া শিশুগণ ভয় পায়, অথচ উহাদের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেও তাহারা বেশ আনন্দ পায়। কেহ মাছ কাটিতেছে, দেখিয়া কোন ৩।৪ বৎসরের শিশুকে দয়ার্দ্র হইতে দেখিনাই; বরং কর্ত্তিত মৎস্যের স্পন্দন কম্পনে ঐ রূপ শিশু দিগকে আমোদ বোধ করিতেই দেখিয়াছি। খাসি বা পাঁঠার রক্তদর্শনের কৌতুহলে তাহা কাটিবার সময় পাড়ার সকল ছেলে মেয়েকে একত্র হইতেই দেখিয়াছি—কিন্তু কাটিবার পূর্ব্বে বা পরে কাহারো চোখে জল ছল ছল করিয়া উঠিতে দেখিনাই।

একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায়, শিশু প্রকৃতির যাহা আমাদের কৌতুক বৃদ্ধি করে, তাহাই যুবক চরিত্রে নিতান্ত গর্হনীয় ও দুর্নীতি বলিয়া ঘৃণিত হয়; অথচ একদিনের জন্যও আমাদের মনে উদয় হয় না, শিশু দের মধ্যে এসকল ক্রিয়াদ্বারা যে বৃত্তিগুলির ইঙ্গিত হইতেছে, তাহা বাস্তবিকই দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য।

শিশুদিগের এই কৌতুকাবহ কর্য্যাবলীর দ্বারা যে বৃত্তি পুষ্ট হয় তৎ প্রতি আমাদের কাহারও দৃষ্টি পড়ে কি? বয়স হইলে আপনি সারিয়া যাইবে বলিয়া আমরা সকলেই একথাটাকে, আমাদের অবহেলার নীচে চাপা দিয়া রাখি। শিশুর এই কার্য্যের সঙ্গে তাহাদের বিবেচনার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াই ইহা দোষের হয় না। কিন্তু এভাবে উহাদিগকে চলিতে দিলে, উহাদের মধ্যে যে অভ্যাসটী গড়িয়া উঠে. তাহার প্রভাব সকল সময় সুখের হয় না।

আমোদ উপভোগের বৃত্তিও ইহাদের মধ্যে বেশ প্রবল। সেই জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উপর অত্যাচারের কৌতুক উহাদিগকে আনন্দ দানই করে। নিজের নিষ্ঠুর আচরণে যে অপরের কষ্ট হইতে পারে, এবোধ শিশুর নাই, তজ্জন্য উহা দোষের নহে। কিন্তু বহুদিন নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয়ে তাহাকে আনন্দ উপভোগ করিতে সুবিধা দান করিলে তার স্বভাবের সহিত যে নিষ্ঠুরতার প্রবৃত্তি ঘনিষ্ট হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে উত্তরকালে যে তাহার এই আচরণে সে কোন দোষই দেখিতে পাইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। পাওয়ার আনন্দই যে শিশুকে লোভী ও স্বার্থপর করিয়া তোলে, তাহা সংযত না হইলে সেই শিশুই যৌবনে অতি স্বার্থপর হইয়া দাঁড়ায়।

যতই ভাবি না কেন, শিশুর উপর কোন নৈতিক বিধি সংস্থাপন করা চলে না। শাস্তির ভয় তাহার থাকিতে পারে না, কারণ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিবেচনা পরিস্ফুট হওয়ার পূর্ব্বে শাস্তি বোধ ও সেকারণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি সম্ভব নহে। আর এই শাস্তি দ্বারা তাহার মধ্যে সৃষ্টির নবীনতার আনন্দকে আমরা হয়ত নষ্ট করিয়াই ফেলিব। শাস্তি দেওয়া চলিবে না, অথচ আমাদের ইচ্ছামত উহাকে চালাইতে হইবে; ইহা কি প্রকারে হইতে পারে—তাহাই বিবেচ্য।

অনেক সময়েই ছেলে মেয়েদের মধ্যে নানা রকমের খাবার জিনিষ বণ্টন করিয়া দিতে হয়; খেলার জিনিষও দিতে হয়। সকলকে সম্মুখে রাখিয়া একে একে দিলেও দু একটী শিশুকে খুব অসহিষ্ণু দেখা যায়। পূজার প্রসাদ বণ্টন সময়ে ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় হয়। অনেকে পরিবেশনের বিলম্ব অপেক্ষা করিতে চায় না। কেহ আবার অল্পে তুষ্ট নহে—আর একটা—দুটা—তিনটা—পাঁচটা—চাহে। এই আবদারের মধ্যে স্বার্থপরতা, লোভ ও অপরের প্রাপ্তিতে ঈর্ষার অঙ্কুর দেখা যায়। অতি শৈশবে এই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হইলে ইহাই শিশু মনকে ধীরে ধীরে আকাড়িয়া ধরে। শৈশবের এই সকল তুচ্ছ বিষয় যে, মানুষের অন্তরের উপাদান গঠনে কত বড় প্রভাব বিস্তার করে, তাহা আমরা বুঝি কই? ছেলেদের মধ্যে কাহার সহিত কাহার কতটুকু পার্থক্য আছে, এসকল জানিবার আগ্রহ বা দেখিবার অবসরই বা আমাদের কোথায়? যে শিশু অত্যধিক অসহিষ্ণু. তাহার হাতে বণ্টনের জিনিষটী (সন্দেশ) সকলের পূর্ব্বে দিয়া তাহাকে যদি বলা হয় দাদাকে দেও, দিদিকে দেও, ভাইকে দেও, বোনকে দেও, সকলকে দেওয়া হইলে তোমার সন্দেশটী তুমি খাইও। তাহা হইলে প্রথম প্রথম বোধ হয় বেশ কৌতুকাবহ ব্যাপার দেখা যায়। দাদাকে দেও, বলা শেষ করার পূর্ব্বেই শিশুর সন্দেশ পূর্ণ হাতটী বোধ হয় তাহার মুখের কাছে উঠিয়া যায় ও খাবারের অর্দ্ধেক তাহার মুখে চলিয়া যায়। ইহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। তাহাকে দিয়াই পরে সকলকে দেওয়াইতে হইবে। উপর্য্যুপরি কয়েক দিন এইভাবে অভ্যাস করিলেই তাহার অসহিষ্ণুভাব, অন্যের চেয়ে বা সবার চেয়ে বড়টা নেওয়ার ঔৎসুক্য কমিয়া যাইতে দেখা যাইবে। খেলার জিনিষও এইরূপে বণ্টন করিয়া দেওয়া ভাল। এক এক দিন এক এক শিশু দ্বারা এইরূপ বণ্টন করানও মন্দ নয়। এভাবে অন্যকে দিবার এবং সকলের সঙ্গে একটা জিনিষ সমভাবে উপভোগ করিবার মত মনোভাব স্থায়ী হইয়া উঠিবে। সকল বিষয়েই,—জামা, জুতা, বই,—এরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক চালাইলে শিশুদের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া উপভোগ করিবার বৃত্তি স্ফুরিত হইতে পারে। এভাবে দেওয়া নেওয়ায়, ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রণয়ও বর্দ্ধিত হয়। তখন কোন শিশু একটা জিনিষ পাইলে অন্যকে তাহার ভাগ দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

অনেক সময় অতি সামান্য কারণে ছেলে মেয়েদের

মধ্যে ঝগড়া হয়। শেষ দিক্‌টার হয়ত একজন অন্যকে বেশী রকমই মারিয়া বসে। এজন্য সহসা, প্রহারকারীকে প্রহার দ্বারা শাস্তি বা শিক্ষা দেওয়া উচিৎ নয়। ইহাতে ঝগড়ার বীজ উৎপাটিত হয় না। বরং শিশুহৃদয়ের ক্ষণস্থায়ী বিদ্বেষ কঠোর শাস্তি দ্বারা একটু স্থায়ী করিবার চেষ্টা করা হয়। তখন—"ছি! পুটু তুমি টিপুকে মেরেছ? ভাইকে মারে? বা'টু কর, বা'টু কর। বল—ভাই, আর মারব না।" "ভাই,—ভাইকে চুমু খাও;" এইরূপ ভাবে উপদেশ দেওয়াই সঙ্গত! এইরূপে পবোধ পাইয়াও তখনই হয়ত একজন অন্যকে চুম্বন করিবে না; কিন্তু একটু সময় গেলে—রাগটা যখন সত্যই পড়িয়া যাইবে, তখন চুমু না খাইলেও আলিঙ্গন পাসে আবদ্ধ হইয়া অন তপূর্ব্ব ভাব উড়াইয়া দিবে। তখন তাহাদের হাসির তরঙ্গ দ্বারাই তাহাদের সকল গ্লানির যে অবসান হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে। এইভাবের—এই ভালবাসার অভিনয়ে যে বেশ কাজ হয়, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ক্রমে উভয়ে একে অন্যের আব্দার ও অত্যাচার একটু সহ্য করিতে শিখিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছে।

শিশুদের মধ্যে প্রণয় বৃদ্ধির আর একটী উপায়—এক সঙ্গে একই বিষয়ে আমোদ উপভোগ। খেলা তাহার একটী। একই খেলায় ছেলেরা কখনও অধিকক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতে চায় না। একই খেলার জিনিষেও অধিকক্ষণ তাহারা তৃপ্ত পায় না। নিত্য নূতন খেলার জিনিষ চাই, অনবরত এক খেলা হইতে অন্য খেলায় তাহারা যাইতে চায়। কতকগুলি খেলানা কিনিয়া দিয়া তাহাতেই অষ্ট প্রহর শিশুর চিত্ত আটকাইয়া রাখিবার ধারণা ও চেষ্টা নিতান্ত ভুল। যে খেলার দ্বারা আমরা উহাদিগকে দিতেছি, তাহাও উহাদের তত ভাল লাগে না। যে সকল খেলা নিজেরা উদ্ভাবিত করিতে পারিতেছে, তাহাতেই উহাদের আনন্দ অধিক দেখা যায়। এক জন একটী কাঠের সাহায্যে একটা টিনে বিকট শব্দ উঠাইতেছে, তখন আর সকলে কাঠি খুজিয়া, লইয়া সেই টীন বাজাইয়া এক ভীষণ কলরব উত্থিত করিতেছে। তখন তাহাদের যে আনন্দ, তাহা অনুভব করিতে পারে কে? বয়স্ক লোকের হয়ত কাণ ঝালা পালা করিতেছে বলিয়া তাহাদিগকে 'প্রহারেণ' নিরস্ত করিতে আসিতেছেন। ধমক বা শাসন এখানে নিষ্প্রয়োজন। অন্য একটী কৌতুক প্রদ খেলায় তাহাদিগকে আকৃষ্ট করাইতে পারিলেই সেই বিকট রব তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়। চিত্ত-চঞ্চল-শিশুদের গতি এইরূপে অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

আমরা কিন্তু তাহা ভাল বাসি না। আমরা শিশুকে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট খেলায় নিযুক্ত রাখিয়া সেই অবসরে নিজের কাজ গুছাইতে বা বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা তাহাদের প্রতি নিতান্ত অবিচার। এই অবিচার ও প্রপীড়নে উহাদের আনন্দ গ্রহণ ক্ষমতা খুন্ন হইয়া পড়ে।

শিশুদিগকে লইয়া বাগানে বেড়াইতে গেলে, তাহাদের কত আনন্দ! একটী বড় ছেলে হয়ত একটা কামিনী ফুলের গাছে ঝাঁকি দিতেছে, আর সেই সুগন্ধ শ্বেত অগণিত পাপড়ি শ্রাবণের ধারার মত অপর বালক বালিকাদের নাকে মুখে চোখে, সকল গায়ে পড়িতেছে, তখন তাহাদের উল্লাস দেখে কে! একজন অপরকে ধরিয়া নাচিতেছে, বিকট চীৎকারে আনন্দ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর সকলে মিলিয়া সেই সকল পাপড়ি চয়ন করিতেছে, কারো নিজের জন্য ভিন্ন করিয়া কেহ কুড়াইতেছে না। এখানে কারো সঙ্গে কারো ঝগড়া নাই, কারো স্বার্থ আসিয়া অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিতে উপস্থিত হয় নাই। পাঁচ সাত দিন এভাবে উহাদের এরূপ স্থানে লইয়া গেলেই দেখা যাইবে অন্য সময়ে ক্ষুদ্র ২ বিষয় নিয় উহাদের যে ঝগড়া হয়, তাহা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

আর একটী বিষয়ও সহজেই লক্ষ্য করা যায়। উহা শিশুদের অন্যের সাহায্য গ্রহণে অভাব আনন্দ; যেটুকু সে নিজে করিতেছে যাহাতে সে বেশ দক্ষ হইয়া আছে, তাহাতে অপর কেহ সাহায্য করিতে গেলে সে চীৎকার করিয়া তার বিরক্তি জানাইতেছে। দের বৎসর পৌনে দুই বৎসরের শিশু হাতে খাইতে চায়। ২॥০ বৎসরের শিশুতো নিজেই বেশ খাইতে পারে।

উহাদের সকল কাজেই দেখা যায়, নিজেরা করিতে

যেন অধিক আনন্দ পায়। আমরা কিন্তু তাহা দিতে চাইনা। এইরূপ ক্ষমতা দানের কৃপণতার ফল সর্ব্বত্র শুভ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি—আমার একটী আত্মীয় খুব চালাক ও মেধাবী ছেলে আই এ পাশ করিয়া ও একা কলিকাতা মেছে থাকিতে সাহস পাইলন'; কারণ এখনও তাহার মা তাহাকে না খাওয়াইয়া দিলে তাহার পেট ভরে না।

শিশুকে স্বাবলম্বনের অধিকার না দিলে তাহার দাঁড়াইবার ক্ষমতা জন্মেনা। আমরা চাই, শিশু গুলি আমাদের পুতুল হইয়া থাকে, আমরা চাই, আমাদের বিধি নিষেধ মানিয়া উহারা চলুক। ভাল মন্দের যে মাপ কাঠি আমরা ঠিক করিয়াছি, তাহাই উহারা প্রকৃত মাপ কাঠি বলিয়া স্বীকার করুক। শিশুর জগৎ যে আমাদের সংসার হইতে কত ভিন্ন, তাহা আমরা বুঝিনা; বুঝিতে চাইনা। শিশুর সকল প্রচেষ্টার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজকে গড়িয়া তুলিবার আনন্দেই তাহারা মস গুল।

মানুষ যে নিজের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তবে মানুষ হইয়া উঠে, এই সত্যের সহজ প্রেরণা আমরা শিশুর মধ্যেই দেখি। তবু তদনুযায়ী সাহায্য আমরা উহাদিগকে করি না। উহাদের শক্তিকে পরীক্ষা করিবার অবসর উহাদিগকে আমরা দেই না। এইরূপে সেই শক্তি চালনা করিবার অভ্যাস পর্য্যন্ত লোপ পায়। অতি শিশুকালেই সহজ ও স্বাধীন শক্তি প্রয়োগের প্রেরণাকে আমরা পঙ্গু করিয়া দেই বলিয়া নিজের শক্তিতে বিশ্বাসী, নিজ শক্তি প্রয়োগে দক্ষ ও উদ্ভাবনশীল মানুষের এত অভাব আমরা আমাদের দেশে দেখিতে পাই। আমাদের সকল শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য ইহাই যে, উহা মানুষকে সমাজের উপযোগী করিয়া তুলিবে। তাহা করিতে গেলেই নানা সংযম ও বিধি নিষেধের মধ্য দিয়া তাহাকে যাইতে হয়। কিন্তু মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া না তুলিলে সমাজ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সমাজের অন্ধ ক্রীতদাসের সংখ্যা বাড়াইয়া সমাজের বোঝা কেবল বাড়িয়াই চলে, উহা বহন করিবার শক্তি থাকে না। সকল অনুষ্ঠানের ভিতরকার কথা এই যে, উহা সমাজে মানুষ গড়নে সাহায্য করে; এজন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আপাত ও বিরোধী কার্য্যকলাপের মধ্যে যে একটী সহজ সম্বন্ধ সূত্রের খোঁজ পাই তজ্জন্য কোনটীকেই আমরা উপেক্ষা করি না বা অনিষ্টকর বলিয়া তুলিয়া দিতে চেষ্টা করি না।

শিশুকে এভাবে চালাইতে হইবে, যে সমাজের জীব হইতে তাহার যে সংযম, অভ্যাস প্রয়োজন, তাহা সে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। অথচ ইহাও দেখিতে হইবে যে তাহার সকল শক্তি বিকাশের আনন্দ চাপল্যও যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। যখনই বিধি নিষেধ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আমাদের অভীপ্সিত, অভ্যস্ত কোন কাজকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে, তখনই উহা আমাদিগকে পীড়ন করে। মনে হয় আমাদের স্বাধীনতা এখানে ক্ষুণ্ণ হইল। তখন হইতেই আমরা যে আমাদের প্রভু নহি এ জ্ঞান আমাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করে। প্রভুত্ব আর ভীরুতার মধ্যে অর্থ বৈপরীত্য থাকিলেও, উহাদের সম্বন্ধটী নিত্য। যেখানেই একের প্রভুতা সেখানেই অপরের ভীরুতা। অন্যের প্রভুতার জ্ঞান হইতেই নিজের মধ্যে ভীরুতার সৃষ্টি হয়। শিশুদিগকে এইরূপ অকারণ নানারূপ বিধি নিষেধের মধ্যে টানিয়া আনিয়া আমরা উহাদের স্বচ্ছন্দতাকে পঙ্গু ও হৃদয়কে ভীরু করিয়া তুলি। ইহার ফলে ক্রমে উহারা নিজের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়ে। অনেক সময়েই দেখি ১বৎসর দেড় বৎসরের শিশুদিগের উপর ভীষণ শাসন চলিতেছে। শিশু শাসন মানুষ গড়িবার অনুকূল কদাপি নহে।

কড়াশাসন শিশুর শক্তি বিকাশের সহজ প্রেরণাকে শুধু যে বন্ধ করিয়া দেয় তাহা নহে; অপুষ্ট স্নায়ুমণ্ডলীর উপর হঠাৎ আঘাত লাগে বলিয়া শিশুর স্নায়ুশক্তি দুর্ব্বল হয়, ইহাতে উহার মেধা কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হয়। আমার দুটী আত্মীয় শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। একটীর বয়স ২॥ বৎসর, বেশ সুস্থ। খাটের রেলিং হইতে ঝুলিয়া ধপ্ করিয়া মেঝেতে নামিবার চেষ্টা করিতেই এক অভিভাবিকার ভীষণ ধমকে তাহার সকল সাহস উড়িয়া গেল। তাহাকে ওরূপ দুঃসাহস করিতে আর দেখিলাম না।

তার ১ দিন কি দুই দিন পরে ১॥ বৎসরের একটী শিশু মেঝে হইতে সেই রেলিং ধরিয়া ঝুলিয়া নানা কৌশলে খাটের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। এক জন আসিয়া তাহাকে ধরিয়া খাটের উপর উঠাইয়া দিল। কিন্তু ইহাতে সে অশান্ত হইয়া পড়িল। বিরক্তি প্রকাশ করিল। খাট হইতে নামিয়া আবার উঠিবার চেষ্টা করিল। ২।৩ বার চেষ্টার পর নিজে বেশ উঠিতে পারিল। তার পর সেস্থান দিয়া প্রথমে ঝুলিয়া পরে ধপ্ করিয়া মেঝেতে নামিল। ইহাতে সে বেশ আমোদ পাইল; এভাবে ১০।১২ বার উঠা নামা করিবার পর তাহার অন্যদিকে মন চলিয়া গেল। আমি যে কয়েক-দিন সেখানে ছিলাম, ঐ ভাবেই উহাকে উঠিতে নামিতে দেখিতাম; কিন্তু ঐ ২॥ বৎসরের শিশুকে আর এক বারও ঐরূপ দুঃসাহস করিতে দেখিলাম না। সেই অভিভাবিকাটীকে পরে ওই ছোট্ট ছেলেটীর পারদর্শিতা-তেই বেশ কৌতুক বোধ করিতেও দেখিলাম।

শিশুদিগকে বাঁধা দিয়া আমরা উহাদিগের সেই কাজের ঝোঁক হয় বাড়াইয়া তুলি, না হয় তাহা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলি।

শিশুদিগের অনুকরণ প্রবণতা, অনেক সময় বানর জাতিকেও ছাড়াইয়া যায়। আর কোন বিষয়ের বিশেষ বর্ণনায় এবং বার বার একই বিশয় উত্থাপনে শিশুর স্মৃতিতে যে ছাপ পড়ে তাহাতে উহা সে নিজে দেখিয়াছে কিনা সে বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা আর থাকেনা। সকলই এলোমেলো হইয়া যায়, মনে করে সে বর্ণিত ঘটনা বা বিষয় নিজে দেখিয়াছে। যাহারা আদালতের কাঠগড়ার গ্রাম্য নিরক্ষর সাক্ষী দিগের প্রতি-প্রশ্নের উত্তর দান কৌতুহলী হইয়া শুনিয়াছেন, তাহারা বলিবেন, এই সাক্ষীদিগের ঘটনা বিষয়ক স্মৃতির যাপ্যতা এইরূপ অপ-রিণত বুদ্ধির জন্যই হইয়া থাকে। শিশুর অবিকশিত ও নিরক্ষর মানবের অপরিণতধীকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে। এই দুইটী শিশুগণের সহায়তায় তাহাদিগের বিরক্তি না জন্মাইয়া উহাদিগকে আমাদিগের ঈপ্সিত পথে চালনা করা যায়। সেখানে বিবেচনা এবং সহিষ্ণুতা এ দুইটী অপরিহার্য্য। একটীর ন্যূনতায় সকল সাবধা-নতার ফল হয়ত এক সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। এই বিবেচনা এবং সহিষ্ণুতা আমাদের আসিতেই পারেনা যদি প্রকৃতই আমরা শিশুদিগকে ভাল না বাসি।

আদর, যত্ন ও ভালবাসা পুত্র কন্যাদের জন্য সকলেরই আছে—কিন্তু ভালবাসার কার্য্যকারিতা মোটেই থাকেনা, যতক্ষণ বিবেচনার সহিত উহা যুক্ত না হয় এবং পুত্রকন্যা-দের যথার্থ হিতসাধনে সহায়তা না করে। একটী মূল্যবান্ ভঙ্গুর জিনিষ নিয়া ছেলে খেলিতেছে, "ভেঙ্গে যাবে তো, ওখানে আস্তে রেখে দাও,"—এভাবে শান্তস্বরে তাহার নিকট প্রস্তাব করিতেই পারি না, যদি উহাকে অন্তরের সহিত আমি ভাল না বাসি। একথাটুকুই হয়ত বলিতাম কিন্তু স্বরের কোমলতা হয়ত থাকিত না, হয়ত একটু রুক্ষ হইয়া পড়িত, হয়ত একটু অসহিষ্ণু হইতাম, উহার নিজের রাখিবার সময়ের অপেক্ষা করিতাম না, নিজেই উহার হাত হইতে জিনিষটি ছিনাইয়া রাখিয়া দিতে ইচ্ছা করিতাম। তাহা হইলেই মুস্কিল হইত। অপরে হাত হইতে সে জিনিষ লইয়া যাইবে ইহা ছেলেটির সহ্য হয় না।

'ভেঙ্গে যাবে তো'—উহার মনে ভাঙ্গিবার একটা দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিতেও না পারে, কিন্তু "আস্তে রেখে দাও"—তে কি ভাবে রাখিতে হয়, তাহার একটা ধারণা হওয়া মাত্র সে উহা করিতে উৎসুক হইয়া পড়ে এবং নিজেই উহা রাখিয়া তৃপ্তি ও আমোদ অনুভব করে। এভাবে উহাদিগকে শাসন না করিয়া যাহা করা উচিৎ তাহাতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে পারা যায়। আমরা সেদিকে মোটেই দৃষ্টি করিনা। আমাদের অসাবধানতায় শত শত বিকাশোন্মুখ প্রাণ চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত হইয়াই পড়িতেছে।

আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিতেছিলেন যে স্বয়ম্ভুই সৃষ্টির আদর্শ। নিজকে নিজে গড়ে তুলবে, তাহাই সৃষ্টির আদিক্রম, যেখানেই ইহার ব্যত্যয় ঘটিবে, বাঁধা জন্মিবে, সেখানেই আদর্শ বিচ্যুতির সম্ভাবনা আসিবে। শিবত্ব এই স্বয়ম্ভুত্বেরই উন্নততর স্তর। মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে শিবত্বকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে স্বয়ম্ভুত্বের সকল প্রকার সুবিধা আমাদের করিতে হইবে। মানুষ যাহাতে নিজের চেষ্টায় মানুষ হইয়া উঠিতে পারে, তাহাতে কোথাও কোন প্রকার বাঁধা না পায়, তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। শিশু জীবনের প্রতি ভালবাসার সহিত লক্ষ্য রাখাই সেই প্রণালী অনুষ্ঠানের মূল ভিত্তি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ।

সমস্যা।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হাসি তামাসা করিয়া গলার মালা বদল করিলেই যে হিন্দুর বিবাহ সিদ্ধ হয় না, এ জ্ঞান শৈলেনের ছিল। তথাপি শৈলেনের এখন মনে হইতে লাগিল, যদি এমনটাই হয়, আর নগেন যদি তাহার সহিত তাহার সমান ক্ষেত্রে আসিয়া না দাঁড়ায়, তবে সমাজে তাহার অবস্থা কি রূপ শোচনীয় হইবে! তাহার পিতার সামাজিক প্রতিপত্তি তাহার এই রূপ অদূর দর্শিতার জন্য কত খানি লাঞ্ছিত হইবে! এগুলি তাহার মনে বেশ্ স্পষ্ট ভাবেই আসিয়া উদয় হইতেছিল। পক্ষান্তরে সমাজের দ্রুত পরিবর্ত্তনের চিত্র গুলিও যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে ছায়া বাজির দৃশ্যের মত ভাসিয়া বেড়াইতে ছিল।

অসবর্ণ বিবাহ সুপ্রজননের পক্ষে যে কতখানি অন্তরায় ইয়ুরোপ ও আমেরিকার আধুনিক পণ্ডিতগণ তাহার সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন, তাহা চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও আজ কাল একটী আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শৈলেন ডাক্তারের সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। আবার আমাদের সমাজের নৈতিক অবস্থাও যে ধাপের পর ধাপ ডিঙ্গাইয়া অধঃ-পাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে—এবং এইরূপ দ্রুত অগ্রসরের যে অচিরভাবিষ্যৎ গতি কি, তৎ সম্বন্ধেও সে এক রকম নিশ্চিত ছিল। এই অবস্থা ভাবিয়াই সে তাহার মনকেও এইরূপ চিন্তায় গঠিত করিয়া লইয়াছিল।

শৈলেনের এখন মনে হইতে ছিল নগেনের কথা। কি করিয়া নগেনকেও সে তাহার এক ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া দাঁড়াইতে পারে। টালিগঞ্জের বাগান বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রিতে ও তার পর সমস্ত দিন এবিষয়ে নগেনের সহিত শৈলেনের কথা কাটাকাটি তর্ক হইয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শৈলেন ও নগেন গোল দিঘীতে বেড়াইতে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল, এমন সময় দুর্গাদাস বাবুর দ্বারওয়ান চিঠি লইয়া আসিয়া শৈলেনের হাতে দিল।

বকুল লিখিয়াছে—"বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। আপনি এখনই চলিয়া আসিবেন।" চিঠি পাইয়া শৈলেন ও নগেন উভয়ই তথায় চলিয়া গেল।

নগেন আটটায় পর বাসায় আসিয়াছিল। বাসায় আসিয়া বাড়ীর চিঠি পাইয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহার পর আর সে দুর্গাদাস বাবুর বাড়ী গেল না। শৈলেনের আসিতে রাত প্রায় ১২ টা বাজিয়া গেল।

ভোর বেলা বাহিরের কপাটের কড়ার ঘন ঘন আঘাত শব্দে নগেনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। সে উঠিয়া জানালা খুলিয়া 'ফুট পাতের' দিকে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, এক খানা গাড়ী দণ্ডায়মান—শৈলেনের পিতা জগবন্ধু বাবু দরজার কড়া ধরিয়া নাড়িতেছেন।

"শৈলেন তোমার বাবা আসিয়াছেন, উঠ।" বলিয়া নগেন শৈলেন কে ডাকিয়া, দৌড়িয়া নীচে নামিয়া গেল।

শৈলেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। শৈলেন নীচে না নামিতে নামিতে তাহার মা, বৌদি ও ছেলেপেলে আসিয়া উপরে উঠিল। নগেন জিনিস পত্র নাবাইয়া আনিল।

শৈলেনের মা আসিয়াই শৈলেনকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া বসিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহার বৌদিও এক দিকে দাঁড়াইয়া কাঁদিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় বাঙ্গালা মায়ের দুর্ব্বল যুদ্ধ অনভিজ্ঞ সন্তান কুলের অবস্থা যেরূপটী হইতে পারে, শৈলেনের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

নগেন ও জগবন্ধু বাবু উপরে আসিয়া কান্না নিবারণ করিতে বিধিমত প্রয়াস পাইলেন। ফল খুব সামান্যই হইল।

জগবন্ধু বাবু বলিলেন "নগেন, এখন উপায় কি? শৈলেন যুদ্ধে যাইব—এটা পাগলের প্রলাপ নয় কি?"

নগেন বলিল "এখন আসিয়াছেন, দেখুন, চেষ্টা করিলে এখনও বোধহয় ফিরান যাইতে পারে।"

জগবন্ধু বাবু—"চল আমরা এখন তারই চেষ্টা করিগে।"

নগেন বলিল 'হাত মুখ ধোন্ আপনি, তারপর যা করিতে হয়, করা যাইবে।"

ততক্ষণে নগেন সকলকে থামাইল। জগবন্ধু বাবু হাত মুখ ধুইতে গেলেন।

নগেন জ্যেঠাই মা ও বৌদিকে লইয়া প্রকৃত অবস্থা নির্দ্দেশের বিচারে প্রবৃত্ত হইল।

জ্যেঠাই মা নগেনের মুখে সকল অবস্থা শুনিয়া বলিলেন "শৈলেন বেম্ম মেয়ে বিবাহ করিতে চায়, তাহাই করুক, বাপ, তাহাই করুক। তবুতো ছেলে আমার বুক জুড়াইয়া থাকিবে। কি বল গো বড় বউ?

বড় বৌ সায় দিয়া বলিলেন—জাত কি আর মা এখন যায়? আমরা তো জাত যাওয়ার দলেই আছি। তা ঠাকুরপো যাহা চায় মা, তাহাই করুক। তবু,—ওমা, শুনিতেই যে প্রাণ কাঁপে গো—সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া—কাজ নাই, মা কাজ নাই।"

জ্যেঠাই মার ভয় তখনো যায় নাই; তিনি পুনরায় কান্নার সুর টানিয়া বলিলেন—"কি হবেরে নগেন, ওরে নগেন, শৈলেনরে কি সাহেব ধরিয়া লইয়া যাইবে রে? আমার কি হবে রে বাবা। বাবা কৈ আমার।" বলিয়া তিনি শৈলেন কে খুঁজিতে লাগিলেন। শৈলেন আসিলে তাহার হাতে ধরিয়া পুনরায় কান্না জুড়িয়া বলিলেন "তুমি বেম্ম বিয়ে করবে বাবা, কর, তবু আমার বুকে,—মার বুকে—ছুরি মারিও না। আমার এই অন্ধের নড়িরে নগেন! নৌকা ডুবাইয়া তুই খবর দিলি।"

নগেন বলিল "কি করিব জেঠাই মা, পরশু রবিবারই যে আমরা প্রথম জানিলাম। জানিয়াই আমরা তার করিয়াছি। যাই হউক, এখন আর চিন্তার বিষয় নাই। জ্যেঠা মহাশয়কে লইয়া এখনই আমরা প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কে ধরিব। আপনারা সুস্থির হইয়া হাত মুখ ধোন্। জ্যেঠা মহাশয়কেও আসল কথাটা বুঝাইয়া বলুন।" তার পর একটু নিম্নস্বরে বলিল "তিনি যদি এখন এই বিবাহে অস্বীকার করেন, তবে কিন্তু বিপদ বাড়িবে ছাড়া কমিবে না।"

জগবন্ধু হাত মুখ ধুইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। নগেন বলিল "শৈলেন এখন দুর্গাদাস বাবুর বাড়ী যাইবে। দুর্গাদাস বাবুর কাল হইতে বাতব্যাধির নমুনা দেখা দিয়াছে। শৈলেনের উপর ৮ টায় প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তার কে লইয়া সেখানে যাইবার ভার। সে সেখানে ৮ টায় তাঁহাকে লইয়া গেলে, আমরা যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িব। সেখানে অন্যান্য ডাক্তারও উপস্থিত থাকিবেন। দুর্গাদাস বাবুর প্রয়োজনে তিনিও অনুরোধ করিতে পারিবেন। সমস্যা সহজে সমাধান হইবে। প্রিন্সিপ্যালই তাহাদের এই যাত্রার ব্যবস্থাপক।'

জগবন্ধু স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু শৈলেনের মা কিছুতেই ছেলেকে দৃষ্টির অগোচর করিবেন না। অবশেষ বধুর সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ পাইয়া তিনি শৈলেন কে ছাড়িলেন।

জগবন্ধু বাবু সকল কথাই শুনিলেন। পুত্র উপযুক্ত, প্রতিজ্ঞা মারাত্মক, সমাজ সমস্যা জটীল—উপায় কি? তিনি কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না।

পুনরায় কান্না আরম্ভ হইল। বড় বউ শ্বশুরের পায়ে ধরিয়া বলিলেন "বাবা জেদ করিবেন না, আমরা তো জাতি যাওয়ার দলেই আছি, আজ না হয় জাতি যাইবে। দশ বৎসর পরে এরূপ ভাব থাকিবে না। আপনি অসম্মত হইয়া উপযুক্ত ছেলের মনে কষ্ট দিবেন না, নিজের মনেও কষ্ট রাখিবেন না।"

বড় বৌ শ্বশুরকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কানে কানে আরও অনেক কথা বলিলেন।

জগবন্ধু বাবু বলিলেন "চার দিক ঠিক রাখিয়া যাহা ভাল মনে বুঝ, তাহাই কর।"

নগেন কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'বাবা নগেন, তোর বাবাই আমার জাত মারিতে প্রথম অগ্রসর হইবে। যা বাবা, তোর হাতে বিচারের ভার দিলাম, তুই যা ভাল মনে করিস, তাই কর। এ বুড়াকে আর এর ভিতর রাখিয়া লাঞ্ছনার ভাগী করিস না। আমি ইহার কিছুই জানি না।"

গজা তামাক আনিয়া দিল। জগবন্ধু বাবু তামাক টানিতে টানিতে সমাজের অবস্থা, পুত্রের বিপদ, বর্ত্তমান শিক্ষিত যুবকদের কাণ্ড—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কাঁদা কাটার পর শৈলেনের বৌদির দৃষ্টি যখন দুঃখিনীর উপর পতিত হইল তখন তাহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। দুঃখিনীও তাহাদিগকে দেখিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। বৌদি' তথাপি দুঃখিনীকে খুবভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন। তাহার রক্ত কপোলের মধ্য-স্থলের কৃষ্ণবর্ণ তিলটী তাহার মুখের জ্যোতি শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছিল। অনিমেষ দৃষ্টিতে তিনি সেইটীর প্রতি অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তারপর শৈলেনের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শৈলেন দুঃখিনীর কথা নগেনের নিকট যতদূর শুনিয়াছিল, তাহা জানাইল। তারপর নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করিল।

বেলা ১০ টায় যখন জগবন্ধু বাবু ও নগেন শৈলেনের মুক্তির খবর লইয়া গৃহে আসিলেন, তখন তাহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

নগেন চাকর লইয়া বাজারে গেল। বৌদি রান্না করিবেন; দুঃখিনীকে উদ্যোগ করিতে বলিয়া তিনি শ্বশুরের নিকট আসিয়া দুঃখিনীর সহিত যাহাতে নগেনেরও বিবাহ হইতে পারে, তাহার জন্য নগেনকে বাধ্য করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহা হইলে যে সমাজে তাহাদিগকে তারাচরণের বিদ্রুপের বিষয় হইয়া থাকিতে হইবেনা—সে বিষয়টা বহু গোপনীয় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া টিকা টিপ্পনির দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন।

জগবন্ধু বাবু সম্মানী ও বিবেক সম্পন্ন লোক। শত্রু মিত্র সকলেই তাহাকে সম্মান করে। তিনি বধূর উপদেশে সায় দিতে পারিলেন না; বলিলেন—"ও সব ব্যাপারের ভিতর আমি নই বৌমা। তোমরা যাহা ইচ্ছা, তাহা কর। নগেন আমাকে অত্যন্ত সম্মান করে, আমি কোন কথা বলিলে অন্ধ বিশ্বাসে সে যদি কার্য্যই করিয়া বসে ও শেষ পিতার কোপে পড়িয়া যায়, তখন সে আমাকে অতি জঘন্য স্বার্থপর বলিয়া মনে করিবে। মনে করিবে, তাঁর নিজের নাক কাটিয়াছে—তাই আমারও নাক কাটাইলেন, কুলে কালি দিলেন। তারপর তারাচরণ মনুষ্য নহে—ও সব ফেসাদে ও অন্যায় পরামর্শে আমাকে তোমরা টানিও না। আমি আজই রাত্রির গাড়ীতে বাড়ী চলিয়া যাইব।"

বড় বৌ বলিলেন—"আপনি চলিয়া গেলে কি বাবা এ ব্যাপারে ঠাকুর পোর মুখ থাকিবে? আপনি রাগ করিয়াছেন জানিলে তিনি কি বিবাহ করিবেন?"

জগবন্ধু বাবু—"আমি কিছুতেই থাকিতে পারিবনা বৌমা: এইরূপ প্রকাণ্ড জাতিনাসা ব্যাপার আমি সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া সম্পাদন করাইতে পারিব না, তোমদের যাহা খুসি তাহা কর।"

বড় বৌ—কথাটা বুঝিয়া বলিলেন—তবে আপনার সম্মুখে না থাকাই ভাল। আমরাই নগেন ঠাকুরপোকে রাজি করাইব।"

শৈলেনের মা এসকল পরামর্শের ধার ধারেণ না। তিনি ছেলের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। সময় সময় পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাহার চক্ষে জলধারা বহিতেছে।

নগেন ও শৈলেন আফিসে গিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। জগবন্ধু বাবু আহারের পর একটু নিদ্রা গিয়াছিলেন, উঠিয়া দুর্গাদাস বাবুকে দেখিতে চলিয়া গিয়াছেন। শৈলেনের মাতা দুঃখিনীর সহিত পাছের বারান্দায় বসিয়া তাহার মুখে কলিকাতার গল্প শুনিতেছিলেন। বৌদি নগেনের নিকট দুঃখিনীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

নগেন বলিতে লাগিল—"আমাদের কাশী হইতে চলিয়া আসিবার দিন বিকালে আমরা কাশীর বিখ্যাত বাবা যোগ জীবন ব্রহ্মচারীর আশ্রমে গিয়াছিলেন। সে খানেই আমার অত্যন্ত অসুখ বোধ হয়।" নগেন এই স্থানে তাহার সহিত বাবা ব্রহ্মচারির যে সকল কথা হয়, তাহা সবিস্তার বর্ণন করিয়া বলিল—'দুখিনী যে কি প্রকারে আমার নিকট আসিল, আমি কিছুই জানিনা। শুনিয়াছি আমার সহপাঠী মহেশ ভট্টাচার্য্য—শৈলন তাহাকে চিনে, সে ঢাকা আমাদের সঙ্গে পড়িত—সেই ব্রহ্মচারীকে অনুরোধ করিয়া আনিয়াছিল। ব্রহ্মচারী আমার শুশ্রূষার লোক অভাব দেখিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে রক্ষিতা—তাহার শিষ্যের কন্যা এই দুঃখিনীকে আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করেন। মহেশ অত্যন্ত ভীতলোক,

সে যে সেই দিন আমাদের বাড়ীর সীমানা ত্যাগ করিল, তারপর এপর্য্যন্ত তাহার সাক্ষাৎ আর পাই নাই। যাই হউক, সে আমার জন্য যথা সম্ভব সাহায্য উপস্থিত করিয়াই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিল। দুর্গাদাস বাবুর মাকেও সে আনিয়া দিয়াছিল—ডাক্তারও সেই প্রথম আনিয়াছিল।" তারপর নগেন যাহা জানে, তাহা বলিল—তাহা পাঠক অবগত আছেন। শেষে নগেন বলিল, "বাবা ব্রহ্মচারীর নিকট আমিও মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। তিনি বিদায় কালে আমার হাতে দুঃখিনীকে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার হাতেই তাহাকে অর্পণ করিলাম। তুমি নিজে গ্রহণ কর—বিশেষ, পাত্রস্থ কর, সেও তোমারই ইচ্ছা।" সেই হইতে দুঃখিনী আমার স্কন্ধেই আছে। আজ দেড় বৎসর সে আমাদের সঙ্গে।

বড় বৌ—"দেড় বৎসর যার সঙ্গে একত্রে কাটাইলে ঠাকুর পো, তারতো চরিত্রও তোমাদের অজ্ঞাত নয়।"

শৈলেন বলিল—"দুঃখিনীর চরিত্র আদর্শের উপযুক্ত বৌদি। কি তার স্বভাব! কি তার অভ্যাস! যেন সোনার মানুষ!"

বড় বউ হাসিয়া বলিল—"আমাদের ঠাকুর পো যে 'নভে' পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে ছুটিলেন, না হইলে এমন চিজও হাত ছাড়া করি।" তারপর নগেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"দেখ ঠাকুর পো, তোমাদের মধ্যে এরূপ একটী সমত্ত মেয়েকে অবিবাহিত রাখিয়া ঘরকন্না করা লোকের চক্ষেও দোষণীয়, নিজের পক্ষেও অনিষ্টকর; এরূপ ভাবে থাকিতে আর আমরা দিতেছিনা ভাই! আমাদের বাবুর যে অবস্থা হইবে, একদিনে তোমারও সেই অবস্থা করিয়া ছাড়িব, এখন স্বীকার করিয়া ফেল। এ ভারি অন্যায় তোমাদেরে, লোকে কি বলে? নিজের কাণে তুলা দিয়া থাকিলেই কি পরের মুখ বন্ধ থাকে? তোমার গুরু তোমার হাতে মেয়ে দিয়াছিলেন কি পরের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য? না—"

বড় বউ হাসিয়া ফেলিলেন।

শৈলেন বলিল—"দিন ঠিক কর, সবই একসঙ্গে হইবে। আর আমাদের দুজনকেই আর একবার করিয়া সাধিতে হইবে কিন্তু বৌ দি!"

নগেন হাসিয়া বলিল—"তোমার কি ভাই, চোখে মুখে লজ্জার বংশ নাই। রবিবার দুপরে বক্তৃতা—শেষ মাতৃকার পূজা, বিকালে মানভঞ্জন বিচিত্র বিলাসের অভিনয়—পরদিন চলাচলি—কান্নাকাটি, তারপর একেবারে ভিজা বেড়ালটী—দৌড়া দৌড়ি করিয়া মরি আমরা। বাপ মাও পর্য্যন্ত মত্ত হইয়া গেল। এমন বেহায়াপনা করিতেই যে পারিব না। দেখিলে না, সে দিন?"

শৈলেন লজ্জায় মরিয়া গেল—তার পর নিজকে সামলাইয়া বলিল—"তোমার বাবার মত আমি করাইয়া লইব। নিতান্ত স্বার্থপর অকৃতজ্ঞ মনে করিও না। দুঃখিনী যে কি পদার্থ, তা যখন তোমার বাপ মা জানিতে পারিবেন, তখন বুঝিবে ভাই—"

নগেন খুব গম্ভীর ভাবে বলিল—"তা হইতে পারেনা বৌদি। আমার বাড়ীতে যে কি বিপদ, তাতো তোমরা জাননা। সান্যাল মহাশয় নীলামের পরওয়ানা জারি করিয়াছেন, পনর দিন মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা না যোগাড় করিতে পারিলে মাথা রাখিবার স্থান থাকিবেনা; এমন অবস্থায় আমার এখন বিবাহের কথা আলোচনার সময় নহে—তারপর বিপদ দেখুন। দুর্গাদাস বাবুর ভরসা করিতেছিলাম—সে গুড়েও বালি; তাঁহার সাহস যে পরামর্শ করিব, তেমন অবস্থাও তাঁহার নয়। আমি কাল রাত্রিতে বাড়ীর চিঠি পাইয়া একেবারে দিসাহারা হইয়া গিয়াছি।"

শৈলেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"এই না তুমি কিস্তি বন্দি করিয়া তাঁহার পাওনা আদায় করিতেছিলে—তাতেও তিনি হটাৎ এমন কাজটা করিলেন?"

নগেন বলিল—"বাবার নিকট মাসে মাসে যে টাকা পাঠাইতাম, তাহা তিনি রীতিমত আদায় করেন নাই—"

শৈলেন উৎসাহের সহিত বলিল—"কোন চিন্তা নাই, আমি সে টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করিলাম। দুর্গাদাস বাবুর নিকট তোমার গুরুদেবের যে চিঠি আছে তাহাতে তিনি দুঃখিনীর বিবাহের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন—দুর্গাদাস বাবু কি তোমাকে তাহা বলেন নাই?"

নগেন—"তাহাতে যথেষ্ট প্রলোভন আছে, আমি

জানি; 'কন্তু প্রলোভনে পড়িয়া হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হওয়া আমি সঙ্গত মনে করিনা।"

শৈলেন—তবে কি তোমার বিমাতার বোনঝিকেই বিবাহ করিবে। তাহাও কিন্তু আমি সঙ্গত মনে করিনা।"

নগেন বলিল—"আমার মাথা ঠিক নাই—একটু চিন্তা করিতে দাও।"

শৈলেন বলিল—"বেশ চিন্তা কর; আমাকে এখন দুর্গাদাস বাবুর বাড়ী যাইতে হইবে, আসিয়া তোমার উত্তর চাই কিন্তু।"

বৌদি বলিলেন—"ঠাকুর পো একটি চক্ষু সার্থক করিলে—আমি ত তো চক্ষু দুটী পীরপুরে রাখিয়া আসি নাই।"

শৈলেন বলিল—"অবশ্য হইবে। মাও মাসিমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। প্রস্তুত হও তোমরা, আমি গাড়ী লইয়া আসিতেছি।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলেন ও নগেনের বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। পীরপুর হইতে গোপী চক্রবর্ত্তী ও তারাপদ সান্যাল আসিয়াছিলেন। রমণ ডাক্তারের দলও আসিয়াছিল। তারাপদ সান্যাল শ্যালক মহেশ ভট্টাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিয়া গোপনে বিবাহের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। মহেশ ভট্টাচার্য্য কাশী হইতে জ্যোতির্ভূষণ উপাধি লইয়া আসিয়া আহিরিটোলায় জ্যোতিষী ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহার সাহায্যে তারাচরণের পুরোহিত মোনাথ ভট্টাচার্য্যের এক পুত্রকে কালীঘাট হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনা হইয়াছিল। পুরোহিত নন্দন কালীঘাটে একটা বারোয়ারীতলার পার্শ্বে অন্ন বিক্রয়ের আশ্রম খুলিয়া রন্ধনে [illegible] অর্থ সম্পাদন করিতেছিল।

শৈলেনের বিবাহ ব্রাহ্ম হিন্দু উভয় মতেই হইয়াছিল। কোন সমাজের অনুষ্ঠানই পরিত্যক্ত হয় নাই। মন্ত্রগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

"যস্য ছায়া মৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।" এই বৈদিক মন্ত্রটী লইয়া উপস্থিত হিন্দু ও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটু গোল বাঁধিবার সূচনা হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন 'হবিষা' শব্দে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, শব্দটা 'মনসা' করা হউক। দুর্গাদাস বাবু বলিয়াছিলেন "থাক্।"

নগেনের সহিত দুঃখিনীর বিবাহ হিন্দু মতে হইয়াছিল। কন্যাদাতা হইয়াছিলেন, নগেনের সহপাঠি ৺কাশীধামের সেই মহেশ ভট্টাচার্য্য। তারাপদ সান্যাল বিবাহ আরম্ভ হইলে পর উপস্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দু হিতসাধিনীর সম্পাদক শাস্ত্রী-বিদ্যাভূষণও বিবাহে যোগদান করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

বিবাহ এক রাত্রেই দুই লগ্নে হইয়াছিল; সুতরাং শৈলেনের মা ও বউদি এবং শাস্ত্রী-বিদ্যাভূষণ দুই স্থানেই উপস্থিত থাকিয়া ব্যাপার সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

বাবা যোগজীবন ব্রহ্মচারী ও বিধু বাবুর নিকট চিঠি গিয়াছিল তাঁহারা উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

বিবাহের তিন দিন পরে বাতব্যাধি রোগে দুর্গাদাস বাবুর পবিত্রাত্মা পরমব্রহ্মে লীন হইল।

* * * *

কিছু দিন পরে হিতসাধিনী পত্রিকার স্তম্ভে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

সামাজিক সমস্যা।

পীরপুরের সামাজিক সমস্যা এত দিনে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার শাস্ত্রী-বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টা ও উদ্যমে সমাধান হইল।

হিতসাধিনীর গ্রাহকগণ অবগত আছেন যে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে পীরপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত তারাপদ সান্যালের কুমারী কন্যা প্রতিমা বালাকে কতিপয় দুর্বৃত্ত লোক তারাপদ বাবুর কুলে কলঙ্ক কালিমা লেপন জন্য তাহার গৃহ হইতে বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বালিকাকে সেই দিনই কোন উচ্চমনা ভদ্রলোক উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। বালিকাটীকে লইয়া সমাজে তারাপদ বাবুর মস্তক অবনত হইবে বলিয়া ভদ্র লোকটী পর দিন রাত্রে গোপনে আনিয়া তাহাকে তারাপদ বাবুর হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি ও গোপনে তাহার শ্যালক সমভিব্যাহারে কন্যাকে ৺কাশীধামে

পাঠাইয়া দেন। ৺ কাশীধামে কন্যাটী সুপ্রসিদ্ধ দেশ পর্য্যটক বাবা যোগ জীবন ব্রহ্মচারীর আশ্রয়ে প্রতি-পালিতা হইতে থাকে।

পীরপুর সমাজের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত তারাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র সমাজ হিতৈষী শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এইরূপ পীরপুর সমাজ সমস্যার সমাধান জন্য উক্ত তারাপদ বাবুর ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণা কন্যাকে বিগত ২৮ ফাল্গুন হিন্দু শাস্ত্র মতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্য্যে সমাজ হিতৈষী শাস্ত্রী-বিদ্যা-ভূষণ মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই বিবাহ দ্বারা পীরপুরের আবহমান-কাল-চলিত সমাজ সমস্যার মীমাংসা এবং রাঢ়ী-বারেন্দ্র সমাজের সমীকরণ হইল।

* * *

পীরপুর সমাজের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত জগবন্ধু রায়। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ রায় বি, এসসি, এম, বি, কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম অতীত নেতা ৺ ডাঃ ডি, কাউড্রর প্রথম কন্যা কুমারী পারুল বালাকে গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে আদান প্রদান ও সহানুভূতির ভাব সৃষ্টি করিয়া দিয়া বৈদিক ধর্ম্মের সাহায্য করিয়াছেন। ইহা দ্বারাও আর একটী বৃহৎ সামাজিক ভেদ-সমস্যার সমাধান হইল।

* * *

জাতিভেদ হীন ব্রাহ্ম সমাজে আভিজাত্যের পূজা মহা কলঙ্ক কর সমস্যা! ৺ ডাঃ কাউড্রর কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত বিধুভূষণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে দ্বারে যাজ্ঞা করিয়াও ব্রাহ্ম-প্রজাপতিগণের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া আগরতলার পাহাড়ে এক কুকী রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যবহারে আশা করি ব্রাহ্ম সমাজপতিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

অর্থ নৈতিক সমস্যা।

ডাঃ কাউড্রু দেশের অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান চেষ্টায় তাঁহার শেষ জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাবি দ্বিতীয় জামাতা ডাঃ জে এন্ ভোস ডি এস সি এখন আমেরিকার হাভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রাকৃতি ক্যাল মিকানিকস্ ডিপার্টমেন্টে কার্য্য করিতেছেন। ডাঃ কাউড্রু তাঁহার দ্বারা তাঁহার ... মিলস্ চালাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। ... ব্যাপি মহা সমরের জন্য এত দিন তাহা কার্য্যে ... হয় নাই। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে এখন বুঝি সে প্রস্তাব একেবারে পরিত্যক্ত হইল।

* * * *

বাঙ্গালার ধনীগৃহে অর্থের অভাব নাই, মনীষাবান ব্যক্তিরও অভাব নাই। লক্ষ টাকায় একটী সুগার কল চলিতে পারে; আশা করি সভার ধন কুবের সমাজ-নেতাগণ অচিরে এ সমস্যার সমাধান করিবেন। বাঙ্গালী এখনও সমবায়ে কার্য্য করিতে শিক্ষা করে নাই, সুতরাং কারবারটী কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সম্পর্কিত হওয়াই সর্ব্বাঙ্গীন শুভ। সম্পাদক শাস্ত্রী-বিদ্যাভূষণ একজন কঠোর শ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন।

রাজনৈতিক সমস্যা।

স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে সন্তোষনীয়, তৎপর স্বদেশানুরাগ—এনীতিই রাজনীতির মূল সূত্র।

জাতি স্বার্থপর না হইলে তাহার রাজনৈতিক অধিকার জন্মেনা। আমরা স্বার্থপর জাতি নই; আমরা আত্ম প্রবঞ্চক, আত্ম বিস্মৃত জাতি।

ধর্ম্ম নীতির সম্মান রক্ষা করিয়া পর জাতির নিকট হইতে নিজের স্বার্থ রক্ষার নাম স্বার্থপরতা; আর নিজের জাতির বা জাতির মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়ার নাম আত্ম প্রবঞ্চনা। আত্ম বিস্মৃতি হইতেই আত্ম প্রবঞ্চনার উৎপত্তি। আত্ম প্রবঞ্চনা জাতির শক্তি হরণ করিয়া দেয়।

* * *

জাতির ধন-সম্পদ ও জাতীয় একতা শক্তির মূল উপাদান। জাতির ভিতর শক্তি সঞ্চয় না হইলে অথবা জাতিতে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিবার কারণ বর্ত্তমান থাকিলে সে জাতির রাজনৈতিক অধিকার লাভের শক্তি জন্মে না। স্বার্থ হইতে ধন সম্পদ; ধন সম্পদ হইতে শক্তি-সম্পদ; শক্তি হইতে অধিকার এবং অধিকার হইতে প্রতিষ্ঠা। ইহার সকলেরই মূল স্বার্থ, সুতরাং স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে সন্তোষনীয় তৎপর স্বদেশানুরাগ বা রাজনীতির চর্চ্চা। অর্থ-স্বার্থের প্রাচুর্য্যই সকল সমস্যা-সমাধানের মূল উৎস।

ধর্ম্মনৈতিক সমস্যা।

হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতা ও ব্রাহ্মসমাজের কুসংস্কারের সহিত ধর্ম্মনীতির কোন সংস্রব নাই। অথবা যে সংস্রব আছে, তাহা আপাততঃ আমাদিগকে ভুলিয়া যাইতে হইবে। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি। যে জাতির উদরের পথ্য আছে, শরীরে বল আছে, গৃহে ধন আছে, সমাজে একতা আছে, ধর্ম্মের স্থান সেই জাতির বিরাট অনুভূতির ভিতর। অন্ন হীন দীন-দুঃখী ও শক্তি হীন দুর্ব্বলের অকরণীয় পাপ কিছুই নাই। যাহারা অন্নের কাঙ্গাল, আত্ম রক্ষায় অসমর্থ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম তাহাদের জন্য নহে; ধর্ম্মনৈতিক সমস্যা সমাধান করিবার বা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইবার তাহাদের আপাততঃ কোনই প্রয়োজন নাই। কেন না অগ্রে বাঁচিয়া থাকা, তৎপর ধর্ম্মরক্ষা! ইহাই সম্পাদক পূজনীয় শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত।"

পত্রিকাপাঠ শেষ করিয়া নগেন বলিল—"শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণের ঐ দোষ—নিজকেই সকল বিষয়ের ভিতর প্রচার করতে চায়—কি বক্তৃতায়, কি লেখায়।"

শৈলেন বলিল—"আজকাল কার দিনই ভাই নিজের ঢাক ঢোল নিজে পিটাবার—Self admiration Soccityর। নিজের কথা নিজে না প্রচার করিলে কে প্রচার করিবে বল? কে কার কথা বলে জগতে?"

নগেন হাসিয়া বলিল কেন ভাই, আমি কি তোমার কথা বলিনাই? নতুবা এ সমস্যার কি এত সহজে সমাধান হইত?

সমাপ্ত।

আয়না

—কচিবৌ—

পড়ার ইতি, শাসন তাড়া,
বাট্‌না বাটা, রান্না বাড়া;
পাতের এঁটো চেটে খাওয়া,
রাত্রে হাড়ে লাগে হাওয়া!
বছর বছর কন্যাবতী,
বৌয়ের যেন দুষ্টমতি;
ভগ্ন কটি, রুগ্ন দেহ,—
চক্ষু দুটি মোছাও কেহ!

—গেঁয়ো 'মাষ্টমশাই'—

মাইনে পড়ে দশ পনর,
ঘুন পাকামি, বক্তা বড়!
বজ্জনায়েক—এই ধারণা,
ছাত্র, চাবুক, যম-যাতনা!
এল-এ বি-এ, ছুঘাযেব,
বাঁধা বুলি কপ্‌চানো বেশ!
হয়না হজম সাবু জলও!
অন্ন কি তবে? কর্ম্ম মলো!

—মোক্তার বাবু—

"ওহে মক্কেল, ব্যাপার কিহে?"
"আজ্ঞে সীমা কোদালদিয়ে—"
"দেওনা টাকা? ব্যাটার কি নাম?"
"একটি টাকা! গঙ্গারাম;"
আধ্‌লি সিকি অল্পে খুসী,
শিকার নিয়ে ছুঁসাছুঁসী!
চাষার টাকা চুষে নেওয়া,
সরল মানুষ বিগ্‌ড়ে দেওয়া!

—তহশীলদার—

"কর্ত্তা সেলাম!" "খাজ্‌না দে না?"
"পাইনা খেতে! বাড়্‌ছে দেনা!"
"দুষ্ট পাজি হারাম জাদা!
বদ্‌না ঘটি দেনা বাঁধা!"
"থাক্‌বে না-তো বাস্তু ভিটে!"
"জুতো তোমার পড়্‌বে পিঠে!"
"একবেলা খাই! ছাওয়াল মরে!'
"সে সব কথা শুন্‌বো পরে।"

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

আলোচনা।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে প্রচলিত আচার-নিয়ম ও ধর্ম্মের আদর্শ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার আগে যদি ইহার মূল উৎপত্তির সূত্রটা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, তবেই ইহার সমুদায় গলদ্ ধরা পড়িয়া যায়।

যে দেশব্যাপী নিরানন্দের জড়ভাব জগদ্দল পাষাণ শিলার ন্যায় সমাজের বক্ষে চাপিয়া রহিয়া তাকে নিশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ দিতেছেনা—ইহা কি একদিন দুদিনের তৈরী? মানুষকে অযথা নির্য্যাতন করিবার মত যে আত্মাবমাননাকর নিদারুণতা সমাজহৃদয়কে পীড়িত করিতেছে, ইহা কি কোনো সম্প্রদায়ের চাতুরী বিশেষ? আত্মার সঙ্গে জগতের সঙ্গে একটা প্রাণান্তিক বিচ্ছেদ্ স্থাপন করিয়া যে আত্মাকে নির্জীব ও জগতকে নিরানন্দ করিয়া তোলা হইয়াছে—ইহা কি আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ কোনো বিশেষ বুদ্ধিমানের জ্ঞানকৃত অলৌকিকী প্রতিভা হইতে সমুদ্ভূত? এই সকল কথা বিচার করিবার দিন আজ আসিয়াছে—তাহা আলোচনা না করিলে, আমাদের জাতীয়তা ক্ষুণ্ণ হইবে বৈ তার গৌরব বাড়িবে না। কূপমণ্ডূকের মত নিজের অন্ধজীর্ণনিকেতনে নিজের বড়াই কারলেও বিশ্বের উন্মুক্ত জ্যোতির্মণ্ডিত গগণতলে তাহা চিরদিনই উপহসিত ও লজ্জিত হইবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে!

ইহা আমরা সকলেই জানি, আমাদের সমাজে জাতিভেদ্ ও অন্যান্য আচার-বিচার নিয়াধিকারীর পক্ষেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই নিম্নাধিকারী কথার তাৎপর্য্য হচ্চে গৃহস্থ! যারা সন্ন্যাসী, তারা আচার-নিয়ম পালন করে না—কর্ম্মও করেনা—তারা আধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিয়া থাকে!

যারা গৃহী, তারা মাছ মাংস আহার করে, কালী দুর্গা প্রভৃতি শক্তির পূজাকরে ও পশু বলিদেয়; আর সন্ন্যাসীরা কন্দমূলফল ভক্ষণে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যারা গৃহী, তারা বিদেশে গেলে সমাজচ্যুত হয়, আর সন্ন্যাসীরা বিদেশ ও স্বদেশ এক বলিয়াই জানে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের এই যে উদারতা, ইহাও খাঁটি কি না বিচার্য্য, কেননা তাঁদের যে সার্ব্বভৌমিকতা, আত্মোপলব্ধি- এগুলোও কথার কথা মাত্র। আসল কথা—উহারাও বিশ্ববিমুখ—কেননা, উহারা কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় করিয়া মুক্তির অভিমুখে প্রয়াণ করিতেছেন। কিন্তু সে মুক্তি কি উপনিষদ্ প্রচারিত বিশ্বোপলব্ধি বা সর্ব্বানুভূতি?—একি আত্মার যোগে আপনাকে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া! তা ত নয়, এযে নির্ব্বাণ মুক্তি! এযে বিশ্ব হইতে বাসনাকে সংবরণ করিয়া আনিয়া শূন্যের মধ্যে তাকে বিলীন করিয়া দিবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। এযে নেতি নেতি করিতে করিতে সোঽহংব্রহ্মে পৌঁছানর সাধনা! এতে আর কিছুলাভ হয়না, হয় মাত্র আলস্য অবসাদ ও জড়তা! কেন যে আমাদের গৃহীদের মধ্যে এইরূপ আত্মাহীন দেহের অহংকৃত লীলা ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রাণহীন আত্মার শুষ্ক নির্জীবতা আসিয়া পড়িল, তাহাই আলোচ্য।

ইতিহাস পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের ক্রমপরিণতিকে বিচার করা যাঁহারা গুরুতর পাপ বলিয়া গণ্য করেন না, তাঁহারা জানেন, যে এককালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন অশেষ প্রভাবান্বিত তখন সহসা অনার্য্য ও আর্য্যের একটা বিরোধ—যাহা পূর্ব্বে দারুণ হইয়া গিয়াছিল—তাহা একেবারেই লুপ্ত হয়, তারফলে অনার্য্যেরা আর্য্যদের মধ্যে অবাধ প্রসার লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু এই মিলনটা এতই আকস্মিক হইয়া পড়িয়াছিল, যে আর্য্যেরা ইহার সত্যটাকে গ্রহণ করিতে না পারিয়া ইহার অসত্যগুলোকে একেবারে নিঃশেষরূপে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন—সেই দারুণ দুর্ব্বিপাকের দিনেই মহাযান পন্থা প্রবর্ত্তিত হয়—তখনি সহজিয়া ধর্ম্ম, দেহাত্মবাদে দেশপূর্ণ হয়—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"

য়ুরোপীয় "eat drink and be merry for tomorrow you may die" এই ধরণের মতামত আর্য্য সমাজে ওতপ্রোত হইয়া বিরাজিত করিয়াছিল।

তাহারি প্রবল প্রতিক্রিয়া স্বরূপে দাক্ষিণাত্যদেশীয় ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য্য একটি গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি ছিলেন ক্ষুরধার বুদ্ধি—তার্কিক—যুক্তি ও বিচারে সকলকে পরাস্ত কারয়া তিনি ভারতবর্ষে অদ্বৈত জ্ঞানের স্রোত উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু হাজার তর্ক করিলে কি হইবে—হাজার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেই বা কি হইবে, তাঁহার অধ্যাত্মতত্ত্ব ছিল অসম্পূর্ণ ও একমুখী—তিনি এইটুকু জানিয়াছিলেন যে এই পঞ্চকোষাত্মক জগতের নানান্ বিচিত্রতা থাকা সত্ত্বেও এর ভিতরে এমন একটি ঐক্য আছে—যাহা নির্ব্বিশেষ—কিন্তু বিশেষকে লইয়াই যে নির্ব্বিশেষের কারবার এ সত্যটি তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন—এবং সেইজন্যই তাঁহারা জগৎকে ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে ব্রহ্ম অবিদ্যার কুহকে পড়িয়া এই প্রত্যয় আনিতেছেন যে তিনি পঞ্চকোষাত্মক। এই প্রত্যয়ই ভ্রমক্রমে জগৎরূপে প্রতিভাত। তখন এই মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত করিয়া সোঽহং ব্রহ্ম এই বিশ্বাস আনিতে পারিলেই মিথ্যা মায়াপ্রপঞ্চ লোপ পাইবে। এই জন্যেই তাঁহারা পঞ্চকোষরূপে বিভক্ত ব্রহ্মকে যথাক্রমে অন্ন প্রাণ, মন, জ্ঞান ও আনন্দময় কোষে আবর্ত্তিত করিয়া পরে ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইবার সাধনা করিয়া থাকতেন। বলা বাহুল্য জগৎকে এরূপ ভ্রমাত্মক বলিয়া কল্পনা টাই ভ্রম—অতএব একই আসনে বসিয়া বসিয়া স্থির হইয়া, জগৎ মিথ্যা, আমি মিথ্যা—এরূপ চিন্তনে আর কিছু হয় না. কেবল আপন মনের খোস্ খেয়ালী কল্পনার ঝাঁঝটুকু উপভোগ করা হয়। এবং সেইটেকেই যারা ব্রহ্মানন্দ বলে, তাদের সঙ্গে ব্রহ্মের কোনো পরিচয়ই যে নাই, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু জড়তাও নিরর্থক হইলেও জগৎ মিথ্যা জ্ঞান আনা ত একদিন দুদিনের কর্ম্ম নয়, অথবা যে সে লোকের সাধ্যও নয়। সেই জন্যই শঙ্করাচার্য্য গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম এই দুই ভাগে ধর্ম্ম সাধনাকে ভাগ করিয়া সন্ন্যাসীদের জন্য অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান ও গৃহীদের জন্যে পৌরাণিক বহু দেববাদ দেশে প্রচারিত করিতে সুরু করিলেন। শেষকালে ব্যাপারটা যে কী দাঁড়াইল, তা পূর্ব্বের কথার সঙ্গে মিলাইয়া পাঠকেরা নিশ্চয়ই ধরিতে পারিয়াছেন আশা করি।

এই যারা পৌরাণিক ধর্ম্মকে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তারা বৌদ্ধপ্রভাব জনিত অনার্য্য সংস্রব হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য একটী তীব্র জাত্যাভিমান পোষণ করিতে লাগিল, যাহা অমানুষোচিত! তাহারা ক্রিয়া কর্ম্মে, আচার নিয়মে, কেবলি গণ্ডী কাটিতে লাগিল—কেবলি সকলকে দূর দূর করিতে লাগিল—কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও অনার্য্য প্রভাবকে একেবারেই কাটাইয়া উঠিতে পারিল না।

সেকালে হিন্দু গৃহীদের মধ্যে এবং কতক কতক সন্ন্যাসীদেরও মধ্যে এক অভিনব ধর্ম্ম দেখা দিল—তান্ত্রিক ধর্ম্ম। ইহাও অদ্বৈতবেদান্তবাদেরই শাখা। কিন্তু ইহাতে প্রকৃতিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া তাহাকেই অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া হইল—কেননা ইহার মূল লক্ষ্য—শক্তিকে খুসী করিয়া তার হাত হইতে রেহাই পাওয়া। শেষকালে এই শক্তি উপাসনার এতটা বাড়াবাড়ি সুরু হইল যে প্রকৃতির হাতে আত্মা যে লাঞ্ছিত এবং প্রকৃতিই সর্ব্বশক্তিমতী, সর্ব্ববিশ্ববিধায়িনী, এমন সব কথা নানা রূপকের মধ্যে দিয়া দেখা দিতে লাগিল; মনসার কাহিনী প্রভৃতি তারি কি উজ্জ্বল নিদর্শন নহে? এই শক্তি উপাসক তান্ত্রিকদের সাধনা বৌদ্ধ মহাযানেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। পঞ্চ-মকার, কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা প্রভৃতি সবই অন্যবিধ আকারে বৌদ্ধ দুর্গতির দিনে জঞ্জালের মতোই জড়াইয়াছিল, আর নানান্ রূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন যেমন যন্ত্রাদি ও মন্ত্র যেমন—"ক্লাং হ্রীং ক্রীং" প্রভৃতি, এসবই তখনকার অনার্য্য বর্ব্বরতারই পরিচয় দেয়, এখন ইহাতে উড্রফ সাহেবের ভক্ত নব্য হাল ফেসানী হিঁদুর দল যাই বলুন!

এখনকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবার যুগে এ সকল মন্ত্রের অনেক নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে সত্য—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এই সকল শব্দকে এক একটী তত্ত্বনির্দ্দেশক সাঙ্কেতিক মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া লাভ কি? বাতাসকে বং, আগকে রং, জলকে লং ও শক্তিকে ক্রীং বলিয়া একশো আট বার করিয়া সেই সব মন্ত্র জপ করিলে প্রকৃতই কি অগ্নি-জল-আকাশ ও শক্তির অন্তরস্থিত পরমাত্মার সহিত যোগ স্থাপন সম্ভব হয়—না তাহার মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদই ঘটিয়া থাকে?

তান্ত্রিকদের যুগে যে কেবলি বীভৎসতার পুঞ্জীভূত আয়োজনই দেখা দিয়াছিল—তা বলিলে একটু ভুল বলা

হইবে। উহাদের মধ্যে রসায়নের চর্চ্চাটা খুব উন্নত আকারে দেখা দিয়াছিল—যদিচ তাহাও বৌদ্ধদের কাছ থেকে ধার করা। কিন্তু সেসব রাসায়নিক তত্ত্ব এখন লুপ্ত—এখন কেবল সেকালকার পাপগুলোই অব্যাহত ভাবে বিরাজ করিতেছে। আমার তো মনে হয়, আধুনিক হিন্দুসমাজের ধর্ম্মানুসারে কর্ণধারই তন্ত্রধার। বস্তুতঃ বৈদান্তিকগণও যখন তান্ত্রিকদের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন—তাঁরাও যখন বলিলেন যে জীবের ভোগলিপ্সা দূর করিবার জন্য কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ব্যাভিচার ও মদ্যাদি পান আত্মার পক্ষে কল্যাণের নিদান, তখন দুর্গতিকে ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তান্ত্রিক ধর্ম্মই দেশ ছাইয়া ফেলিল—সুরা ও নারী হইল সে ধর্ম্মের প্রধান উপকরণ; মারণ, উচ্চাটন, বসীকরণ, ভূতপ্রেত পিশাচ সাধনা প্রভৃতিও তাহাতে আনুসঙ্গিকভাবে দেখা দিল।

বস্তুতঃ শক্তিকে যখন কোনো পরমপুরুষের অমোঘ নিয়মাধীন রূপে বিবেচনা না করিয়া কোনো মহান্ একের প্রকাশের উপকরণ বা বাহন রূপে না দেখিয়া তাহাকেই একান্ত ও উদ্ধত করিয়া দেখা হয়, তখনি ন্যায় ও ধর্মনীতিকে দুর্ব্বলতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া উঠে। তন্ত্রে যে মহামায়ার ভৈরবী মূর্ত্তিকে আরাধনা করা হইয়াছে—তাহা আত্মার প্রকাশশক্তি নহে অর্থাৎ তাহার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিবার কোনো কথা তন্ত্রে নাই—তাহাকে খুসী করিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নানানুরূপ ব্যাভিচারের সৃষ্টি হইয়াছে। যে শক্তি কোনো নিয়ম মানেনা—তার খামখেয়ালই চরম নিয়ম—সে ইচ্ছা করিলে স্বর্গে পাঠাইতে পারে, ইচ্ছা করিলে নরকে পাঠাইতে পারে; ইচ্ছা করিলে বাঁচাইতে পারে, ইচ্ছা করিলে মারিতে পারে—সবই তার অসংযত ইচ্ছার অংংকৃত লীলার উপরে নির্ভর। অতএব তাকে মানিয়া চলাই সব-চেয়ে বড় কথা—সে জন্যেই তাকে অতকরিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা—তাকে নরমুণ্ড, মহিষমুণ্ড, ছাগমুণ্ড প্রভৃতি দারুণ উপচারে সন্তুষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা। ইহাকেই যদি সুপবিত্র আর্য্যধর্ম্ম বলা হয়, তাহাহইলে পাপকেও পুণ্যের নামে গিল্টি করিয়া চালানো হয়।

কিন্তু এই একদিকে বৈদান্তিক জড়তা, অপরদিকে তান্ত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা, একদিকে আরাম-আলস্য অপরদিকে প্রমত্ত ব্যাভিচার, একদিকে তামসিকতা অপরদিকে রাজসিকতায় যখন দেশ আচ্ছন্ন, তখনি সত্যধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য একটী সজীব প্রয়াস দাক্ষিণাত্যে দেখা দিল—রামানুজ গোস্বামীর নেতৃত্বে। রামানুজ গোস্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ্ সে বিশ্বব্রহ্মবাদ্ বলিলেও চলে। ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈত লীলার দিক্‌টা না থাকিলেও জগতকে ব্রহ্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া দেখিবার তত্ত্বটা ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল উৎস্ এই রামানুজ হইতে উৎসারিত হয় এবং চৈতন্যদেবের হৃদয়প্রবাহিনী প্রেমধারার সহিত সম্মিলিত হইয়া ইহা দেশব্যাপী একটি অনির্ব্বচনীয় ভাব বিস্তার করে। চৈতন্যদেবের ব্রহ্মধারণার মূল তত্ত্বটা সম্পূর্ণ ঔপনিষদিক্ এবং গীতারই অন্তর্ভূত। কিন্তু একটি দিকে ইহা উপনিষদ অপেক্ষা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল—সেটা তার বিচিত্রতারদিক্! চৈতন্যদেব সম্পূর্ণ ভেদাভেদ্‌বাদী ছিলেন—কিন্তু ভেদাভেদবাদকে যাঁহারা মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত! উপনিষদেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রকাশ কি অলঙ্কভাবার দেখা দিয়াছে! যাঁহারা প্রত্যেক কথারই ঘোরালো রকমের অর্থ তৈরী করিয়া বসেন, তাঁহারা তাহা না বুঝিতে পারেন, কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে সরলবিশ্বাসের সহিত উপনিষদ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভেদাভেদ্‌বাদই ঐ তত্ত্বরসাত্মক কাব্যে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছে। উপনিষদতো সবলে সব একাকার করিয়া দেন নাই—

যশ্চায়মস্মিন্ আকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ

আবার

যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ

ইহাতে কি ঠিক জীব ও ভগবানের দ্বৈতাদ্বৈত রহস্যই বলা হইয়াছে না?

ভেদাভেদ্‌বাদ্, কথাটার মানেও সকলে জানেনা। বস্তুতঃ এই তত্ত্বটা আর কিছুই নয়—এই বিশাল বিশ্ব জগৎ ও বিশ্বমানব মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অরূপ ব্রহ্মের অখণ্ড আনন্দ হইতে জন্মলাভ করিতেছে এবং নানা বিচিত্রতায়

পথ বাহিয়া আবার তাঁহাতেই আসিয়া বিলীন হইতেছে— বিশ্বপ্রকৃতিতে ও বিশ্বমানবে তাঁহার এই অচিন্ত্যলীলা আনন্দরূপে, অমৃতরূপে নবনব মূর্ত্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। একদিকে সমস্ত দ্বৈতভাব সমস্ত বিচিত্রতা, সেইদিকেই ভেদেরদিক্; অপরদিকে একটি সচ্চিদানন্দ ঘন ঐক্য, সেইটেই অভেদের দিক্। বিশ্বাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পরের আনন্দময় যোগে আপনাদিগকে পরস্পরের দিকে কেবলি উদ্ভাসিত করিতেছেন—সেইটিকেই আত্মার যোগে সংযতচিত্তে উপলব্ধি করিবার সাধনা— বুদ্ধদেবের ও উপনিষদের সাধনা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রহ্মবোধকেই কর্ম্মের মধ্যে সফল ও সার্থক করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এবং সেই ব্রহ্মবোধকেই নানা বিচিত্র সম্ভোগের মধ্যদিয়া নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করিবার প্রথম চেষ্টা দেখা যায়—মহাভারতীয় যুগে— ভগবানের বিষ্ণু মূর্ত্তিতে। মহাভারতে যিনি বিষ্ণু— চৈতন্যদেবের সময় তিনিই কৃষ্ণরূপে পরিণত হইলেন। জানি না চৈতন্যদেব ব্রহ্মকে কোন বিশেষ দেশের বা মানব সমাজের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিয়াছিলেন কিনা —বোধ করি দেখেন নাই—কিন্তু পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভগবানকে একেবারে নিছক সাকার ও মনুষ্য-গুণসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এইখানেই সে সমস্ত বৈষ্ণবদের একটি অন্ধতা।

অনন্ত পুরুষকে অরূপ জানিয়াও কোন বিশেষ দেশবাসী রূপের মধ্য দিয়া তাঁহাকে কল্পনা করিবার সময় তাঁহাতে সেই বিশেষ দেশের ছাপ পড়িলেও তাঁহাকে সেই বিশেষ দেশেরই উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় না—কিন্তু যদি ভগবানের অরূপত্বকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়া তাঁহাতে দৃঢ়ভাবে কোন বিশেষ দেশকাল পাত্রের আরোপ করা হয়, তবে গভীরতর আনন্দ জন্মাইলেও তাহাতে মানুষেরই পূজা করা হয়— পরমাত্মার নহে। কেননা পরমাত্মা সগুণ হইলেও অরূপ। — তবে যে তাঁহাকে রূপ দিয়া ধ্যান করা হয়, তাহাতে এমন কেহ বলিতে পারিবে না, যে কেবল মাত্র একটা দেশেরই উপযোগী রূপে তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে, তাহা বলিলেই মহান্ পুরুষকে আপন সঙ্কীর্ণতা দ্বারা খণ্ডিত ও ছোটোই করা হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মে এই গলদটী পরে দেখা দিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মে ভগবানের রূপ কল্পনা একেবারেই বর্জ্জন করিবার দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। আর অনন্ত স্বরূপের নাম দিয়া মানুষের পূজা করিলে তাহাতে বিকৃতির সম্ভাবনা পদে পদে বৈষ্ণব-ইতিহাস আলোচনা করিলেও আমরা সেই কথাই জানিতে পাই।

কিন্তু তৎসত্বেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে, যে পরবর্ত্তী কালের ভক্ত বৈষ্ণবগণ মানুষের পূজা করিলেও মানুষের অন্তরাত্মা পরমানন্দেরই পূজা করিয়াছেন, শক্তির পূজা করেন নাই! সেইজন্য তাঁদের আত্মবোধ খুব ব্যাপক এবং উদার না হইলেও তাহা আত্মবোধই— পাপবোধ নহে। সুতরাং মনুষ্যগুণবিশিষ্ট দেবতার পূজা করিলেও তাহা ভূতপ্রেতপিশাচের পূজা নহে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে আর একটী প্রচেষ্টা দেখিতে পাই, সেটা—বহুদেববাদকে একটা বিশিষ্ট অর্থ দান করিয়া বিশ্ব ও ঈশ্বরতত্ত্বেরই রূপকভাবে পরিণত করা। ইহার পূর্ব্বে নানা দেবতার উপদ্রবে দেশ জর্জ্জরিত হইতেছিল। কিন্তু বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকেই পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপে নির্দ্দেশ করিয়া আর সকলকে তাঁহারি বিভিন্নভাবে প্রকটিত বিভিন্ন প্রকার প্রকাশরূপে নির্দ্দেশ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রথম আমাদের জাতি-অভিমানে প্রচণ্ড আঘাত দিয়া ব্রাহ্মণ, শূদ্রের ব্যবধান চূর্ণ করিয়া ফেলে—তাঁহাদের মূল মন্ত্রই রসের সাধনা—"রসো বৈ সঃ" এই উপলব্ধিতে তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়া সর্ব্বপ্রকার জড়তা, অভিমান ও জ্ঞানের চাতুরীকে একেবারে ধৌত-পরিপ্লাবিত করিয়া দেন।

তাঁহারা বলিতেন "বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর"

তাঁহারা বলিতেন "অরসজ্ঞ কাক চোষে জ্ঞাননিম্ব ফলে
বসজ্ঞ কোকিল চোষে প্রেমাম্রমুকুলে"

তাঁহারা বলিতেন "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-
পরায়ণঃ।"

কিন্তু এমন পরম মধুর পরমানন্দময় ধর্ম্মও টিকিল না— তার একটি মাত্র কারণই আমাদের চোখে পড়ে— বৈষ্ণবদের যে এই সচ্চিদানন্দের নিগূঢ় উপলব্ধি—ইহা কেবল একটি মাত্র রূপককে আশ্রয় করিয়া রাধাকৃষ্ণেই

আবদ্ধ ছিল—এবং তাহারি ঐকান্তিক আতিশয্যে তাহা নিতান্ত বিশ্ববিমুখ হইয়া পড়িয়াছিল। যদিচ চৈতন্যদেব সংসারের মধ্যেই সেই সচ্চিদানন্দের উপাসনায় গভীরতম রস উপলব্ধির জন্য তাঁহার নিত্য সহচর নিত্যানন্দকে পর্য্যন্ত গৃহী করিয়া দিলেন তথাপি পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভোগে সংসারকে অস্বীকার করিতে লাগিলেন—কাজেই স্বস্তির চাঁপরের মধ্যে কতকগুলি বাষ্পোচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিবার নানান্ চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতে লাগিল, পরে তাহা অবিকৃতভাবে নানান্ প্রমত্ততা ও অসংযমের পরাকাষ্ঠায় দেশ ভাসাইয়া দিল।

এই সময় হইতেই যাঁরা ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত তাঁরা বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হইলেন। আবার আসিয়া পড়িল সেই আচার বিচার, সেই জাতিভেদ, সেই নেতি নেতি, ধর্ম্মের নামে সেই রক্তপাত।

আজো পর্য্যন্ত সমাজ এই তিনটির প্রভাব হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে নাই। ধার্ম্মিক বলিয়া যাঁরা দেশে বিখ্যাত, তাঁরা হয় বৈদান্তিক, নয় তান্ত্রিক, নয় বৈষ্ণব। অবশ্য বৈষ্ণব দুচার জন ভালো আছেন একথা মানি। কিন্তু হিন্দু সমাজ বলিয়া গৌরব করিবার কিছুই এ সমাজে এখন নাই। যা আছে তাহা প্রাচীন ধর্ম্মবোধের সুবিশাল সৌধের ভগ্নস্তূপ—জীর্ণ, শীর্ণ, শত-দীর্ণ; ইহার ফাটলে ফাটলে ভিত্তিতে ভিত্তিতে কত জটীলতা, কত অসঙ্গতি, কত আতিশয্য বটবৃক্ষের কুটিল শিকড়জালের মতো জড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে না আছে উপনিষদের বিশ্বানুভূতি, বুদ্ধদেবের ব্রহ্মবিহার, না আছে গীতার কর্ম্মযোগ, না আছে নানক-কবীরের সর্ব্বজনীন ব্রহ্মোপাসনা, না আছে মহাপ্রভুর বিশ্বপ্লাবিত প্রেমের তরতর ধারা। আছে কেবল বৈদান্তিকী জড়তা, তান্ত্রিকী উন্মত্ততা ও বৈষ্ণবী অসংযম!

কিন্তু দূর অতিদূর হইতে শিঙার ধ্বনি শ্রবণ কুহরে প্রবেশ করিতেছে—তাই নব্যবাংলা আর বার্দ্ধক্যের জড় আবরণের মধ্যে আত্মহত্যার সাধনা করিতে চাহিতেছেনা—দূর-দিগন্তে যেখানে জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে, মুক্ত জীবনের জয়ধ্বনি মনুষ্যত্বের সুপ্ত চৈতন্যকে চেতাইয়া তুলিতেছে—সেদিকে আজ বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভরসা একনিমেষেই তার অতীপ্সিত ফলকে কি সম্পূর্ণ বিকশিত দেখিতে পাইতেছে। বাঙালীর হৃদয়ের দরজা আজ মুক্ত—নাই কোনো অর্গল, কোনো শৃঙ্খল, কোনো বাধাবন্ধ। সে আজ ভারতবর্ষের জাগরণ মন্ত্রের পুরোহিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে শুনিতে পাইল যে—সে কে! সে আজ দেখিতে পাইল, তাহার চিরন্তন সাধনার ধারাকে এবং সেই ধারার সঙ্গে বিদেশীয় ঋষিদিগের হৃদয় কন্দর নিসৃত আনন্দবাহিনী তটিনীর গঙ্গাযমুনা সঙ্গম ঘটাইয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিল।

আজ তার প্রাণে অসীম বিশ্বাস, অনন্ত অধ্যবসায় ও নিরলস তপস্যার দীপ্তি দেদীপ্যমান। বাঙালীর এই নব-যুগের উদ্বোধনকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া যাহারা ইহাকে শাসাইয়া রাখিতে চাহে—তাহাদিগকে সজোরে, সতেজে ঘা দিবার দিন আসিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাইত জড়তা হইতে মুক্তি, উন্মত্ততা হইতে মুক্তি, অসংযম হইতে মুক্তি।

এই মুক্তির আবেগ প্রথম বাঙালীর হৃদয়ে—সজাগ হইয়া উঠিয়াছে—বাঙালীই ভারতবর্ষকে মুক্তিদান করিবে।

আজ সত্যই অন্তরের গভীর অন্তস্তলে অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে—ক্ষুদ্রে আর তৃপ্তিনাই—"ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" আজ সত্য সত্যই আমাদের দেশের যৌবনধর্ম্ম কোন্ পরমসুন্দরের আলোক স্পর্শে ঝলসিত হইয়া উঠিয়াছে—দেশের বহু-দিবসের আচ্ছন্ন জরা ইহাকে আজ বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছেনা, এ যেন যুগযুগান্তের জীর্ণ নোঙর কাটিয়া মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালার সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। মুখে ইহার তৃপ্তি নাই—এবার বুকভরা বিশ্বজোড়া অতল অকূল আনন্দরাশিকে একনিশ্বাসে পান করিতে।

তবে সেই আনন্দের জোয়ার আসুক—হৃদয়ে উদ্দাম তরঙ্গ ভঙ্গে, বহুক্ সুদূর সুনীলের নির্ম্মল হাওয়া, প্রাণের সমস্ত রুদ্ধ দুর্গমতা ধুলায় লুটাইয়া ছুটুক্, অন্তরে যৌবনের অফুরান্ তুফান কোন্ কাল বৈশাখীর রুদ্রমন্ত্রে, বন্ধনহারা আনন্দের মন্ত্রে!

শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী।

পাথরচাপা কপাল।

(১)
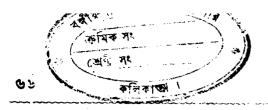
ভগবানের কৃপা দৃষ্টিতে মহাসাগর মহানগরীতে পরিণত হয়, অন্ধে নয়ন মেলিয়া চায়,—বোবায় কথা বলে। দৃষ্টান্ত আমাদের রাধানাথ দত্ত। রাধানাথ ছেলেবেলা হইতেই ভ্যাবা গঙ্গারাম। কিন্তু বিধির বিধানে সে আজ সহরের সেরা উকীল। তাহার দুয়ারে রাজা জমিদারের গাড়ী খাড়া। তাহার সলা পরামর্শের দামও অনেক বেশী। অথচ তাহার অতীত জীবনের কাহিনী—নিতান্তই হাস্যকর। কেবলি সরলতা ও আহাম্মুকীর ভিতর দিয়া তাহার জীবনটা আপন লক্ষ্যের—দিকে ছুটিয়া চলিয়াছিল। এবং কে যেন তাহার সেই সরলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার কাণ্ডগুলিকে এড়াইয়া তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছিল।

ছয় সাত বছর বয়সে রাধানাথ তাহার পিতার সঙ্গে খামার বাজারের পুকুরে মাছ ধরিতে যাইত। বৃদ্ধ যদুনাথ, তাহার বন্ধু দয়ালকৃষ্ণ ও আর কয়েকজন শিকারী টিকিট লইয়া ঐ পুকুরে নিয়মিত মাছ ধরিতেন। ক্ষুদ্রতম সহরটীতে যদুনাথ যেখানেই যখন মাছ ধরিতে যাইতেন—বালক রাধানাথ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত। পিতা মাছ ধরিতেন—পুত্র অসংখ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ কথা কহিত ও গান গাহিত।

পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ছিল সেই ক্ষুদ্র সহরের বেশ্যা পল্লী। চারিদিকে দরমার দেয়াল ঘেরা খান কতক ঘর। একদিন শিকারীর দল বড়শী লইয়া বসিয়াছেন,—দয়ালকৃষ্ণ রাধানাথকে ঠাট্টা করিয়া কহিলেন—"বাবাজী ঐ তোমার শাশুরীর ঘর। যাও ত এক ছিলিম তামাক নিয়া আইস দেখি।"

ঠিক সেই সময় যদুনাথের বর্শীতে একটা মাছ টোপ খাইয়া গেল। যদুনাথ অকৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় টোপ দিলেন। ইশারা করিয়া দয়ালকে দেখাইলেন,—চারে মাছ আসিয়াছে;—চুপ থাক। যদুনাথ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বর্শীর কাৎনার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এদিকে অন্যের অলক্ষ্যে শ্রীমান্ রাধানাথ সেই নির্দ্দিষ্ট ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া "শাশুরী ও শাশুরী এক কল্কি তামাক সাজিয়া দাও ত"—বলিতেছিল। চাতকিনী—কি একটা গৃহকর্ম্মে ব্যস্তছিল আর গুণ্ গুণ্ স্বরে গাইতেছিল—

"শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ—
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকা'ল।
যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধ'রে কাঁদে,
জননি! দেননী—দেননী বলে।"

—সহসা মধুর আহ্বান শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, বাল গোপালেরই মত এক কৌঁটা সোনার ছেলে দুয়ারে দাঁড়াইয়া বাবার জন্য তামাক চাহিতেছে। অমন ছেলে ত পথে ঘাটে সে কত দেখিয়াছে! হতভাগিনী জানিত তাহার বুকের স্নেহধারা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। কত খাতির প্রণয়ের মিষ্টি বুলি অহরহ তাহার কাণে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সেগুলি তৎক্ষণাৎ অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার কোন চিহ্নই ত নাই। এই হৃদয়ের বালুচরে ত একবিন্দু সরলতাও নাই। কিন্তু আজ এই একটুখানি ছেলেটার ডাক শুনিয়া—তাহার মুখখানি দেখিয়া চাতকিনী নিজকে সামলাইতে পারিল না। তাহার হৃদয় এক মহাপ্লাবনে ভাসাইয়া দিয়া স্নেহ স্রোত বাণ ডাকিল। সে ক্ষুধিতা বাঘিনীর মত লাফাইয়া রাধানাথকে কোলে তুলিয়া লইল এবং শত চুম্বনে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

* * *

কিছুদিন পরে রাধানাথ বসন্তের প্রকোপে শয্যায় পড়িয়া যখন আর্ত্তস্বরে কহিত "শাশুরী আমায় আর একটু আম দাও," তখন সেই পতিতা চক্ষু মুছিয়া কহিত,—বাবা তুমি সারিয়া ওঠো;—আম কিনিয়া দিব।

রাধানাথ উঠিল, তাহার বাবাকে লইয়া কাল বসন্ত মহাযাত্রা করিল।

আটদিন পরে শোনা গেল, সেই সহরের প্রধানা গায়িকা চাতকিনীও বসন্তরোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। লোকে কহিত, আহা এমন গায়িকাটা পরের ছেলের শুশ্রূষা করিয়া প্রাণ দিল।

(২)

রাধানাথ হার্ডিঞ্জ স্কুলে ভর্ত্তি হইল। তাহার দূর সম্পর্কে এক মেসো সহরে মোক্তারী করিতেন। রাধানাথ তাহার গলগ্রহ হইল। মেসোর রুক্ষ শাসন এবং মাসীমাতার তিক্ত ভৎর্সনা নীরবে সহ্য করিয়া রাধানাথ চাকরের প্রায় সকল কাজ করিত। তৎপরিবর্ত্তে দুটী খাবার পাইত।

একদিন নদীর ধারে বেড়াইবার সময় একদল দুষ্ট ছেলে মজা দেখিবার জন্য রাধানাথকে কহিল—'ঐ যে সাহেব যাইতেছেন, তাঁহাকে যদি ছুঁইয়া আসিতে পার তবে তোমার পড়ার সববই আমরা চাঁদা করিয়া কিনিয়া দিব ; তা ছাড়া এক্ষুণি একটাকার সন্দেশ খাওয়াইব।"

দুটাতেই রাধানাথের মস্ত প্রলোভন। সে অকুতোভয়ে ছুটিয়া গিয়া জজ সাহেবের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল।

সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি আমাকে থাবা মারিলে কেন ?

রাধানাথ শুষ্ক মুখে কহিল—"আমি আপনাকে মারি নাই। আমি বড় গরীব, ছেলেদের নিকট তাদের পুরাতন বই চাহিয়াছিলাম। তাহারা বলিল—সাহেবকে ছুইতে পারিলে, আমরা তোমাকে বইত দিবই ; সন্দেশও খাওয়াইব। আমি আর কখনো সন্দেশ খাই নাই !"

সাহেব পকেট হইতে নোটবুক্ খুলিয়া রাধানাথের নাম ঠিকানা, সব লিখিয়া লইলেন। তারপর একটী টাকা দিয়া বলিলেন,—যাও. তোমরা সন্দেশ খাওগে।

*　　　*　　　*

পরদিন স্কুলে যখন জজ সাহেবের চাপরাসী গিয়া রাধানাথকে ডাকিয়া আনিল, তখন শিক্ষক মহাশয়গণের পদতলে ধরণী যেন ঘুরিতেছিল। রাধানাথের অন্নদাতা মোক্তার মহাশয় সাহেবের তলপ পাইয়া কম্পিত কলেবরে তথায় হাজির হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন —রাধানাথ না জানি কি ভীষণ কাণ্ডই করিয়াছে !

*　　　*　　　*

ফলে রাধানাথ বিদ্যালয়ে ফ্রি পাইল এবং সাহেবের নিকট হইতে দশ টাকা করিয়া মাসিক সাহায্য পাইতে লাগিল।

(৩)

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাধানাথ তাহার বাল্যবন্ধু রামকুমারের সঙ্গে ঢাকায় পড়িতে গেল। সূতার নগরের রাখাল রাজের আখড়ায়—কয়েকটী গরীব ছাত্র থাকিত। তাহারা মাসিক ৬৲ ছয় টাকা দিয়া খাবার এবং অর্দ্ধ অন্ধকার কোঠায় একখানা বিছানার ঠাঁই পাইত।

ঢাকায় আসিয়া রাধানাথ রাধু মামা নামে পরিচিত হইয়া উঠিল। রামকুমার—তাহাকে রাধু মামা ডাকিত, তাহার ভাগিনেয় অশ্বিনী ও রাধু মামা ডাকিতে ইতস্ততঃ করিল না। শেষটা ঠাকুর চাকর পর্য্যন্ত "রাধু মামা" করিয়া লইল। এইরূপে আধা সরকারী মামা হইয়াও রাধানাথ ক্ষেপা বনিল না। সে প্রসন্ন মুখে তাহার সকল ভাগিনেয়ের সহিতই সদ্ব্যবহার করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল।

ঢাকার জনতা, গাড়ী ঘোড়ার তাড়াহুড়া রাধানাথ ভারি অনাবশ্যক মনে করিত। তাহার বিশ্বাস ছিল— এখানেও ধূলা, দুর্গন্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার বেবন্দোবস্ত আছে। বরং দুই চারিটা দালান বেশী হইতে পারে। কিন্তু এত সব হেঙ্গামের অনাবশ্যকতায় রাধানাথ ঢাকার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া গেল এবং নিজবাসার গণ্ডীকেই সে প্রাণপণ যত্নে আঁকড়াইয়া থাকিল।

একদিন রাধানাথ বেড়াইতে গিয়া বুড়ী গঙ্গা দর্শন করিল এবং ভক্তিভরে প্রণাম জানাইয়া সগর্ব্বে কহিল— "রামকুমার, এইত বৃদ্ধা গঙ্গা বা বুড়ী গঙ্গা। ইনিইত আদি। কলিকাতার গঙ্গাত সে দিনের। শাস্ত্রেই আছে—

গাঙ্গং বারি মনোহারী—কি জল ! বাঃ !

ইহার পর রাধানাথ প্রত্যহ বুড়ী গঙ্গায় স্নান করিত এবং প্রায়ই ছাত্রগণকেও টানিয়া লইয়া যাইত।

সকলের মাতুল সম্বোধনের ফলে রাধানাথ পাড় দেওয়া ধুতি ছাড়িয়া থানের ধুতি পরিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং রামকুমার স্বচ্ছন্দে মাতুলের ত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশরূপে পাড়ের কাপড়গুলি পরিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া রাধানাথ প্রীত মনে কহিত—বটেই ত, পাড়ের ধুতি ওদেরেই মানায় ভাল।

এদিকে জগৎ নন্দী মামার থানের ধুতি হইতে ২ হাত কাটিয়া লইয়া বালিশের খোল প্রস্তুত করিল। অশ্বিনী কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল কি মামা তোমার কাপড় যে মোটে ৮ হাত? রাধানাথ অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে কহিল আমি ৮ হাত কাপড়ই পছন্দ করি। অনর্থক দু হাত কাপড়ের বোঝা বহন আহাম্মকী মাত্র। বলা বাহুল্য পরদিন তাহার কাপড়গুলি সবই ৮ হাতে পরিণত হইয়া গেল। রাধানাথ ভ্রূক্ষেপও করিল না।

রাধানাথের মণিব্যাগে ৮||৶ আনা ছিল। বিশেষ প্রয়োজনে রামকুমার ঐ তহবিল হইতে ১৲ একটী টাকা লইয়া গেল। অভ্যাস মত রাধানাথ প্রাতঃকালে হিসাব মিলাইয়া দেখিল ৭||৶০ আছে। অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করিল, মামা তোমার তহবিলে কত আছে?

রাধু কহিল—সাত টাকা দশ আনা।

রামকুমার সেই দিন অপরাহ্নেই মামার তহবিল পূর্ণ করিয়া রাখিল। পরদিন অশ্বিনীর প্রশ্নের উত্তরে মামা কহিলেন—আমার তহবিলে ৮||৶০ আছে।

অশ্বিনী বলিল—তবে না কাল ৭||৶ বলিয়াছিলে? মামার গণনায় বড় ভুল হয়।

রাধু সহজ স্বরে কহিল—ইস্—অঙ্কে আমার আবার ভুল। আমরা বাপু ধানদিয়া লেখা পড়া শিখি নাই। পি, ঘোষ মম শুভঙ্করী শেষ করিয়া তবে পরীক্ষা পাশ করিয়াছি। আমি অঙ্কে ভুল করি না।

(৪)

গোপাল বাবু রাধানাথের ব্রাস্ করা বিলাতী জুতা পরিয়া, সেইস্থানে তাঁহার ছেঁড়া চটী রাখিয়া দিলেন। এবং খুব তাড়ায় কণ্ঠে কহিলেন,—'মামা, শীগ্‌গীর চল —আজ ভারী একটা সভা আছে।'

সভার নামে রাধানাথের হুস থাকিত না। সে দ্রুত সাজ পোষাক লইয়া গোপাল বাবুর ছেঁড়া চটী পায়ে দিয়া বাহির হইল। পথে জগৎনন্দী কহিল—কি মামা আজ চটী যে—

বিলাতী জুতা একে শক্ত,—তায় পরা বড় হেঙ্গাম। আবার তাল ঠেকে না। চটী বেশ!

তোমার জুতো কোথায়?

বাসায়।

গোপাল বাবু দিব্যি মস্ মস্ করিয়া চলিয়াছেন। রামকুমার কহিল—গোপালদার জুতা জোড়াটা বেশ।

সম্মানের সুরে রাধানাথ কহিল—হাজার হোক বাবা—ওরা বনিয়াদি ঘরের ছেলে।

পথে রামকুমার দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—'মামা ঐ যে লোকটী দেখ, উনি আমাদের নিজ জিলার লোক। শৈলেন বাবু। এখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল।

রাধানাথ—স্বচ্ছন্দে শৈলেন্দ্র বাবুর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। শৈলেন বাবু তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল— আমি আপনারই এক জিলার লোক। আমায় চিনেন না? আমি রাধানাথ।

উদার হৃদয় শৈলেন্দ্র বাবু রাধানাথের হাত ধরিয়া কহিলেন—"বাপু, এযুগে তোমার মত মানুষ আরো আছে? যেয়ো একদিন আমার বাসায়।

কৃতার্থ হইয়া রাধানাথ নিজদলে গিয়া মিশিল। গোপাল বাবু কহিলেন—কি মামা কি কথা হলো!

"অনেক কথা। শ্রীকণ্ঠ বাবু বেশ লোক।"

"শ্রীকণ্ঠ নয় মামা—শৈলেন্দ্র।"

"হাঁ হাঁ বাপু আমি বেশ জানি—উনি আমার দেশের লোক। আমিতো শৈলেন্দ্রই বলিয়াছি।"

(৫)

আখড়ায় প্রকাশ্য ভাবে মাছ মাংসের প্রবেশ নিষেধ ছিল। মাছ মাংস খাইতে না পারিয়া রাধানাথের বড়ই বিরক্তি বোধ হইতেছিল।

একদিন সে রামকুমারকে কহিল—চল্‌না, একদিন হোটেলে খাইয়া আসি। সেখানে মাছ মাংস বেশ পাওয়া যায়।

"বেশ ত মামা, চল না।"

বুড়ী গঙ্গায় যাইবার পথের ধারে, একটা বড় মেস ছিল। তাহাতে প্রায় ত্রিশজন ছাত্র বাস করিত। রাধানাথ নির্ঘাত জানিত এটা একটা বড় হোটেল। কারণ প্রায়ই সে ঐ মেসের চাকরকে প্রচুর উৎকৃষ্ট মাছ সহ মেসে ঢুকিতে দেখিত এবং স্নানের সময় মেসের দরজার পাশে মাছের আঁইস দেখিয়া তাহার রসনা আর্দ্র

হইত। মনের আকাঙ্ক্ষা চাপিয়া আর কত রাখা যায়; রাধানাথ সেদিন কহিল—রামকুমার চল্না কালই হোটেলে খাইয়া আসি।

বেশ ত মামা, চল।

সেদিন রবিবার। রাধু ঐ মেসের দিকে খুব নজর রাখিল। দেখিল একটী বাবু একজন ঝাঁকা মুটেসহ মেসে প্রবেশ করিল। চাকরটার হাতে একরাশি গলদা চিংড়ি, গণ্ডা দুই ইলিশ, আর চারিটা রোহিতের মুণ্ড।

রাধানাথ একটু তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া আসিল। পথে রামকুমার কহিল—মামা, আজ ত রবিবার। সারা বছর নিরামিষ খাই,—আজ মাছ খাওয়াটা আমার যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছে।

'আচ্ছা তবে তুমি আর একদিন খাইও।' বলিয়া রাধানাথ রামকুমারের স্কন্ধে ভিজা কাপড়খানি চাপাইয়া দিয়া কহিল—আমি একেবারে পেট ঠাণ্ডা করিয়া আসি। তারপর রাধানাথ মেসে ঢুকিয়া সটান বারান্দায় উঠিল এবং একখানা ভাল পিঁড়িতে বসিয়া থালা ধুইয়া অনুজ্জার কণ্ঠে ডাকিল—ঠাকুর, ভাত লইয়া আইস!" আমি কিন্তু ভাল খাই না, পুর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি।

তখনো মেসের ছেলেদের খাইবার ঘণ্টা পড়ে নাই। মেসের ম্যানেজার অনাদি বাবু কলতলা হইতে মাথা মুছিতে মুছিতে সামনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কার গেষ্ট মহাশয়? রাধানাথ ঘাড় বাঁকাইয়া অনাদি বাবুর মুখের উপর বিরক্তি পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল, কোন উত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে করিল না।"

অনাদি বাবু পুনরায় সেই প্রশ্ন করিলেন। রাধানাথ একটু উষ্মার সুরে কহিল—"নগদ পয়সা ফেলিয়া দিব; হোটেলে খাইতে আবার গেষ্ট্ ফেষ্ট্ কি?"

বিপিন বাবু তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে রুখিয়া আসিলেন,—কোথাকার লোকরে, ডাক্ত পুলিশ।

রাধানাথ জোর গলায় ডাকিল। ঠাকুর ভাত দিয়া যাও। হোটেলে খাইতে আবার কুষ্টি ঠিকুজী কিসের! রাধানাথ বামহস্ত প্রসারিত করিয়া একটী ঝক্ ঝকে সিকি দেখাইল।

সদর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রামকুমার রঙ্গ দেখিতেছিল। সে অনাদি বাবুকে হাত ছানি দিয়া ডাকিল। অনাদি বাবু আসিলে রামকুমার রাধানাথের সকল কথা সংক্ষেপে তাহাকে জানাইয়া কহিল—"তা হলে এখন ওকে ডেকে নিয়ে যাই।"

অনাদি বাবু জিভ কাটিয়া কহিলেন, "ছি ছি ছি! তা কি হয়?"

মেসে একটা টিপাটিপি হাসির স্রোত চলিল। ততক্ষণ রাধানাথ গম্ভীর ভাবে বসিয়া মাছের ঝোল ইত্যাদির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিল।

* * *

পেটে হাত বুলাইয়া উদ্গার তুলিতে তুলিতে রাধানাথ আখড়ায় প্রবেশ করিয়া কহিল—"যা বল বাপু, একে বলে খাওয়া, আর একেই বলে ভদ্রতা! বেশ হোটেল কিন্তু! আচ্ছা রামকুমার, ওরা পয়সা নিলেনা কেন? ভারী অন্যায় কিন্তু!

জগৎ কহিল—"মামা একদিন ওদেরে একটা ভোজ দাও, তবেই সব ঠিক হইবে।"

পরের রবিবারে জগৎ রাধানাথকে লইয়া দোকানে গেল এবং তাহাকে সেখানে বাঁধা রাখিয়াই ফর্দ্দমত ভোজের জিনিসাদি লইয়া আসিল। রাধানাথ বেলা বারটা পর্য্যন্ত দোকানে বসিয়া রহিল।

(৬)

দোলের হোলি লাগিয়াছে। আখড়ায়, অনাদি বাবুদের মেসে ধুম পর্ব্ব। সেদিন রাধানাথ আসিয়া দেখিল, অনাদি বাবু মুখ ভার করিয়া বসিয়াছেন। রাধানাথ জিজ্ঞাসা করিল, কি অনাদি বাবু, আপনাদের ত আজ আমোদ আহ্লাদ দেখিনা। এতবড় আমোদটা—

একটা বিশাল দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ম্লান মুখে অনাদি বাবু কহিলেন, 'মামা, সব মাটী! হোলির ধুমটা বেহালে গেল। রাজা ছাড়া কি হোলি হয়? রাজা পাই কাহাকে? অরাজক ভাবে হোলি হয় কি?

বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ না করিয়া রাধানাথ কহিল—সে জন্য ভাবিবেন না। রাজা সাজিব আমি নিজে। ভারী মজা হইবে। এবং যে টাকাটা পাওয়া যাইবে তাহাতে বেশ দুটা ভোজ হইবে।

বিনয় বাবু কহিলেন, মামা দেখো পরে কিন্তু বলিও না,—যে আমার লজ্জা করে। আগেই বলিয়া রাখি—।

রাধানাথ জিভ কাটিয়া কহিল—সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়? কথার নড়চড় কি বদুদত্তের ছেলের হয়? হতেই পারে না।

* * *

সেদিন ডাকে রাধানাথ দত্তের নামে ডাক পিয়ন এক রেজেষ্টরী করা লেপাফা দিয়া গেল। রামকুমার সলম্ফে মামার হাত হইতে লেপাফা কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিল। প্রথমে মনে মনে পাঠ করিয়া এক আনন্দ চীৎকার তুলিল,—মামা, মামা, তোমার পা'র ধূলা দাও দিকিন। আর রোখ একশটা টাকা চাই,—আমাদের আমোদ করবার জন্যে।

সকলে উৎকর্ণ হইয়া বিস্মিত নেত্রে রামকুমারের কথা শুনিতে লাগিল।

রামকুমার চিঠি পড়িতে লাগিল।

"মান্যবরেষু,—

মহাশয়, আমার মক্কেল পরলোকগতা চাতকিনী বাইজী—যাহাকে আপনি ছেলে বেলায় শাশুরী ডাকিতেন। তাহার স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ দশহাজার টাকা আপনার নামে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছে। ঐ অলঙ্কার ধনপৎ সিংহের কুঠীতে এবং টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। উইলের সর্ত্ত অনুসারে আপনি অদ্যকার তারিখ হইতে ঐ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। আপনি আসিয়া আপনার সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। নিবেদন ইতি—

বশংবদ—

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চৌধুরী উকীল।

রাধানাথ ভগ্ন কণ্ঠে কহিল—হায় হতভাগিনী, ধন প্রাণ আমারি লাগি দিলি!

রামকুমার কহিল—'মামা, তোমার এই সম্পদ প্রাপ্তির সংবাদটা কাক পক্ষীও যেন এখন না জানে।

(৭)

রাধানাথের মা চিঠি লিখিয়াছেন—ছেলের বিবাহ ঠিক হইয়াছে। শুনিয়া মেসের ছেলেরা বাঁকিয়া বসিল—বাঃ, আমরা মেয়ে দেখিলাম না, কিসের বিবাহ! এ বিবাহ হইবে না।

রাধানাথ কহিল—সর্ব্বনাশ, সে কি হয়? মা নিজে সব কথা বলিয়াছেন, তাঁর উপর কি কথা বলা চলে?

জগৎ বলিল—যা বেটা, তোর মা কোন সত্যি যুগের বুড়ী। মেয়ে দেখ্‌ব আমরা।

রাধানাথ কহিল—তা দেখিও। কিন্তু; আমার মা—বাপুহে—তাঁর কি ভুল তোমরা ধরিতে পারিবে?

অনাদি বাবু বলিলেন,—আচ্ছা দাঁড়াও তোমার শ্বশুরকে—পরিবারসহ ঢাকায় টেনে আনব—মেয়ে দেখ্‌ব—তার পর ছাড়্‌ব—।

* * *

সুসজ্জিত কোঠায় পালঙ্কের উপর রাধানাথকে বসাইয়া রামকুমার সদলে বাহিরের বড় হলে গিয়া বসিল। জগৎ নন্দী মামার কাণে কি একটা উপদেশও দিয়া গিয়াছিল। অনাদি বাবু দরজার পাশে পরদার আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর সকলে বৈঠক খানা উজাড় করিয়া উচ্চ হাসি ও গল্পের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল।

অন্দরের দিকে পর্দ্দা ঠেলিয়া—এক সালঙ্কারা যুবতী রাধানাথের কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে এক কৃষ্ণকায়া তরুণী।

রাধানাথ ধ রে ধীরে পালঙ্ক হইতে নামিয়া অগ্রবর্ত্তিনী যুবতীর পায়ের গোড়ায় মাথা নোয়াইল। স্ত্রীলোকটী খিল খিল করিয়া হাসিয়া সরিয়া পড়িল। রাধানাথ পর্দ্দা ঠেলিয়া সবেগে বাহির হইয়া আসিল।

অনাদি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মামা, কেমন দেখিলে?

"বেশ ত! আরে বাপু! আমার মা নিজে দেখিয়াছেন! সে কি ভুল হইতে পারে? আর হবেনা কেন? যেমন মা, তেমন ঝি।" এই বলিয়া রাধানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তখন সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রাধানাথ জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা হাসিলে কেন?

অশ্বিনী কহিল—মামা, তুমি যাহাকে প্রণাম করিয়াছ, সে যে রমেশ বাবুর বাসার ঝি? সঙ্গের মেয়েটী দেখ নাই?—

রাধানাথ অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিল।—বাপু হে, সব বুঝি। যাহাকে প্রণাম করিয়াছি—সে হাজার হোক কায়েতের ঘরের মেয়ে ত? বয়সে আমার অনেক বড়। বয়সের সম্মান করিতে হয়।

"সঙ্গের মেয়েটী কেমন দেখ্‌লে মামা"—

বিরাট বিস্ময়ে রাধানাথ কহিল—"সঙ্গের মেয়ে? কই—হাঁ বেশ মেয়েটী!

* * *

বিবাহ বাসরে অনিন্দ্যসুন্দরী ফুলবালার সঙ্গে রাধানাথের সম্মিলন দেখিয়া মেসের ছাত্রেরা কাণে কাণে কহিল—"হাঁ মামা, তোমার মার পছন্দ আছে বটে!

(৮)

"মামা মামা তুমি ত ওকালতি পাশ করিয়াছ—গেজেট আসিয়াছে।" গোপাল বাবু উর্দ্ধশ্বাসে সংবাদটা জানাইলেন।

রাধানাথ সহজভাবে উত্তর করিল। পড়া বইএর প্রশ্ন বাবা—উত্তর লিখিতে ভুল হবে কেন? সুতরাং পাশ করা শক্ত কিছু নয়।

* * *

আজ সহরে রাধানাথ দত্তই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উকীল। রামকুমার মামারই সঙ্গে আছে। স্থানীয় হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করে। রাধানাথ বলে—মামা, তুমি আমার বল বুদ্ধি সব। তুমি ছাড়িয়া গেলে আমার মূল্য এক কাণা কড়িও নয়।

রামকুমার একদিন কহিল—মামা, জগৎ নন্দীটা বয়ে গেল। তাকে এখানে আনিয়া একটা মুহুরীগিরি টিরি দিলে বেচারা কিন্তু রক্ষা পাইত।

রাধানাথ তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখিল—

প্রিয় জগৎ বাবু,

আপনি অতি সত্বর এখানে আসিবেন। আমার একজন মুহুরী দরকার। রামকুমার বলিয়াছে। আপনি আসিতে দ্বিধা করিবেন না। এ গৃহ আপনার নিজ গৃহ বলিয়া মনে করিবেন। আপনার পাথের মনি অর্ডার করিয়া পাঠান হইল। ইতি—

আপনার
সেই মামা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

"ভাঙ্গা ও গড়া।"

(অগ্রহায়ণের প্রবাসীর "ভাঙার গান" কবিতা পাঠে লিখিত।)

ভাঙ্গাটাত সহজ দাদা, গড়াই বিষম ল্যাঠা;
ভাঙ্গার আগে ভালো করে তলিয়ে দেখো সেটা।
পুরাণো যা, ভাঙ্‌তে যদি হ'য়ে থাকে সাধ,
তাহলে কেবল চল্‌বেনাকো গঠন দিয়ে বাদ।
পুরান্ ভিত্তি, পুরান্ চাল, ভাঙ্গাচুড়া ছাউনি,
ভেঙ্গেফেলে দেখ্‌তে হবে নূতন কিছু পাওনি।
নইলে বল মাথা রাখবার স্থানটা কোথায় পাবে—
ঝঞ্জা, বৃষ্টি শীতাতপে প্রাণটা যখন যাবে?
(যদি) নূতন জামার অভাবেতে শীতে মরে যাই,
পুরাণোটা তালি দিলে ক্ষতির কারণ নাই।
মরার চাইতে বাঁচাটাই আগে দেখ্‌তে হ'বে,
রাগকরে তাই মরে গেলে—বোকাই লোকে ক'বে।
নদীর মতো ভাঙ্গা যদি হয়কো তোমার নীতি,
তারি কাছে শিখ্‌তে হবে নূতন গড়ার রীতি।
একূল ভেঙ্গে সেতো দেখ্‌ছি গড়্‌ছে আর্ এক কূল,
ধ্বংস নিয়েই নদী ছোটে—এটা মস্ত ভুল।
পুরাতনের ভিট্ না হ'লে নূতন কোথায় টিকে।
ভাঙ্গন নিয়েই পাগল তুমি, বিমুখ গড়ার দিকে
ধ্বংস তুমি বলছ যাকে—এটাই হচ্ছে গড়ন,
(যেমন) মরণে লুকিয়ে আছে নূতনতর বাঁচন।
নূতন কিছু গড়তে যদি থাকে তোমার মনে,
পুরাতনের বীজটী তবে রাখিও যতনে।
এইতো হলো গড়ার নীতি—ধ্বংস নীতি নয়।
এম্‌নি করে যুগে যুগে নূতন সৃষ্টি হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বিবিধ সংগ্রহ।

মৎস্য তাজা রাখা।

বর্ত্তমানে রেল জাহাজের সুবিধা হওয়াতে বড় ২ সহর বন্দরে বহু দূরদেশ হইতে মৎস্য আমদানী হইয়া থাকে। এ যাবৎ বরফের সাহায্যেই এই আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে একরূপ ঔষধ আবিষ্কার হইয়াছে যাহা দ্বারা বরফের সাহায্য ব্যতীত মৎস্য অন্যূন ৫ দিন টাটকা রাখা যায়। ইহার ফলে মৎস্য ব্যবসায়ে এক তুমুল পরিবর্ত্তন হইবে। যে সব স্থানে মৎস্যের নিতান্ত অভাব সে সব স্থানের লোক মৎস্য পাইতে পারিবে, এবং যে সকল মৎস্য ভোক্তার অভাবে পচিয়া যাইত তাহা আর হইতে পারিবে না।

মামী।

প্রাচীন মিসরদেশে মৃতদেহ রক্ষার জন্য যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া করা হইত তাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ আজ পর্য্যন্তও বাহির করিতে পারেন নাই। মিসরেও সকল বৈজ্ঞানিক ইহা সম্যকরূপে জানতেন কিনা সন্দেহ, কারণ অধ্যাপক নিউয়েল (H. Newell) বলেন তথায় এক রাজকুমারীর একটী "মামী" (Mummy) এরূপ পাওয়া গিয়াছে যে তাহা মুষ্টিমেয় ধূলিরাশি ভিন্ন আর কিছুই নহে, অথচ সহস্রাধিক বৎসরের "মামী"ও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। বর্ত্তমানে মিঃ ফ্রেন্সিস্ (Mr. Francis) নামক এক ভদ্রলোক এই মামী প্রস্তুত করিবার একরূপ তরল পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার প্রধান উপাদান পিয়াজ জাতীয় একরূপ মূল হইতে উৎপন্ন তৈল। এই পদার্থে মানবের মস্তিষ্ক ভিজাইয়া দেখা গিয়াছে যে উহা কাষ্ঠের মত শক্ত হইয়া যায়। উহা পুনরায় জলে ভিজাইলে মগজটী কোমল হইয়া স্বাভাবিক আকার ধারণ করে।

এই পদার্থে ভেক ও মৎস্য ভিজাইয়া এক বৎসর অবিকৃত অবস্থায় রাখা গিয়াছে। হয়ত সময়ে ইহাদ্বারা মৎস্য ব্যবসায়ে এক তুমুল পরিবর্ত্তন ঘটিবে। পিয়াজ জাতীয় মূল হইতে যে তৈল গ্রহণ করা হয় উহা বিষাক্ত নহে। বরং উহা ঔষধের ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই তরল পদার্থে ডিম্ব ভিজাইয়া ৬ মাস পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখা গিয়াছে। মৃত্যুর ১২ দিন পরে একটী মৃতদেহ ইহাতে ভিজাইয়া আজ পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখা হইয়াছে। হস্তলিখিত পুস্তকাদি উহাতে ভিজাইয়া বহুকাল অবিকৃত রাখা যাইতে আশা করা যায়।

উপবাস।

অল্প দিন হয় কর্কের মেয়র ৭৬ দিন অনাহারের পরে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। সাধু হরিদাস ৪০ দিন মাটীর নীচে থাকিয়াও জীবিত ছিলেন। কিন্তু এ সকল উদাহরণ অতি বিরল। সর্প এবং ভেকই নাকি বাতাহারে বহুদিন জীবিত থাকিতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিলাতে সারে (Surrey) প্রদেশের রেড হিলে (Red hill) একটী স্কুল গৃহ ১৫ বৎসর পরে ভাঙ্গিবার সময়ে দেখা গেল একটী ভেক এই দীর্ঘকাল দেয়ালের মধ্যে প্রোথিত থাকিয়াও জীবিত আছে। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক বাক্‌লেণ্ড (Buckland) প্রস্তরের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া নির্ব্বাত অবস্থায় ভেক বন্ধ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ অবস্থায় উহারা এক বৎসরের কিছু অধিক কাল বাঁচিতে পারে। তাঁহার বিশ্বাস একেবারে নির্ব্বাত অবস্থায় রাখিয়া পরীক্ষা করা কখন সম্ভব হয় নাই। আমাদের দেশে ইহা প্রচলিত যে শীতের সময়ে সর্প এবং ভেক দীর্ঘকাল বাতাহারে থাকিতে পারে।

দিক্‌নির্ণয়।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে দিবাভাগে সূর্য্য এবং রাত্রিতে ধ্রুবতারা প্রভৃতি দ্বারা দিক্‌নির্ণয় করিতে হইত। কম্পাস আবিষ্কারের পরে কম্পাস দ্বারাই উক্ত কার্য্য সাধিত হয়। কম্পাস সর্ব্বদা সঙ্গে থাকা সম্ভব নয় কিন্তু ঘড়ি অনেক সময়েই অনেকের সঙ্গে থাকে। দিবাভাগে সূর্য্যালোকে এই ঘড়ির দ্বারাও দিক্ নির্ণয় করা যায়। সূর্য্যালোকে একটী ঘড়িকে চিৎ করিয়া রাখিয়া উহার এক পার্শ্বে একটী শলা এরূপ ভাবে ধরিতে হইবে যেন ঐ শলাটীর ছায়া ঘড়ির ডায়েলের উপরে পড়ে। তখন আমাদিগকে ঘড়টী ঘুরাইয়া এরূপভাবে ধরিতে হইবে যেন ঐ শলার ছায়া ঘড়ির ঘণ্টার কাটার ঠিক উপরে পড়ে। এরূপ অবস্থায় ঐ শলার ছায়া এবং ঘড়ির ১২টার অঙ্কের ঠিক মাঝ মাঝি কোণটী দক্ষিণ দিক হইবে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, DACCA

নবম বর্ষ। ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩২৭। চতুর্থ সংখ্যা।

আধুনিক শিক্ষায় হিন্দু দর্শন।

বিগত ১৯১৮ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উপাধি-পত্র-বিতরণ সভায় (Convocation) লর্ড রনেল্ডসে রেক্টর স্বরূপে বক্তৃতাচ্ছলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের অধ্যয়ন সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সকল শিক্ষিত ভারত-বাসীর প্রণিধান যোগ্য। উক্ত মাননীয় বক্তার মতে ভারতীয় বিশ্বভারতীর বিদ্যামন্দিরে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনার যে সুব্যবস্থা নাই ইহা একটা অত্যদ্ভুত অসঙ্গতি। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত অভিমত অনুমোদন করি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোন শক্তিমান হিন্দু লেখক ("জনৈক এম এ উপাধি-ধারী হিন্দু" এই ছদ্মনামে) ১৯১৮ সনের এপ্রিল সংখ্যক "Modern Review" পত্রে উপর্য্যুক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার লেখার তাৎপর্য্য এই যে, বি এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিক্ষার্থীদিগকে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত করিলে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে—তাহাতে ভারতবাসীর স্বাভাবিক পারলৌকিক মুক্তিপ্রবণতা, ঐহিক সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি তীব্র ঔদাসীন্য, তাহাদের প্রকৃতিগত অদৃষ্টবাদ এবং শাস্ত্রীয় ও সামাজিক শাসনাতিশয্যের ঐকান্তিক বশ্যতার ভাব চিরন্তন করিয়া রাখিবে, এবং সেই জন্য ভারতবাসী আধুনিক নাগরিকতা ও বিশ্বমানবরূপী নারায়ণ সেবার যোগ্যতা লাভে চিরকাল অশক্ত থাকিবে। আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বোক্ত লেখক হিন্দু দর্শন অধ্যয়নের পরিণাম সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করিয়াছেন তাহার মূলে, দর্শন শাস্ত্র আলোচনার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও ফল কি, এবং বর্ত্তমান ভারতের মানসিক দাসত্বের প্রকৃত হেতু কি, তদ্বিষয়ে একটা বিষম ভ্রান্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ, বিশাল জ্ঞান-রাজ্যের যত বিভিন্ন বিভাগে মানবীয় শক্তি আত্ম প্রকাশ করিয়াছে তন্মধ্যে দর্শন বিভাগের ন্যায় আর কোথাও মানুষের বিচার-শক্তি (Reason) এমন একাধিপত্য লাভ করে নাই। যুক্তিই সকল দার্শনিকের এক মাত্র পথ-প্রদর্শক, আর হিন্দু দর্শনে এই সাধারণ নিয়মের কোথাও ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। হিন্দু দর্শনকারগণ বেদের প্রামাণ্য ও অভ্রান্ততা স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ, বৈদান্তিক ও মীমাংসকগণ ছাড়া অন্যান্য দার্শনিকেরা শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিমূলক বিশ্লেষণী শক্তির বলে স্ব স্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অধুনিক পরীক্ষা-মূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও মানব দেহের উপর চিত্তবৃত্তির (mind) ক্রিয়া কি উপায়ে সম্পন্ন হয় এই জটিল সমস্যা পূরণ করিতে পারে নাই, শুধু মানবমনের প্রবুদ্ধ অবস্থার বাহিরে আর একটা অপ্রবুদ্ধ বা মগ্নচৈতন্যের অবস্থা থাকার সম্ভাবনীয়তা মাত্র অনুমান করিতে পারিয়াছে। কিন্তু বহুশতাব্দী পূর্ব্বে মহর্ষি কপিল মানবদেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং এই সকলের যোগসূত্র কি, তদ্বিষয়ে এমন গভীর অভ্রান্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কারণ, কপিলদেবের যোগসূত্র গুলিতে উক্ত জ্ঞানকেই মানুষের জীবনে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কি প্রণালী অবলম্বন করিলে মানুষ ভগবদ্ভক্তি কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকেও শুধু দৈহিক যন্ত্র সমূহকে নিয়মিত এবং চিত্তবৃত্তিকে আয়ত্ত করিয়া

অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার, নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যকার মনস্তত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা চিরকাল সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। ঐ দিকে আবার অভ্রান্ত বেদবাদী মীমাংসকগণ এবং বৈদান্তিকগণ নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধিকে বেদবাক্যদ্বারা কখনও পঙ্গু করিয়া ফেলেন নাই—পক্ষান্তরে যখনই বেদের অংশ বিশেষ বিচার-বুদ্ধির বিরুদ্ধ হইয়াছে তখনই তাঁহারা সেই সেই অংশকে 'অর্থবাদ' অনর্থক, কিম্বা 'পুষ্পিত বাক্যাড়ম্বর' প্রভৃতি উপেক্ষা বাক্যে বিশেষিত করিয়া অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বৈদান্তিকদের মধ্যে ও আবার বেদান্ত বাক্যের ব্যাখ্যা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ কি মতের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতায়, কি চিন্তার অবাধ-নির্মুক্ত স্বাধীনতায়, কি বিচার-বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, কি সত্য-সন্ধানের জন্য অদম্য ব্যগ্রতায়, কি তত্ত্বের গভীরতায় কোন বিষয়েই হিন্দুদর্শনের সঙ্গে অপরাপর সভ্যদেশীয় সমগ্র দার্শনিক বিদ্যার তুলনা হয় না। অতুলনীয়া প্রতিভা ও সর্ব্বানুসন্ধায়িনী মনীষা বলে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বদর্শী ঋষিগণের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর অদ্বৈতবেদান্তের যে অভ্রস্পর্শী অবিনাশী কীর্ত্তি-স্তম্ভ গড়িয়াছেন তাহা মানবের ধীশক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন। এবং মানব-মনের অন্তস্তলে এক অদ্বিতীয় সর্ব্বসমন্বয়কারী পরম তত্ত্বের জন্য যে এক অনির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষা নিহিত রহিয়াছে তাহা যতই জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে ততই শাঙ্কর দর্শনের মহার্ঘতা সভ্যজগৎ উপলব্ধি করিতে পারিবে।

আজ হিন্দুসমাজকে অদৃষ্টবাদের সংক্রামক ব্যাধি কবলিত করিয়াছে, হিন্দুসমাজে চিন্তার মৌলিকতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, আজ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল হিন্দুই রীতিনীতি ও শাস্ত্র-সমাজের শাসন নির্ব্বিচারে মানিয়া লয়, এবং হিন্দুর ধর্ম্ম বিকৃত ও আচার-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে—ইহা সত্য। কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থার মূলকারণ হিন্দুদর্শন নহে, কিন্তু উক্ত দর্শনালোচনার অভাব এবং বহুকালব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নৈতিক ও মানসিক দাসত্ব। আজ আর ভারতীয় দার্শনিকগণের শিষ্যগণ দ্বারা এদেশে দার্শনিক বিদ্যা অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে না ইহার কারণ ইহা নয় যে ভারতীয় দর্শন চিন্তাশক্তিকে খর্ব্ব করিয়া দেয়, কিন্তু উপর্য্যুক্ত ঐতিহাসিক প্রতিকূল কারণ-পরম্পরার সমবায়ে এবং আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির গুণে আমাদের সমুদায় অন্তর প্রকৃতি অচ্ছেদ্য লৌহ শৃঙ্খলের বন্ধনে মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া গিয়াছে। আসল কথা, ভারতীয় দর্শনালোচনা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শনের যে প্রণালীতে অধ্যয়ন- অধ্যাপনা হইয়া থাকে তাহাকে দর্শনালোচনার হাস্যকর অভিনয় ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। মেক্সমূলর, থিবো প্রভৃতির প্রণীত হিন্দুদর্শনের কঙ্কালসার, সংক্ষিপ্ত ইংরাজী সংস্করণের সাহায্যে বিপুলকায় মূল ভারতীয় দর্শনের চিন্তা-প্রণালী, বহু-বিচিত্র সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন দর্শনের পরস্পরের সাম্য বৈষম্য ও অভিব্যক্তির ধারা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে সম্যক্‌রূপে ব্যুৎপন্ন করিতে যাওয়া, আর গোষ্পদ সাহায্যে অনন্ত বারিধির উপলব্ধি করা একই কথা। অপর দিকে, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ-শিখার ন্যায় যে মুষ্টিমেয় চতুষ্পাঠী এখনও অতীত শিক্ষা পদ্ধতির শেষ নিদর্শন স্বরূপ বিদ্যমান আছে তার শিক্ষণীয় বিষয় ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতিশাস্ত্র, এবং উর্দ্ধপক্ষে ন্যায় দর্শনে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে—ভারতবর্ষের যাহা বিশিষ্ট গৌরবস্থল, অর্থাৎ সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শন, তার নাম গন্ধ মাত্র তথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত সর্ব্ব-সঞ্জীবন প্রেম-ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও তদানুষঙ্গিক সাহিত্যিক অভ্যুত্থান, নব্য ন্যায় দর্শনের উদ্ভব এবং নব্যভারতের শঙ্করাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের আধুনিক জ্ঞানালোকিত বেদান্ত দর্শনের অভিনব ব্যাখ্যান—এই সকল দ্বারা ইহাইকি সপ্রমাণ হয়না যে, ভারতবর্ষের আত্মা, তাহার মর্ম্মগত আধ্যাত্মিকতা ও উন্মাদনী শক্তি বহুশতাব্দীব্যাপী প্রতিকূলতার নিষ্পেষণেও সমূলে বিনষ্ট হয় নাই, পক্ষান্তরে তাহা এখন এই প্রাচীন জাতির অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশে বীজাকারে সুপ্ত রহিয়াছে, এবং যখনই আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ

উপস্থিত হইবে তখন সুবিশাল পাদপরূপে পল্লবিত হইবে? বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ ও কাব্যাবলীও ইহাই প্রমাণিত করে যে আমাদের ঐ আশা দুরাশা বা অলীক কল্পনা মাত্র নহে।

'মর্ডান রিভিউ' পত্রের উক্ত লেখকের মতে মানুষের পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা এবং মানব জীবনের উন্নতি বিধানের উপযোগিতা বিষয়ে হিন্দু দর্শন অপেক্ষা পাশ্চত্য দর্শন শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে দর্শন কর্ম্মবাদ আবিষ্কার করিয়া অদৃষ্ট ও পুরুষকারের (Destiny and Free will) চিরন্তন দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে, যে দর্শনের মূল প্রেরণা-বাক্য—'নায় মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ,' যে দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত—"তত্ত্বমসি," জীব ও ব্রহ্মস্বরূপতঃ অভিন্ন, যে দর্শনের মূল লক্ষ্য মানসিক বিলাস-লীলা মাত্র নহে, শুধু বুদ্ধি-বৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন নহে, পক্ষান্তরে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়া শম দমাদি সাধন-সম্পৎ অর্জ্জন দ্বারা মানুষ শুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া কি প্রকারে তার পরম কল্যাণ অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈকত্বোপলব্ধি করিতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ, সেই দর্শনের ন্যায় মনুষ্যত্বের অসীম সম্ভাবনীয়তা প্রদর্শক, মনুষ্য-জীবনের অশেষ উৎকর্ষ-সাধক দর্শন শাস্ত্র জগতের আর কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়? আর যে বেদান্তের উপদেশে মানুষ আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধির পথে অগ্রসর হইয়া অজ্ঞান-সম্ভূত সকল বিরোধ পার্থক্য, মানুষে মানুষে, প্রাণীতে প্রাণীতে পর্ব্বত-প্রমাণ ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া সমুদায় জীব-জগতকে সর্ব্বগ্রাহিণী প্রীতিবশে আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা করে, তাহার সঙ্গে তোমার ঐ নীতি-কথা-মালার তুলনা করিও না, যাহা বাহির হইতে মানব-হৃদয়ের উপর চাপাইয়া দিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র আদিম-পাপক্লিষ্ট (?) মানুষকে মুক্ত শুদ্ধ করিতে চায়।

আমাদের জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান সঙ্কটে, বিশেষ ভাবে অর্থ বিষয়ক সমস্যায় পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান চর্চ্চার বিস্তার যে একান্ত আবশ্যক তাহাতে মতদ্বৈত থাকা অসম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে যে প্রণালীতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা চলিতেছে এবং যে উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রয়োগ হইতেছে তাহাতে বিজ্ঞানালোচনার প্রচলিত পদ্ধতির সমীচীনতা বিষয়ে আমাদের সকল মোহ দূর করা অত্যাবশ্যক। আমরা যেন সতর্ক হই পাছে পাশ্চাত্যদের ন্যায় আমরাও দর্শনশাস্ত্রের সকল যোগ স্পর্শ বর্জ্জন করিয়া, অন্ধবেগে জড়বিজ্ঞানের মায়া-মৃগীর পশ্চাতে ধাবিত হইয়া চিরন্তন কল্যাণকে হারাইয়া সীতাহারা রামচন্দ্রের ন্যায় জাতীয় জীবনকে হাহাকারে পূর্ণ না করি। আজ বিজ্ঞান-লক্ষ্মী মানুষের হাতে কি ভীষণা রাক্ষসীতে পরিণতা হইয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য মনীষী এমার্শনের কথায় শুনুন:—The motive of science was extension of man on all sides into Nature till his hands should touch the stars, his eyes see through the earth, his ears understand the language of beast and bird, and the sense of the wind; and, through his sympathy, heaven and earth should talk with him. But that is not our science. All our science lacks a human side, × × × puts humanity to the door, × × wants the connection which is the test of genius × × Science in England, in Ammerica is jealous of theory, hates the name of love and moral purpose. × × In the absence of the highest aims, of pure love of knowledge, and the surrender to nature, there is the suppression of the imagination, the priapism of the senses and the understanding; we have the factitious instead of the natural, tasteless expense, art of comfort, and the rewarding as an illustrious inventor whoever will contrive one impediment more to interpose between man and his objects."—অর্থাৎ, বিজ্ঞানবলে মানুষ সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিতে আত্ম-বিস্তার করিবে, সমস্ত-বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিবে—মানুষের হস্ত সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলীর স্পর্শসুখ লাভ করিবে মানুষের দৃষ্টি বসুন্ধরার মর্ম্মগত রহস্যের সন্ধান করিবে, মানুষের শ্রুতি বিহঙ্গের কাকলী, প্রভঞ্জনের আর্ত্তনাদ ও

জীব-জন্তুর নীরব ভাষার তাৎপর্য্য নিরূপণ করিবে, এবং সর্ব্বগ্রাহিনী অনুভূতিবশতঃ মানুষ দ্যুলোক-ভূ-লোকের সঙ্গে সখ্যালাপ করিবে,—এই মহতী আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায়ই মানুষ বিজ্ঞান চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া পড়িয়াছে। এই বিজ্ঞানের সঙ্গে মানব-হৃদয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা মনুষ্যত্বের কোন ধার ধারে না, মনুষ্যত্বকে ইহার পরীক্ষাগারের ছায়া ঘেঁসিতে দেয় না। বিশ্বের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে যে সুগভীর নাড়ীর বন্ধন রহিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতিই দিব্যদৃষ্টি প্রতিভাবানের লক্ষণ, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকের সেই প্রতিভা, সেই দিব্যদৃষ্টি নাই। পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত বিজ্ঞান এখন দিব্য কল্পনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া থাকে, জাগতিক ব্যাপারে প্রেম ও মঙ্গলাভিপ্রায় থাকার কথা শুনিলে উক্ত বিজ্ঞান তাহা অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া দেয়। তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পৃহা ও আত্মহারা স্বভাব-প্রীতি প্রভৃতি সুমহৎ ভাব দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, তাহাদের বিজ্ঞান-চর্চ্চায় মানুষের হৃদ্‌বৃত্তি সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া থাকে, এবং শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাম ও বুদ্ধিবৃত্তিই দেবতার আসন অধিকার করিয়া বৈজ্ঞানিকের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়া থাকে। ইহার ফলে আধুনিক বিজ্ঞান আমাদিগকে স্বভাবানুগত্য ও সরলতার পরিবর্ত্তে কৃত্রিম, রুচিবিরুদ্ধ, বহুব্যয়-সাধ্য বিলাসিতার অনুরাগী করিয়াছে, এবং আমাদের ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্তির কৌশল উদ্ভাবনে নিযুক্ত আছে। তাই যে কেহ মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে নূতন নূতন অন্তরায় বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করেন তাহাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া পুরস্কৃত করি।

আবার, বিকৃত লক্ষ্যভ্রষ্ট আধুনিক বিজ্ঞান যে মানুষের উপর প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই সেই কথা এমার্শনই বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিজ্ঞানলব্ধ কলকারখানা দ্বারা ধনী সম্প্রদায় যেমন অর্থলিপ্সা পরিতৃপ্তির সহজ উপায় লাভ করিয়াছেন, অপরদিকে আজ লৌহময় যন্ত্র শিল্পীর শিল্প-কৌশল, উদ্ভাবনী শক্তি, সৌন্দর্য্যবোধ কাড়িয়া লইতেছে, শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে যন্ত্রের অঙ্গরূপে ব্যবহার করিয়া মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত করিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নৃশংসতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রাপ্তহই বিংশ শতাব্দীর সেই মহাকুরুক্ষেত্র রণে—পাশব বলদৃপ্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বভৌমত্বকামী জার্ম্মেনীর সেই মহানরাশন যজ্ঞের বিশাল প্রাঙ্গনে বিজ্ঞান-সহচরী রণ-চণ্ডীর ভীষণ তাণ্ডব নৃত্যে ও লোমহর্ষকর শোণিতোৎসবে!

আধুনিক বিজ্ঞানের এই ধ্বংসলীলার উদ্দাম গতি রুদ্ধ করিতে হইলে অবিলম্বে এই বিজ্ঞান রূপী মহাদানবকে ত্রিদিব সম্ভূত কল্যাণময়ী ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করা আবশ্যক; নতুবা অচিরে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে একবার গ্রীকশ্রেষ্ঠ প্লেটো প্রাচ্যদেশীয় অধ্যাত্ম তত্ত্ব এবং প্রতীচ্যদেশীয় ভৌতিক জ্ঞানের সমন্বয় করিয়াছিলেন। আজ সমগ্র জগতবাসী আবার তদ্রূপ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর একজন সমন্বয়-কারী মহাত্মার আবির্ভাবের জন্য একাগ্রমনে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ইতিমধ্যেই ভারত গৌরব, দার্শনিক-বিজ্ঞানবিদ্‌, আমাদের জগদীশচন্দ্র একমেবাদ্বিতীয়মের প্রাচ্যআদর্শকে ভিত্তি করিয়া মানবজাতির চিরকল্যাণের জন্য এক নব্য বিজ্ঞান-তন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এবং কে বলিতে পারে যে এই ঋষি-জননী ভারত-ভূমির পবিত্র জঠর হইতে আর এক মহাপ্রাণ নরপুঙ্গব অবির্ভূত হইবেন না, যিনি অমানুষী প্রতিভা ও পুরুষপরম্পরাগত সাধনার বলে জড়বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্ক্রিয়ার আলোকে প্রাচীন তত্ত্ববিদ্যার আধুনিক আদর্শ সঙ্গত ব্যাখ্যানমূলক এক পূর্ণতর নব্য দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়া আধুনিক মানবের আধ্যাত্মিক বুভুক্ষা প্রশমিত করিবার পথ নির্দ্দেশ করিবেন? কারণ, মানব জাতির অভিব্যক্তির বর্ত্তমান অবস্থায় সংসারবিমুখী সন্ন্যাসাশ্রমের প্রাচীন আদর্শকে জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব। এখন মানুষ চায় সেই তত্ত্ববিদ্যা যাহা ঐহিক ও পারত্রিকের, সুসংযত ভোগও ত্যাগের এতকালের দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া দিয়া গৃহীকেই প্রেমিক সন্যাসী-হইবার সাধন প্রণালী শিক্ষা দিবে। ঐহিক পারত্রিকের পবিত্র সমন্বয়ের আদর্শ প্রাচীন ভারতে যে

ছিল না তাহা নহে, যদিও কার্য্যতঃ তাহা একদেশিক বৈরাগ্যের আদর্শেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাই প্রাচীন ভারতকে আহ্বান করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ—

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে সুখে,
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

এখন সমগ্র জগৎ ভারতবর্ষের নিকট ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার সেই নবতর ব্যাখ্যান চাহিতেছে যাহা মানুষকে গৃহস্থ সন্ন্যাসীর আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য নবীন প্রেরণা দান করিবে। মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির জীবন-প্রণালী ও কার্য্যাবলী সেই নব্য তত্ত্ববিদ্যা উদ্ভূত হইবার পথ বহুপরিমাণে সুগম করিয়াছে। কিন্তু সেই শুভ দিনের সুপ্রভাতকে নিকটতর করিতে হইলে ভারতীয় সাধনার সাররত্ন বেদান্ত-তত্ত্বজ্ঞানকে প্রাচীন পুঁথির অন্ধ গুহা হইতে উদ্ধার করিয়া দেশময় ছড়াইয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক;— আর সেই তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে আমাদের মত যাহারা উচ্চশিক্ষার বড়াই করি তাহাদের পক্ষে মূল উপনিষদাবলী ও ষড়দর্শনের জ্ঞানার্ণবে অবগাহন করা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কারণ, চুঙ্গীবাহিত সমুদ্রবারি দ্বারা যেমন নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু রত্নাকরের রত্ন সংগ্রহ অসম্ভব, সেই রূপ বেদান্ত প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদ-গ্রন্থ পাঠে আমরা পল্লবগ্রাহীতার পরিচয় দিয়া অশিক্ষিতের নিকট বাহবা লাভ করিতে পারি কিন্তু তদ্দ্বারা তত্ত্ববিদ্যা আলোচনার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক আধ্যাত্মিককল্যাণ, তাহা আমাদের চিরদিন অনায়ত্ত থাকিবে। দেশের ভবিষ্যভাগ্যের নিয়ন্তা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের কি এবিষয়ে কোন কর্তব্য নাই? ভারতীয় বিদ্যামন্দিরে ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার উপযুক্ত স্থান কি তাহা কি তাঁহাদের একটু ভাবিয়া দেখা সঙ্গত নহে?

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

জাগৃহি।

(১)

ছুটেছে তমসা ফুটেছে সহসা পুরব-আকাশ রঞ্জিয়া,
অতি-বিচিত্র-চিত্রিত-কত রেখা;
ভাতিছে তরুণ প্রভাত-অরুণ নদ নদী গিরি-লঙ্ঘিয়া,
সপ্ত-অশ্ব-স্যন্দন যায় দেখা।
হোথা অনন্ত দিগ্‌দিগন্ত-প্রান্তে সঘন ঘর্ঘরে,
জাগায়ে চেতন উড়ায়ে কেতন রাঙা,
আসিছে তপন; স্বনিছে পবন ঘন ঘন বন-মর্ম্মরে,
বুলায়ে স্নিগ্ধ দুলায়ে সলিল-ভাঙ্গা;
সুখ-পালঙ্কে আলস-অঙ্কে লালস-পঙ্কে নিদ্রিত।
কেরে বিমুগ্ধ! ক্ষুব্ধ নহিস্ তবু!
তরুণ প্রভাতে অরুণ-প্রভা-তে কেনরে নয়ান মুদ্রিত!
নবীনানন্দে নন্দিবি নারে কভু!
থাক্ তুই পড়ে, আয় ত্বরা করে ওরে তপস্বি! হে গৃহি!
এসহে সাধক! পুণ্য পাবক! পরমানন্দে জাগৃহি!

(২)

হের ভৈরবে এল গৌরবে নব যৌবন নন্দিত,
ফুল-সৌরভে বিভাসি বসুন্ধরা!
আনন্দছবি! সুন্দর রবি কতনা ছন্দে বন্দিত,
কতনা মন্ত্রে মন্ত্রিত হল ধরা!
দীপ্ত বদন দিব্যমোহন লাল চন্দন চর্চ্চিত,
প্রসন্ন-হাসি বিকাশিছে গরিমায়,
রুচির নয়ণ রঞ্জিত ঘন কনকাঞ্চন অর্চ্চিত,
মোহিছে পরাণ কী মহান্ মহিমায়!
নবীন কিরণ নয়ন-হরণ নিন্দি হিরণ নন্দিছে,
গন্ধ-গহন মন্দ- পবন ভরে;
দীপ্তিতে তার তৃপ্তির পার না পেয়ে ধরণী কান্দিছে,
মুখর-গুঞ্জে মঞ্জু কুঞ্জ'পরে।
একি কল্যান দ্যুতি-অম্লান! ওরে তপস্বি! হে গৃহি!
দেখরে সাধক! পুণ্য পাবক! পরমানন্দে জাগৃহি!

(৩)

শোন্ আনন্দে মোহন-ছন্দে মধুর-মন্ত্র-বন্দনে,
মন্দ্রিয়া দিশি নন্দিয়া নব-রবি;

সুন্দর-মন-নন্দন-বন- কুন্দে গন্ধ-চন্দনে,
গগণ-রন্ধ্র পূর্ণ করিয়া সবি।
সুস্নাত-শুচি সুশুভ্র-রুচি-রুচির স্নিগ্ধ অম্বরে,
মন্তরশত জলদ মন্দ্র মত ;
ঘন ঝঙ্কারে তুলি হুঙ্কারে মহা-ওঙ্কার মন্ত্ররে,
সাম-সঙ্গীত ধ্বণিয়া রণিয়া শত।
শুভ্র-ফেণিল-তটিনী-সলিল-হিল্লোলাকুল তটতীরে,
কল-কল্লোল-উচ্ছল কলরোলে,
মিশাইয়া সুর ধ্বনিছে মধুর মুক্তির মহা-মন্দিরে,
মুনিগণ শত উদাত্ত কলকলে।
এস মহর্ষি! হেমধুবর্ষি! ডাক সহর্ষে " হে গৃহি!
জাগরে সাধক পুণ্য পাবক পরমানন্দে জাগৃহি!"

(৪)

জাগ পৃথিবীতে আশা-ভরা চিতে জাগরে আজিকে সংযমী,
জরা হতে জাগ যৌবন-জয় গানে।
জাগ আজি ধীর! হে বিজয়ি! বীর! লজ্জা বেদনা সবদমি
পবিত্র-হৃদে পরম-পুণ্য ধ্যানে!
এস এস ত্যাগী আলস তেয়াগি, বৈরাগী বৈভব ছাড়ি,
একতারা স্তব তানে কর রে পুর!
ভৈরব-রবে বাজাও এ ভবে জাগায়ে জগৎ-সংসারী,
মন্ত্রে মোহন তন্দ্রা করহ দূর!
প্রভাত-নিশায় আলোক-আধাঁর গঙ্গাসাগর সঙ্গমে,
স্বজন-পূত-তীর্থসলিলে গাহি,
তর্পণ কর অর্পণ কর অন্তরে যাহা ধন জমে,
বন্ধন-হারা আনন্দ গান গাহি!
আয় আয় ভবে মেল তোরা সবে ওরে তপস্বি! হে গৃহি!
জাগরে সাধক! পুণ্য পাবক! পরমানন্দে জাগৃহি!

শ্রীসত্যপ্রিয় চৌধুরী।

ময়মনসিংহের কবি কাহিনী।

কবি কালীচরণ।

কালীচরণ দের বাড়ীছিল কেন্দুয়া থানার আইথর। কয়েক বৎসর হইল কালীচরণ কলেরা রোগে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র সুখ-সচ্ছন্দে আইথরের বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু কেহই পিতার গুণ গ্রহণে সমর্থ হইলেন না। না হইলেও, ইহাদের বিদ্যা বুদ্ধির গৌরব যথেষ্ট আছে।

কবি কালীচরণের কালী কলমের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলেও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রতিভায় এবং সঙ্গ ও চর্চ্চার ফলে তিনি এক জন শিক্ষিত লোকই ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণাদিতে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল।

ময়মনসিংহের অনক্ষর কবি, রামু রামগতির সাহচর্য্যে ও অনুকম্পায়, অর্দ্ধ বয়সে কালীর অন্তর্নিহিত স্বভাব-সিদ্ধ কবিত্ব কুসুম ফুটিয়া উঠে। শেষে রামু-রামগতির সঙ্গেও ইনি বহু কবিগান গাইয়াছিলেন। কিন্তু, হাসনপুরের সম্ভু জেলেই ছিল তাঁহার সহযোগী কবির সরকার। আমার সঙ্গেও ইনি অনেক দিন কবিগান গাইয়াছেন। তুলনায় আমি কালীর নীচে ছিলাম। কৌশল পূর্ব্বক কথার কাটাকাটি করিয়া কালীর সঙ্গে আমি পারিতাম না। তাঁহার যেমন গীত রচনার শক্তি ছিল, ছড়া পাঁচালীর মুখ ছিল তদপেক্ষা অধিক প্রখর।

শম্ভু ও কালীর মধ্যে গুণে গরিমায় কে বড়, কে ছোট, এসম্বন্ধে এক দিন এক কবি গানের আসরে কয়েক জন ভদ্র লোক নিরপেক্ষ উত্তর পাইবার আশায়, রামু সরকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—(সেদিন গান ছিল রামুর সঙ্গে আমার) রামু উত্তর করিলেন,—"শম্ভু কালীর ছোট বড় সম্বন্ধে আমার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া মণ্ডপের দিকে চাহিলেইত বুঝিতে পারেন।" (গানছিল কালী পূজার আসরে।) রামুর এই কথার তাৎপর্য্য এই যে,—মণ্ডপের ভিতর শ্রীবিগ্রহ শম্ভু (শিব) নীচে পড়িয়া আছেন, আর কালী (দেবী) তাঁহার বুকের উপর খাড়া। রামু সংক্ষিপ্তোত্তরে ইহাই বুঝাইয়া দিলেন, শম্ভু নীচে, কালী তাহার উপরে। বাস্তবিক শম্ভু সরকার অপেক্ষা কালী সরকার অনেকাংশে গুণী ছিলেন।

নিম্নে "সৌরভের" পাঠক গণের অবগতির জন্যে কবি কালীচরণের রচিত কয়েকটি গীত লিখিত হইল।

ডাক্‌মালুশী।

"ও মা কালিকে, কালের ভয় পেয়ে মা,
কালী বলে ডাক্‌তেছি তোমায়।
তুমি কাল বারিণী, বিপদহারিণী,
দীন তারিণী তার গো আমায়।

শুনেছি মা বল্লে কালী, দূরে যায় সব মনের কালী,
তাইতে কালী ডাকি সর্ব্বদায়,
মাগো কালের মুখে পড়্‌বে কালী,
কালী যদি আমায় রাখ রাঙ্গাপায়।

অন্তরা— কালের কি ভয় রাখি মা, কাল্ বারিণি। বদনে যদি বলি কালী। আমরা নেচে গেয়ে বল্‌ব কালী, আনন্দে বাজাইয়া করতালি।

কাল্ কাটাইলাম "কালী বল্‌ব" বলে করে কেবল আজি কালি, কালী বলে, নিদান কালে, রাখর মা রক্ষা কালী।

কবি কালীচরণের এই গীতটিকে সমালোচনার মানদণ্ডে তুলিয়া দেখিলে গীতের ভাব-গুরুত্ব এবং কবির কাব্য-কৃতিত্ব সবিশেষ পরিলক্ষিত হইবে।

কবি মহড়ার পদে বলিয়াছেন, "কালের ভয় পেয়ে মা কালী বলে ডাক্‌তেছি তোমায়।" আবার অন্তরার পদে বলিতেছেন,—"কালের কি ভয় রাখি মা-কাল্ বারিণি! বদনে যদি বলি কালি।" এখানে ভাবের বৈষম্য দুষ্ট হয় বটে, কিন্তু, মহড়ার পরের পদটিতে দুইটি ভাবেরই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে।

সেই পদটির প্রথমে নাম মাহাত্ম্য, "শুনেছি মা, বল্লে কালী,—দূরে যায় সব্ মনের কালী, তাইতে কালী ডাকি সর্ব্বদায়, (মাগো!) কালের মুখে পড়্‌বে কালী, কালী যদি রাখ আমায় রাঙ্গা পায়,,। নাম মাহাত্ম্যের এবং "তুমি যদি আমায় রাঙ্গা পায় রাখ, তবে কালের মুখে কালী পড়িবে,, এই স্থিরসিদ্ধান্তের আনন্দোচ্ছ্বাসে কবি একটি অভয় শান্তির আশ্রয় পাইয়া, সাহস করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—

"কালের কি ভয় রাখি মা কাল বারিণি!
বদনে যদি বলি কালী।"

অন্তরার পর-পদে কবি দৈন্য-বিনয় ও আত্মসমর্পণের ভাব সংযোজিত করিয়া গীতটিকে বড়ই মধুর করিয়াছেন। যথা, "কাল কাটাইলাম কালী বল্‌ব বলে, করে কেবল আজি কালি,, এই আত্ম নিবেদনের পরই আত্মসমর্পণ, "অধীন কালী বলে, নিদানকালে, রা'কর মা, রক্ষা কালি!"

কালী-কৃত মাথুর।

চিতান, — বৃন্দা যেয়ে মধুপুরে, করজোড়ে,
কৃষ্ণের কাছে কয়।

পাড়ন' — কৃষ্ণ হে, বড় দুঃখ পেয়ে এলেম এথা,
জানাইতে দুঃখের কথা, শুন যদি বলি সমুদয়॥

লহর, — তুমি বল্‌তে যারে প্রাণেশ্বরী,
যারে অতি আদর করি, রাখিতে বুকে,
এখন তুমি কে আর সেবা কে?

বুকের মানুষ শোকে পোড়া, ভূমেপড়া আধা মড়া,
(তুমি) সুখেতে আছ মথুরা, এক বার দেখ্‌লেনা তাঁকে!

মিল,—তোমায় দেখার আশায় প্রাণ রয়েছে
আর কিছু নাই বাকি,—চল শীঘ্র কমলাখি
দেখ্‌তে তোমার রাধিকায়।

মহড়া,— এই নিবেদন, মদনমোহন, করি এখন,
তোমার রাঙ্গা পায়।

ধুয়া,— রাধার ঘটেছে দুর্দ্দশা যত,
বলে আর জানাব কত,—
মড়ার মত পড়ে সদায় রয়,—
জাহ্নবী যমুনা ধারা দু,টি চক্ষে বয়,
শত ডাকেও কথা না কয়,
মুখের দিকে মাত্র চায়।

খাদ,— দু'দিনে চা'রদিনেও নাহি দু'টা অন্ন খায়।

লহর,— ছিল স্বর্ণ লতা রাধিকা,
কৃষ্ণ তোমার প্রাণাধিকা,— আমরা জানি,—
ওহে—শ্যাম চিন্তামণি,— সহকার তরু বিনে—
ভূমে পড়ে দিশি দিনে,
শুকাইছে দিনে দিনে, কণ্ঠাগত পরাণি॥

মিল,—দিতে সেই সমাচার এলাম আমি
কৃষ্ণ গুণ ধাম,—
দাসীর প্রতি হইওনা বাম,—চল শীঘ্র শ্যাম রায়॥

ঝুমুর,— এখন দেখ্‌বে কিহে মদনমোহন,—যেয়ে।
ব্রজের শোভা, মনোলোভা, সব্ গেছে ফুরায়ে॥

শুক শারী নীরব আছে, ভ্রমর যায়না
ফুলের কাছে,— ধেনু আছে চেয়ে,—
নাই সেই কোকিল পাখীর কুহু কুজন
থাকিয়ে থাকিয়ে ॥
পরচিতান,—বড় কষ্ট পেয়ে, এলাম ধেয়ে,—
তোমায় নিয়ে যেতে বৃন্দাবন।
পারাণ,—কৃষ্ণহে,—এইছিল কি গোপীর লেখা,—
বিচ্ছেদ বিষে শ্রীরাধিকা,—
অকালেতে ত্যজিবে জীবন ॥
লহর,—এখন তুমি গেলে বাঁচ্‌বে রাধা,—
রাধা নাকি তোমার আধা, বলেছ আগে,—
তোমার সে কথা আর কোথায় লাগে ?
পড়ে রাধার চরণ তলে,—ভাসহ ক' দিন নয়ন জলে,
মাথায় নিছ চরণ তুলে,
সে সব্‌ কি মনে জাগে ?
মিল,—বল্‌বার কথা অনেক আছে,—
এখন তা বলার সময় নাই,—
চল আগে ব্রজেতে যাই,—আবার এইস মথুরায় ॥

এই গীতটিতে কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনের অবস্থা এবং কৃষ্ণহারা বিরহবিধুরা গোপীর দুর্দ্দশা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। গীতের আদ্যন্ত শব্দাড়ম্বরশূন্য হইলেও ভাব ও রস-প্রাচুর্য্যে গীতটি অত্যুৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। সমালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহার পদে পদে ভাব-বৈচিত্র পরিলক্ষিত হইবে।

একদিন কবি কালীচরণ দে, কবিরভাবে বৃন্দা হইয়া, শম্ভুকে কৃষ্ণ করিয়া বলিতেছেন।

(টপ্পা।)

" বৃন্দা আমার নামটি বটে,—বসতি করি বৃন্দাবন।
একটি মর্ম্ম কথা জানিতে,—এসেছি তোমার সাক্ষাতে,—
যোড়হাতে জানাই নিবেদন ॥
তুমি কাইল বলে যে এসেছিলে,—বাকি তাহার কতদিন ?।
মথুরাতে,—তুমি নাকি হৈলে কুব্‌জার প্রেমাধীন ॥
কংসের দাসী কুব্‌জায়,—তোমায় বুঝি কু-বুঝায়,—
নিকটে বসে নিশিদিন,—তুমি ছিলে রাখাল, হইলে ভূপাল, সেই এক্‌দিন আর এই একদিন ॥ "

শ্রীকৃষ্ণের চিরপরিচিতা বৃন্দা,—মথুরায় উপস্থিত হইয়া সেই কৃষ্ণের নিকট " বৃন্দা আমার নামটি বটে" এরূপ বলার তাৎপর্য্য কি ? উত্তরে ইহার দুইটী কারণ বুঝা যায়। প্রথমতঃ কবিগানের আসরে যিনি যে হইয়া দাঁড়া হইবেন,—তিনি টপ্পার চিতান পারাণে তাহার সবিশেষ পরিচয় না দিলে,—সভাস্থ সকলে বুঝিতে পারেন না, " ইনি কে—হইয়া কি বলিতেছেন। " দ্বিতীয়তঃ,—কৃষ্ণ " কা'ল আসিব" বলিয়া বহুদিন যাবত আর মথুরা হইতে বৃন্দাবন আসিতেছেন না। বহুদিন যাবত ব্রজের গোপ-গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের দেখা সাক্ষাৎ নাই। আবার শুনা যাইতেছে,—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) মথুরায় কংসবধ করণান্তর রাজত্ব পাইয়া কংসের দাসী কুব্‌জার সঙ্গে প্রেম করিয়া মহা-ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া বসিয়াছেন। " আমি পরিচয় নাদিলে কি তিনি এখন আর আমাকে চিনিবেন ? " বৃন্দার মনের এই সন্দেহপূর্ণ ভাবটি লইয়া কবি বলিতেছেন,—" বৃন্দা আমার নামটি বটে,—বসতি করি বৃন্দাবন। "

পক্ষান্তরে সাধারণের বুঝিবার সুবিধা করিয়া দিয়া কবিগানের রীতিরক্ষা ও করিয়াছেন। এখানে একটি পদে দুইটী ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃন্দা চিতানে আপন পরিচয় প্রদান করিয়া পারাণের পদে বলিতেছেন,—" যোড়হাতে জানাই নিবেদন। " ব্রজের ভাবে কৃষ্ণকে যোড়হাত করিয়া কথা কহিবার বৃন্দার কারণ ছিল না। এখানে (মথুরার) কৃষ্ণ মহারাজ,—রাখাল নহেন। সুতরাং যোড়হাত করিয়া কথা না কহিলে নিতান্ত বেয়াদবী হয়,—এই জন্যই " যোড়হাতে জানাই নিবেদন। "

ব্রজ-ভাব বিভোরা বৃন্দা তন্মুহুর্ত্তেই কৃষ্ণকে পূর্ব্বভাবে আপনজন মনে করিয়া দু'টা শ্লেষব্যঞ্জক শক্ত কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। যথা, — "তুমি কা'ল বলে যে এসেছিলে, বাকি তাহার কত দিন ?,,

বৃন্দা স্ত্রীলোক,—বড়দুঃখ পাইয়া আসিয়াছেন। মনের রাগে তিনি আর স্ত্রীজন সুলভ স্বভাবসিদ্ধ ভাবকে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাই মহড়ার পদে বলিতেছেন, "মথুরাতে তুমি নাকি হইলে কুব্‌জার

প্রেমাধীন।" অন্তরার পরে আরো একটুক্ শ্লেষকটূক্তি করিলেন,—"কংসের দাসী কুব্জার, তোমায় বুঝি কু-বুঝায়, নিকটে বসে দিনিদিন,—(তুমি) ছিলে রাখাল, হৈলে ভূপাল, সেই একদিন আর এই একদিন।"

কুব্জার সঙ্গে কৃষ্ণ প্রেম করিয়াছেন,—তাই খোটা দিয়া,— "সেই একদিন আর এই একদিন" বলিয়া বৃন্দা কৃষ্ণের পূর্ব্বাবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

একটি ক্ষুদ্র টপ্পার এতগুলি বিস্তৃত ভাবের সমাবেশ করা,— কবির কৌশল ও কবিত্বের পরিচায়ক বটে।

কবি কালীচরণের এই টপ্পার প্রতিবাদে শম্ভু সরকার কৃষ্ণ হইয়া উত্তর করিলেন,— "তুমি কে ? কি বলিতেছ ? আমি ত তোমাকে চিনিই না।" কৃষ্ণের এই প্রকার নীরস মর্ম্মভেদী কথায় অবশ্যই বৃন্দার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল,— সন্দেহ নাই। বৃন্দা-ভাবে বিভাবিত কবি কালীচরণ আর একটি টপ্পায় বলিলেন,—

"এখন আমায় চিন্‌বে কেনে, বেস্ কথা বল্লে জলধর।
(বল্লো) এখন নাই সেই চিনার দিন,
সেই এক দিন আর এই এক দিন,—
দু'দিন মধ্যেই চিন্‌লাম্ আপন পর ॥
চিনা মানুষ চিনা যায় না, নূতন চিনার খাতিরে।
চিন্‌বে কিসে চিন্তামণি,— তুমি যে বাঁচনা ভরে ॥
শ্রীরাধিকার মানের দায়,—
কাঁদ্‌তে যখন শ্যামরায়,—চরণে পড়ে,—
তখন অম্‌রা আপ্‌না ছিলাম,—এখন কি মনে পড়ে ? ॥"

কালীচরণের এই টপ্পাটিও বিদ্রূপের ভাষায় অতি সুন্দর হইয়াছে। "চিনা মানুষ চিনা যায় না,— নূতন চিনার খাতিরে" "নূতন চিনা" এই কথার ইঙ্গিতে কুব্জাকেই লক্ষ্য করিয়াছে।

কুব্জার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নূতন ভাব, নূতন ভালবাসা,— নূতন প্রেম, নূতন চিনা। তাই বৃন্দা ভাবিতেছেন,— "আমার সঙ্গে ব্রজ গোপীর প্রেম সম্বন্ধীয় কথা কহিলে, কুব্জা শুনিয়া কৃষ্ণের উপর রাগ করিবে, তাই তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) আর আমাকে চিনিয়া ও চিনিতেছেন না।" মুখরা বৃন্দা এই ভাবে অনুপ্রাণিতা হইয়াই, বলিতেছিলেন "চিনা মানুষ চিনা যায়না, নূতন চিনার খাতিরে।" অন্তরার পরে আবার,— "চিন্‌বে কিসে চিন্তামণি,— তুমিযে বাঁচনা ভরে।"

শ্রীরাধার দুর্জ্জয় মানে হত বুদ্ধি হইয়া কৃষ্ণকে অনেক সময় হাবু ডুবু খাইতে হইত। তখন বৃন্দার বুদ্ধি প্রভাবে কৃষ্ণ কোন মতে শ্রীমতীর অতল স্পর্শ মান সমুদ্রের তল পাইতেন। তাই বৃন্দা কৃষ্ণের হিতৈষিণী বলিয়া বড় আদরিণী ছিলেন। অত কৃষ্ণ কুব্জার ভয়ে, সেই পরমাত্মীয়া বৃন্দাকে চিনিতেছেন না বলায়,—বৃন্দা রাগের সহিত আগের গুপ্ত কথাটা হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন।— "শ্রীরাধিকার মানেরদায়, যখন কাঁদ্‌তে শ্যামরায়—চরণে পড়ে,— তখন আম্‌রা আপ্‌না ছিলাম,— এখন কি মনে পড়ে ? ।" কৃষ্ণকে কৃতঘ্ন বলিয়া গালি দেওয়াই এই অন্তরা-পদটির উদ্দেশ্য।

শম্ভু সরকার শ্রীকৃষ্ণ ;— তিনি কালীচরণ বৃন্দার তীব্রোক্তিতে লজ্জিত হইয়া পরে বলিলেন,—

"হাঁ তোমায় যেন চিনি চিনি লাগে।"

তদুত্তরে কালীচরণ টপ্পা করিলেন—

" বল্লে তুমি চিন্তামণি,— চিনি চিনি লাগে।
যখন ছিলে বৃন্দাবন, মিঠা ছিল গোপীগণ,
চিনিরমতন লাগিতাম আগে ॥
এখন চিটা খেয়ে চিনির মিঠা মনে কি আছে তোমার ?
মুখের কথা চিনি চিনি অন্তরে চিটাই তোমার সার ॥
পদ্মের ভ্রমর শিমুলে, এমন করে রয় ভুলে,
জীবনে শুনি নাইতো আর,—
(দিলে) চোরের গলায় তুলসীমালা,
অভ্যাসের দোষ যায়না তার। "

কবি কালীচরণের এই টপ্পাটি রচনায় ও ভাব মাধুর্য্যে অত্যুত্তম হইয়াছে। কবি বৃন্দা এখানে 'চিনি' শব্দের অর্থান্তর করিয়া শ্লেষ করিতেছেন।—" তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ,—" তোমাকে যেন চিনি চিনি লাগে "। যখন তুমি বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকার প্রেমাধীন ছিলে,—তখন আমরা মিঠা ছিলাম,—সুতরাং 'চিনি চিনি' লাগিতাম,— এখন মথুরায় আসিয়া তোমার কি আর চিনির মিঠা মনে আছে ? চিটার মিঠায় মুগ্ধ হইয়া তুমি একবারে পূর্ব্বভাব হারাইয়া ফেলিয়াছ। "

তিনি তিনির কথা এই পর্য্যন্ত কহিয়া অতঃপর পদে আর একটি নূতন কথার অবতারণা করিয়াছেন। "পদ্ম ফুলের ভ্রমর যে এমন করিয়া শিমুল ফুলে মজিয়া থাকে,—তাহা তো আর শুনি নাই!"

ব্রজে শ্রীমতী ছিলেন পদ্মফুল,—কৃষ্ণ ছিলেন সেই ফুলের মত মধুকর;—মথুরার কুব্জা হইল শিমুলফুল,—তুলনায় অনেক তফাৎ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে পরিত্যাগ করিয়া কুব্জার প্রেমে আসক্ত হইয়া আছেন,—ইহা অসম্ভব রুচি বিকার। কবি এই ভাব তরঙ্গে ভাসিয়াই বোধ হয় গাইলেন,—"পদ্মের ভ্রমর শিমুলে, এমন করে রয় ভুলে, জীবনে শুনি নাইত আর"—।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কৃষ্ণের স্বভাবের কথা বৃন্দার মনে পড়িল। তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) বৃন্দাবনে অনেক দিন শ্রীমতীকে আশা দিয়া বনে আসিয়া নিজে আসিতেন না। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে পড়িয়া থাকিতেন। সেই কথাটা মনে করিয়াই বৃন্দা বলিতেছেন,—"দিলে চোরের গলায় ফুলসী মালা অভ্যাসের দোষ যায় কি তার?।"

ভগবল্লীলা তত্ত্বের সার সিদ্ধান্ত,—গভীরতম ভক্তি সমুদ্রে নিমজ্জিত;—সেকল তত্ত্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কবিগান করা চলে না। কবিগান করিতে হইলে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যাংশ ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ মাধুর্য্যের ভাব রক্ষা করাই উচিত। আমাদের বর্ণিত কবি কালীচরণ এখানে তন্নিমিত্তই যথা সাধ্য নর লীলার ভাব রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

মোহ।

শাখা ভাবে উঁচু হই, পাইব বাতাস;
পাতা ভাবে নীচে বুঝি সুখের আবাস;
শাখা যত ভাবে তত বেড়ে চলে যায়,
ভূমিতলে পাতা পড়ি গড়াগড়ি খায়।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ।

স্রোতের ফুল।

১

আশ্বিন মাসে প্রফুল্লর বিবাহ হয়। আশ্বিনের বিবাহে তাহার মাতার একেবারেই মত ছিল না। মা বলিয়াছিলেন—"আর চারিটা মাস পরেই হউক না—আশ্বিনে বিবাহ—"

গৃহিণীর ভাব বুঝিয়া কর্ত্তা বলিয়াছিলেন—'উবেচ মরণং' এইতো? কোন চিন্তা নাই—এই জন্যই আশ্বিনে বিবাহ উচিত, কেননা, এত বড় সত্য সিদ্ধান্ত আর কোন মাসের বিবাহে নাই। আমরা চিরকাল মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া এখানে থাকিতে আসি নাই—"

উত্তরে গৃহিণী বলিয়াছিলেন—"চারি মাস অপেক্ষা করিলেই বা ক্ষতি কি?"

কর্ত্তা বলিলেন—"কার্ত্তিকে প্রফুল্লর নয় বৎসর পার হইয়া যাইবে; গৌরী দানের ফলও পাইলে না, শেষ রোহিনী দানের ফলটাও যাইবে; তা কোন মতেই সঙ্গত নহে; দেবী পক্ষ, উত্তম কাল, অনর্থক আপত্তি করিও না, গুরুজনের বৃথা আপত্তিতেই বরং অশুভ আশঙ্কা অধিক।"

প্রফুল্লর বাবাতে মাতে এইরূপ অনেক দিন কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল। বাবার জেদে এবং রোহিণী দানের পুণ্য লাভের প্রলোভনে তাহার মা আর শেষে অধিক আপত্তি দেখান নাই।

প্রফুল্লর বরটী যদিও তাহাদের হরিণা গ্রামেরই অধিবাসী ছিল, তথাপি প্রফুল্ল তাহাকে কখনও দেখে নাই, সেকালের রীতি অনুসারে দেখিবারও প্রত্যাশা করে নাই।

পরেশকে যে কেবল প্রফুল্লই দেখে নাই, তাহা নহে; হরিণা গ্রামের অনেকেই তাহাকে জানিত না; কেননা পরেশ বাল্যকাল হইতেই তাহার এক মাতুলের আশ্রয়ে ঢাকা থাকিয়া স্কুলে পড়িত। হরিণা গ্রামে তাহার পৈত্রিক গৃহ অথবা পিতা মাতা কেহই বর্ত্তমান ছিলেন না।

আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই বিবাহের প্রাথমিক মঙ্গল আচরণাদি হইয়া যায়। মঙ্গলাচরণের পরদিন হইতেই

শরতের নির্মল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া একটা ভাবি দুর্য্যোগের সূত্রপাত করিয়া দেয়। হরিণা গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়া মেঘনা বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের চড়াভূমি। সুতরাং এরূপ ঝড়ের প্রকোপ হরিণার উপর দিয়া অহরহই প্রবাহিত হইত।

অকালে ঝড়ের লক্ষণ দেখিয়া প্রফুল্লর মা পুনরায় বলিয়াছিলেন—"আমাদের বিবাহের নামে অকালেও বাদলের হাওয়া বহিতেছে—"

তাহার বাবা তাহাতে বাধা দিয়া উত্তর করিয়াছিলেন—"শান্ত শীতল বারিপাত ভবিষ্যত শান্তিরই সূচনা জানাইয়া দেয়—বৃথা অমঙ্গল চিন্তা করিও না—বিশেষ—ভয়ের স্থলেই জয় হয়।"

বিষম বাদল রাত্রিতেই প্রফুল্লর বিবাহ হইয়া গেল। প্রফুল্ল তখনও পুতুল খেলা খেলিত, পুতুলের বিবাহ দিত, পুতুল দম্পতির শুভদৃষ্টি করাইত, বিবাহের আচার অনুষ্ঠান সকলি বেশ জানিত; তথাপি লজ্জাতেই হউক, আর নিতান্ত বালিকা সুলভ স্বামী জ্ঞানের অভাব বশতঃই হউক—শুভ দৃষ্টির সময়ও স্বামী পদার্থটীর প্রতি একটী বার দৃষ্টিপাত করিল না; ফলে এমনি একটা ভাবহীন অজ্ঞতার ভিতর দিয়া বাল্যবিবাহ নামক এই ক্রিয়াটী সম্পন্ন হইয়াছিল।

মার বুকে সন্ধ্যার পরই বালিকার ঘুমাইবার অভ্যাস। বিবাহের পর বাদলের বারি ধারার অসুবিধায় বৈবাহিক আচার অনুষ্ঠানের যতই বিলম্ব ঘটিতেছিল প্রফুল্লর শরীর ও মন ততই অবসন্ন হইয়া কোথাও ঢলিয়া পড়িবার মত হইয়াছিল।

ইহার পর যখন শয্যায় শয়ন করিবার সময় হইল, তখন বালিকা নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রিতে স্বামীর ডাকে প্রফুল্লর ঘুম ভাঙ্গিল। ঘরে প্রদীপ ছিল, প্রদীপের আলোকে সে ঘরের ভিতরের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল।

সর্ব্বনাশ কাণ্ড! প্রবল জল স্রোত ভিটা মাটি ডুবাইয়া কল্ কল্ রবে ঘরের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতেছে।

বাহিরের প্রকৃতি তখন গাছপালা লইয়া প্রচণ্ড তাণ্ডবে নৃত্য করিতেছিল। বাতাসের এক একটা প্রবল ধাক্কা এক একবার যেন ঘরখানা উড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল। প্রফুল্লর স্বামী তাহাকে এক হাতে ধরিয়া লইয়া উঠিয়া অতি কষ্টে ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল। বালিকা কাপড়খানা পরিধান করিতেও অবসর পাইল না, অপরিচিত স্বামীটিকে দুই হাতে আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘরের বারান্দায় আসিয়া এক পা জলে দাঁড়াইয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন চারিদিকে কেবলি চিৎকার শোনা যাইতেছিল। এই সময় দক্ষিণের ভিটার ক্ষুদ্র ঘরখানা বাতাসের তাড়নায় উঠানের জলের উপর পড়িয়া গেল; প্রবল স্রোতের বেগে প্রফুল্লও আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—বারান্দা হইতে পিছলাইয়া উঠানের জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। তাহার স্বামীও সেই মুহূর্ত্তে তাহার পশ্চাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

২

প্রলয়ের প্রতাপ তখনও সম্পূর্ণ থামিয়া যায় নাই। মাঝে মাঝে প্রবল বাতাস ক্রুদ্ধ অজগরের মত গর্জ্জন করিয়া বহিয়া চলিতেছিল। মেঘনার তীরে এক গৃহস্থের একখানা ক্ষুদ্র গৃহে এক তীর্থযাত্রী বাবাজীর দল একটী জলমগ্না বালিকাকে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র গৃহখানাও তখন ক্ষুব্ধ বায়ুর প্রবল তাড়নায় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

জ্ঞান হইলেই বালিকা বুঝিতে পারিল—সে একটা ঘরের মধ্যে কতকগুলি ধানের খড়ের উপর শুইয়া আছে, এবং তাহার নিকটে কএকটী লোক বসিয়া রহিয়াছে। বালিকা একবার মাত্র চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াই ভয়ে চক্ষু বুজিয়া ফেলিল। তখন অল্পে অল্পে নিজ বিপদের কথা তাহার স্মরণ হইতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে মার কথাই তাহার মনে পড়িল, তখন সে তাহার মাকে ডাকিয়া কাঁদিতে চেষ্টা করিল।

মেয়েটী চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধ বাবাজী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া একটু গরম দুগ্ধ খাওয়াইতে চেষ্টা করিলেন। ক্ষুধার তাড়নায় বালিকা কতকটা

দুধ পান করিয়া একটু সুস্থ হইল, তারপর 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিকটে উপবিষ্ট সেই বৃদ্ধ বাবাজী বলিল—"কোন ভয় নাই মা, তোমাকে যেখানে রাখিয়া আসিতে বলিবে আমরা তোমাকে সেই খানেই লইয়া যাইব—তোমার বাপ মাকে খুজিয়া বাহির করিব—তোমার কোন চিন্তা নাই, আগে তুমি সুস্থ হও।"

বালিকা কিছুতেই শান্তি পাইতেছিল না। সে বলিল "আমাকে আজই বাড়ী লইয়া যাইবেন তবে?"

বৃদ্ধ বাবাজী বলিলেন—"আজ! অসম্ভব মা, আজ যাইবার সুযোগ নাই; মেঘনায় প্রবল ঝড়—কত গাঁও দেশ ডুবিয়া গিয়াছে—কি ভীষণ প্রলয় হইয়া গিয়াছে—মা, তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই! যাহা হউক, তোমার কোন চিন্তা নাই; তুমি আগে সুস্থ হও—তারপর নৌকা করিয়া তোমাকে তোমার বাড়ী লইয়া যাইব। তোমার বাড়ী কোথায় মা?"

বালিকা বলিল—"হরিণা।"

বাবাজী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি মা?"

বালিকা বলিল—"প্রফুল্ল"।

"তোমার বাড়ীতে আর কে আছেন মা?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বালিকা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বাবাজী পুনরায় তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"তোমার আত্মীয় স্বগণের খোজ লইতে হইলে তাঁহাদের পরিচয় জানা থাকা চাই। তোমার বাবার নাম কি?"

প্রফুল্ল চক্ষু মুছিয়া বলিল—"আমার বাবার নাম গৌরীকান্ত চৌধুরী।"

"তোমরা ব্রাহ্মণ?"

"না, আমরা কায়স্থ।"

বিকালে ঝড়ের রুদ্রমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। বাবাজীর দল একখানা নৌকা করিয়া প্রফুল্লকে লইয়া হরিণা অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু কোথায় হরিণা? হরিণা গ্রাম মেঘনার কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে। শুধু হরিণা নহে, হরিণার মত শত শত গ্রাম লক্ষ লক্ষ প্রাণী লইয়া বঙ্গোপসাগরের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে লয় পাইয়া গিয়াছে। মেঘনার সৈকত ভূমে স্তূপীকৃত মৃতদেহ দেখিয়া বৃদ্ধ বাবাজী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রফুল্লকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইয়া মৃতদেহ গুলি দেখাইয়া বলিলেন—"কি দেখিতেছ মা, তোমাদের হরিণা গ্রাম নাই; তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার আর যাহারা ছিলেন—কোথায় লইয়া গিয়া তাহাদিগকে তোমায় দেখাইব? তাহারা কোথায় আশ্রয় নিয়াছেন—কেহতো এখন তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারিবে না!—"

বালিকা সকল কথা না বুঝিয়াই কাঁদিতে লাগিল। তারপর কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

মালঙ্কার হরিহর ঘোষাল একজন সঙ্গতি সম্পন্ন তালুকদার। বৃদ্ধ বালকদাস বাবাজীর আখড়া ঘোষাল বাবুদেরই এলকায়। বাবাজীর চেলাদের ইচ্ছা ছিল, প্রফুল্লকে আখড়ায়ই রাখিয়া দেয়; বালকদাস তাহা ভাল মনে করে নাই। বালকদাস আখড়ায় পঁহুছিয়াই প্রফুল্লকে লইয়া গিয়া হরিহর বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। এবং সে প্রফুল্লকে কি প্রকারে পাইয়াছে, সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলিল।

হরিহর বালকদাসের নিকট সকল কথা শুনিয়া এবং প্রফুল্লকে কায়স্থ কন্যা জানিয়া তাঁহার নিজ কন্যা যমুনাকে ডাকাইয়া আনিলেন। যমুনা প্রফুল্লর সমবয়স্কা এবং তাহারই মত সুন্দরী মেয়ে।

যমুনা আসিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রফুল্লর সহিত ভাব করিয়া লইল; তারপর তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

বালকদাস বলিলেন—"তবে মেয়েটী এখানেই থাক, দেখি তাহার কোন আত্মীয় স্বগণের খোঁজ খবর করিতে পারি কিনা?

হরিহর সম্মতির হাসি হাসিয়া বলিলেন 'থাক্, আপত্তি কি? তবে বয়সকালে ভাল থাকিলেই ভাল। তুমি মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইও। এবং তার আত্মীয় স্বজনের খবর লইতে চেষ্টা করিও।"

বালকদাস বলিলেন—"মেয়েটী কেবলি কাঁদে, আর তার দোষই বা কি, ছেলে মানুষ—মা বাপের কোল হইতে ঘুমের ঘোরে সর্ব্বনাশ—"

হরিহর বলিলেন—"সেতো ঠিক কথা—আহা হা! কি ভীষণ দুর্ঘটনাই হইয়া গিয়াছে, এবার দৌলতখাঁর প্রলয়ে—শোনা যায় আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ প্রাণী মারা গিয়াছে।"

বালকদাস বলিল—"সেতো স্বচক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছি—মরার উপর মরা স্তূপ হইয়া পড়িয়া আছে; মেঘনার জলে মৃত দেহের দুর্গন্ধে নৌকা ভাসাইবার উপায় নাই। সে অঞ্চলের দুই চার দশটী লোকও রক্ষা পাইয়াছে কি না সন্দেহ। মধ্যরাত্রে সমুদ্রের জলে বান ডাকিয়া সারা দেশ ডুবাইয়া ফেলিয়াছিল—মানুষ গরু বাঁধা অবস্থায় ডুবিয়া মরিয়াছে—ইহা মহাপ্রলয়—শাস্ত্রের কথিত মন্বন্তর।"

হরিহর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"হরিণা গ্রামের অবস্থা কেমন দেখিলে?"

বালকদাস—"হরিণাতো দৌলতখাঁর মোহনাতেই ছিল—দূরের গ্রামগুলিরও বড় বড় দুই চারিটা গাছ ব্যতীত গ্রামের চিহ্ন কিছুই নাই; ঘর দরজার অবস্থা বলিব কি ভিটের মাটি পর্য্যন্ত উৎখাত করিয়া সমভূমি করিয়া দিয়া গিয়াছে—না দেখিলে তেমন ঘটনা প্রত্যয় করা যায় না; অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।"

বালকদাস বিদায় হইবার পূর্ব্বে হরিহর যমুনা ও প্রফুল্লকে ডাকাইয়া আনিলেন।

যমুনা আসিয়া বাবার নিকট সোহাগের সুরে বলিল—"বাবা, ওর সঙ্গে আমার মিল হইয়াছে ও আমাদের এখানেই আজ থাক্ বাবা!"

বালকদাস প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি মা, এখানে থাকিবে কি?"

প্রফুল্ল মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বালকদাস সাশ্রুনয়নে বলিল—"আমি মাঝে মাঝে আসিয়া, দেখিয়া যাইব; কোন ভয়ের কারণ নাই; যখন যাহা বলিতে হয়, কর্ত্তা বাবাকে বলিও; তিনি তোমাকে তাঁহার এই মেয়েটীর মতনই দেখিবেন। আমি তোমার মা ও বাবার খোঁজ করিব।"

প্রফুল্ল মা ও বাবার কথা শুনিয়া অশ্রু পূর্ণ নয়নে নীচের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন যমুনা তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

হরিহর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া—রক্ষা করাই মনুষ্যত্বের নিদর্শন—"

বালকদাস তাহার তালুকদারকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

৪

হরিহর বাবু সম্রান্ত তালুকদার হইলেও তাঁহার বাড়ীতে দাস দাসীর কারবার ছিলনা। পূর্ব্ব পুরুষেরা যে ক্রীতদাস রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন সেই ক্রীতদাস দিগের বংশধরেরাই বর্ত্তমানে 'নানকার' প্রজা হইয়া তাঁহার বসত-বাড়ীর চারিদিকে ভিটি লইয়াছিল এবং ডাকে হাঁকে কাজ কর্ম্ম করিয়া দিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিত।

তখন গৃহিণীরা নিজে জল আনিতেন, মসলা পিসিতেন, ঘর লেপিতেন, বাসন ধুইতেন। এগুলি ছিল তাঁহাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। ইহার উপর প্রয়োজন হইলে চিড়া কুটা, ধান ভানাও চলিত, তাহাতে ও ধনী বা সম্মানী ঘরের গৃহিণীদের সম্মানে আঘাত লাগিবার কোন কারণ হইত না। ভাণ্ডারী বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা প্রয়োজন মত সাহায্য করিত মাত্র।

বাড়ীর কর্ত্তারাও তখন নিজ হস্তে সকল কর্ম্ম করিতেন। কেবল কোন ভদ্রলোক গৃহে আসিলে ভাণ্ডারী বাড়ী হইতে লোক ডাকাইয়া আনিয়া সে দিনের বা সে সময়ের কাজ করাইয়া লওয়া হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পূর্ব্ব বঙ্গের প্রায় সমস্ত তালুকদার গৃহেই এইরূপ প্রথা বিদ্যমানছিল। এই প্রথা কৃপণতা হইতে উদ্ভূত ছিলনা; শক্তির সদ্‌ব্যবহারই ছিল ইহার উদ্দেশ্য।

প্রফুল্ল যমুনার 'সই' হইয়া এবং যমুনার মা'র মিষ্টি স্নেহের অংশ পাইয়া অল্প দিনের মধ্যেই পিতামাতার অভাব ভুলিয়া গেল। এখন সে যমুনার সহিত প্রতিদিন কলসি ভরিয়া জল আনে, বাসন ধোয়, ঘর লেপে, গৃহ কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া কে কোন কাজ বেশী করিতে পারে—আড়ি করিয়া করে; দ্বিপ্রহরে দুই সইতে দশপঁচিশ,

ঘাষবন্দী প্রভৃতি খেলা খেলে এবং বাঁশের ও বেতের ডালা, পাখা, ঝাঁকা, খেজুরের পাতার ঝাড়ুনী প্রভৃতি নানা রকমের জিনিস প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে। তারপর রাত্রিতে আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজপুত্র ও রাজকন্যার গল্প, বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর গল্প, মনের নাও পবনের বৈঠার গল্প, করে।

বাবাজী আসিয়া মাঝে মাঝে প্রফুল্লকে দেখিয়া যায়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সাহায্য করে। ঘোষাল বাবু ও তাহাকে যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখেন।

যমুনার দাদা মন্মথ ঢাকা থাকিয়া স্কুলে পড়িত। সে শীতের বস্ত্রে ও পূজার বস্ত্রে যে কোন দ্রব্য আনিত তাহা সমান দুই ভাগে আনিত। যমুনা ও প্রফুল্ল তাহার সমান আদর ও স্নেহের অধিকারিণী হইয়াছিল।

মন্মথ বাড়ীতে আসিলে যমুনা ও প্রফুল্লর আনন্দের সীমা থাকিত না। তখন খেলা ও গল্পের তুফান চলিত। মন্মথ দুজনাকেই সমানে লেখা পড়া শিখাইয়াছিল। মেয়েদের লেখা পড়া শিক্ষায় মন্মথর মা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন—লেখাপড়া শিখিয়া যমুনা ও প্রফুল্ল বেশ সুন্দর সুর করিয়া তাহাকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইতেছে—তখন তাঁহার আর তাহাতে আপত্তি রহিলনা। তিনি ও তাহাদের নিকট হইতে একটু একটু করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ সুখের কোলে ও সোহাগের পরশে প্রফুল্লর বালিকা জীবন ঘোষাল গৃহে দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

রবির কাণ্ড।

(ফরাসী হইতে)

নিশি-রত্নাকর তীরে আরক্ত লজ্জায়
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে রবি, হরণে মদন,
দিল ডুব মনোসাধে ডুবুরীর প্রায়,
অমনি উঠিল রত্ন তারা অগণন।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় বিদ্যানন্দ।

সার উইলিয়ম হার্সেল।

বর্ত্তমান যুগের জ্যোতিষী-আবিষ্কারের মধ্যে ইউরেনাস আবিষ্কারই সর্ব্ব প্রথম। এই আবিষ্কার বৃত্তান্ত অবগত হইতে সকলেরই কৌতুহল জন্মিবার কথা। কিন্তু এই আবিষ্কার বিস্তৃত ভাবে জানিতে হইলে জ্যোতির্ব্বিদ হার্সেলের জীবন চরিত জানিতে হয়। তাই এই জীবন চরিত পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করা গেল।

বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ উইলিয়াম হার্সেল ১৭৩৮ খৃঃ অঃ হেনোভারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সুচতুর লোকছিলেন। তিনি সঙ্গীতাচার্য্যের কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। তাঁহার ১০টী সন্তানের মধ্যে হার্সেল চতুর্থ। তাঁহার সন্তানগণ সকলেই পিতার সঙ্গীত শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। উইলিয়ামের সঙ্গীত ও দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বাল্য কাল হইতেই এক অদম্য ইচ্ছাছিল। ফলে তিনি অল্পদিনের ভিতরেই তাঁহার শিক্ষক যাহা জানিতেন তাহা শিখিয়া ফেলিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি বাঁশী ও বেহালা বাজাইতে সুদক্ষ হইলেন এবং হেনোভার রাজ দরবারে ও সৈনিক বিভাগে বাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে ফরাসীরা হেনোভার আক্রমণ করিয়া হেনোভারের সৈন্যদল পরাভূত করিল। যুবক হার্সেল এই যুদ্ধ ব্যাপারে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় অন্যবিধ জীবনোপায় অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়া তিনি সৈনিক বিভাগ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া ইংলণ্ডে চলিয়া আসিলেন। কথিত আছে যে এই ঘটনার ২০ বৎসর পরে সম্রাট তৃতীয় জর্জ্জ সৈন্যদল হইতে পলাইবার জন্য হার্সেলকে নিজহস্তে যথা বিধি ক্ষমাপত্র প্রদান করেন।

১৯ বৎসর বয়সে বাদক উইলিয়াম নিজ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি প্রথমতঃ অত্যন্ত কষ্টে পড়েন; কিন্তু কৌশল ও অধ্যবসায় দ্বারা সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া তিনি ২৩বৎসর বয়সে ব্যবসায় সুবিধা করিয়া ইংলণ্ডে স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। ১৭৬৬ সনে হার্সেল একটু উন্নত অবস্থায় বাথ নগরের

গির্জার বাদকের কার্য্য করিতেন, তথায় অনেক ছাত্রকে বাদ্য শিক্ষাদিতেন ও বাদ্যযন্ত্র মেরামত করিতেন। এই ব্যবসায় অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেও তাঁহার বাল্যজীবনের প্রবল জ্ঞান পিপাসা বর্ত্তমান ছিল, তিনি মুহূর্ত্ত সময় অবসর পাইলে তাহাই পাঠে নিয়োগ করিতেন। ললিতকলার পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য তাহার গণিত অধ্যয়ন করিতে হয়। অঙ্কশাস্ত্র হইতে দৃষ্টি-বিজ্ঞান, দৃষ্টি-বিজ্ঞান হইতে দূরবীক্ষণ এবং অবশেষে দূরবীক্ষণ হইতে তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার জ্যোতিষের প্রারম্ভ অতি সাধারণ। সামান্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র যোগে তিনি নভোমণ্ডলের প্রথম দৃশ্য অবলোকন করেন। অতি পূর্ব্বে নির্ম্মলগগণে কতবার কত সহস্র ২ নক্ষত্ররাজি অবলোকন করিয়াছেন; কিন্তু আজ সামান্য যন্ত্র সাহায্যে নক্ষত্রের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাইয়া মোহিত হইলেন। যে সকল নক্ষত্র পূর্ব্বে ক্ষীণপ্রভ ছিল তাহারা উজ্জ্বল বোধ হইল। এবং অসংখ্য নক্ষত্র যাহা পূর্ব্বে নগ্নচক্ষে দেখা যায় নাই, তাহা দৃষ্টি পথে পতিত হইল। যাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বোধের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা আছে তাহার নিকট এই দৃশ্য অতি মনোহর। ইহা দেখিয়া হার্সেলের জীবন পরিবর্ত্তিত হইল। ক্রমে তাহার প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীত শিক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দকে বিস্মৃত হইয়া তিনি বাকী জীবন বিজ্ঞানের এক উন্নত শাখায় নিয়োজিত করিলেন।

হার্সেল ঐ ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ দূরবীক্ষণ দ্বারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি লণ্ডনে একটী ভাল যন্ত্র ক্রয় করিবার জন্য লিখিলেন; কিন্তু উহার দাম অত্যন্ত অধিক বোধ হওয়াতে তিনি নিজেই একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিতে মনন করিলেন। এই সঙ্কল্পই বিজ্ঞানজগৎ ও হার্সেলের উভয়ের মঙ্গল জনক হইল। একজন সঙ্গীত শিক্ষক দিবানিশি নিজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কারুকার্য্য ও অক্ষি বিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও যেস্থলে শিল্প কার্য্যের অসাধারণ নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতা ও অধ্যবসায় দুস্তর বাধা বিঘ্নকে গ্রাহ্য করেনা। বাথ নগরের বাদ্যদলের পূর্ণ উন্নতির সময়ে তথাকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে ফিরিয়া যন্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়াই তিনি চোঙ ঘর্ষণ ও কাঁচ মসৃণ করিতে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেন। হার্সেল দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিতে যেরূপ ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত কার্য্য করিতেছিলেন, এরূপ অধ্যবসায় বোধ হয় কোন পুরাকালের ভুয়া রাসায়নিক শিশাকে স্বর্ণে পরিণতঃ করিবার চেষ্টাতে নিয়োগ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

হার্সেল তাঁহার গৃহকে একটী কারখানায় পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহার বসিবার ঘর মিস্ত্রিখানায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা শুধু উৎকৃষ্ট নহে—অত্যুৎকৃষ্ট হওয়া চাই। তাঁহার এই অক্লান্ত অধ্যবসায় সফলকাম হইল—তিনি তৎকালিক পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিলেন।

যখন প্রচারিত হইল যে হার্সেল তাঁহার নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাই নূতন নূতনতত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তখন সকলেই তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত যন্ত্র ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। তিনি প্রায় ৮০টী বড় এবং অনেকগুলি ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছিলেন। ইহার অনেকগুলি বিদেশের রাজন্যবর্গ ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহই বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না, তবে এই বিক্রয়ে হার্সেলের যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। হার্সেল মধ্য জীবন পর্য্যন্ত জনসাধারণের নিকট কেবলমাত্র একজন পরিশ্রমী ও উৎকৃষ্ট বাদ্যকর বলিয়া খ্যাতছিলেন। তাঁহার এই খ্যাতি কেবল বাথ সহরে নহে পশ্চিম ইংলণ্ডেও ব্যাপৃতছিল। তিনি তখন অবসর সময়েই দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতেন, তাঁহার এই কার্য্যের খবর যাহারা তাঁহাকে গায়ক বলিয়া সম্মান করিতেন তাহাদের অনেকে জানিতেন না। ১৭৭৪ সনে হার্সেল তাঁহার নিজ নির্ম্মিত একটী দূরবীক্ষণ দ্বারা নভোমণ্ডল প্রথম পর্য্যবেক্ষণ করেন। ক্রমে অভিজ্ঞতার সঙ্গে ২ যন্ত্রের উন্নতি করিতে থাকেন। তাঁহার উৎসাহে বহু উৎসাহী ব্যক্তি এই কার্য্যে আকৃষ্ট হন। সার উইলিয়াম ওয়াটসনের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় তাহার একটী নিদর্শন।

একদা হার্সেল চন্দ্রমণ্ডলের পর্ব্বত শ্রেণী পর্য্যবেক্ষণ

করিতেছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে লাগিল তখন গৃহ ছাড়িয়া রাস্তাতে যন্ত্র স্থাপন করিয়া তাঁহাকে চন্দ্রমণ্ডল দেখিতে হইয়াছিল। সে সময়ে সার উইলিয়াম ঘটনাক্রমে সেই রাস্তায় যাইতেছিলেন। তিনি গভীর রাত্রিতে এক অদ্ভুত যন্ত্র নিয়া এক ব্যক্তিকে পথের উপরে বসিয়া কার্য্য করিতে দেখিয়া অবাক হইলেন। তাঁহার জ্যোতিষ সম্বন্ধে একটু জ্ঞান ছিল, তিনি দাঁড়াইলেন। তখন সার উইলিয়াম ওয়াটসন উক্ত যন্ত্রদ্বারা একবার চন্দ্র মণ্ডল দেখিবার অনুমতি চাহিলেন। হার্সেল তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ যন্ত্র ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপ কার্য্যে ওয়াটসনের আগ্রহ দেখিয়া হার্সেল সার উইলিয়ামের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং সার উইলিয়ামও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হওয়াতে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল। এই বন্ধুতাই হার্সেলের ভবিষ্যৎ জীবনে মহা শুভফল প্রসব করিয়াছিল।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে হার্সেল নিখুঁত রকমের একটী যন্ত্র দ্বারা নক্ষত্র মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৭৮১সনের ১৩ইমার্চ্চ শুভক্ষণে হার্সেলের যন্ত্র যখন মিথুন রাশিতে স্থাপিত করিয়া (Constilation Gemini) একটী একটী করিয়া নক্ষত্র রাজি দেখিয়া যাইতেছিলেন। তখন এরূপ একটী পদার্থ তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইল যাহা অপর নক্ষত্র হইতে কিছু স্বতন্ত্র। ইহা কেবল একটী আলোক বিন্দু নহে। ছোট হইলেও উহার একটী পরিধি আছে। প্রশ্ন উঠিল—যদি ইহা নক্ষত্র না হয় তবে উহা কি? রাত্রির পর রাত্রি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার আর একটী বিশেষত্ব দেখা গেল যে উহা অপর নক্ষত্রের মত স্থির নহে; উহা স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। তখন উহা স্থির বুঝা গেল যে নবাবিষ্কৃত পদার্থটী আমাদের সৌর জগতেরই অন্তর্ভুক্ত আর একটী কোন পদার্থ। যাহা হউক তাহা বুঝিতে হার্সেলের আরও কতিপয় মাস অতি বাহিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি একটী বিশাল গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন—যাহা শনি গ্রহেরও বহির্ভাগ দিয়া পরিভ্রমণ করে। তিনি প্রথমতঃ ইহাকে একটী পুচ্ছশূন্য ধূমকেতু মনে করিয়াছিলেন। এরূপ মনে করার কারণও ছিল; কাযেই উহা প্রথমতঃ ধূমকেতু বলিয়াই প্রচারিত হইল। ক্রমে উহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেং গণিত শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ উহার কক্ষ আবিষ্কার করিলেন। তখন দেখা গেল এই বিশাল গ্রহ শনিগ্রহের বহু লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করিয়া সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পূর্ব্বে লোকের শনিগ্রহকে সৌর জগতের সীমান্ত গ্রহ বলিয়া ধারণাছিল; এখন সেই সংস্কার দূর হইল। ইহা আয়তনে শনি ও বৃহস্পতি হইতে কিঞ্চিৎ ছোট বটে; কিন্তু মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও পৃথিবী হইতে বড়। খালি চক্ষে আমরা উহাকে কদাচিৎ দেখিতে পাই। এই বিশাল গ্রহ বহুকোটী মাইল দূরে অবস্থান করিয়া ৮৪ বৎসরে সূর্য্যমণ্ডলকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে কপারনিকাস, কেপলার, গেলিলীও কিম্বা নিউটনের আবিষ্কার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে সন্দেহ নাই; হার্সেলের আবিষ্কার ইহা হইতে স্বতন্ত্র। মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহ সমূহও অবশ্যই কেহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু ইতিহাসে তাহাদের কোন নাম উল্লেখ নাই। ঐ সকল আবিষ্কার কোন্ যুগে কে করিয়াছিলেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু হার্সেলের আবিষ্কার ঐতিহাসিক যুগে প্রথম।

এইরূপে বাথ সহরের একজন গায়ক—যাঁহার নাম পূর্ব্বে কেহ জানিত না—পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্টনামা হইয়া উঠিলেন। জগতের চারিদিক হইতে বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। হার্সেল কি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজ মুখে শুনিবার জন্য সম্রাট তৃতীয় জর্জ্জ তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আসিতে আদেশ করিলেন। হার্সেল একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও সৌরজগতের একখানা মানচিত্র সহ সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট হার্সেলের বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। উইণ্ডসার প্রাসাদে দূরবীক্ষণ স্থাপিত হইল। হার্সেল সম্রাটকে শনি প্রভৃতি গ্রহসমূহ দেখাইলেন। কথিত আছে রাণী এবং তাঁহার সখিবৃন্দ সম্রাট যাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন তাহা দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়িলে, পর দিবস রাণীর এক কক্ষের

বাতায়ণ পথে দূরবীক্ষণ স্থাপিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অপরাহ্ন হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, একটী নক্ষত্রও দেখা গেল না। এইরূপ ঘটনা জ্যোতির্ব্বিদদের পক্ষে নূতন নহে; কিন্তু হার্সেল ইহাতে দমিত হইবার নহেন। তিনি মহিলাদিগকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির নির্ম্মাণ কৌশল, কাঁচখণ্ডের কি কাজ এবং কিরূপে উহা মসৃণ করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয় বুঝাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু সময় অতিবাহিত করিয়াও যখন দেখা গেল, মেঘ অপসৃত হইতেছেনা, তখন তিনি প্রস্তাব করিলেন যে যখন প্রকৃত শনিগ্রহ দেখিবার আর সেদিন সম্ভাবনা নাই তিনি তাঁহাদিগকে কৃত্রিম শনিগ্রহ দেখাইবেন। অনুমতি পাওয়া মাত্র তিনি আকাশের দিক হইতে বাগানের এক সুদূর দেয়ালের দিকে দূরবীক্ষণের মুখ ফিরাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তেই শনিগ্রহ সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। গ্রহের মণ্ডল ও চক্র সমূহ এরূপ যথা যথ দেখাইতে লাগিল যে উহা দেখিয়া একজন সুচতুর জ্যোতির্ব্বিদেরও ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বাহ্নে হার্সেল যখন বুঝিয়াছিলেন যে রাত্রিতে মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার সম্ভাবনা, তখন তিনি একখানা বোর্ডে ছিদ্র কাটিয়া শনিগ্রহের অনুরূপ করিয়াছিলেন, এবং উহা বাগানের সুদূর দেওয়াল গাত্রে রাখিয়া উহার পশ্চাতে একটী আলো রাখিয়াছিলেন। দূরবীক্ষণ যোগে এখন উহাই শনিগ্রহের প্রতিরূপ দেখা যাইতে লাগিল।

হার্সেলের উইণ্ডসর প্রাসাদে আগমণ—হার্সেল ও বিজ্ঞানজগৎ উভয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক হইল। রাজার মনে ভাল ধারণা জন্মাতে তিনি হার্সেলকে উইণ্ডসার প্রাসাদে রাজজ্যোতির্ব্বিদ নিযুক্ত করিলেন। দূরবীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্র বসাইবার খরচ রাজা বহন করিলেন এবং সামান্য ভাবে সংসার চলিতে পারে এজন্য হার্সেলের বেতন বৎসর ১০০ শত পাউণ্ড নির্দ্ধারণ করিয়াদিলেন। হার্সেল তাঁহার এই দুঃখের কথা কেবল মাত্র তাঁহার বদান্য বন্ধু সার উইলিয়াম ওয়াটসনকে বলিয়াছিলেন। সারউইলিয়াম ওয়াটসন ইহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, "কোন সম্রাটই এত সুলভ মূল্যে সম্মান ক্রয় করেন নাই।" হার্সেল অপর সকলের নিকট প্রকাশ করিতেন যে রাজা তাঁহাকে প্রচুর অর্থই দিয়া থাকেন। এই কার্য্য গ্রহণ করাতে হার্সেলের সমূহ আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল। কারণ ইহার জন্য তাঁহাকে বাথ নগরের যে বাদকের কার্য্যত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইত।

হার্সেল জ্যোতিষ চর্চ্চাকেই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। তিনি প্রৌঢ় হইয়াছিলেন, জীবনের অর্দ্ধাধিক কাটিয়া গিয়াছিল, তথাপি দ্বিগুণ উৎসাহে নূতন কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত গ্রহটীর নাম দেওয়া হইয়াছিল ইউরেনাস। ইউরেনাস পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে বর্ত্তমান অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দ্বারাও তাহা সুস্পষ্ট দেখা যায় না। ইউরেনাসের পরিধি ৩১ লক্ষ ৭ হাজার মাইল স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহার আয়তন পৃথিবীর ৬৪ গুণ। ইউরেনাসের উপাদান পৃথিবীর উপাদান হইতে অত্যন্ত লঘু। কাযেই যদিও উহা পৃথিবী হইতে ৬৪ গুণ বড় তথাপি উহা পৃথিবী হইতে মাত্র ১৫ গুণ ভারি।

অন্যান্য গ্রহদৃষ্টে অনুমিত হয় যে ইউরেনাসেরও পরিভ্রমণের জন্য একটি কক্ষ আছে। যে গ্রহটী এত ক্ষুদ্র ও অস্পষ্ট দেখা যায়, তাহার গতি নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে অনুমিত হয় যে একরূপ অপার্থিব গ্যাসে ইউরেনাস আচ্ছাদিত।

এইসুদূর গ্রহ ইউরেনাসেরও ৪টী চন্দ্র আছে। এই চন্দ্র ৪টীর নাম, এরিয়েল, আমব্রিয়েল, টিটেনিয়া ও ওবেরণ উহাদের সর্ব্ব নিকটস্থ এরিয়েল ২ দিন ১২ ঘণ্টায় ইউরেনাসকে প্রদক্ষিণ করে এবং দূরতম ও[illegible]ের প্রদক্ষিণে ১৩ দিন ১১ ঘণ্টা লাগে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

চাহার গুলজার সুজা-ই।

চাহার গুলজার সুজা-ই—(সুজা উদ্দৌলার গোলাপ বাগান চতুষ্টয়) একখানা ইতিহাস গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা হরিচরণ দাস। দাস মহাশয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল দিল্লী প্রদেশে। অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলার বৃত্তি ভোগ করিতে থাকিয়া অশীতি বর্ষ বয়সে বৃদ্ধ ঐতিহাসিক মাতৃভূমি ভারতবর্ষের এই বিরাট ইতিহাস খানার রচনা শেষ করিয়া গিয়াছিলেন। এই বিরাট গ্রন্থ পাঁচটী সুবৃহৎ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল।

দাস মহাশয় হিন্দু হইলেও হিন্দুস্থানের প্রাচীন ইতিহাস ভাগ তিনি মুসলমান কবি ফৈজির পারস্য ভাষায় অনুদিত রামায়ণ, মহাভারত, যোগবাশিষ্ঠ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন ; সুতরাং ঐ গ্রন্থের প্রাচীন ঐতিহাসিক অংশের জন্য তিনি অবশ্যই তেমন দায়ী নহেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির তিনি সমসাময়িক ব্যক্তি। সমসাময়িক লেখকের উক্তিকে যদিও সকল অবস্থাতেই প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা নিরাপদ জনক নয়, তথাপি অনেক শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে 'সমসাময়িক লেখকের উক্তি সমধিক প্রামাণ্য।'

এই মতের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক হরিচরণ দাস মহাশয়ের "গুলজার" হইতে কয়েকটী ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সিরাজের পলায়ন।

"সিরাজউদ্দৌলা পলায়ন করিলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ইংরাজ ও জাফর আলীর মধ্যে বিভাগ হইয়া গেল। তিনি পলাইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে গিয়া তামাকের জন্য লালায়িত হইয়া উঠেন। এবং সঙ্গীয় ভৃত্যকে অগ্নি সংগ্রহের জন্য নিকটবর্ত্তী বনে পাঠাইয়া দেন। সেই বনে এক দরবেশের কুটীর ছিল। ভৃত্য কুটীরের সম্মুখে যাইয়া অগ্নিপ্রার্থী হইলে, ভৃত্যকে দেখিয়া দরবেশ চমকিত হইয়া উঠিল।

কথিত আছে যে এই দরবেশও এক সময় সিরাজ উদ্দৌলার ভৃত্য ছিল। কোন ত্রুটীর জন্য নবাব তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিলে সে ফকিরি অবলম্বন করে এবং এই অরণ্যে আসিয়া বাস করিতে থাকে।

নবাবের ভৃত্যকে সে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল। তখন সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল—বেকুব ভৃত্যটীও সরল ভাবে সকল কথা বিবৃত করিল। তখন দরবেশ ভৃত্যকে কুটীরে বসাইয়া রাখিয়া ত্বরিত পদে নিকটবর্ত্তী শাসনকর্ত্তার নিকট যাইয়া নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার খবর বলিল। শাসনকর্ত্তাও সেই দিনই পলায়িত নবাবের অনুসন্ধান জন্য পরওয়ানা পাইয়াছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি নৌকায় চড়িয়া আসিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে বন্দী করিলেন এবং অনুচরগণসহ জাফরআলী খাঁর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। জাফর আলি সিরাজকে ১১৬০ হিজরা অব্দে হত্যা করিয়াছিলেন।"

ঐতিহাসিক দাস মহাশয় এই ঘটনাকে ১১৬০ হিজরা অব্দের (১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ) ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইংরেজ চরিত্র।

ঐতিহাসিক দাস মহাশয় ইংরেজের উপর বড়ই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—শোনা যায় ইংরেজেরা এতই ন্যায়বান ও সৎ যে তাঁহারা তাঁহাদের শাসনাধীন স্থানের কোন ধনবান, বণিক বা সামান্য লোকের সম্পত্তির প্রতিও লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকান না। পরন্তু ঐ সকল ব্যক্তিদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকেন। তাঁহারা অত্যাচারী নহেন—সততা এবং ন্যায় বিচারই তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহারা সুখী হউন। এবং এইরূপ সত্য পথেই পরিচালিত হউন।"

ইংরেজের প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াও ঐতিহাসিক দাস মহাশয় গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংসকে বন্দী করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ।

"মিঃ হেষ্টিংস—যিনি কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন—তিনিই ইংলণ্ডের রাজা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ,

মুর্শিদাবাদ ও পাটনার গবর্ণর নিযুক্ত হন। এবং অবশেষে ইংলণ্ডেশ্বরের অবাধ্য হইয়া তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করেন। ইংলণ্ডেশ্বর তখন তাঁহার স্থলে অন্য একজন শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করেন; ঐ নূতন শাসনকর্ত্তা কলিকাতা পঁহুছিয়া যখন মিঃ হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন তিনি সেই নূতন শাসনকর্ত্তাকে তাহার অনুচরগণ দ্বারা হত্যা করাইলেন।

ইহার পর ইংলণ্ডের রাজা অন্য একজন শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করেন। তিনি আসিলেও হেষ্টিংস গবর্ণরী পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে দুই জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের (duel) ব্যবস্থা হয়। স্থির হয় যে যুদ্ধে জয়লাভ করিবে, সেই গবর্ণর হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হেষ্টিংস জয়লাভ করেন এবং প্রতিপক্ষকে পিস্তলের গুলিতে আহত করেন। সুতরাং এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও উপায়হীন হইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

ইংলণ্ডেশ্বর তখন নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি প্রায় চারি শত ইয়ুরোপীয় সৈন্যে এক জাহাজ বোঝাই করিয়া তাহা মিঃ মেকফার্সনের নেতৃত্বে কলিকাতা পাঠাইয়া দেন। এই সঙ্গে মিঃ হেষ্টিংসের নামেও এক চিঠি প্রেরণ করেন। সেই চিঠিতে এইরূপ লিখা থাকে যে "আপনাকে এই সময় অনেক যুদ্ধ করিতে হইবে সুতরাং আপনার সাহায্য জন্য মিঃ মেকফার্সন সৈন্যদলসহ প্রেরিত হইলেন। আপনি প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।" মিঃ মেকফার্সনকে কিন্তু গুপ্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে মিঃ হেষ্টিংসকে বন্দী করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের নিকটে প্রেরণ করা হয়।

মেকফার্সন কলিকাতার নিকট পঁহুছিয়াই রাজার চিঠি মিঃ হেষ্টিংসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার সম্মান-অভিবাদন স্বরূপ নিজ জাহাজ হইতে কামান ধ্বনি করিলেন।

চিঠি পাইয়া মিঃ হেষ্টিংস সরকারী কর্ম্মচারীগণে পরিবৃত হইয়া মেকফার্সনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন করিতে যাত্রা করিলেন। উভয়ের সাক্ষাতে উভয় উভয়কে যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

মিঃ হেষ্টিংস নৌকা হইতে তাহাকে অবতরণ করা মাত্র মেকফার্সন হেষ্টিংসকে বন্দী করিতে আদেশ করিলেন; আদেশ প্রতিপালিত হইল। তখন মেকফার্সন ইংলণ্ডেশ্বরের উভয় আদেশ (হেষ্টিংসকে বন্দী করিবার ও মেকফার্সনের গবর্ণরী পদের) দেখাইলেন। হেষ্টিংসের তখন আর আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত উপায় রহিল না। অগত্যা তিনি তাহাই করিলেন।

তখন মেকফার্সন হেষ্টিংসকে উপযুক্ত পাহারা বন্দী করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন।"

সমসাময়িক ঐতিহাসিকের উপর শ্রদ্ধা রাখিতে হইলে এ ঐতিহাসিক তত্ত্ব উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

'গুলজারের' পরিচয় আজ আপাততঃ এই পর্য্যন্তই দেওয়া গেল। এখন বর্ত্তমান ইতিহাস লেখকগণ 'কোন কথা' হইতে 'কোন কথার' উৎপত্তি—বিচার করিয়া দেখুন। 'যাহা রটে তাহা বটে' বলিয়া যে সকল লেখক কিম্বদন্তী হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত তাঁহাদেরও ভাবিবার মত অনেক বিষয় ইহাতে আছে।

আমার ত্রি-দশা।

আদ্য দশা।

(১)

আমি ছোট বেলা হইতেই কিছু স্বতন্ত্র রকমের ছিলাম। আমার মতগুলি বড় কাহারও সহিত মিলিত না। বাড়ী গেলে পাড়া প্রতিবাসীরা আমাকে "ব্রহ্মজ্ঞানী" বলিয়া ঠাট্টা করিত। আমার দোষগুলির মধ্যে একটা ছিল কি— আমি স্ত্রী জাতিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম। জানিনা বিধাতার এই উদার সরল সৃষ্টির প্রতি আমার এ অশ্রদ্ধার কি প্রচুর কারণ ছিল? আমার মনে অহরহ জাগিত;—

"কি মত্র হেয়ং? * * * কান্তা।
কাশৃঙ্খলা প্রাণ ভৃতাংহি? নারী।
ত্যাজ্যং সুখং কিং? রমণী প্রসঙ্গঃ।
দ্বারং কিমেবনরকস্য? নারী।
সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা? স্ত্রী।
বিজ্ঞান্মহা বিজ্ঞতমেহস্তি কোবা?
নার্য্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ।"

বাড়ী আসিলেই মা আমার নিকট বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিতেন; কিন্তু আমার সর্ব্বদাই সেই এক বুলি, "এ জীবনে বিবাহ করিব না।" মা কত বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু আমি সে রকম কথার আমেজ পাইলেই পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতাম। মা'র সে প্রস্তাব শূন্যে উড়িয়া যাইত।

(২)

পিতৃদেব মহকুমায় হাটিয়া হাটিয়া যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, এতদিনে আমার উপর আসিয়া তাহার ফল ভোগের পালা পড়িল। একদিন শয়ন করিয়া সে বিরাট কাণ্ড কারখানাটার বিষয় একটু পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম—এমন সময় মা আসিয়া আমার নিকটে উপবেশন করিলেন।

মা আমার হাত ধরিয়া বলিলেন:—"সুরেন! আমি তোমার গর্ভধারিণী জননী, আমার কথাটা কি একবারও শুনিতে নাই?"

আজ আমি সংসারের কথাই ভাবিতেছিলাম, তাই মার কথাটা মনে লাগিল, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। মা বলিতে লাগিলেন:—"স্বর্গীয় কর্ত্তার আমলের যে ঋণ আছে, তা তুমি জান, এখন সকল পাওনাদারই যার তার প্রাপ্য আদায় জন্য নালিস করিতে চাহিতেছে, ইহার কি কোন উপায় নাই?"

আমি রুক্ষ স্বরে বলিলাম,—"তবে কি তোমরা আমাকে বাঁদর নাচাইয়া সে দায়টা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাও নাকি?"

মা বলিলেন—"তা'তে তোমার পড়া শোনার কোন ক্ষতি হইবেনা। বর্ত্তমানে যে সম্বন্ধটা উপস্থিত, তাহা হইতে গেলে, তাঁহারা ঋণটা শোধ করিয়া দিতে প্রস্তুত, অধিকন্তু বিবাহ খরচ এবং তোমার কলেজ ব্যয়ও দিতে সম্মত আছে।"

কথা শুনিয়াই আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গেল। খুব আচ্ছা রকমে মাকে দু'চার কথা শুনাইয়া দিলাম।

এর পর যতদিন আমি বাড়ীতে ছিলাম, মা আর সে বিষয়ে কোন কথা তুলিলেন না। আমিও শুভে কুশলে বাড়ী ছাড়িলাম।

(৩)

এবার আমার এফ. এ. পরীক্ষার বার। এণ্ট্রেন্সে জলপানি ঘটিয়াছিল, তা'ই দুটা বৎসর চলিয়াছে, নতুবা দরজারই হোঁচট খাইয়া পড়িয়া থাকিতে হইত সন্দেহ নাই।

পরীক্ষার আর অল্পদিন বাকী। ফিয়ের টাকাটা এবার বাড়ী হইতেই যোগাড় করিতে হইবে। তাই মার নিকট অজস্র চিঠি লিখিয়া অস্থির হইয়া গেলাম—কোন উত্তর পাইলাম না।

একদিন হঠাৎ আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম আমার হাতে পড়িল! খুলিয়া পাঠ করিলাম, তাহাতে লিখাছিল—"বাড়ীঘর জায়গাজমি ঋণের দায়ে নীলাম হইয়া গিয়াছে। সত্বর চলিয়া আইস।"

টেলিগ্রামের মর্ম্ম অবগত হইয়া আমার মনে একটু দুঃখ হইল বটে কিন্তু যুগপৎ ঘৃণারও উদয় হইল। সেটা মার উপর—ততোধিক স্ত্রী জাতীয় গভীর স্বার্থপরতার প্রতি। আমার পরীক্ষার বছর, চিঠি লিখিয়া লিখিয়া ক্লান্ত হইলাম, তার কোন উত্তর নাই—'বাড়ী ঘর নিলাম হইয়াছে।' বেশ হইয়াছে।

আমার কিন্তু তখন সংসারের সহিত এইরূপই সম্বন্ধ ছিল। যাহা হউক, মার টেলিগ্রাম পাইয়া বাড়ী যাইতে হইল।

(৪)

বাড়ীতে আসিয়া আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিল। মা বলিলেন,—"আমরা এ বাড়ীতে আর থাকিতে পারিব না। বাড়ী, জমি, ঘর, দরজা সব নিলাম হইয়া গিয়াছে। ক্রেতা মহাশয় আসিয়া শীঘ্রই আমাদিগকে বাড়ী হইতে উঠাইয়া দিবেন।"

আমি কিছু নরম হইলাম। মাকে বলিলাম,—'যা করিতে হয়, এর মধ্যে করিয়া ফেল, আমি বেশীদিন বাড়ী থাকিতে পারিব না—পরীক্ষা নিকট।"

মা সেই বিবাহের কথাটা পাড়িলেন। আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"এসব কথা আমার নিকট আর বলিবার প্রয়োজন নাই—মাত্র সম্পত্তি ও বাড়ী রক্ষার জন্য আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত।"

আমার এ কথায় মা মনে মনে হাসিয়াছিলেন কিনা, আমি লক্ষ্য করি নাই।

(৫)

আমার বিবাহটা আমারই উপদেশ মত অতি সংক্ষেপেই হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমি কিছু স্বতন্ত্র রকমের লোক ছিলাম, কাজেই চির প্রচলিত রীতি অনুসরণের অনেকটা ব্যতিক্রম আমার বাড়ীতে লক্ষিত হইয়াছিল। বিবাহ বাসরে নব-প্রণয়িনীর প্রিয় সম্ভাষণের শুভ খবরটা আমার নিকট কেহ মুখ ফুটিয়া লইতে চেষ্টা করে নাই। জিজ্ঞাসা করিলে আমি যে কিছুই বলিতে পারিতাম না—সেটা সকলে বিশ্বাস করিতেন কি না—জানি না।

যে জন্ত আমার বিবাহ—সে কার্য্যটা বিবাহের পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল; আর যাহা কিছু বাকীছিল তাহা বিবাহের পর হইয়া গেল।

বিবাহ করিয়া আমার একটী নূতন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেটী—পূর্ব্বে বাড়ী আসিলে আমি বাড়ীর ভিতরে শয়ন করিতাম। বিবাহ করিয়া অবধি—শয্যাটী সরিয়া আসিয়াছে, এখন বাহির বাটীতে শয়ন করি। মা এর জন্ত অনেক বকিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই আমার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইল না।

আগামী কল্য শুভদিন। নবজীবনে কলেজে যাইব, একটা দিন চাই, তাই দিন দেখাইয়াছি। কাল সহরে যাইব। মার আজ বড়ই খেদ * * *। মনে মনে ভাবিলাম বাসর শয্যাটা যে ভাবে গেল এ রাতটাও সেই ভাবেই যাক্। বিলাতে ২০।৩০ বৎসরও স্বামী স্ত্রীতে বাক্যালাপ না করিয়া মানসিক দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারে, আর আমি একটা রাত পারিব না? নিরর্থক একটা সাধারণ বিষয়ের জন্ত মার প্রাণে কষ্ট দিই কেন? শয্যা পরিবর্ত্তন করিলাম।

মধ্য দশা।

(১)

যাওয়া হইল না। কেন যাওয়া হইল না, সে কথা মাকে কেমন করিয়া—কি বলিয়া বুঝাইব? সে বিষয়ে শুইয়া শুইয়া মুদ্রিত নয়নেই ধ্যান করিতেছিলাম, এমন সময় মা আসিয়া ডাকিলেন,—

"সুরেন! বেলা হইয়া গেল খাইবে কখন? যাত্রার সময় যে চারিদণ্ড মধ্যে।"

মার সাড়া পাইয়া আমি লজ্জায় অধীর হইয়া পড়িলাম, কি করি? কেমন করিয়া বলিব—"আমার যাওয়া হইল না।"

যাই হউক কোন প্রকারে বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম আমার শরীরটা যেন আজ কেমন কেমন করিতেছে মা!"

মা বলিলেন—"তবে আজ যাইয়া কাজ নাই।"
আমি বলিলাম—"দেখি"।—

মনে মনে ভাবিলাম—

"ঘরে লক্ষ্মী সরস্বতী, আমি অখিলের পতি,
হ'কগে এ বসুমতী যার খুসী তার।"

(২)

ক্রমে আমার অসুখ বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। আমার যে কি অসুখ, আমি নিজেই তাহা ঠিক বলিতে পারিতাম না। তবে এই মাত্র জানি, দিবসে উদর পূরণ এবং নিশীথে তৈল দাহনে আমার সে অসুখের বিন্দুমাত্রও বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপে সে বছরটী আমার সে উৎকট অসুখে অসুখেই মাটী হইয়া গেল।

এখন মাকে ধরিয়া মামার নিকট একখানা চিঠি লিখাইলাম। উদ্দেশ্ত—গবর্ণমেন্ট আফিসে যদি কোন কাজ কর্ম্ম মিলে।

মামার উত্তর আসিল, মামা লিখিয়াছেন—"এ বছর কোন কাজ পাওয়া যাইবেনা। এপ্রেন্টিস হইয়া যদি থাকিতে চাও, তবে পত্র পাঠ এখানে চলিয়া আইস।"

চিঠি পড়িয়া বাড়ীর উঠানটা প্রকৃতই উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল মহা-সমুদ্র বলিয়া আমার চক্ষে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমি কি করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। উৎকট অসুখে পড়িয়া হৃদয়ের যাবতীয় যন্ত্রগুলি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। মনে মনে ভাবিলাম —বিনা মাহিয়ানায় এপ্রেন্টিসই যদি হইতে হয়, তবে ত যে দিন যাওয়া যায় সেই দিনই হইতে পারিবে। অনর্থক এখন যাইয়া মাতুলের তণ্ডুল-রাশি ধ্বংশ করিব কেন?

অবশ্ত এগুলি মনে ভাবিবার তখন আর একটী

... কারণ ছিল—কএকটী সর্ব্বপ্রধান অভাবের চিন্তা আমাকে তখন বড়ই ভাবনাগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। ...গুলি—

চাপার "ওই আঁখি তুলে চাওয়া,
ওই কথা,
ওই হাসি,
ওই কাছে আসা আসি—
অলক দোলায়ে দিয়া হেসে চ'লে যাওয়া।"

আমি যখন এগুলির অভাব চিন্তায় ব্যস্ত—ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ মামার নিকট হইতে এক খানা চিঠি আসিয়া আমার সেই অভিনব চিন্তায় বাধা প্রদান করিল। মামা লিখিয়াছেন— "তোমাকে ২০৲ টাকা বেতনে কেরাণী নিযুক্ত করা গেল, পত্র পাঠ চলিয়া আসিবা"।

মাথায় বজ্রাঘাত হইল। আমি বুঝিলাম—আমার পক্ষে এ একটা বড়ই সংঘাতিক সময় দাঁড়াইয়াছে; অথচ না গেলেও নয়। আজ কালকার বাজারে একটা চাকুরি মিলান সাধারণ কথা নয়। যাই হউক মাকে চিঠির মর্ম্ম অবগত করাইলাম। মা বড়ই খুসি হইলেন; বলিলেন "তবে কালই চলিয়া যাও"।

আমি বলিলাম,—"হাঁ, কালই যাইব"।

অন্ত দশা।

(১)

তার পর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে—আমার গৃহিণী আর এখন সেই ব্রীড়াবনত মুখী নির্ব্বাক ক'নে বউটি নন। তিনি এখন একজন তর্জ্জন গর্জ্জন শালিনী লাজলজ্জা ভয় বিরহিতা 'সদর-আলা' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁর দুর্দ্দান্ত তাণ্ডবে আমি অস্থির, পাড়া প্রতিবেশী অস্থির। একদিন যাহাকে একটী মধুর কথায় শ্রবণ পরিতৃপ্ত করিবার মানসে যে ভাবে অনুনয় বিনয় করিতে হইয়াছিল, আজ তাহারি গরল উদ্গিরণ কারিণী তর্জ্জন গর্জ্জন প্রভৃতি শেষের জন্য আমাকে ততোধিক কাকুতি মিনতির সহিত অনুনয় করিতে হইতেছে—কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"।

ফলে গৃহে বিরাট বিভীষিকা মূর্ত্তির লীলা খেলায় প্রায়ই চাকর চাকরাণীর অভাব দেখা যাইতে লাগিল, কাজেই গৃহে প্রবল বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহের সময় অসময় নাই। ... দাঁড়াইতে লাগিল— 'হরি বসরে আসর'।

মার স্বর্গ প্রাপ্তির পর হইতেই আমি সপরিবারে কার্য্য স্থানে বাস করিতেছিলাম। মার মৃত্যুতে সংসারের ব্যয় কমিবারই কথাছিল, কিন্তু তাহা হইল না। কেননা আমার বাঁধা বেতনের প্রতি গৃহিণী লক্ষ্য না করিয়া প্রতি বৎসরই নূতন নূতন অতিথি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সুতরাং সেই বাঁধা কুড়িটী টাকার আয়ে আমার সংসার চলিতেছিল না। আমি ক্রমেই নিরুপায় হইয়া পড়িতেছিলাম। এদিকে আমার বেতনের নির্দ্দিষ্ট কুড়িমুদ্রা গৃহিণীর বেশ ভূষাতেই ব্যয়িত হইয়া যাইত। উপরি পাওনা আমার ছিল না, কারণ Clerkshipটা সর্ব্বদাই কিছু ব্রাহ্মভাবাপন্ন।

আমাকে যে ২৪ঘণ্টাই গালি মন্দ শুনিতে হইত, এমনটী কেহ কখনও মনে করিবেন না। সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া আমি তাহার নাড়ী নক্ষত্র গুলির সহিত বড়ই সুপরিচিত হইয়া গিয়াছিলাম। বিধি ব্যবস্থানুযায়ী চলিলে রোগ তত কঠিন দাঁড়াইতে পারেনা। আমি যখন যে স্থানে যাইতাম, তাহার জন্য কোন একটা কিছু না লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতামনা। তথাপি অনেক সময়েই গোল বাঁধিত। অদৃষ্টের ও উদরের নির্ব্বন্ধ অবশ্যই সে দিন অন্যথা হইত না। দিন এমনই ভাবে চলিতে লাগিল।

(২)

কিছু দিন পরে আমাদের সেরেস্তা বদল হইল। আমি ফিতা ফাইলের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া দড়ি বস্তার ভার প্রাপ্ত হইলাম। অভাব কিন্তু তথাপি ঘুচিল না।

অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। আমারও স্বভাবটা বিগড়াইয়া যাইতে লাগিল; যত সব পৈশাচিক ভাব আসিয়া হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। কেমন করিয়া দুটা পয়সা বেশী রোজগার করিব—অহরহ সেই উপায়ই চিন্তা করিতে লাগিলাম। উপায় কিন্তু কিছুতেই ঠাওরাইয়া উঠিতে পারিলাম না, অথচ অভাব নিত্য।

আমি যে না বুঝিতাম যে এ ২০৲ টাকাতেই এক রকমে-কষ্টে-সৃষ্টে চালান যাইতে পারে—তা নয়; কিন্তু সে পথ আমার নিজেরই অতিরিক্ত নির্ব্বুদ্ধিতা হেতু বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাই এখন অসময়ে ঔষধ প্রয়োগ হইয়াছিল বৃথা।

একদিন নিরিবিলি বসিয়া আমি আমার ভবিষ্যত আকাশের খসরা মানচিত্র খানার পর্য্যালোচনা করিতছিলাম, এমন সময় সতীর্থ সুরেশচন্দ্র আসিয়া আমার সে সমাধি ভাঙ্গিয়া দিল। সুরেশকে উপযুক্ত সমাদর করিলাম। তাহার নিকট আমার গোপন করিবার কিছুই ছিল না, তাই নিঃসঙ্কোচে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। উভয়ে অনেক ক্ষণ উভয়ের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে বিচার বিতণ্ডা হইল। সুরেশ আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়াই জানিত; এ ক্ষেত্রে আমার বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া ভৎর্সনা করিল। তার পর গোপনে অনেক উপদেশ দিয়া উপায়ের সূক্ষ্ম পথগুলি বিশেষ রকমে পরিচিত করাইয়া দিল। অবশ্য যদিও তাহাতে আপত্য করিবার অনেক আবশ্যক কারণ বর্ত্তমান ছিল, অবস্থার প্রতি তাকাইয়া তাহা তখন অত্যন্ত অনাবশ্যকই মনে করিলাম।

এতদিনে আমার অদৃষ্ট লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন। তমসাচ্ছন্ন নৈশ গগনে যেন পূর্ণচন্দ্রের আলোক রশ্মি প্রতিভাত হইল। আমার স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতে লাগিল।

(৩)

শনি আমাকে জবাব দিবেন। কাজেই কোষ্টীর মতে—"বড় বিষম শনির শেষ, প্রাণে না মারে ভোগায় ক্লেশ"—বলিয়াই আমার ধারণা ছিল; কিন্তু অবস্থার বেশ একটু ক্রমোন্নতি দেখিয়া সে ধারণাটা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া একেবারে লয় পাইয়া গিয়াছিল।

কবিরা বলেন—"স্ত্রীলোক—তেঁতুল, লঙ্কা ও কড়া স্বামী ভালবাসে।" তাঁহাদের কথা এতদিন মানিয়া আসিয়াছিলাম বটে কিন্তু এখন আর একথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কারণ যদিও আমি একেবারেই কড়া হইতে পারি নাই—আমার স্ত্রী আমায় বেশ একটু ভালবাসিয়া চলিতেছিলেন। এখন আর আমায় গৃহে আসিয়া মানভঞ্জন, বিচিত্র বিলাসের পালাগুলির অভিনয় দেখিতে হইত না। কিন্তু যতই বচ্ছলতা দেখা যাইতে লাগিল, ততই তারও নূতন নূতন আবদার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উপায় নাই—যথাসাধ্য তাহাও চলিতে লাগিল।

* * *

এদিকে সুরেশের বুদ্ধি কৌশলে ও পরামর্শে অল্প দিনের মধ্যেই আমি একজন ভয়ানক রকমের 'সরফরাজ' হইয়া উঠিয়াছিলাম। বাদী প্রতিবাদী দুই দিক হইতেই আমাকে সমানে সেলাম করিত। আমিও দু'হাতেই কাজ করিতাম।

গৃহেও একখানা ছোট খাট আনন্দ বাজার বসিয়া গিয়াছিল। একে একে আমার শ্বশুর গৃহ হইতে সাত ভাই আসিয়া 'চাঁপাকে' বেষ্টন করিয়া লইয়াছিলেন।

খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমারও আয়ের পন্থা বৃদ্ধির জন্য লোভের মাত্রা বাড়িয়া চলিতেছিল। "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।" পাপ নাকি বাপকেও ছাড়ে না। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই আমাদিগকে আসামীর 'তক' অধিকার করিয়া দাঁড়াইতে হইল। আসামী—১নং এ সুরেশ চন্দ্র এবং ২নং এ আমি শ্রীমান—নাকি দাখিলী কাগজাত হইতে কোর্ট ফি উঠাইয়া বিক্রি করিয়া সরকারের ক্ষতি করিতেছিলাম।

সাক্ষী সাবুদ লইয়া প্রমাণ হইল—সুরেশচন্দ্র পুরাতন নথী হইতে কোর্ট ফি ষ্টাম তুলিয়া লইয়া নূতন নথীতে লাগাইয়া দাখিলী নূতন কোর্ট ফি বিক্রয় করিয়া লইত। বিচারে তাহার উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ হইল। আমার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রমাণ না হওয়ায় আমি সন্দেহের ফল (Benifit of doubt) পাইলাম বটে, কিন্তু আমার সেই বক্ষঃপঞ্জর সদৃশ বিংশতি রজত খণ্ডের অমূল্য রত্নটী হইতে আমি চিরবঞ্চিত হইলাম।

এখন আমার যে কি দশা—বিনি উপার্জ্জন অক্ষম হইয়া আমার ন্যায়—গরীয়সী সহধর্ম্মিনীর সহবাস করিতেছেন—সেই কূর্ম্মপ্রাণ সংযমী পুরুষ ব্যতীত অন্যের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন।

টকা-প্রশস্তি।

(১)

টকা তুমি মানুষ গুলার জীবন গাড়ীর চাকা!
তোমার বলে বিশ্ব চলে, নইলে সবি ফাঁকা।
বোতলভরা রক্তজলা মাতাল কোথা পাবে।
তোমার ছাড়া কেমন করে চুকু-চুকু খাবে!
গেঁজেল দু-টান কস্‌বে কিসে তোমার দয়া বিনে।
আফিং-খোরে তোমায় মাগো চেয়ে এ দুর্দ্দিনে!
মজিখোরের মতি তুমি যোগাও সর্ব্বক্ষণ;
চণ্ডু-চরস-হোকাখোরের চাদা কর মণ।
পকেট-কাটার লক্ষ্য তুমি, কোকেন্ খোরের প্রাণ,
তাইতো পথে সাম্‌লে চলি, সজাগ রাখি কান।

(২)

হাজার টাকার হুজুর হতে দিন-মজুর ঐ কুলী,
সবাই তোমার তালাস করে আহার নিদ্রা ভুলি।
বিবেকের ঘোর বেশ্যাবৃত্তি করেন কত 'বাবু'!
বাড়ী ফেরেন সন্ধ্যাবেলা হয়ে বিষম কাবু।
সে যে শুধু তোমার লাগি, পোড়া পেটের দায়,
আর পুরাতে গিন্নীদেবীর অলঙ্কারের আর।
রাত্রি জেগে পড়ুয়া সবে পড়ে তোমার তরে,
তোমার পায়ে স্বাস্থ্য দিয়ে তোমার পূজা করে।
গো রূপসী রূপার চাক্‌তি, করুণ দৃষ্টি দিয়ো!
ভুল বুঝোনা, কবির তুমি প্রিয়ার চেয়ে প্রিয়!

(৩)

তোমার কৃপায় মাসিক পত্র গজায় বাংলা যুড়ে;
পোঁ ধরেছেন সব কাগজই বাঁধা সমান সুরে।
লেখার যতই থাক্‌না অভাব, আছে উচ্চরব;
লোভ রেখেছেন লক্ষ টাকার বিষয় ও বৈভব!
আজ্‌গুবি সব অশ্লীলতা দেখ্‌ছি বিজ্ঞাপনে;
ছাপাখানা সবাই চলে তোমার দরশনে।
তোমার লোভে বাপের নামও বদ্‌লায় আদালতে;
ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন হয়ে থাকেন কোনো মতে!
মনোহারিণী মা রূপেয়া, বদন তুলে চাও!
ধর্ম্মভীরু লোকগুলাকে চরণ ধূলি দাও!

(৪)

[illegible] ইয়ার জোটে তোমার কৃপা লোভে;
কয়ালেতে ডাকিয়া সব নিত্য তারা শোভে।
পঞ্চ ম-কার চল্‌তে থাকে যাবৎ থাকো তুমি,
আর যতদিন বিক্রি না হয় বাস্তভিটায় ভূমি।
পাথর-চাপা দাও মা তুমি কনের বাপের বুকে,
দুর্ভাবনা বাড়াও বলে যায় সে শিঙা ফুঁকে।
তোমার আশায় বরের বাপের নড়্‌তে থাকে ল্যাজ,
বেচে ফেল্‌তে পুত্র তাদের তাই সহেনা ব্যাজ।
টকা তোমায় ব্যাজ করে এমন সাধ্যি কার?
দশটি মেয়ের বাবা হয়ে হয় যেন ছারখার।

(৫)

মনুষ্যত্ব ধর্ম্ম প্রীতি মর্‌ছে তোমার তাপে,
তাই এ জাতি ধ্বংস পথে নাম্‌ছে ধাপে ধাপে।
মূর্ত্তিমতী শক্তি নারী, তাঁদের আদর নাই;
মেয়ের বিয়ে দিতে নগদ তিনটি হাজার চাই!
পাশ-করা সব দাগা ষাঁড়ের দাম যে আরো বেশী!
ছেলে ব্যাচার ব্যব্‌সা করেন 'বাবু' বঙ্গ দেশী।
রূপের চেয়ে রূপার আদর, ধন্য তুমি টাকা।
বাংলা দেশের ছেলের বাপের হচ্ছে বাড়ী পাকা!
যার ঘরে মা বিরাজ করো, হোক্ সে নেহাৎ পাজি,—
সবাই তাকে কর্‌ছে তোয়াজ, বল্‌ছে-'হাঁ-জী-হাঁ-জী'!

(৬)

টাকা তোমার কৃপায় দেখি টাকের ওপর টিকি!
অর্ব্বাচীনই 'বাচস্পতি' দুচার পাতা লিখি।
রাজার বাড়ী পূজা পার্ব্বণ হচ্ছে বার মাসে,
তোমার শ্রাদ্ধ হয় না সেথা, দেব্‌তা নাহি আসে!
তোমার মাথায় হাত বুলায়ে নানান্ ফিকির ক'রে,
পালে পালে মেকি মানুষ ফির্‌ছে ভুবন ভ'রে!
মস্ত বড় মেকির যুগে হৃদয় গেছে মারা!
টকা তোমার মোহন রূপে বিশ্ব পাগল-পারা!
ফুটির মত ভুই মেদিনী ফেটে দুফাঁক্ হ!
সহ্য তো আর হয় না মাগো হ-য-ব-র-ল!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

Printed by Satish Chandra Roy, At the Jagat Art Press, Dacca
and Published by Kedar Nath Mojumdar, Research House, Mymensingha.

সৌরভ

নবম বর্ষ। ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩২৭। পঞ্চম সংখ্যা।

ঋগ্বেদীয় যজ্ঞ।

মনু যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ঋগ্বেদের ঋষিগণ তাহাই পালন করিতেন। যে জনগণ এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা ঋগ্বেদে মানুষ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মে আমরা তিন দেব সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইঁহারা বসু, আদিত্য ও রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই তিন দেব সম্প্রদায় ব্যতীত আমরা সবিতা ত্বষ্টা নামে এক দেবের নাম প্রাপ্ত হই। ইনি দেব পত্নীদিগের দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

মানব ধর্ম্মাবলম্বীগণ কৃষি কার্য্যের জন্য স্বর্গীয় জল পাইবার প্রার্থনা করিতেন। ইন্দ্র, অগ্নি, মরুৎগণ যাহাতে দানবদিগের নিকট হইতে উহা বল পূর্ব্বক কাড়িয়া আনিতে পারেন, সে জন্য ঋষিগণ তাঁহাদিগকে যজ্ঞে আহ্বান করিতেন এবং ঘৃত, সোম, পিষ্টক, পশুমাংস প্রভৃতি অগ্নি কুণ্ডে আহুতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের ভোজনার্থ প্রদান করিতেন। তাঁহারা এই মনে করিতেন যে ইন্দ্রাদি দেবগণ এই সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া এরূপ সবল হইবেন, যে দানবগণ তাঁহাদিগের নিকট পরাজিত হইয়া স্বর্গীয় জল বৃষ্টিরূপে প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। যখন মনুষ্যগণ যুদ্ধ যাত্রা করিত তখন তাহারা ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবদিগকে যজ্ঞে আহ্বান করিয়া স্তব, গান ও আহুতি দ্বারা তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিত। যুদ্ধ স্থলেও যজ্ঞ করা হইত। আবার যুদ্ধ বিজয় হইলে মহা সমারোহ পূর্ব্বক যজ্ঞ হইত। কোন রাজার পুত্র না হইলে, পুত্রেষ্টি বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হইত। এই সকল যজ্ঞ ব্যতীত প্রতি পর্ব্বে, বিভিন্ন ঋতুতে, সংবৎসরে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ছিল।

যজ্ঞ করিতে হইলে প্রথমে একটী অগ্নিবেদি রচনা করিতে হইত। মনুষ্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মনুর অগ্নিবেদির নাম 'ইড়া' ছিল বলিয়া ঋগ্বেদীয় আর্য্যদিগের অগ্নিবেদি 'ইড়া' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই জন্য গৃৎসমদ ঋষি একটী ঋকে অগ্নিকে বলিয়াছেন "হবনীয় অগ্নি (১) পিতার ন্যায়; ইড়ার পদে মনু দ্বারা প্রথম প্রজ্বলিত হন।" অপর এক ঋকে দেখিতে পাই দেবগণ 'ইড়াকে' মনুর শাসনী করিয়াছেন।" (২)

মনু আপন যজ্ঞ সাত জন হোতা বা পুরোহিত দ্বারা যে সম্পাদন করাইয়াছিলেন, তাহা একটী ঋকে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"প্রজ্বলিতাগ্নি মনু (শ্রদ্ধাযুক্ত) মনের দ্বারা সাত জন হোতার সহিত যাঁহাদিগের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ হোত্রাকে যাজন করিয়াছেন।" (৩) যজ্ঞে সাত জন হোতা নিয়োগের উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) সেকালে এই সকল পুরোহিতদিগকে অধ্বর্য্যু, ঋত্বিক্,

(১) জোহূত্রঃ। অগ্নিঃ। প্রথম। পিতেব।
ইড়ঃ। পদে। মনুষা। যৎ। সমিদ্ধঃ। ২।১০।১

(২) ইড়াং। অকৃণ্বন্। মনুষস্য। শাসনীং। ১।৩১।১১

(৩) যেভ্যঃ। হোত্রাং। প্রথমাম্। আযেজে। মনুঃ। সমিদ্ধ। অগ্নিঃ। মনসা। সপ্ত। হোতৃভিঃ। ১০।৬৩।৭

(৪) সপ্ত। হোতারঃ। তং। ইৎ। ঈড়তে। ৮। ৪৯। ১৬
পর্ষৎ। পথে। অহন্। আ। সপ্ত। হোতৄন্। ১০। ৬১। ১
সপ্ত। হোতারঃ। ঋত্বিজঃ। ৯। ১১৬। ৩
সপ্ত। হোতৃভিঃ। হবিষ্মতে। ৩। ১০। ৪

বিপ্র, ঋষি, কবি, রেভ, হোতা, আবয়, কারু প্রভৃতি নাম প্রদান করা হইত। (২)

একটী ঋকে কোন ঋষি বলিয়াছেন যে "পাঁচ জন অধ্বর্য্যুর সহিত সাতজন বিপ্র অগ্নির প্রিয় গুপ্ত পদ রক্ষা করেন।" (৩) কেহ কেহ এই ঋকের অর্থ করেন ৫ জন অধ্বর্য্যু ও ৭ জন বিপ্র অর্থাৎ ১২ জন পুরোহিত; এবং মনে করেন সেকালে ১৬ জন পুরোহিত যজ্ঞে নিযুক্ত হইতেন। (৪) এই একটী মাত্র ঋকের উপর নির্ভর করিয়া যজ্ঞে ১২ জন পুরোহিত নিয়োগের মত আমরা সমর্থন করিতে পারি না। বটব্যাল মহাশয় ১৬ জন ঋত্বিক কোথায় পাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। ঋগ্বেদের প্রায় সর্ব্বত্র ৭ জন পুরোহিতের উল্লেখ রহিয়াছে। আমরা সেইজন্য "পাঁচ জন অধ্বর্য্যুর সহিত সাত জন বিপ্রের" অর্থ এইরূপ মনে করি যে—যে সাত জন বিপ্র অগ্নির পদ রক্ষা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে পাঁচজন অধ্বর্য্যু নামে অভিহিত হইতেন।

যজ্ঞে নিযুক্ত সাত জন ঋষির প্রত্যেককে এক একটী বিশেষ নাম প্রদান করা হইত। একটী ঋকে অগ্নিকে বলা হইয়াছে—হে অগ্নে! হোতার কর্ম্ম তোমার; ঋত্বিক পোতার কর্ম্ম তোমার; নেষ্টার কর্ম্ম তোমার; তুমি যজ্ঞ ইচ্ছাকারী আগ্নীধ্র; প্রশাস্তার কর্ম্ম তোমারি; ও তুমি ব্রহ্মা (হইয়া) যজ্ঞ কামনা কর এবং আমাদিগের গৃহে গৃহপতি হও।" (১) অন্য এক ঋকে দেখিতে পাই অগ্নিকে এইরূপ বলা হইয়াছে—"হে অগ্নে! তুমি প্রাচীন অধ্বর্য্যু ও হোতা হও; প্রশাস্তা, পোতা ও জন্মমাত্র পুরোহিত হও; হে ধীর, বিদ্বান্! সকল ঋত্বিককে পোষণ কর; তোমার সখ্য আমরা নষ্ট করিব না।" (২) এই দুই ঋক্ হইতে যজ্ঞে নিযুক্ত সাতজন বিপ্রের মধ্যে ছয় জনের নাম প্রাপ্ত হই; যথা, হোতা, পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র, ব্রহ্মা ও প্রশাস্তা। আর এক ঋকে ছয় জনের নিম্নলিখিত রূপ নামও প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা, হোতা, অধ্বর্য্যু, অগ্নিমিন্ধ, গ্রাবগ্রাভ, শংস্তা, ও সুবিপ্র। (৩) এই ঋকে ঋত্বিক্‌দিগের সাধারণ নাম 'আবয়' বলা হইয়াছে। আমরা অনুমান করি ইংরাজী Abbey শব্দ ও বৈদিক আবয় শব্দ একই। ভারতীয় 'পোতা' শব্দ হইতে ল্যাটিন, গ্রীক ও ফরাসী Poet শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে আমাদের অনুমান। কারণ পোতাও কবি পদবাচ্য হইতেন। আর মনে করি গ্রীক নেষ্টর শব্দ বৈদিক নেষ্টৃ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

যজ্ঞে সাম গান হইত। ইহার ভার একটী ঋত্বিকের উপর থাকিত। তাঁহাকে সেকালে 'উদ্‌গাতা' নাম দেওয়া হইত। (৪) শতপথ ব্রাহ্মণে অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা ও উদ্‌গাতা ঋত্বিক্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। (৫)

---

(২) অধ্বর্যবঃ। হবিষা। মর্জয়ধ্বম্। ৭। ২। ৪
অস্মন্। ঋষয়ঃ। সপ্ত। বিপ্রাঃ। ৯। ৯২। ২
পদে। রেভন্তি। কবয়ঃ। ন। গৃধ্রাঃ। ৯। ৯৭। ৫৭
হোতা। অধ্বর্য্যুঃ। আবয়াঃ। ১। ১৬২। ৫
প্রত্নাঃ। ঋণ্তি। কারবঃ। ৯। ১০। ৬

(৩) অধ্বর্য্যুভিঃ। পঞ্চভিঃ। সপ্ত। বিপ্রাঃ। প্রিয়ং। রক্ষন্তে। নিহিতং। পদং। বেঃ। ৩। ৭। ৭

(৪) মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্রের রচিত তৃতীয় মণ্ডলের ৭ম সূক্ত দেখিতে অনুরোধ করি। তথায় স্পষ্টাক্ষরে পাঁচজন অধ্বর্য্যু ও ৭ জন বষট্‌ কর্ত্তার (হোতা ও উদ্‌গাতা?) উল্লেখ আছে—অতএব মধুচ্ছন্দার সময়ে সোমযাগে ষোল জন ঋত্বিকই যজ্ঞে ব্রতী হইতেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

উমেশ বটব্যাল প্রণীত বেদ-প্রবেশিকার ৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) তব। অগ্নে। হোত্রং। তব। পোত্রং। ঋত্বিয়ং। তব। নেষ্ট্রং। ত্বং। অগ্নিৎ। ঋতায়তঃ। তব। প্রশাস্ত্রং। ত্বং। অধ্বরীয়সি। ব্রহ্মা। চ। অসি। গৃহপতিঃ। চ। নঃ। দমে॥ ২। ১। ২

(২) ত্বং। অধ্বর্য্যুঃ। উত। হোতা। অসি। পূর্ব্যঃ। প্রশাস্তা। পোতা। জনুষা। পুরোহিতঃ। বিশ্বা। বিদ্বান্। আর্ত্বিজ্যা। ধীর। পুষ্যসি। অগ্নে। সখ্যে। মা। রিষাম। বয়ং। তব॥ ১। ৯৪। ৬

(৩) হোতা। অধ্বর্য্যুঃ। আবয়াঃ। অগ্নিমিন্ধঃ। গ্রাবগ্রাভঃ। উত। শংস্তা। সুবিপ্রঃ। ১। ১৬২। ৫

(৪) গায়ত্রং। ত্বঃ। গায়তি। শক্বরীষু। ১০। ৭১। ১১
বদতি। সামগাঃ ইব। গায়ত্রং। চ। ত্রৈষ্টুভম্। ২। ৪৩। ১
উদ্‌গাতা ইব। শকুনে। সাম। গায়সি। ২। ৪৩। ২

(৫) The officiating priests meet together; the Adhvaryu, the Hotri, the Brahman, and the Udgatri; for under these the other priests are. XIII 4, 1, 4

যজ্ঞ কালে হোতা ও ব্রহ্মা ইন্দ্রকে সোমরস আহুতি প্রদান করিতেন; (৩) পোতা মরুৎগণকে, আগ্নীধ্র অগ্নিকে, প্রশাস্তা মিত্রবরুণকে সোমাহুতি প্রদান করিতেন। (৪) বোধ হয় এই পাঁচজন পুরোহিত, অর্থাৎ হোতা, ব্রহ্মা, পোতা, আগ্নীধ্র ও প্রশাস্তা সে কালে পাঁচ অধ্বর্য্যু নামে অভিহিত হইতেন। যজ্ঞ কালে সাম গান হইত। উদ্গাতার উপর এই ভার থাকিত। আর যে নেষ্টা নামক ঋত্বিকের উল্লেখ আছে, তিনি সম্ভবতঃ অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদন ও কাষ্ঠ দ্বারা তাহা প্রজ্জলিত করিতেন। অতএব যজ্ঞে নিযুক্ত ৭ জন ঋত্বিকের প্রত্যেকের কতকগুলি বিশেষ কার্য্য থাকিত।

ঋগ্বেদের কালে ঋষিগণ দেবাহ্বান স্তোত্র সাত ছন্দে রচনা করিতেন। এক একটী ছন্দ দেব বিশেষের সহিত বিশেষ ভাবে যুক্ত মনে করা হইত। কারণ একটী সূক্তে এইরূপ দেখিতে পাই:—"অগ্নির সহিত যুক্তা গায়ত্রী-ছন্দ হইয়া ছিলেন; উষ্ণিক্ ছন্দের সহিত সবিতা হইয়াছিলেন; মহান্ সোম অনুষ্টুপ ছন্দ ও উকৃথ সকলের সহিত হইয়াছিলেন; বৃহস্পতির বাক্যকে বৃহতীছন্দ রক্ষা করিয়াছিলেন। বিরাট ছন্দ মিত্র বরুণের আশ্রিত হইয়াছিলেন। দিবা ভাগ ও ত্রিষ্টুপ ছন্দ ইন্দ্রের হইয়াছিলেন। জগতী ছন্দ বিশ্ব দেব গণে প্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন; তাহার দ্বারা ঋষি ও মনুষ্যগণ সৃষ্ট হইয়াছিলেন।" (১)

প্রত্যেক যজ্ঞের দুইটী প্রধান অঙ্গ ছিল। একটী অগ্নি মন্থন ও অপরটী সোমাভিষবন। দুইটী অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া ঋত্বিকগণ অগ্নি উৎপাদন করিতেন। এই কালোচিত অনেক স্তব রচিত হইয়াছিল। অরণি কাষ্ঠ দ্বয় ঘর্ষণ কালে এই জাতীয় স্তব পঠিত হইত। সেইরূপ সোম বৃক্ষের (বা লতার) ডাঁটা ও পাতা যজ্ঞার্থে সংগ্রহ করা হইত; যজ্ঞকালে প্রস্তর ফলকের উপর প্রস্তরময় মুষল দ্বারা উহাদিগকে ঋত্বিক গণ ছেঁচিতেন। তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা চটকাইয়া উহা হইতে রস বাহির করা হইত (১) এই রস সুত-সোম নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে মেষ লোম দ্বারা প্রস্তুত 'পবিত্র' নামক বস্ত্র খণ্ড, কাষ্ঠ বা গোচর্ম্ম নির্ম্মিত দ্রোণ নামক পাত্রের মুখে স্থাপিত হইত; ইহার উপর সুত-সোম ছাঁকিবার জন্য ঢালা হইত। (২) সম্ভবতঃ ছাঁকিবার পূর্ব্বে সোম রস জল, মধু এবং দধি বা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইত। সোমকে ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিবার প্রক্রিয়া সে কালে 'পবমান' নামে অভিহিত হইত। সোম অভিষবন কালে ঋত্বিক্ গণ হস্তে স্বর্ণ ধারণ করিতেন সোম যে পার্ব্বত্য প্রদেশে উৎপন্ন হইত, ঋগ্বেদের নানা স্থানে ইহার উল্লেখ আছে।

সোমরস ব্যতীত ঘৃত, পুরোডাশ (অর্থাৎ এক প্রকার পিষ্টক), ভৃষ্ট যব, ছাতু ও নানা প্রকার পশুর মাংস দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হইত; কারণ একটী ঋকে আছে "হে ইন্দ্র! আমাদিগের ধানাবন্তের

---

(৩) পিব | ইন্দ্র | স্বাহা | প্রহুতং | বষট্ কৃতং | হোত্রাৎ | আ | সোমং | ২ | ৩৬ | ১
ত্বং | অস্য | ব্রাহ্মণাৎ | আ | তৃপৎ | পিব | ২ | ৩৬ | ৫

(৪) ভরতস্য | সূনবঃ | পোত্রাৎ | আ | সোমম্ | পিবত | দিবঃ | নরঃ | ২ | ৩৬ | ২
ইহ | বিপ্র | রক্ষি | সোম্যং | মধু | পিব | আগ্নীধ্রাৎ | ২ | ৩৬ | ৪
অনু | অচ্ছ | রাজানা | নমঃ | এতি | আবৃতং | প্রশাস্ত্রাৎ | আ | পিবতং | সোম্যং | মধু | ২ | ৩৬ | ৬

(১) অগ্নেঃ | গায়ত্রী | অভবৎ | সযুগ্বা | উষ্ণিহয়া | সবিতা | সং | বভূব | অনুষ্টুভা | সোমঃ | উক্থৈঃ | মহস্বান্ | বৃহস্পতেঃ | বৃহতী | বাচং | আবৎ ॥ ১০ | ১৩০ | ৪
বিরাট্ | মিত্রাবরুণয়োঃ | অভিশ্রীঃ | ইন্দ্রস্য | ত্রিষ্টুপ্ | ইহ | ভাগঃ | অহ্নঃ | বিশ্বান্ | দেবান্ | জগতী | আ | বিবেশ | তেন | চাক্লপ্রে | ঋষয়ঃ | মনুষ্যাঃ ॥ ঐ | ৫

(১) নরঃ | সহস্র ধারং | দুহন্তে | দশ | ক্ষিপঃ | নৃভিঃ | সোম | প্রচ্যুতঃ | গ্রাবভিঃ | সুতঃ | ৯ | ৮০ | ৪

নেতাগণ ও তাঁহাদের দশ অঙ্গুলি সহস্রধারাযুক্ত (সোমকে) দোহন করিতেছেন | হে সোম! পাষাণ সকলের দ্বারা মর্দ্দিত ও নেতাদিগের দ্বারা (তুমি) বহির্গত।

অদ্রয়ঃ | ত্বা | বপ্সতি | গোঃ | অধি | ত্বচি | ৯ | ৭৯ | ৪
গো ত্বকের উপর পাষাণ তোমাকে ভক্ষণ করিতেছে |

(২) সুতাঃ | ...সোমাসঃ | দধি আশিরঃ | পবিত্র | অতি | অক্ষরন্ | ৯ | ৬৩ | ১৫
দধি সংযুক্ত সুত সোম 'পবিত্র' অতিক্রম করিয়া ক্ষরিত হইয়াছেন |
অব্যঃ | বারেষু | সিঞ্চত | ৯ | ৬০ | ১০ মেষলোমে সিঞ্চন কর।

(অর্থাৎ যাহার ভৃষ্ট যব আছে তাহার), করম্ভবন্তের (অর্থাৎ যাহার দধি যুক্ত ছাতু আছে তাহার), অপূপবন্তের (অর্থাৎ যাহার পিষ্টক আছে তাহার), উক্থবন্তের (অর্থাৎ স্তব কারীর) প্রাত: কালের সেবা গ্রহণ কর।" (১) অগ্নিদেবের উদ্দেশে এইরূপ স্তব দেখিতে পাই ; যথা, "বৃষ যাঁর অন্ন তাঁহাকে, বশা (অর্থাৎ বন্ধ্যা গাভী) যাঁর অন্ন তাঁহাকে, সোম যাঁর পৃষ্ঠে দেওয়া হয় তাঁহাকে, (এরূপ) বিধাতা অগ্নিকে স্তোত্র দ্বারা পরিচর্য্যা করি।" (২) অগ্নির উদ্দেশে যে বৃষ, বশা, অষ্টাপদী (অর্থাৎ গর্ভিণী গাভী) আহুত হইত, তাহাও একটী ঋকে দেখিতে পাই ; "হে ভারত অগ্নে! তুমি আমাদিগের হও। বশা, উক্ষ (অর্থাৎ বৃষ) ও অষ্টাপদী দিগের দ্বারা তুমি আহুত হও।" (৩) ইন্দ্রের ভক্ষণের জন্ম মহিষ ও বৃষ দ্বারা যজ্ঞ করা হইত। সেই জন্য একটী ঋকে এই প্রকার বর্ণিত আছে—"হে ইন্দ্র! তুমি যখন তিনশত মহিষের মাংস ভক্ষণ করিয়া ছিলে।" (৪) অপর একঋকে ১৫ ও ২০টী বৃষ পাক করিয়া ইন্দ্রকে ভোজনার্থ দানের উল্লেখ আছে।" (৫) যে সকল পশু দেব বাহন রূপে কল্পিত হইত, তাহা দিগকে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সেই সেই দেবের নিকট প্রেরণ করা হইত। অশ্ব ইন্দ্রের বাহন এবং ছাগ পূষার বাহন ছিল। (৬) সেই জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব ও ছাগ বলি হইত।

---

(১) ধানাবন্তং। করম্ভিণং। অপূপবন্তং। উক্থিনং। ইন্দ্র। প্রাত:। জুষস্ব। ন:॥ ৩। ৫২। ১

(২) উক্ষ অন্নায়। বশা অন্নায়। সোম পৃষ্ঠায়। বেধসে। স্তোমৈ:। বিধেম। অগ্নয়ে। ৮। ৪৩। ১১

(৩) ত্বং। ন:। অসি। ভারত। অগ্নে। বশাভি:। উক্ষভি:। অষ্টাপদীভি:। আহুত:। ২। ৭। ৫

(৪) ত্রী। যৎ। শতা। মহিষাণাং। অঘ:। মা:। ...মঘবা ৫। ২৯। ৮

(৫) উক্ষ:। হি। মে। পঞ্চদশ। সাকং। পচন্তি। বিংশতিং। উত। অহং। অদ্মি। পীব;॥ ১০। ৮৬। ১৪

(৬) ইন্দ্র:। এনং। প্রথম:। অধি। অতিষ্ঠৎ। ১। ১৬৩। ২
ইন্দ্র ইহাকে (অর্থাৎ অশ্বকে) প্রথম আরোহণ করিয়াছিলেন।
পূষণং। নু। অজাশ্বং। উপ। স্তোষাম। বাজিনম্। ৬। ৫৫। ৪
ছাগবাহন, অন্নযুক্ত পূষাকে স্তব করি।

বোধ হয় সে কালে এক জাতীয় দুগ্ধবতী গাভী ছিল, ইহারা 'অঘ্ন্যা' বা অহননীয়া বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। (২) সম্ভবতঃ ইহাদিগের দুগ্ধ সোম রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া যজ্ঞে প্রযুক্ত হইত বলিয়া, তাহাদিগকে হত্যা করা হইতনা।

ঋগ্বেদীয় যুগের শেষভাগে ঋষিগণ যজ্ঞোৎপত্তির একটী মতবাদ (theory) প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, 'হিরণ্যগর্ভ' নামক দেব যখন জলি সমূহে বেষ্টিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। (৩) পরে তিনিই বিশ্বকর্ম্মা নাম ধারণ করিয়া দিব্যলোক ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। (৪) আপনাকে যজ্ঞ করিয়া দেবগণের উৎপত্তি সাধিত হইয়াছিল, সেইজন্য তিনিই পুরুষ বা যজ্ঞ পুরুষ। (৫) তৎপরে দেবগণ মিলিত হইয়া যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে মনুষ্য, জীব, জন্তু, বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়াছিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

সান্ত্বনা-সঙ্গীত।

তোমারি মলয় এনেছে বহিয়ে
আমার প্রাণের মধুর গন্ধ!
তোমারি বাঁশরী দিয়েছে গড়িয়ে
আমার প্রাণের ললিত ছন্দ!
তোমারি সেফালী দিয়েছে গো ঢালি
আমার প্রাণের বিপুলানন্দ,
বহি ঘন ঘন মন্দ পবনে
তপ্ত-জীবন করিছে শান্ত!
এ জীবন ঢালি দিব গো অঞ্জলি—
দাও হে তোমার চরণ-প্রান্ত,
তব পদ ধূলি নতশিরে তুলি
হইব ধন্য হে প্রাণ কান্ত!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়।

---

(২) অদ্ধি। তৃণং। অঘ্ন্যে। বিশ্বদানীং। পিব। শুদ্ধং। উদকং। আচরন্তী। ১। ১৬৪। ৪০
হে অহননীয়া গো! বিচরণশীলা (তুমি) সকল স্থানে তৃণ ভক্ষণ কর, শুদ্ধ জলপান কর।

(৩) দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

(৪) দশম মণ্ডলের ৮২ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

(৫) দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

স্রোতের ফুল।

৫

যমুনার বিবাহ। যমুনার মন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—মাকে, বাবাকে, সইকে ছাড়িয়া সে কেমন করিয়া গিয়া অচিনা পুরীতে থাকিবে? সে এক দিন নিতান্ত মুখরা হইয়া প্রফুল্লর কাছে তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিল—

"সই, আমি কেমন করিয়া তোমাকে ছাড়িয়া অচিনা স্থানে থাকিব?"

প্রফুল্ল হাসিয়া উত্তর করিল—"অচিনা যে হইব দুদিন বাদে আমরা সই, আর তোমার অচিনা স্থানই যে আপনার হইয়া যাইবে; তখন আমি কেমন করিয়া থাকিব! আমার যে আর সই ছাড়া এ জগতে কেহ নাই।"

যমুনা বলিল—"তবে চল সই, সেই অচিনা পুরীতেই যাইয়া দুই সইতে একত্র থাকি।"

যমুনা কথা গুলি বলিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িল। কেননা, সে যাইবে বিবাহিত হইয়া, তাহার স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে; সই সেখানে যাইবে কেন?

প্রফুল্ল বলিল—"তা বেশ! মা, বাবা যদি বলেন, আমি যাইব। চির দিনতো আর তোমার সহিত আমাকে থাকিতে হইবে না—প্রথম প্রথম দুই একবার গেলেই হইবে—তা যাইব।"

প্রফুল্ল তাহার লজ্জা কাটাইয়া দিল দেখিয়া যমুনা সাহসের সহিত একটু রসিকতা করিয়া বলিল—তোমারও তো সই বিবাহের সময় হইয়াছে, তোমার সহিত না হয় আমি যাইব, তোমারও তো ভয় ভাবনা হইবে?"

প্রফুল্ল মাটির দিকে মুখ নত করিয়া রাখিয়া বলিল—"আমি বিবাহ করিব না সই।"

প্রফুল্লর এই উত্তরে যমুনা হাসি রাখিতে পারিল না; সে হাসিয়া কুটপাট হইল, তারপর প্রফুল্লর উপর ঢলিয়া পড়িল। প্রফুল্ল গম্ভীরভাবে মুখ নত করিয়া রহিল। হাসিলও না, কোন কথাও বলিল না।

যমুনা প্রফুল্লকে ঠেলিয়া হাসাইতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া বলিল—"কেন সই বিবাহ করিবে না? মা তো তোমার বিবাহের কথাও দাদাকে বাবাকে বলিয়াছেন।"

প্রফুল্ল তথাপি কোন উত্তর করিল না; যমুনাও জেদ ছাড়িল না; কথা বাহির করিবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; শেষ রাগ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

যমুনা কাঁদিল দেখিয়া প্রফুল্লরও দুঃখ উপচাইয়া উঠিল; সে তাহার জীবনের অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া যমুনার গলা ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

প্রফুল্ল তাহার নিজের জীবনের অনেক কথাই সইকে বলিয়াছে, গৃহিণীকে বলিয়াছে, কর্ত্তাকে বলিয়াছে; কিন্তু তাহার যে বিবাহ বাসরেই এই সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তাহা সে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও বলে নাই। হাতে রূপার বালা ক গাছা দেখিয়া তেমন কথা জিজ্ঞাসা করিবারও কাহার মনে হয় নাই। প্রফুল্ল আজ যমুনার পীড়াপীড়িতে সে কথা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে রুদ্ধ গোপন কথা তাহার মনকে আজ এতই কাতর, এতই পীড়িত করিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রফুল্ল যমুনার নিকট তাহার সেই পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের গোপন কাহিনী চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিল; তারপর ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ যে সে আর বালিকা নয়, প্রাণের ক্ষুধা সে যে আর চিন্তা করিয়া মিটাইতে পারে না; তাই আজ সেই নিরাশ্রয় বালিকা তাহার একটী মনের মানুষের নিকট প্রাণের গোপন ক্ষত প্রকাশ করিয়া দিয়া কাঁদিয়া সেই ক্ষতের যন্ত্রণা উপসম করিতে চেষ্টা করিল।

যমুনার চক্ষেও জল পড়িতেছিল।

যমুনা গম্ভীর হইয়া বলিল—"তুমি তো সই আর কোন দিন একথা বল নাই।"

প্রফুল্ল দুই হাতে নিজ মুখ চোখ চাপিয়া রাখিয়া বলিল—"তখন বলিনাই; কিন্তু এখন যে তাহা না ভাবিয়া পারিতেছি না—চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না সই।"

যমুনা প্রফুল্লর হাত দুখানা টানিয়া লইয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল। তারপর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল।

৬

আজ কাল যে ব্যাপার দশ হাজার টাকায় নির্ব্বাহ হয় না, সে কালে পাঁচ সাত শত টাকা খরচ করিলেই তেমনতর ব্যাপার বিরাট ঘটা ও আমোদ আহ্লাদ সহকারে সম্পন্ন করা যাইত। হরিহর বাবুও বেশ সমারোহ করিয়াই যমুনার বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

তখন রেল ছিল না, ষ্টীমার ছিল না, চলাচলের ভাল পথ-ঘাট পর্য্যন্ত ছিল না; তথাপি এই বিবাহে লোক জমিয়াছিল বেশ।

সে কালে লৌকিকতা রক্ষার যে প্রথা ছিল, তাহাতে আত্মীয় স্বগণকে ডাক যোগে লৌকিকতার নমুনা জ্ঞাপন করিবার অবকাশ ছিল না; প্রত্যেকেই প্রত্যেক ব্যাপারে যোগ দান করিয়া মনের আনন্দ দান করিয়া আত্মীয়তা রক্ষা করিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিত। ইহা সেকালের আত্মীয় কুটুম্বদের একটী অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য ছিল। সুতরাং যমুনার বিবাহে মালঞ্চা গ্রাম লোক সমাগমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

বিবাহের দিন প্রফুল্ল কিছুতেই আর তাহার সেই প্রাচীন কথা মন হইতে দূরে রাখিতে পারিল না। সে যতই যমুনাকে তাহার প্রফুল্ল ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিতেছিল যমুনা ততই তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলের পরদার ফাঁকে যেন অফুরন্ত চখের জলই দেখিতেছিল।

বিবাহ বাড়ীতে কাজের লোকের অভাব ছিল না, তাই প্রফুল্লকে অন্য কোন কাজের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয় নাই। প্রফুল্ল সারা দিন যমুনার নিকট বসিয়া থাকিয়া তাহাকে নানা বিষয়ে প্রবোধ দিয়াছে ও নিজ মর্ম্ম পীড়ায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াছে।

প্রফুল্লর বয়স কৈশোর অতিক্রম না করিলেও তাহার মনের ও শরীরের গতি উদ্দাম ভাবে যৌবনের সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছিল। যমুনার শরীরের গঠন ছিল প্রফুল্ল অপেক্ষা অনেক খানি দুর্ব্বল এবং সুখের ক্রোড়ে প্রতি পালিত বলিয়া তাহার মনের গতিও ছিল অতি সরল। বিপদে পড়িয়া এবং পরের ঘরে জীবন অতিবাহিত করিয়া প্রফুল্লর ভাবনাতে পরিপক্কতা আসিয়াছিল— যমুনার চেয়ে অনেক খানি অধিক।

প্রফুল্ল যমুনাকে প্রবোধ দিতে ছিল বটে কিন্তু তাহার নিজ স্মৃতি কিছুতেই তাহার নিজ প্রাণকে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে যতই মনকে— যাহা গত হইয়াছে, তাহা তো আর আসিবে না—বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল, ততই তাহার মনে হইতে ছিল—হায় এমন দিন তো আমারও একদিন আসিয়াছিল।

ফলে প্রফুল্ল নিজের চক্ষু মুছিতে মুছিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। যমুনারও পিতামাতা ছাড়িবার কষ্ট অপেক্ষা সইর ব্যথা ভাবিয়াই কষ্ট হইতে ছিল বেশী।

প্রফুল্ল বেশ গীত গাইতে পারিত। তাহার কণ্ঠে জল ভরা, সাজান, বিরহ প্রভৃতি মেয়েলী গীত শুনিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে যেসকল স্ত্রীলোক মুগ্ধা ছিলেন এবং যাহাদের নিকট হইতে সে তোষামোদ করিয়া গীতের পদ ও সুর শিখিয়াছে আজ তাহারা তাহাকে ডাকিয়া অনুরোধ করিয়াও একটী গীতের লহর ধরাইতে পারিলেন না। অনোন্যপায় হইয়া তাহারা প্রফুল্লকে ছাড়াই গীত গাইতে লাগিলেন। প্রফুল্ল যমুনাকে সাজাইতে বসিয়াছিল, তেমন ভাবে থাকিয়াই হৃদয়ের দারুণ বেদনা দীর্ঘ নিশ্বাসে বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল।

এই সময় যমুনার দাদা মন্মথ আসিয়া প্রফুল্লকে তাহার হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিল—"আয় দেখি প্রফুল্ল—তুই কয় খানা রিকাবিতে বেশ সুন্দর—পরিস্কার করিয়া কয় খানা জল খাবার সাজাইয়া আমার সঙ্গে আয় দেখি। তক্তি, গঙ্গাজলী, রসকরা, চিড়া, পদ্মচিনি, ক্ষীরের সাজ—সব যেন থাকে, দেখিস, খুব তাড়াতাড়ি—"

প্রফুল্ল ভাড়ারে গিয়া গৃহিণীর নিকট হইতে সব জিনিস লইয়া রিকাবি গুলি সাজাইয়া মন্মথকে খবর দিল। মন্মথ আসিয়া প্রফুল্লকেই সেগুলি লইয়া তাহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল। প্রফুল্ল তাহাই করিল।

মন্মথর কয়েকটী সতীর্থ ঢাকা হইতে আসিয়া তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছে। ভাণ্ডারী ঠাঁই করিয়া দিয়া গিয়াছিল, প্রফুল্ল মন্মথর ইঙ্গিতে সাজান রিকাবিগুলি স্থানে স্থানে রাখিয়া যাইতে লাগিল; এদিকে মন্মথও বন্ধু দিগকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রফুল্লর তখনো রিকাবি রাখা শেষ হয় নাই; তাড়াতাড়ি করিতে যাইয়া সে একটা জলের গ্লাস ফেলিয়া দিল।

প্রফুল্ল লজ্জা পাইল বুঝিয়া মন্মথ বলিল—

"এত তাড়াতাড়ি কেন, লজ্জাইবা কি? তুমি আমার বোন্, ওরা আমার বন্ধু! যাও, আর এক গ্লাশ জল লইয়া আইস!"

প্রফুল্ল লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া জল আনিতে গেল।

যাদব বলিল—"বেশ সুন্দরী মেয়ে।"

মন্মথ যাদবের কথায় যোগ দিয়া বলিল—"এমন কাজ নাই যা আমার এ বোন্‌টী না জানে এবং সুন্দর করিয়া করিতে না পারে; সকল বিষয়ে সুন্দর!"

সুশীল সকলের মুখের দিকেই তাকাইল, তারপর মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—"আরো কাহারও কিছু বলিবার আছে কি?"

নরেশ বলিল—"অন্যের কথার ও দেখার মূল্য কি? নিজের চোখে দেখ, নিজের মনে বুঝ—বাস্‌।"

সুশীল বলিল—তথাপি—দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ!"

মন্মথর মাতুল ভাই অক্ষয় বলিয়া উঠিল—"তবে কি অর্জ্জুনের লক্ষ্য ভেদের ফল বণ্টন হইবে হে?"

মন্মথর কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। এই সময় প্রফুল্ল জল লইয়া আসিয়া—সেই হাস্য কোলাহলের মধ্যে—আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

মন্মথ স্থান দেখাইয়া বলিল—"এই স্থানে রাখ।"

প্রফুল্ল সকলের সাগ্রহ দৃষ্টির মধ্যে জলের গ্লাস রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

৭

প্রফুল্ল যমুনার সহিত তাহার শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছে। এ কার্য্যটী ভাল হয় নাই। ১৪।১৫ বৎসরের একটী গৃহস্থ হিন্দু মেয়ের এরূপ ভাবে কোথাও যাওয়া সমাজ বিরুদ্ধ—লোকাচার বিরুদ্ধ। তথাপি প্রফুল্লকে এরূপ কার্য্য করিতে হইয়াছিল—কতকটা বাধ্য হইয়া, আর কতকটা তাহার নিজের ইচ্ছায়ও বটে।

যমুনার একান্ত ইচ্ছা ছিল—প্রফুল্লকে তাহার সহিত লইয়া যায় এবং দুদিন বাদে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া আইসে। তাহার মার ও মন্মথর তাহাতে সম্পূর্ণ অমতছিল। হরিহর বাবু কিন্তু মেয়ের কথায় সায় দিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার মনের ভাব—কায়স্থ বা শূদ্র ব্রাহ্মণের কার্য্য করিবে না তো করিবে কে? এ ব্যাপারে প্রফুল্লর প্রতি তাহার ব্যবহার বা চিন্তা—তিনি খুব উদার ভাবে করিতে পারেন নাই। ফলে তাহার অবহেলায় যমুনার সঙ্গে যাইবার ভাল লোক ঠিক হইল না; যখন উপস্থিত বিপদের প্রতিকার আশু কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল—প্রফুল্ল তখন নিজের অবস্থা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল না।

যমুনার আগ্রহ, তাহার মাতার বিপন্ন চাহনি ও কর্ত্তার ইঙ্গিতে তখন প্রফুল্ল বাধ্য হইয়া যমুনার সঙ্গে যাত্রা করিল।

যমুনার শ্বশুরের অবস্থা স্বচ্ছল নহে। কোন মতে কষ্টে সৃষ্টে দিন চলে। তার উপর তাহার শাশুড়ী কালীতারা অত্যন্ত জাঁদরেল মেয়ে; মুখে তাহার আসিতে পারে না, এমন কথাই নাই।

দুই দিন যাইতে না যাইতেই কালীতারা বধুকে শুনাইয়া দিলেন—"ঠাট করিয়া দাসী বাঁদী লইয়া গরীব শ্বশুরের ঘর করিতে আসিলে, যাহাতে সম্মান থাকে, তেমন যোগাড় লইয়া আসিতে হয়। যার নিজের থাকিবার নাই ঠাঁই—সঙ্গে তার সাত দাই—। এতবড় কলাগাছ মেয়ে—তার সঙ্গে আবার একটা ফেউ ....."

পিতা মাতার চির আদরে প্রতিপালিত যমুনার এই প্রথম আঘাত। এই আঘাত সামান্য হইলেও এই আঘাতে যমুনা কাঁদিয়া অস্থির হইল। তার ভাবনা হইল—প্রফুল্লর জন্য বেশী; প্রফুল্ল এ কথা শুনিয়া কি ভাবিবে! হায়, তাহাকে কেন আনিয়াছিলাম?..."

কালীতারা গোপনে কথাগুলি বলেন নাই; দশ জনকে বেশ ভাল করিয়া শুনাইয়াই ঝঙ্কার দিয়াছিলেন; প্রফুল্লও তাহা সমুখে থাকিয়াই শুনিয়াছিল।

প্রফুল্ল কালীতারার চরিত্র দুই দিনের মধ্যেই বেশ সুন্দর বুঝিয়া ফেলিয়াছিল; সুতরাং তাহার এবম্বিধ খোঁটায় সে একটুও বিচলিত হইল না। প্রফুল্ল কথাটী শুনিয়াই যমুনার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল—যমুনা না জানি এ কথায় কতখানি মর্ম্ম পীড়া পাইয়াছে।

যমুনা চখের জল মুছিতে মুছিতে রান্না ঘরে চলিয়া গেল। দেখিয়া প্রফুল্লও ধীরে ধীরে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া যমুনাকে ধরিয়া, নিজের আঁচল দিয়া যমুনার চক্ষু মুছাইয়া দিল। তারপর বেশ স্বাভাবিক স্বরে বলিল—"সই শ্বশুরের ঘরে এ সকল কথা নিত্যই শুনিতে হয়, এ সকল তোমাকে সহ্য করিয়াই চলিতে হইবে।..."

প্রফুল্লকে দেখিয়া যমুনা আরও অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিল, প্রফুল্লও পুনঃ পুনঃ তাহার চক্ষু মুছাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

প্রফুল্ল বলিল—"আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া মাঐ মা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমি একটুও দুঃখিত হই নাই, সে জন্য তোমার কোন লজ্জার কারণ নাই ; লজ্জা হইতে হইলে তাঁরই হওয়া উচিত। যার ভাত দিবার ক্ষমতা নাই, তার বিবাহ করাইবার সাধ কেন..."

যমুনা প্রফুল্লর শেষ মন্তব্য শুনিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাতে তাহার মুখ বন্ধ করিয়া ধরিয়া বলিল—এরূপ কথা বলিও না সই, শুনিলে আর উপায় থাকিবে না ; আমার জন্য আমি আর চিন্তা করি না...তোমাকে যাতা বলিয়া তোমার মনে কষ্ট না দেন। তোমাকে পাঠাইয়া দিতে পারিলে..."

প্রফুল্ল বলিল—"কোন চিন্তা নাই সই, তোমাকে অরণ্যে বাঘের হাতে ফেলিয়া আমি যাইব না ; এখানে থাকিব, এবং যে রূপ করিয়া থাকিতে হয়, সেরূপেই থাকিব। মান অপমানের জ্ঞান আমার জন্য ভগবান রাখেন নাই ; সে জন্য তুমি একটুও চিন্তা করিও না।

কালীতারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন—প্রফুল্ল রান্নাঘরে গিয়াছে। তিনি ক্ষুব্ধা বাঘিনীর মত সে দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"ওগো, ও শূদ্র-ভদ্রের মেয়েটা বাঁদীই হও আর সই ই হও—ও ঘরে তুমি গেলে যে হাঁড়ি কুড়ি নষ্ট হইতে পারে তা কি জান না ; না মালঞ্চায় ঝি দাসীর রাঁধা বাড়া চলে ?"

প্রফুল্ল মুখ বাড়াইয়া স্বাভাবিক স্বরেই বলিল—"আমি ওই দিকে যাই নাই মা।" তারপর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"মা, এত শক্ত কথা এমন অসহায়কে বলা কি ঠিক! ছেলে বিবাহ করাইলে দুইচার জনের ভাতের বরাদ্দ ঘরে থাকা চাই ; আর এই সকল কথা এই মেয়েকে বলিলে কি হইবে। ওতো আর নিজে সঙ্গে করিয়া লোক লইয়া আইসে নাই! বাপ মা..."

কড়ায় উত্তপ্ত তেলে বেগুন পড়িলে যেমনটী হয়, প্রফুল্লর কথা শুনিয়া কালীতারা ঠিক তেমনি ছেঁৎ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কি! কি! যত বড় মুখ না তত বড় কথা, বাঁদির মুখে পাজির কথা—অতখানি সদর আলা হইলে এই বাড়ীতে ঠাঁই নাই, ঝাঁটা মারিয়া বাহির করিয়া দিব! জান! আমার মুখের উপর কথা! দেখ দেখি মদ্দানি..."

প্রফুল্ল কাছে আসিয়া মাটির দিকে চাহিয়া পায়ের নখে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল—"আমি তেমন কি কথা বলিয়াছি মাঐ মা ; আপনি রাগ করিলেন কেন ?"

কালীতারা প্রফুল্লর কথায় মনোযোগ না দিয়াই বলিতে লাগিলেন—"এ মালঞ্চা নয়, এখানে সইয়ালা ফইয়ালা ঝালাইবার ঠাঁই নাই। কুকুরকে নাই দিলে ঘাড়ে চড়িয়া নাচে... "

কালীতারার মুখে যেন খৈ ফুটিতেছিল। তিনি মুখে বক্ বক্ করিতে করিতে বাহের বাড়ীর আঙ্গিনার দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রফুল্ল রান্না ঘরের দিকে আসিয়া যমুনাকে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইয়া বলিল—"সই আমার জন্য তুমি ভাবিওনা ; তোমার জন্য এগুলি আমার মনে একটুও কষ্ট দিতে পারিবে না।"

যমুনা কাঁদিতেছিল, বলিল—"এও যদি তোমাকে কষ্ট না দিবে, তবে কিসে কষ্ট দিবে সই ; আমার জন্য এত অপমান তোমার সহ্য করিতে হইবে জানিলে কি আমি তোমাকে আনিতে এত আগ্রহ করিতাম। মা, দাদা তোমার জন্য কত আপত্তি করিয়াছিলেন..."

প্রফুল্ল বলিল—"দুঃখ অপমান সহ্য করিবার শক্তি প্রত্যেকেরই থাকা চাই সই, যে দিন সহ্য হইবেনা, সে দিন আমিতো অনায়াসেই চলিয়া যাইতে পারিব, কিন্তু তুমি তো তা পারিবে না! তোমার কথা ভাবিয়াই আমাকে এখন সকল রকমের বাক্য যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করিতে হইবে।..."

যমুনা—"আমি নিজের অপমান যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব, তোমার অপমান যে আমার সহ্য হইতেছে না—"

প্রফুল্ল—"সহ্য করিয়া চলিতে হইবে ; আমি চলিয়া গেলে তোমার জন্য যে ভাবিবার লোকটীও থাকিবে না—তোমার সেই দুঃখের চিন্তাই যে আমাকে কোথাও সুখে রাখিবে না। তুমি এ বিষয়ে আর কোন চিন্তা করিও না!"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে যমুনা ঘরে গেল; প্রফুল্ল সম্মার্জ্জনী হাতে লইয়া গৃহ ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল। সে এ বাড়ীতে কেবল বসিয়াই খায় না; সে জন্য বুকের পাটা তার একটু শক্তছিল।

৮

গদাধর ভট্টাচার্য্য চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া হস্তলিখিত মহাভারত পাঠ করিতেছিলেন। তখনও তাঁহার পাঠের বৈঠকে শ্রোতার দল আসিয়া জমে নাই। তিনি যখন সুর করিয়া পাঠ করিতেছিলেন:—

বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যাগ্র মেদিনী।
দুর্য্যোধন কহিলেন শ্রীকৃষ্ণে আপনি॥

ঠিক সেই সময় কালীতারা দেবী আসিয়া বাহিরের আঙ্গিনার কোণে দাঁড়াইয়া নথ সহ তাহার উল্কির ছাপার চিত্রিত মুখ মণ্ডল ইতস্তত ডানে বামে নাড়াইয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গিমার সহিত সচীৎকারে প্রফুল্লর মুখে মুখে উত্তর প্রত্যুত্তর করা রূপ অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য বিচার প্রার্থী হইলেন।

ভট্টাচার্য্যের অখণ্ড মনোযোগ তখন কুরুক্ষেত্রের ভাবি বিপ্লবের উপর অত্যন্ত কুতুহলের সহিত সংবদ্ধছিল; সুতরাং গৃহিণীর অপ্রত্যাসিত অভিযোগ তাঁহাকে বেশী বিচলিত করিতে পারিল না; তিনি কেবল—"দেখা যাবে পরে—যাও" বলিয়া কোন প্রকারে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাও যে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ব সূচনা, তৎ বিষয়ে তাঁহার আপাতত: কোন চিন্তাই দেখা গেল না।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর নিকট ভট্টাচার্য্যের কোন চেষ্টাই কখন সফল হয় নাই। সুতরাং এই প্রাথমিক অবহেলার চেষ্টার যে ক্রটী তাঁহার ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে টের পাওয়াইয়া দিতে কালীতারা দেবীকে অধিক কথা অপব্যয় করিতে হইল না।

কালীতারা চারিদিকে লোক জন নাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি মণ্ডপে উঠিয়া ভট্টাচার্য্যের তামাকু সাজানো কলিকাটী রাগের ভরে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তখন ভট্টাচার্য্যের চৈতন্য হইল—কুরুক্ষেত্রের কথা দ্বাপরের গল্প নহে, এযে সাক্ষাৎ তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে সপ্রকাশ।

তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার হুকাটীর প্রাণ রক্ষার জন্য অত্যধিক ব্যগ্র হইয়া তাহা ধরিয়া ফেলিলেন এবং এক হাত পুস্তকের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া বলিলেন—"কি হইয়াছে বল; গঙ্গা কি বউকে কিছু বলিয়াছে? না ঝিকে কিছু করিয়াছে?"

কালীতারা তামাক ও টিকার পাত্রের উপর চরণ কমলের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া তাহা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া অনুনাসিক ভ্যাংচি সহকারে বলিলেন—"বুঁড়া বয়সে ছুঁড়ি দেখিয়া পাগল হইয়াছেন—এখন বলেন গঙ্গা কি ঝিঁকে কিছু করিয়াছে! গঙ্গা করিবে কেন? নিজেই মুখ দিয়া, সোহাগ দিয়া, নাই দিয়া—সাহস বাড়াইয়া দিয়াছ—এখন দেখ গিয়া—সে বেটী ঝি, না কর্ত্তার উপর কর্ত্তা:.."

গদাধর ঢোক গিলিয়া চক্ষু তারকা উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বলিল—"কি হইয়াছে—বিষয়টা কি বলনা শুনি?

কালীতারা তখন সবিস্তার সকল কথা বলিয়া প্রফুল্লকে অবিলম্বে মালঞ্চা পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন।

গদাধর বলিলেন—"তাঁহারা লোক পাঠাইল, নৌকা পাঠাইল সময় দিলে না, এখন পুনরায় লোক না আসিলে অথবা সে মেয়ে নিজ হইতে না যাইতে চাহিলে পাঠান যায় কেমন করিয়া? তা যে কেবল ভব্যতা বিরুদ্ধ হইবে তা নয়, খরচ পত্রও প্রয়োজন। তারপর মেয়েটাই বা কি মনে করিবে বউটাইবা বলিবে কি?"

"মেয়েটা কি খায় কম, ইহাতে খরচ লাগেনা কি?"

"তা—একটা বেশী লোকের খাওয়ার দিবার শক্তি না থাকিলে, ছেলের বিবাহ করাইলে কেন? আমার তো সেজন্য ইচ্ছাই ছিল না; তখন তো ছেলের বউ, ছেলের বউ করিয়া নাচিলে, এখন দুদিন যাইতে না যাইতেই বউ-ঝি বালাই হইল কেন? এখন ছেলেকে বল রোজগার করিয়া বউ পালিতে? আর তোমার ক্ষমতা থাকে—ঝিকে পাঠাইয়া দাও। কিন্তু খুব ভদ্র ভাবে। আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না; আমি এ সকল খাম্‌খেয়ালি ব্যাপারের মধ্যে নই—যখন যাহা খুসি—তখনি তাহা আমি করিতে পারিব না।" বলিয়া গদাধর রাগ দেখাইয়া মহাভারত খানা বন্ধ করিয়া তাহা বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন।

এই সময় একজন শ্রোতার আগমন সম্ভাবনা দেখিয়া কালী তারা পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিলেন। যাইবার সময় কেবল এইমাত্র বলিয়া গেলেন:—"তবে ঝি লইয়াই বসতি কর, দেখি কেমন রসে দিন যায়।

ক্রমশঃ—

দখিন হাওয়া।

বসন্তে আসি মোরা ধীরে নেমে মর্ত্ত্যে,
জানিনা আছে কি দুখ সুখ পরিবর্ত্তে,
ফুটাই কুসুম কলি,
চলি মোরা চঞ্চলি,
কিশলয় কাছে যাই
চুম্বন করতে,
ধীরে নেমে আসি মোরা মধুমাসে মর্ত্ত্যে।

দক্ষিণ হ'তে মোরা আনি মৃদুস্পর্শ,
গোপনে জাগাই মনে ভাষাহীণ হর্ষ;
চুত কলিকাগুলি
মোরা বিকচকা তুলি,
উচ্ছল কুহুরব আনি প্রতিবর্ষ,
নীরবে জাগাই মনে ভাষাহীন হর্ষ।

প্রাণের পুলকে মোরা মেতে উঠি লাস্যে,
পঙ্কজ প্রস্ফুটি উঠে স্মিতে হাস্যে;
বকুল মুকুল দল
আহ্লাদে ঢল ঢল,
মধুলিহ চুমে আজ কিংশুক আস্যে,
হিল্লোল পুলকেতে মাতি মোরা লাস্যে।

মোরা অতি নির্ম্মম, অকারণ মিত্র,
অনাহূত বিভ্রমি ভুবনে বিচিত্র।
ফাল্গুণে ফুলবনে
কুসুম প্রলেপণে
আগুণ লাগায়ে মোরা রচি নবচিত্র—
মোরা চিরচঞ্চল-অকারণ-মিত্র।

মৃতের জিয়াই মোরা, হাসি দেই নিঃস্বে
আমাদের কেহ নাই, কিছু নাই বিশ্বে।
অজ্ঞাত কুলশীল,
খোলাপ্রাণ, খোলাদিল,
বিলকুল-উল্লাস নব নব দৃশ্যে—
আমরা জিয়াই মরা—হাসি দেই নিঃস্বে।

কে আছ কোথায় আজ বীত-সুখ-সুপ্ত,
জরা-ভার-জর্জ্জর কে রয়েছ গুপ্ত?
যৌবন ঝরণায়
ব্যাধিজরা ঝরে যায়,
আঁখিজল হেথা হ'তে চির অবলুপ্ত,
কোথায় কে আছ ওগো বীত-সুখ-সুপ্ত?

এসো এসো কে আসিবে এসো ভুজবন্ধে,
চুম্বনে কে মাতিবে পুলক-আনন্দে;
নগ্ন শিথিল বাস,
অধরে মধুর হাস,
উচ্ছ্বসি কে উঠিবে কুসুমের গন্ধে—
মধুমাসে এসো ওগো এসো ভুজবন্ধে॥

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ।

মহারাজ অশোকের ধর্ম্মপ্রচার।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন! ইনি প্রায় ২৫ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি দক্ষিণ ভারতের কাবেরী নদী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। পিতৃদত্ত বিশাল সাম্রাজ্যের তিনি কোনও অনিষ্ট সাধন করেন নাই। দুঃখের বিষয় আমরা এপর্য্যন্ত বিন্দুসার সম্বন্ধে আর কোনও বিশেষ কথা জানিতে পারি নাই।

ঐসময় তক্ষশীল ভারতবর্ষের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। অনেকে বলেন তখন উহা ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।, ভারতের ভিন্ন২ স্থান হইতে প্রধান ২ সামন্ত ও নৃপতি গণের পুত্রেরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য এই স্থানে প্রেরিত হইতেন। আজ কাল Residential Universityর প্রচলন লইয়া এদেশে খুব গোলযোগ হইতেছে। অনেক য়ুরোপীয়ের বিশ্বাস ইহা ভারতে এক নূতন জিনিষ। কিন্তু ভারতের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন যে ইহা আমাদের অতি নিজস্ব প্রথা। অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু সন্তানরা এই প্রথায় শিক্ষিত হইতেন। তক্ষশীলার ন্যায় ভারতের আরও কয়েক স্থানে সে সময় এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই সকলের মধ্যে উজ্জয়িনী ও গয়ার নিকট বর্ত্তী নলন্দার বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল।

বিন্দুসারের মৃত্যুর সময় অশোক বর্দ্ধণ উজ্জয়িনী নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। কেহ ২ বলেন, তাঁহার একশত ভ্রাতা ছিল। পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া তিনি একজন ছাড়া সকলকে হত্যা করিয়া ফেলেন। কিন্তু ইহা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। আমরা তাঁহার শিলালিপি পাঠে জানিতে পারি যে, তাঁহার রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরেও তাঁহার কয়েকজন ভ্রাতা ও ভগিনী জীবিত ছিলেন। খ্রীঃপূঃ ২৭২ সালে বিন্দুসারের মৃত্যু হয়। কিন্তু বিশেষ বিস্ময়ের কথা এই যে তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। হয়ত তাঁহার অপর কোনও প্রতিদ্বন্দী থাকাতে তিন বৎসর কাল কলহ বিবাদে অতিবাহিত হইয়াছিল।

ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে মহানদী হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যে ভূভাগ বিস্তৃত তাহা ঐসময় কলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। খ্রীঃপূঃ ২৬১ বৎসরে অশোক এই প্রদেশ জয় করেন। কলিঙ্গ রাজের অধীনে প্রায় ৬০,০০০ পদাতিক ১০০০অশ্বারোহী এবং ৭০০ হস্তীছিল। এইজন্য অশোককে এই যুদ্ধে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। কথিত আছে। এই উপলক্ষে প্রায় একলক্ষ লোক হত ও প্রায় দের লক্ষ লোক আহত ও বন্দী হইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, এই যুদ্ধের জন্য সমস্ত দেশে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে সহস্র ২ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। এই জন-ক্ষয়কর ব্যাপারে মহারাজ অশোকের হৃদয় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তিনি বুঝিলেন যে, সামান্য ভূমি লাভের জন্য এই লক্ষ ২ লোককে হতাহত করিয়া তিনি যথেষ্ট অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছেন। তখন তিনি শপথ করিলেন যে অতঃপর আর রাজ্যলাভের জন্য তিনি এইরূপ লোক ক্ষয়কর যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হইবেন না।

এই খানে বলিয়া রাখা ভাল যে, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার এবং অশোক সকলেই অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। অশোক কলিঙ্গ বিজয়রূপ মহাপাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু মনে কিছুতেই শান্তি পাইলেন না। এই সময় জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিয়া অশোক ক্রমে ২ হৃদয়ে পরম শান্তি লাভ করেন। এই ঘটনায় তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং কিয়দ্দিবসের মধ্যে তিনি প্রকাশ্য ভাবে ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহার পর তিনি এই নব ধর্ম্মের বিস্তার ও উন্নতি সাধনের জন্য তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। ইহার জন্য তিনি যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা আমরা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিলাম।

(১) তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের ভিন্ন ২ স্থানে প্রস্তরের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের মূল নীতি সকল খোদিত করিয়া স্থাপন করেন। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে; (ক) স্থানে ২ বিশাল প্রস্তর স্তম্ভ সকল প্রোথিত করা হইয়াছিল। এই স্তম্ভ সকল এক একখণ্ড বিশাল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হইত। বারাণসী কলেজের পশ্চাদভাগে ও প্রয়াগের প্রসিদ্ধ দুর্গের মধ্যে এই জাতীয় স্তম্ভ আছে। (খ) ভিন্ন ২ স্থানের শিলার উপর এই প্রকারের লিপি খোদিত হইয়াছে। (গ) ভারতের অনেক পর্ব্বতের গহ্বরে এই প্রকার লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত ৩৪টী স্থানে অশোকের শিলালিপি আবিস্কৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই সমস্ত লিপি পালি ভাষায় লিখিত। ঐ সময় উহাই রাজভাষা ছিল।

(২) বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি প্রচারক নিযুক্ত করেন। অনেকে হয়ত জানেন, ঐ সময় ভারতে এই নবধর্ম্মের অবস্থা বিশেষ আশাজনক ছিল না। মগধ ছাড়া তখন জগতের আর কোনও স্থানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যাইত না। অনেকে অনুমান করেন, তখন দুই তিন হাজারের অধিক বৌদ্ধ মগধে ছিল না। যদি এই সময় মহারাজ অশোক এই ধর্ম্ম অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই ধর্ম্মের নাম জগতের ইতিহাস হইতে মুছিয়া যাইত।

বৌদ্ধেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; শ্রমণ ও ভিক্ষু। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীরা ভিক্ষু ও সংসারীরা শ্রমণ নামে পরিচিত হইতেন। অশোক ভিক্ষু দগকে উক্ত প্রচারকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই নবীন ধর্ম্ম যাহাতে

ভারতের চারিদিকে প্রচার হয়, তাহার জন্য অশোক প্রথমে বিশেষ চেষ্টা করেন। কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত, গান্ধার, দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে তিনি বহু প্রচারক প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম অল্প দিনের মধ্যেই ঐ সকল স্থানে প্রচারিত হয়। ইহার পর তিনি ভারতের বাহিরেও প্রচারক প্রেরণ করেন। তাঁহার ত্রয়োদশ শিলালিপি পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, সিরিয়া, মিশর, মাসিডোনিয়া, এপিরস, কাইরিনি, পারস্য প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ প্রচারক সকল গমন করিয়াছিলেন। এবং এই সকল স্থানের বহু লোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

(৩) তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বড় ২ সহরে মঠ স্থাপন করিয়া অভিজ্ঞ ও প্রবীন ভিক্ষু সকল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রচার কর্ম্মের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। প্রচারকেরা সন্তোষ জনক কার্য্য করিলে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইতেন।

(৪) দরিদ্রদিগকে দান করিবার জন্য স্থানে ২ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজপথের ধারে, ছায়া যুক্ত বৃক্ষ সকল, এবং কূপ ও সরোবর খনন করা হইত। এই সকল কার্য্যের জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখনকার বড় লোকেরাও এই সকল সৎকর্ম্মে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন। যদি কোনও অর্থবান লোক এই প্রকার কার্য্যে কার্পণ্য প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতেন।

(৫) অশোকের রাজত্বের সময় পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের এক মহা সমিতির অধিবেশন হয়। বলা বাহুল্য, মহারাজ অশোকের আন্তরিক যত্নই ইহার জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ। বুদ্ধের মৃত্যুর পর ও অশোকের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে নানাপ্রকার নূতন মতের সৃষ্টি হইয়াছিল ; ঐসকল মত সংশোধনের জন্য এই মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। ইহা দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

(৬) তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োবিংশ বৎসরে মহারাজ অশোক তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েন। প্রথমে তিনি উত্তর দিকে গমন করেন এবং আধুনিক মজঃফরপুর ও চম্পারণ জেলার ভিতর দিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হয়েন। ইহার পর পশ্চিমদিকে গমন করিয়া তিনি মহাত্মা বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্তু নগরে উপস্থিত হয়েন। তাঁহার দীক্ষাগুরু উপগুপ্ত তাঁহাকে ঐপবিত্র স্থান দেখাইয়া দেন। এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশে অশোক ঐ স্থানে এক প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপিত করেন। ইহার গাত্রে এই কথা গুলি খোদিত করা হয়—"মহারাজ। এই স্থানে পবিত্রাত্মা জন্মগ্রহণ করেন"। লিপিগুলি দেখিলে মনে হয় বুঝি দুই দিন পুর্ব্বে ইহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, অধুনা কপিলাবস্তু 'লুম্বিনিবাগ' (Lumbini Garden) নামে পরিচিত। ইহার পর মহারাজ খাড়নাথ (কাশী), 'বুদ্ধগয়া, 'শ্রবস্তি' হইয়া কুশীনগর গমন করেন। শাক্যমুনি শেষোক্ত স্থানে মহানির্ব্বাণ লাভ করেন। মহারাজ অশোক প্রত্যেক স্থানেই দুই একটি করিয়া স্মরণ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

তাঁহার রাজত্বের ৩২ বৎসর পরে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, গাহর্স্থ আশ্রম নির্ব্বাণ মুক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। এই জন্য তিনি স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুর পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন। রাজকার্য্যাদি একবারে ত্যাগ করিলেন কিনা ঠিক বলিতে পারা যায় না। কেননা এই ঘটনার ছয় বৎসর পরেরও তাহার শিলা লিপি আমরা দেখিতে পাই। হয়ত তিনি রাজকার্য্য তাঁহার মন্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক ; ইহার পর তাহার জীবন যে কেবল মাত্র ধর্ম্ম কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

যে সময় অশোক সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েন, সে সময় নেপাল, কাশ্মীর প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশ স্বাধীন ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র হিমালয় প্রদেশ মগধের অধীন হইয়া পড়ে। মধুপাটন নামক স্থান প্রথমে নেপালের রাজধানী ছিল। যে সময় অশোক তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন তিনি নেপাল রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ

অনুসারে 'ললিত পাটণ' (পাটন বা ললিতপুর) নামে নেপালের এক নূতন রাজধানী নির্ম্মিত হয়। এই সময় মহারাজের সহিত চারুমতি নাম্নি তাঁহার এক কন্যা ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থ তিনি আজীবন ঐ ললিতপাটণে বাস করেন। ইহার স্বামী দেবপাল অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, চারুমতি তাঁহার স্মরণার্থ নেপালে 'দেবপাটণ' নামক এক সহর স্থাপন করেন।

অশোকের ন্যায় সার্ব্বভৌম সম্রাট ভারতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান পর্য্যন্ত ভারতে আর কখনও একজন নরপতির অধীনে এত বড় বিশাল রাজ্য শাসিত হয় নাই। ইহার সাম্রাজ্যের উত্তরে তিব্বত, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে কাভেরী নদী ও পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও পারস্য রাজ্য অবস্থিত ছিল। ভারতের সুদূর দক্ষিণে ক্ষুদ্র চোলা, পাণ্ড্য, কেরল পুত্র ও সত্যপুত্র ভিন্ন সমস্ত স্থান তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। উক্ত চারিটী ক্ষুদ্র রাজ্য তাহার অধীন ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিত। আজ কাল আমরা যাহাকে protected states বলি ইহারা সেই প্রকার ছিল। এতদ্ব্যতীত, ভারতের বাহিরে নেপাল, কাশ্মীর আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে, মগধের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল পাটলিপুত্র হইতে শাসিত হইত। দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকল চারিখণ্ডে বিভক্ত ছিল; (১) উত্তর পশ্চিম খণ্ডঃ—তক্ষশীলা ইহার রাজধানী ছিল। আধুনিক পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, কাশ্মীর, আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান ইহার মধ্যে ছিল। (২) পূর্ব্ব খণ্ডঃ—কলিঙ্গ, বঙ্গ, আসামের কিয়দংশ ও মধ্য ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক ইহার অন্তর্গত ছিল। তোসলি নামক কোনও এক অজ্ঞাত নগর ইহার রাজধানী ছিল। (৩)পশ্চিম খণ্ডঃ—মালব,গুর্জ্জর এবং সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবার প্রদেশ) ইহার ভিতর ছিল। উজ্জয়িনী ইহার রাজধানী ছিল। (৪) দক্ষিণ খণ্ডঃ—নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী সমস্ত স্থান ইহার মধ্যে ছিল। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক খণ্ডে একজন করিয়া রাজপ্রতিনিধি বাস করিতেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান পাটলীপুত্রে গমন করিয়াছিলেন। তখনও পর্য্যন্ত অশোকের রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল। তিনি বলেন, লোকে যে বলে এই প্রাসাদ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহাতে আমি বিস্মিত হই নাই। কারণ এপ্রকার সুন্দর ভবন আমি আর দেখি নাই। মানুষ যে এমন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারে, তাহা আমার ধারণা ছিল না।" মধ্য ভারতের সাঞ্চি নামক স্থানে আজ পর্য্যন্ত কয়েকটি বৌদ্ধ স্তূপ অনেকটা অবিকৃত অবস্থায়, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অশোকের সময় নির্ম্মিত। হিন্দুরা ঐ সময় স্থপতি বিদ্যায় যে কতদূর উন্নত হইয়া ছিলেন এই সমস্ত স্তূপ দেখিলে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আমরা প্রথমে যে সকল স্তম্ভের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও বড় কম কারিকরি প্রকাশ হয় নাই। এক একটা স্তম্ভ ৫০ ফুটের কম উচ্চ নয়। ওজনে প্রত্যেকটা ৬০।৭০ টন কম হইবে না। একটা আস্ত প্রস্তর লইয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। কিভাবে যে ইহা পর্ব্বত হইতে কাটা হইয়াছিল এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহা, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এমন অনেক স্থানে স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছে যেখানের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে কোনও পর্ব্বত নাই! তাহার পর কৃত্রিম গহ্বরের কথা। অতি কঠিন পর্ব্বত সকল কাটিয়া অনেক স্থানে সারি সারি অনেকগুলি গহ্বর প্রস্তুত করা হইয়াছে। এক এক স্থানে ৭০।৮০ ফুট লম্বা ২৫।৩০ ফুট চওড়া ও ৩০।৪০ ফুট উচু গহ্বর পর্ব্বত কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই প্রাচীন যুগে তাঁহারা যে কি প্রকারে এই সমস্ত কঠিন কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আমরা শীঘ্র বুঝিতে পারিব না।

প্রাচীন হিন্দু যুগের নরপতিগণের মধ্যে অশোকের ইতিহাস আমরা যেমন জানিতে পারি এমন আর কাহারও নয়। ইহার দুইটি প্রধান কারণ দেখা যায়— তাঁহার শিলালিপি ও বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ সকল। এই সকল শিলালিপি হইতে আমরা তাঁহার বিষয় অনেক কথা

জানিতে পারি। ইহারা যদিও বৌদ্ধধর্ম্ম নীতি প্রচারের জন্য খোদিত হইয়াছিল, আমরা কিন্তু ইহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পারি। একটি বিষয়ে আমরা বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। এই সকল শিলালিপির কোনও স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কোনও কথার উল্লেখ দেখা যায় না। এই সকল লিপি হইতে তিনি জনসঙ্ঘকে যাহা শিখাইতে চাহিয়াছিলেন আমরা তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

১। প্রাণীহিংসা যাহাতে কেহ না করে সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছিল। যাঁহারা আহারের জন্য পশু হনন করিতেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ হারে শুল্ক দিতে হইত। বৎসরের মধ্যে ৫৬ দিন সাম্রাজ্যের কোনও স্থানে পশু হত্যা হইতে পাইত না। এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে অতি গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইত।

২। পিতামাতা, গুরুজন ও শিক্ষা এবং দীক্ষা গুরুর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা।

৩। সত্যকথা। একটি শিলালিপিতে এই কথাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ পিতামাতাকে অবশ্য সম্মান করিবে; জীবের প্রতি দয়া কর; সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে; শিক্ষকের প্রতি কদাপি অসম্মান প্রদর্শন করিও না।

৪। অন্য সমস্ত ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। প্রত্যেক ধর্ম্মই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, হিন্দুশাস্ত্রও সর্ব্বদা এই মত প্রচার করিয়া আসিতেছেন। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কখনও ভারতে উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। অপর ধর্ম্মের প্রতি হিন্দু যে কখনও বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টীয় মিসনরিরা কিন্তু কোনও দিন এই প্রকার উদারতা দেখাইতে পারেন নাই। ধর্ম্মের জন্য য়ুরোপ খণ্ডে যে কত সহস্র সহস্র লোক জীবনদান করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। খ্রীষ্টানরা স্পষ্টই বলেন, "নরক হইতে উদ্ধার লাভ করিবার একমাত্র উপায় যীশু খ্রীষ্ট; জগতের অপর সমস্ত প্রচারকই ভণ্ড।"

দান ও ইহার শ্রেষ্ঠতা।

রাজপথের উপর কূপ ও পান্থশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্বে ছায়াযুক্ত বৃক্ষ সকল স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক কূপের পার্শ্বে গবাদি পশুর জল পানের স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল। অনাথ ও দরিদ্র রোগী ও পশুদিগের চিকিৎসার জন্য সহস্র ২ হাসপাতাল স্থাপন করা হইয়াছিল। তাঁহার সাম্রাজ্যের বাহিরের অনেক স্থানেও এই প্রকার হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অশোকের প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারকেরা যে জগতের ভিন্ন২ স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অশোকের অনুজ মহেন্দ্র প্রথমে এই কার্য্যের জন্য দক্ষিণ ভারতে গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি সিংহল গমন করেন। ঐ সময় তিস্সা সিংহলে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন বটে কিন্তু মহেন্দ্রকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। মহেন্দ্রের যত্নে এই নবীন ধর্ম্ম সিংহলের অনেকে অবলম্বন করিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি সমস্ত জীবন এই স্থানেই বাস করেন। শুনা যায়, তাঁহার মৃত্যুর পর সমগ্র সিংহল বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন মহেন্দ্র অশোকের পুত্র ছিলেন, এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার ভগিনী সঙ্ঘমিত্রাও সিংহল গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ফাহিয়ান ও হুয়েন্থসাঙ্গ দুই জনেই মহেন্দ্রকে সম্রাটের ভ্রাতা বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা কেহই সঙ্ঘমিত্রার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই।

ইংরাজি ইতিহাস লেখকেরা অশোকের নামের সহিত The Great শব্দ যোগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই মতকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। মনে রাখা উচিত, অশোকের সময় এদেশে রেল, তার এমন কি ভাল রাজপথও ছিল না। এদেশে একতা কোনও দিন ছিল না। অশোক কলিঙ্গ জয়ের পর যুদ্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাপি আমরা তাঁহার রাজত্বের সময় কোনও প্রকার বিদ্রোহ বা অন্য প্রকার অশান্তির কথা জানিতে পারি না। তাঁহার বিপুল

সাম্রাজ্যের মধ্যে যে তিনি কি প্রকারে সর্ব্বদা শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আজকাল যে দেশের চারিদিকে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করিতেছে তাহার প্রধান কারণ—রেল ও তার। আমাদের বোধ হয় তিনি যে সাম্রাজ্যের চারিদিকে বৌদ্ধ নীতি সকল প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার জন্য যে নানা প্রকারের কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার ফল ফলিয়াছিল—তাহারই জন্য দেশের লোক পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা ত্যাগ করিয়া শান্তির সহিত বাস করিতেন।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ।

ঢাকা হইতে দাস রপ্তানীর ব্যবসায়।

দাসত্ব প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালেও বিদ্যমান ছিল সত্য কিন্তু মধ্য এসিয়ার খিবার হাটে বা আফ্রিকার কাইরোর বাজারে যেরূপ করিয়া পশুপক্ষীর মত মনুষ্য দাস ক্রয় বিক্রয় হইত তেমনতর ক্রয় বিক্রয় প্রচলিত থাকার কোন বিবরণ প্রাচীন ভারতের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ বা কাব্য সাহিত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমাদের এই শস্য শ্যামলা বঙ্গদেশের ভাগ্যে এমনই একটা দুঃসময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল যখন এই দেশের হাটে বাজারে পর্য্যন্ত মানুষ পেটের দায়ে মানুষ বিক্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করিবার উপায় খুঁজিতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সোণার বাঙ্গালাকে মহা শ্মশানে পরিণত করিয়া গিয়াছিল; সে শ্মশানে বিচরণ করিয়া বাঙ্গালী মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিল—আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিক্রয় করিয়া উদর সর্ব্বস্ব হইয়াছিল; নিরন্ন প্রতিবাসী দিগের ক্ষুধিত ও নিরাশ্রয় শিশু সন্তানদিগকে নির্দ্দয়ভাবে তাহাদের মৃতপ্রায় পিতামাতার ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়া পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিতেছিল। পর্ত্তুগীজ বণিকেরাও এই সুযোগে একটী অতি লাভজনক ব্যবসা চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল।

ইতিহাস পাঠকের নিকট অবশ্যই ইহা অবিদিত নহে যে এমনি ভাবে বাঙ্গালা মায়ের একটী দুর্ভাগ্য শিশু পর্ত্তুগীজ বণিকদিগের ব্যবসায়ের সওদা হইয়া হস্তান্তরিত হইতে হইতে কালক্রমে যাইয়া ফরাসীর রাজা লুইর সিংহাসন সান্নিধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল এবং ভীষণ ফরাসী বিপ্লবের সময় নিজ অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কেবল ফরাসী দেশে নহে পৃথিবীর যাবতীয় স্থানে আমেরিকার আদিম অধিবাসী ও আফ্রিকার নিগ্রো দিগের ন্যায় দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীও যে ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত ছিল তাহা ঢাকা জেলার তদানিন্তন কালেক্টর বা চিফ্ মিঃ এম, ডের লিখিত ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখের একখানা চিঠির মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলাম।

মিঃ এম্, ডে, (M. Day) রেভিনিউ কমিটির তদানিন্তন একটিং সেক্রেটারী মিঃ উইলিয়ম কাউপারকে ঢাকা জেলার এই শোচনীয় দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া দিবার জন্য জরুরী উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছেন :—

"নিম্ন শ্রেণীর পর্ত্তুগীজেরা এই জেলার বহু নিঃস্ব পরিবারের শিশুদিগকে কলিকাতা, চুঁচুড়া ও অন্যান্য বৈদেশিক উপনিবেশ সমূহে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া যে একটা ব্যবসায় চালাইয়াছে—এই শোচনীয় সংবাদ আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। আমি নিম্নে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা যাহাতে এই মনুষ্য রপ্তানীর ব্যবসা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা অচিরাৎ করিবেন। ইহা না করিতে পারিলে আমাদের শাসন ব্যবস্থার পঙ্গুত্ব প্রমাণিত হইবে।

এ জেলায়—দীর্ঘকাল দুর্ভিক্ষ থাকায় ও জলপ্লাবনে শস্য হানী জন্য—শোচনীয় অবস্থা নিবন্ধন জেলার নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসীগণ উদরান্নের সংস্থান করিবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের সন্তানগুলিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইতেছে এবং এইরূপ শত শত মনুষ্য বিক্রীত ও হস্তান্তরিত হইয়া স্থানান্তরে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে।

এই শোচনীয় সংবাদ পাইয়া আমি—মফস্বলে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া অবগত হইলাম—মফস্বল হইতে নিম্ন শ্রেণীর পর্ত্তুগীজেরা নৌকা বোঝাই করিয়া শিশু বালক বালিকা (Children of all ages) দিগকে সুন্দর বনের পথে এ জেলা হইতে কলিকাতায় লইয়া গিয়া জাহাজে তুলিয়া দিতেছে এবং সেই জাহাজ সেই হতভাগ্য নির্ব্বাসিত দিগকে লইয়া বিদেশীয় উপনিবেশ সমূহে চলিয়া যাইতেছে। মাননীয় মিঃ লিগুসে গত শুক্রবার ঢাকা আসিয়াছেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন—তাহার আগমন পথে তিনি এইরূপ শত শত হতভাগ্যের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। এই ব্যবসায় নিরোধ করা এবং এইরূপ হতভাগ্য নিরুপায় দিগকে দেশ-বহিস্কার (transportation) হইতে এবং দাসত্ব বন্ধন হইতে রক্ষাকরা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এই ব্যবসায় বন্ধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে—আমাদের শুল্ক আদায়ী কর্ম্মচারীদিগের (Custom Masters) প্রতি আদেশ প্রচার করিয়া এইরূপ লোক পূর্ণ নৌকা গুলিকে আটক করিয়া ফেলা এবং এই উপায়ে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করা। আমি নিজের এলাকায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম। জেলার প্রতি নৌকা চলাচলের পথে উপযুক্ত প্রহরী নিযুক্ত করিলাম এবং তাহাদিগকে ঐরূপ নৌকা আটক করিয়া সদরে আনয়ন করিতে আদেশ করিলাম। মফস্বলের হাটে বাজারে এবং পল্লির নিভৃত স্থান সমূহেও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। আমার এই অনুসন্ধান ব্যর্থ হয় নাই। অদ্য প্রাতে—২ বৎসর হইতে উর্দ্ধ ৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক—৪২টী শিশুকে বিক্রেতা সহ ধৃত করিয়া আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে; আমি বিক্রেতা দিগকে আপনাদের আদেশ প্রাপ্ত হইবার সাপেক্ষ কাল পর্য্যন্ত আটক থাকিতে বাধ্য করিয়াছি। শিশুগুলি প্রাণ হীন প্রায়—যে পর্য্যন্ত না তাহাদিগের পিতা মাতার খোজ পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত তাহাদিগের রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছি। তৎপর আপনার বোর্ড যেরূপ সাহায্য তাহাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন—সেইরূপ সাহায্য প্রদান করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের আত্মীয়গণের নিকট প্রেরণ করা যাইবে।"

সহৃদয় মিঃ ডে এই স্থানেই চিঠি শেষ করেন নাই। এই শোচনীয় ব্যবসায়ের উচ্ছেদ জন্য উপায় উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া শেষে দেশের তৎকালীন ভীষণ দুরবস্থার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"——এই উপলক্ষ্যে এইরূপ শোচনীয় ও ত্রাশ জনক আর একটী ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া আপনাদিগের কমিটিকে বিরক্ত করিতেছি।

দীর্ঘকাল ব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও শস্যের মূল্যাধিক্য হেতু এই জেলার—বিশেষতঃ জেলার পূর্ব্বাঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের শত শত—শত শত কেন বলি—সহস্র সহস্র নিরন্ন অসহায় হতভাগ্য ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে—কেহ মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে, কেহ বা পথিকের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়া অসহায় ভাবে চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া শরীরের শেষ শক্তিটুকুও ব্যয় করিতেছে। পথিকের অবস্থাও এমন যে এ শোচনীয় দৃশ্যও তাহাদের হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক করিতেছে না। চাউলের মূল্য ঐ অঞ্চলে ২০ সের হইতে ২৫ সের টাকায় (?)। দীর্ঘ কালের অনসন ক্লেশে ইহারা মজুরীও করিতে পারিতেছেনা, সুতরাং অন্নও সংগ্রহ হইতেছেনা। আমি আপাততঃ কিছু চাউল ঐ অঞ্চলে পাঠাইলাম—দেশের ধনবান লোকেও কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছে—আপনাদের কমিটিও আশা করি আমাকে আমার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন।"

দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় সংজ্ঞাহীন পিতা মাতার ক্রোড় হইতে অপেক্ষাকৃত বলবান পুরুষেরা যে মৃতপ্রায় শিশুদিগকে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া নিজ নিজ উদরান্নের ব্যবস্থা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিত—ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। এইরূপ অবস্থায় নিজ নিজ সন্তানকেও পিতা মাতার হস্তান্তরিত করিয়া দিয়া দায়িত্ব মুক্ত হইয়াছে। এইরূপ হস্তান্তরিত বালক বালিকা সংগ্রহ করিয়াই পর্ত্তুগীজেরা ব্যবসায় চালাইয়া ছিল।

সহৃদয় ডে সাহেবের চিঠির ফলে বে-আইনি মনুষ্য বিক্রয় ব্যবসায়ের উচ্ছেদ হইলেও দাস ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা এ অঞ্চল হইতে তখনই একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় নাই। দেশ প্রচলিত প্রথায় ইহার পূর্ব্বে যেমন দাস বিক্রয় হইত ইহার পরেও সেইপ্রথা তেমনি বিদ্যমান ছিল—এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বৃটীশ বিচারাদালতে তাহা আইন সঙ্গত প্রথা বলিয়া গ্রাহ্য হইত।

মনুষ্য বিক্রয়ের কারণ ও দাস দাসীর মূল্য।

সে কালে মনুষ্য বিক্রয় কার্য্য সাদা কাগজে একখানা দলিল সম্পাদন করিয়া হইত। মনুষ্য বিক্রয়ের যে সকল প্রাচীন দলিল পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে সে সকল দলিল পত্রের আলোচনায় দেখা যায় যে কেবল দুর্ভিক্ষে পড়িয়াই লোক আত্ম-বিক্রয় ও আত্মীয় বিক্রয় করিত না। নানা কারণেই এই শ্রেণীর লোক স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া পরের দাসত্ব গ্রহণ সমীচীন বলিয়া মনে করিত; সাধারণতঃ এই শ্রেণীর লোক পূর্ব্ব বাঙ্গালায় শূদ্র বলিয়া অভিহিত। যুগ যুগান্তরের দাসত্ব ভাব মজ্জাগত থাকিয়া এই শ্রেণীর লোককে এই ভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল কিনা সমাজতত্ত্বজ্ঞেরাই তাহা আলোচনা করিবেন।

যে যে কারণে সে কালের লোক দাসত্ব-খত লিখিয়া দিয়া আত্মবিক্রয় ও আত্মীয় বিক্রয় করিত নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণই ছিল তাহার মধ্যে প্রধান। (১) অন্ন সংস্থান, (২) মহাজনের ঋণ পরিশোধ এবং (৩) আশ্রয় গ্রহণ।

ভীষণ দুর্ভিক্ষে অন্ন সংস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া যে সকল লোক দাসত্ব খত সম্পাদন করিত তাহারা স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া একত্রে কোনও গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিত। এক গৃহে সমস্ত গোষ্ঠীর স্থান করিতে না পারিলে স্তন্যপায়ী শিশুকে ও কন্যাকে লইয়া মাতা এক স্থানে ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকে লইয়া পিতা অন্য স্থানে আশ্রয় লইত। এইরূপ স্থলে দাস দাসীর মূল্য আশ্রয়দাতার ইচ্ছামত সামান্য কিছু ধার্য্য হইত।

ঋণগ্রস্ত হইয়া তাহা পরিশোধের অন্য উপায় নাই দেখিয়া যাহারা আত্ম বিক্রয়-কবচ সম্পাদন করিত তাহাদের মূল্য ঋণের মুদ্রার সমান ধার্য্য হইত।

আত্মীয় পরিজন শূন্য নিঃসঙ্গী ব্যক্তির পক্ষে সৎ গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ সমীচীন বলিয়াও অনেকে দাস বৃত্তি গ্রহণ করিত। এরূপ স্থলে ক্রয় বিক্রয়ের দলিলে একটা অতি সামান্য মূল্য লিখা থাকিত। কেননা মূল্য সামান্যই হউক আর বেশীই হউক তাহার আদান প্রদান না হইলে আদালতে সেই দাস বা তাহার বংশধরগণ ক্রীতদাস বলিয়া প্রমাণিত হইত না।

নিম্নে ২২৫ বৎসরের প্রাচীন একখানা আত্ম বিক্রয় দলিলের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল। এই দলিলের দলিলদাত্রী দাসী মাত্র নয় আনা মূল্য লইয়া নিজকে পুরুষানুক্রমের জন্য দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছিল।

"ইয়াদিকির্দ্দি সকল মঙ্গল আলয়

শ্রীজগদীশ নন্দী সদাশয়েষু শ্রীমতি আভঙ্গী ওলদে শিবরাম এস কস্য আত্মবিক্রী পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে তোমার স্থানে ॥/০ নওয়ানা পাইয়া বিক্রয় হইলাম। তোমার দাস্যতা কবিবাম পুরুষি ক্রমে বহন বাহন করিতে রহ ইতি সন ১১০২। ৩ তিন আশ্বিন মোকাম দৌলতপুর।"

(দলিলে সাক্ষীগণের নাম ও উভয় পক্ষের স্বাক্ষর আছে)

এই তৃতীয় কারণে অধিকাংশই নিরাশ্রয় বৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোক এবং যৌবনগত বিধবা স্ত্রী লোকেরা আত্ম বিক্রীত হইত।

ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীরা সে কালে আশ্রয় দাতা গৃহস্থের পরিবারভুক্ত স্ত্রী পুত্র কন্যার ন্যায় ছিল; তাহারা আশ্রয় দাতা গৃহস্থের পুত্র কন্যার উপর যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিত বটে কিন্তু নিজের ছেলে মেয়েদিগকে নিজের ইচ্ছায় হস্তান্তরিত করিতে, ছেলেকে অন্যত্র চাকুরী করিয়া দিতে বা মেয়েকে বিবাহ দিতে পারিত না। ক্রীতদাস দাসীর ছেলে মেয়েরা আশ্রয় দাতা গৃহস্থের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। দাসী পুত্রের বিবাহের জন্য কন্যা ক্রয়ের মুদ্রা ও দাসী কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার বাবত কন্যা পণ এ উভয় বাবতের ব্যয় ও আয় আশ্রয় দাতা গৃহস্থের হইত। নিম্নে যে দলিলের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল তাহা এই উক্তি প্রমাণ করিবে।

"শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস সদাশয়েষু—

পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমার পৈত্রিক মনস্য পরাণ ভাণ্ডারীর কন্যা শ্রীসুবস্তি দাসীকে তোমার নফর শ্রীমেঘু ভাণ্ডারির স্থানে বিবাহ দিবার পাঁচ রূপেয়া নগদ পাইয়া সত্ব ত্যাগ করিয়া দিলাম ইমনুষ্য ও ইহার সন্তানাদি হয় ইহাতে আমরা কাহারো সত্ব নাই সত্ব পরিত্যাগ করিয়া দিলাম অন্যত্র কেহ দাওয়া করে আমি নিশাদাহি কবিবাম এতদার্থে লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১১৬১ সন বিতং ৭ অগ্রহায়ণ।"

এই দলিল শ্রীসুবস্তি দাসীর আশ্রয় দাতা শ্রীরাম শর্ম্মা ও শিবরাম শর্ম্মা কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস বরাবরে সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। দলিলে সাক্ষিগণের স্বাক্ষর আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্রীত দাসের পুত্র কন্যাগণ আশ্রয় দাতা গৃহস্থের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। গৃহস্থ নিজ ঋণ পরিশোধের জন্য যেমন থালা ঘটি বাটি বা গো-মেষ-মহিষ বিক্রয় করিতে পারিত তেমনি তাহার গৃহের দাসদাসী বা তাহাদের পুত্র কন্যা গণকেও বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে ঋণ পরিশোধ অথবা সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। নিম্নে যে দলিলের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল তাহা আমাদের এই বর্ণনার উক্তি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবে। দলিলদাতা শ্রীশান্তরাম ঘোষ নামক অধমর্ণ রামবল্লভ নামক তাঁহার দাসকে নিজ উত্তমর্ণ শ্রীরাম নারায়ণ ভট্টাচার্য্য নিকট বিক্রয় করিয়া উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিয়া অতিরিক্ত সপ্তদশ রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই দলিলের মুন্সিয়ানা ভাষা ও ঐতিহাসিক নামাবলী বিশেষ আলোচনার বিষয় বটে।

"সস্তি সমস্ত সুপ্রশস্তালঙ্কৃত সবিরাজমান শ্রীশ্রীযুক্তা মুদ সাহাবাদ সাহা পাদ ম্নানামভ্যুদয়িনী গৌড়রাজ্যে তদ্যুক্ত শ্রীশ্রীমাহাম্মুদ জঙ্গ নবাব সাহের দত্ত প্রভুত্ব শ্রীযুক্ত হাজি মাহাম্মুদ হুষেণ সাহেব নিয়োযিত শ্রীযুক্ত সমসেরগাজি সাহেব প্রতিপাল্য মান রোষণাবাদান্তর্গত সুরনগর দেশীয় দক্ষিণসাহাপুরাখ্যগ্রামে শ্রীরঘুদেব চক্রবর্ত্তীণঃ সভায়ামনেক মুষলমান দ্বিজসজ্জনাধিষ্ঠিতায়াং সপ্তসপ্তত্যধিক ষোড়শ শততম শকাব্দী আষাঢস্য প্রথম দিবসে শ্রীরামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যস্য সকাশাদ্রাজতীয় সপ্তদশ মুদ্রাঃসমাদায় শ্রীশান্তরাম ঘোষ নামা হমুণাঘোপহত্যা শ্রীরামবল্লভ নামাস্মদ্দাস মুপরিলিখিত বিত্তদাতারি সেচ্ছয়া বিক্রীতবানিতি।

শ্রীশান্তরাম ঘোষস্য।

শ্রীরামবল্লভ দাসং। উভয়ানুমত্যা লিখিতং—

শ্রীকৃপারাম পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যেণ।

অত্র পত্রার্থে সাক্ষিণঃ:—

মুষলমানাঃ দ্বিজাঃ সজ্জনাঃ

(বাহুল্য ভয়ে সাক্ষিগণের নাম উদ্ধৃত করা গেল না।)

এইরূপ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের এই সুজলা সুফলা বাঙ্গালা মায়ের একশ্রেণীর সন্তানদিগের অবস্থা।

বিদ্রোহী দাসের বিচার।

আশ্রয় দাতা গৃহস্থের অবস্থার উপর ক্রীত দাস দাসীগণের অবস্থা নির্ভর করিত। অবস্থার সমতা বা উন্নতি হেতু যাহাদের একই আশ্রয়ে এক পুরুষ বা দুই পুরুষ থাকিবার সৌভাগ্য ঘটিত তাহারা ততদিন সুবিধা থাকিলে আশ্রয় দাতার সহিত এক পরিবারেই থাকিত; অসুবিধা হইলে পৃথক বাড়ীতে বাস করিবার অধিকার পাইত। এরূপ স্থলে আশ্রয় দাতার খানা-বাড়ীর সন্নিকটেই তাহার গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইত, তাহাকে তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সংসার প্রতিপালনোপযোগী জমি বিনা খাজানায় দেওয়া হইত এবং বিবাহ করাইয়া দিয়া পৃথক অন্ন করিয়া দেওয়া হইত। এই স্বাধীন অবস্থাতেও তাহাদিগকে বা তাহাদের পরপুরুষ গণকে আশ্রয় দাতার বা তাঁহাদের পরবর্ত্তীগণের ডাকে হাঁকে উপস্থিত থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে হইত। এই ব্যবস্থা অন্যথা হইবার উপায় ছিল না। যদি কেহ তাহা অন্যথা করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইয়া স্থানান্তরে আশ্রয় লইত কোম্পানীর আইন তাহার প্রতিকারে পরাঙ্মুখ হইত না। পূর্ব্ব আশ্রয় দাতা বৃটীশ আদালতের সাহায্যে ঐ নানকার ক্রীতদাসকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করাইতে বাধ্য করিত।

নিম্নে যে দরখাস্তের প্রতিলিপি প্রদান করিলাম তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কন্যা বিক্রয় পত্রের মেঘু ভাণ্ডারী ও সুবন্থি দাসীর সন্তানগণ বিরুদ্ধে তাহাদের পৈত্রিক মনিব কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসের পুত্রবধু ও পুত্রগণ ময়মনসিংহের দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় লইয়া সেই দাস সন্তান দিগের বিরুদ্ধে যে প্রতিকার চাহিয়াছেন তাহা প্রমাণিত হইবে।

"আরজি শ্রীমহেশ্বরী দাস্যা জওজে স্বরূপ চন্দ্র দেব মোতফা ও শ্রীযাদবরাম দেব ও শ্রীরামচন্দ্র দেব ও শ্রীরাম জীবন দেব সাকিন বোরগাঁও পরগণে নসিরুজিয়াল আরজ এহি আমার দিগের পৈত্রিক নফর মেঘু শিকদারের পুত্র আনন্দী রাম শিকদার ও ফকিরচন্দ্র শিকদার মজকুর ও তাহার শ্রীপুত্র কন্যা এখন পর্য্যন্ত আমাদিগের নিকট থাকিয়া কার খেদমত করিতেছিল ফকিরচন্দ্র শিকদার

মজকুর ও তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা এখন পর্য্যন্ত আমারদিগের নিকট হাজির থাকিয়া কারখেদমত করিতেছে আনন্দীরাম মজকুর বিদেশগামী নিরুদ্দেশ হইয়াছে এবং আনন্দীরাম মজকুরের স্ত্রী আদরী দাসী কৌত হইয়াছে। আনন্দীরাম মজকুরের পুত্র জগৎরাম ভাণ্ডারী আমারদিগের সরকারে কারখেদমত করিয়া সন ১২২৪ সনের শ্রাবণ মাসে তপে হাজরাদি সাকিন সিকান্দর নগর ভাগিয়া গিয়া বসত করিতেছে কিন্তু আমারদিগের যখন যে ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে তখন হাজির হইয়া কারখেদমত করিয়াছে এহাতে তপে হাজরাদি সাকিন সিকন্দরনগরের নাথু শিকদার কালু শিকদার ও নালু শিকদার ও জয়া শিকদার ও জুগল শিকদার ও টকা শিকদার ও সুবল শিকদার ও রুস্তুরাম সরকার ও গঙ্গারাম শিকদার ও আরাধন শিকদার ও মাগন শিকদার ও বদন শিকদার ও কেবল শিকদার ও হাল সাকিন তথাকার সুবল শিকদার ও ধনা শিকদার ওরফে কেজু শিকদার ইহারা পানা দেহি ও বদশলাতে সন ১২৩২ সন ইস্তক কারখেদমত করে না এবং আমারদিগের এক্তারে আইসে না। আমারদিগের কারখেদমতে হাজির না থাকাতে তাহার লোকসানি শালিয়ানা মবলক ৪৫৲ টাকা সিক্কা লোকসান হয় অতএব উমেদবার উপরের লিখা আসামী জগতরাম ভাণ্ডারী ও তাহার স্ত্রী চন্দ্রা দাসী ও পানা দেহেন্দা আসামী আনকে হুজুর তলপ দিয়া সাবুদ লইয়া তজবিজ করিয়া সাবেক বদস্তুর আমারদিগের কারখেদমতে হাজির করাইয়া দিতে হুকুম হয়। ইতি সন ১২৩৪ সন ৩০ কার্ত্তিক।

সদর উকীল গোপীনাথ রায়	কাজির বাড়ীর উকীল
দাখিলা ৩ অগ্রাণ	জগন্নাথ মজুমদার
সফর্দ্দ কাজি সদর আমিন।	দয়ানন্দ রায়।

এই মোকদ্দমা কাজি সদর আমিনের নিকট বিচার জন্য সোপর্দ্দ হইয়াছিল, কেননা ইহার বিষয়টী ছিল মুসলমান শাসনকালের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিচার্য্য।

বলা বাহুল্য ময়মনসিংহের কাজি সদর আমিনের বিচারে এই মোকদ্দমা বাদীর পক্ষে ডিক্রি হইয়াছিল।

এই মোকদ্দমা ডিক্রি হওয়ার কিছুকাল পরেই ১৮৪৫ সালে এই জঘন্য দাসত্ব প্রথা বৃটিশ ভারত হইতে আইন বলে উঠাইয়া দেওয়া হয়।

ক্রীতদাসের মুক্তি।

ক্রীতদাসের বংশধরগণ যে সেকালে স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারিত না, তাহা নহে; আশ্রয়দাতাকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলে ক্রীতদাসের সন্তানগণও পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিত। পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার আসামী জগৎরাম ও চন্দ্রাদাসী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পর পূর্ব্ব আশ্রয়দাতাগণের নিকট হইতে আসিয়া ৪৫ (সিক্কা) টাকা দিয়া একখানা স্বাধীনতার ফারখতি লইয়া গিয়াছিল। বাহুল্য ভয়ে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

কালো মেঘ ভেসে যায়।

(১)

আকাশেতে রজনীতে কালো মেঘ ভেসে যায়!
বঁধুরে হেরিতে প্রাণ চারিদিকে শুধু চায়!
আজি তারে এইক্ষণে, বার বার পড়ে মনে,
নিরালাতে আজি রাতে দেখা হোক্ দুজনায়!
আমি যারে ভালবাসি এই বেলা সে কোথায়!

(২)

আজি মোরা মেঘ সাথে উড়িব গো নীলিমায়!
ঘুম এলে ঘুমাইব বারিদের বিছানায়!
তারাগুলি হেসে হেসে, আকুল হইবে শেষে,
গলা ধরা ছাড়িবনা' মজে রব মহিমায়!
আমি যারে ভালবাসি এই বেলা সে কোথায়!

(৩)

ফুল-ছুঁড়ি ফুল-পরী আগালে ফুলের ঘায়;
উড়িয়া বেড়াব তবু মেঘে-ভাঙ্গা জোছনায়!
মানুষের দেশে প্রীতি, সে শুধু নিয়ম রীতি,
ভালবেসে হেথা প্রাণ কেঁদে মরে নিরাশায়!
আমি যারে ভালবাসি এই বেলা সে কোথায়?

(৪)

ভালবাসি যারে তার কাজ কি গো তুলনায়!
তার কালো চুল হেরি কালো মেঘ গলে যায়!
মুখ দেখে বলে চাঁদ, "একি হোলো পরমাদ"
চোখ দুটি দেয় লাজ গগণের তারকায়!
তুলনা দেখাতে গিয়ে কাঁদে ভাষা পড়ি পায়!

(৫)

সরু দুটি ঠোঁটে দেখি গোলাপ জলিয়া যায়!
তারি'পরে কিবা শোভা বাঁশীপানা নাসিকায়!
ও দীঘল আঁখি মাঝে, জগতের শোভারাজে,
তার প্রেম চাহনির তুলনা কি দিব হায়!
দেখিলে বুঝিতে কেন ভালবাসি বঁধুয়ায়!

(৬)

কথা শুনে মনে পড়ে সুর দেওয়া কবিতায়!
মৃণাল ও বাহু দুটি পরশিতে কেনা চায়!
পরিধানে নীল শাড়ী, বলিহারি বলিহারি!
দেহের ললিত শোভা শাড়ী ফুঁড়ি বাহিরায়!
কমল চরণ তলে ধরা তাই মুরছায়!

(৭)

তার গাল লালে লাল, ভুরু আঁকা তুলিকায়!
কুরূপা হেরিয়া তারে লাজে দূরে সরি যায়!
তার কোলে মাথারাখা, ভুবন ভুলিয়া থাকা,
জীবন সফল হ'লো পূজি প্রাণ-প্রতিমায়!
বোঝাতে পারিনে কেন ভালবাসি বঁধুয়ায়!

(৮)

ওইযেরে কালো মেঘ গরজিল পুনরায়!
চল বঁধু চল যাই কাজ নাই ভাবনায়!
প্রাণে প্রাণে বিনিময় সে যেন কিছুই নয়!
আমাদের ভালবাসা কে বু'ঝবে দুনিয়ায়!
ভালবেসে হেথা প্রাণ কাঁদে বড় নিরাশায়!

(৯)

আগে হোলো ভালবাসা মজি' প্রেম-প্রতিভায়!
ভালবাসি—ভালবাস সেটা মহা করুণায়!
দূরে দূরে সাধাসাধি, দূরে দূরে কাঁদাকাঁদি,
দূর হোক্—এস মিলি দূরে রাখি লালসায়!
এখনো আকাশে বঁধু, কালো মেঘ ভেসে যায়!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

"তিন টাকা ন' আনা ছ' পাই।"

(১)

দুগ্ধপোষ্য শিশুর অভাবটা অতিমাত্রায় অগ্রাহ্য ক'রে, গাভীটাকে প্রতাপদত্তের গোশালায় উঠায়ে দিয়ে, তিন টাকা ন' আনা ছ' পাই বাকী ঋণ স্বীকার করে নবীন দাস যখন বাড়ী ফিরে এলো তখন কর্ম্মকঠোর দিবসের অবসানে সূর্য্যদেব বিশ্রাম লাভের জন্য পশ্চিম গগণে বিরাট ঘটা ক'রে বসেছেন। নবীন অতি অন্য মনস্ক ভাবে ঘরে প্রবেশ করল। তারপর তার শতছিন্ন গামোছা খানা যথাস্থানে রেখে', তামাক সেজে ঘরের বাহিরে এসে তামাক টান্‌তে লাগল। তার চিন্তামলিন মুখের উপর একটা অব্যক্ত ব্যথার গাঢ় রেখা ফোটে উঠেছিল। এই বিরাট বিশ্বের মাঝে তার বুক ভরা ব্যথা ব্যক্ত কর্‌বার কোন লোক ছিল না, স্থান ছিল না, সময় ছিল না। এক কণা সহানুভূতির আশা এই দুনিয়ায় কর্‌বার মত তার কেউ ছিল না। এই সংসারে যে দয়ামায়া নাই, সহানুভূতি নাই, অনুগ্রহ নাই—সে বুঝেছিল, ইহা গ্রহের দোষ নহে—সংসারের দোষ। স্বার্থ মলিন—সংসারের দুর্ব্বলতা সে টা! তাই সে আপন মনে তামাক টান্‌তে টান্‌তে ভাব্‌তেছিল—"দরিদ্র আমি; আমার অভাব চিরদিন। চির অভাবীকে কে কোথায় সাহায্য করে? আমি অপরের অনুগ্রহের যোগ্য নহি। যার দৈন্যের কথা ভাব্‌বার তার নিজ শক্তি টুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে, তার জন্যে চিন্তা কর্ব্বার আর কারো ত কোন ন্যায় সঙ্গত প্রয়োজন থাক্‌তে পারে না।"

চির দরিদ্রতার নির্ম্মম কষাঘাতে বিব্রত সহানুভূতি প্রার্থীর দৈন্যতাই যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে না হইলেও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থ অভিযোগের এক মস্ত কারণ, ধন দৌলত, মান সম্মান, সুখ সম্পদ—এমন কি, নিজের জীবনের উপরওযে দরিদ্রের কোন দাবী নাই—সে যে শুধু কোন অজ্ঞাত অমার্জ্জনীয় অপরাধের শাস্তি ভোগ করে জীবন কাটাবার জন্যে জন্মেছে, সমাজের উপর যে তার কোন দাবীই নাই, অথচ সমাজ প্রতিদিন তার অসংখ্যদাবী কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে

নিবার অগ্রিম ডিক্রি পেয়ে বসে আছে—এই চিন্তা কর্ত্তে কর্ত্তে অজ্ঞাতে গোধূলি অবসান হয়ে গেল। অগ্নি-নির্ব্বাপিত হুকায় আরো একটা ফাঁকা দম দিয়ে হুকাটা হাতে নিয়ে সে সেই অন্ধকারেই বসে রইল।

চির অভ্যাসগ্রস্ত গৃহিণী প্রেমদা দোহন পাত্র হস্তে গোশালায় গিয়ে যখন গাভীটাকে দেখ্তে পাইল না তখন সব কথা মনে করে শেল বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়্ল। গাভী এবং বৎসটার জন্যে মস্ত একটা অভাবের অনুভূতির মধ্যে গভীর ব্যথার বেদনা নিয়ে মনে কর্‌ল তার ক্ষুদ্র সংসারের কথা। ঋণ জর্জ্জড়িত চির অভাবগ্রস্ত স্বামীর বেদনা ক্লিষ্ট মুখখানা তার মনে জেগে উঠায় সে শিহরিয়া উঠ্ল। যুগপৎ আর একখানা ক্ষুদ্র মুখ তার মনে হলো। এখন কি দিয়ে সে সেই দুগ্ধ পোষ্য শিশু মণিকে পালন কর্ব্বে? এই কথা মনে হওয়ায় প্রেমদা আর আত্ম সম্বরণ কর্ত্তে পার্‌ল না সে কেঁদে ফেল্‌ল। চোখ মুছে, দোহন পাত্র হস্তে স্বামীর নিকট গিয়ে দেখ্ল হুকাহস্তে নিয়া নবীন অন্ধকারে একা একা বসে আছে।

নবীন কিরূপ মর্ম্মান্তিক ব্যথার যাতনায় ম্রিয়মানছিল তা' প্রেমদা চিন্তা না করে শুধু শিশু পুত্রের প্রতি স্বামীকে এত উদাসীন মনে করেই তার ভারি রাগ হয়েছিল। সে নবীনের সম্মুখে গিয়ে বল্‌ল—"হাঁ৷ গা। তোমার ইচ্ছেটা কি? গাইত দিয়ে এলে, কিন্তু ছেলেটার উপায় কি হবে?"

নবীন এতক্ষণ একাবসে তার জীবনব্যাপী অভাবের বিস্তৃত আলেখ্যটা দেখ্‌তেছিল। সমসাময়িক বিশেষ অভাবগুলোর গুরুত্ব গুছিয়ে গুছিয়ে সে তত দেখ্‌তে পারে নাই—এখন প্রেমদার কথা শুনে সে সবকথা তা: মনে হ'ল। সহ্য কর্ব্বার শক্তি নবীনের ছিল, তাই পাহাড়ের মত বিপদরাশিও তাকে ঘাব্‌ড়াতে পার্‌ত না, কিন্তু শিশু পুত্রের অভাবের কথাটা হঠাৎ শুনে তার জর্জ্জরিত বুকটা ছ্যাৎ করে উঠ্‌ল। আত্মগোপন করে কম্পিত রোষ বিস্ফারিত নেত্রে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্‌ল—"ছেলেটার কি করা যাবে? কথা শুনতে গা ধরে। কেন,—ছেলেটার কি করা যাবে তা, আমি কি বল্‌ব? ছেলের কথা ছেলের মা জানে, আর ছেলে জানে।"

প্রেমদা—"রকম দেখে শরীর জলে। কথার শ্রী দেখ,—ছেলের মা জানে আর ছেলে জানে। কেন, ছেলের বাবা কি কিছুই নয়? শুধু গাইয়ের ঘাস কাট্‌বারই কি দরকার ছেলের বাবাকে দিয়ে? আচ্ছা, গাই ত দিয়ে এলে, এখন তার দাম পেয়েছ কত?"

নবীন—"গাই দিয়ে এলাম কি? আমি দিলাম, না ওরা নিলে? আমি কি সখ করে দিয়ে এসেছি? বাপ্‌রে বাপ্! বেটা ডাকাত, ডাকাত! আর তার দামই বা পাব কি? তবে যা দিয়েছে, খুবই বেশী!"

প্রেমদা—"হিসেব টা শোধ হয়েছে ত?"

নবীন—"মহাজনের হিসেব শোধ হ'তে কখন শুনেছ কি? কত কান্নাকাটি করে—হাতে পায়ে ধরে—তবে আট টাকা চার্ আনা গাইয়ের দাম জমা দিয়ে আরও তিন টাকা ন' আনা ছ' পাই বাকী রেখে এসেছি।"

প্রেমদা—"ওমা,—আট টাকা চার্ আনা! এযে দিনে দুপুরে ডাকাতি গো! দু সের দুধ দেয় গাই—তার দাম হলো আট টাকা চার্ আনা!"

নবীন—"তা না হবে কেন? এযে ডাকাতের দেশ, মগের মুল্লুক, সুদখোরের রাজ্য! এখানে দয়া নাই, মায়া নাই, সহানুভূতি নাই। এখানে ইজ্জৎ নিয়া থাকা যায় না, এখানে ইজ্জৎ থাকে না।"

নবীন চীৎকার করিয়া উঠিল; তাহার হাত হইতে হুকাটা পড়িয়া গেল।

(২)

নবীনের ঋণের ইতিহাসের প্রকৃতিটা ছিল অদ্ভুত। কিন্তু যার প্রতিকারের উপায় নাই তা শক্তি না থাক্‌লেও সহ্য করতে হয়—অন্ততঃ প্রাণের দায়ে। সে গ্রামের সকলেই প্রায় এরূপ ঋণদায়ে বিব্রত ছিল।

নবীনের মহাজন ছিলেন প্রতাপ দত্ত। প্রতাপ দত্ত পাশ করা পুরাতন উকীল। উকীল হলেও দত্ত মহাশয়ের স্থূল দেহের অনুপাতে বুদ্ধিটা ছিল বহুল পরিমাণে স্থূল। কিন্তু তাতে ওকালতী ছাড়া অন্যান্য কাজের কোন বিভ্রাট ঘট্‌ত না। পত্নী মনোরমার চানক্য বিনিন্দিত কূট-বুদ্ধির প্রভাবে প্রতি কাজে দত্ত মহাশয়ের জয় জয়কার হত।

সে আজ বহু দিনের কথা—মনোরমার গৃহস্বামীর আধিপত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাক্ষীগোপাল স্বামী কর্ত্তৃক তদীয় সহোদরদিগকে চোখে অঙ্গুলী দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তার স্বামীই পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী। দত্ত মহাশয় পত্নীর পেটে বুদ্ধির বোলা রেখে—পারেন নাই—কেবল হাকিমকে বুঝাইতে। কিন্তু নিরুপায়;—কূট বুদ্ধিতে নিরুপমা বনিয়াদী ঘরের ছেলে বৌ মনোরমা ইংরাজের এজলাসে উঠেন কি করে? তাই যখন ওকালতীর উন্নতি হল না অথচ বৎসরান্তে একবার করে নাছাড় ষষ্ঠীদেবীর আশীর্ব্বাদ লাভ কর্ত্তে লাগলেন তখন অদূর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস পেয়ে মনোরমা পরিচালিত বিব্রত দত্ত মহাশয় একান্ত নিরুপায় অবস্থায় পৈতৃক লক্ষী ব্যবসায় আঁকড়ে ধর্‌লেন। ওকালতীর প্রতি তার আন্তরিক ঘৃণা জন্মিল।

আজ এগার বৎসরের কথা। নবীনের পিতা হারাণ দাস তখন জীবিত। নবীন তখনো সংসারী হয় নাই। সে বৎসর অজন্মা হয়েছিল। পাটের চাষও হল না। পেটের দায়ে হারাণ দাস যে দিন দত্ত মহাশয় হতে আঠারো আনা পয়সা কর্জ্জ করে এনে চাল নিয়ে এলো—সে দিন সে ভাবে নাই যে এই ঋণের জের পুত্র পৌত্রাদিক্রমে চল্‌তে থাক্‌বে।

চারি বৎসর পূর্ব্বে একদিন উপর হ'তে হারাণের ডাক আসায় সে চলে গেছে। যাবার পূর্ব্বে বহুবার সে সেই আঠারো আনার সুদ দিয়েছে; তার সুদ দিয়েছে, আসল দিয়েছে, অনন্তের যাত্রী বৃদ্ধ শুক্‌নো বুকের সবটুকু রক্ত নিঃশেষে শেষ করে দিয়েও সেই আঠারো আনা শোধ করে যেতে পারে নাই। তারপর নবীনের আমল। গত চারি বৎসর যাবৎ সেও উশুল দিয়ে আস্‌ছে কিন্তু কম্‌ছে না কিছুই। এ বৎসরের হিসাবে সর্ব্বশুদ্ধ ১১৮/৬ পাই দাঁড়িয়েছিল। ত্রিশ পয়ত্রিশ টাকার দুগ্ধবতী একটা গাভীর মূল্য আট টাকা চার্‌ আনা ধ'রে উশুল দিয়েও বাকী রইল তার দেনা——
——৩॥/৬ পাই!

(৩)

মণি দরিদ্রের ঘরে এসেও তার ছোট ছোট প্রয়োজন নিয়ে সে প্রভাত জীবনের প্রথম কয়েকটা মাস বেশ রাজপুত্রের হালেই ছিল। পেটভরা দুধ, আর বুকভরা আদর পেয়ে শিশু দ্বিগুণ উৎসাহে দিন গোণ্‌তে লাগল। দিন কারো সমান যায় না। শিশু অজ্ঞান; শক্তিহীন; কিন্তু অ—দৃষ্ট অদৃষ্ট শাসন যে তারও মাথা পেতে মেনে নিতে হয়! অদৃষ্টের নির্ম্মম কষাঘাতের প্রতিকার নাই, যাহা সহ্য কর্ব্বার সামর্থ নাই তাহাও একান্ত বশ্যতার সহিত বহন কর্ত্তে হয়। বিধি নিয়মের বাধ্য, না নিয়ম বিধির বাধ্য?

গাভীটা মহাজন নিয়ে গেল। অভাবগ্রস্ত বাপ মা দুধ খরিদ কর্ত্তে পারল না। তাই মণির আহারেরও একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। মাতৃস্তনে দুধ ছিল না। ভাতের ফেন তার দুধের বাহিরের অভাবটা পূরণ করে দিল।

আষাঢ়ের প্রথম। কয়দিন যাবৎ অবিশ্রাম বৃষ্টি; সে দিনও বর্ষণের বিরাম ছিল না। বাহিরে সাঁ সাঁ করে বাতাস বইতেছিল। এই দুর্য্যোগের মধ্যে বাহির হবার উপায় ছিল না।

বেলা এক প্রহর অতীত হয়ে গেছে। মণি শয্যায় অচেতন অবস্থায় আছে। পোনর দিন যাবৎ সে জ্বরে পীড়িত। অধিকাংশ সময়ই অচেতন থাকে। কখন কখন চেতনা হলেও অল্প সময় মধ্যেই তাহা লোপ পায়। আজ পর্য্যন্ত একদাগ ঔষধ পায় নাই। অপথ্য কুপথ্যে রোগ ক্রমে দুরারোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেমদা মণির বিছানায় বসে তার ক্ষুদ্র মস্তকে হস্ত বুলাইয়া দিতেছে। নবীন রোগীর বিছানার নিকটে একখানা কাষ্ঠাসনে বসে বাহিরের বাদ্‌লারদিকে চেয়ে আছে। প্রেমদা মণির মাথায় হাত রেখে বল্ল—"ওগো, ছাতাটা নিয়ে একটু ঘুরে আস না, যদি কারো কাছে একটু দুধ পাওয়া যায়। কেবল গরমজল আর কতবার দিব?"

নবীন—"ঘরে বসে ত বলে ফেল্লে—ঘুরে ফিরে একটু দুধ আন, কিন্তু বলত কার কাছে যাই? কেইবা আমার

জন্মে দুধ নিয়ে ঘরে বসে আছে? আর দুধ থাক্‌লেও কিনে আনিবারইবা পয়সা কোথায়? বেটা ডাকাত কি কারো কিছু রেখেছে? দেখ্‌লে ত কাল সারাদিন বৃষ্টির জলে হেটে হেটে এক মুট চাল আন্‌তে পারি নাই। কাল উপোস দিয়েছ; নিজে না হয় নাই খেলাম, বুড়ো হাড়ে উপোস দিতে পার্‌ব কিন্তু মণির করি কি?......"

প্রেমদা—'তবু তুমি যাও, একটু চেষ্টা কর; ভগবান অবশ্যই দিবেন। তাঁর রাজ্য; সে না দেখ্‌লে কে দেখ্‌বে?'

নবীন—'ভগবান কোথায়? এযে ডাকাতের দেশ গো, ডাকাতের রাজ্য। এমুল্লুকের ত্রিসীমায় ভগবান পৌছাতে পারেন না। ওগো! ভগবান নেই। আচ্ছা, তুমি বল্‌ছ আমি একটু দেখে আসি। কিন্তু যাই কার কাছে!'

নবীন গামোছা খানা মাথায় বেঁধে বাহির হয়ে গেল। বাহিরের দুর্য্যোগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না।

(৪)

শোকে, দুঃখে, বিরহে একটা সুদীর্ঘ মাস কেটে গেছে। ভরা বর্ষা। সারা দেশখানা যেন জলের উপর ভেসে আছে। প্রভাত সূর্য্যের শান্তোজ্জল কিরণরশ্মি গাছের উপর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ঠিক এমনি এক প্রভাতে দেখা গেল নবীনের গৃহখানা তাহার মাথা রাখ্‌বার পক্ষে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল।

মণির জ্বরের তৃতীয় সপ্তাহের শেষ দিনে দশমাসের একটা জীবন শেষ করে মণি মুক্তিলাভ করিল। সে অনন্তের পানে চলে গেল। ইহাতে নবীনের ক্ষুদ্র সংসারের একটা মস্ত পরিবর্তন হয়ে গেল। এই ক্ষুদ্র শিশুটী তার বিশৃঙ্খল সংসারটাকে কতটুকু শৃঙ্খলাযুক্ত করে রেখেছিল তা সে সেই দিন বুঝ্‌তে পার্‌ল যে দিন প্রভাতে শোকাকুলা অস্থিচর্ম্মসার প্রেমদা নবীনের পা দুখানা বুকের উপর টেনে নিয়ে বার বার প্রণাম কর্ত্তে কর্ত্তে শিশু পুত্রের অনুসরণ করে চলে গেল।

মণি আর প্রেমদার অভাবে নবীনের বেসুরো জীবনটা একেবারে বিকল হয়ে উঠ্‌ল। দিন কতক সে কিছুতেই আপনাকে সাম্‌লায়ে নিতে পার্‌ল না। অনাহারে, অর্দ্ধাহারে বিরহের দুঃসহ বোঝা বুকেকরে দিন কতক পিতৃপুরুষের বাস্তভিটায় মশাল-প্রদীপ জালাবার জন্যে নীরবে পড়ে রইল। কিন্তু—"নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?" বিধাতা তার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনাটিও পূর্ণ করলেন না। গভীর ব্যথার করুণ ক্রন্দন, প্রাণের ঐকান্তিক প্রার্থনা, একটা দগ্ধচিত্তের বেদনামাখা নিবেদন তাঁর কাণে পৌছিল না। তার জীবনের শেষ বাসনা—প্রাণাধিক পুত্র এবং প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গে পিতৃপুরুষের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন—তার গৌরবের এই জীর্ণ কুটীরে জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটায়ে দেওয়া ঘ'টে উঠ্‌ল না।

একদিন অপরাহ্ণে প্রতাপদত্তের লোক সরকারী প্যাদা সহ ডিক্রিজারীর পরওয়ানা নিয়ে এসে সেই অপরিশোধ খতের টাকার সুদ ও খরচের জন্যে ভিটাখানা নীলাম করে চলে গেল। নবীনের গৃহ তাহার নিজের মাথা রাখবার পক্ষেই চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হ'লো। এর পর তাকে এ গ্রামে আর কেহ দেখ্‌তে পায় নাই। ঋণ রহিয়া গেল কিন্তু তবু তার সেই ৩৷/৬

(৫)

তার পর বহুদিন চলে গেছে। নূতন পুরাতনের সংমিশ্রনে, জরা মৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে' সে গ্রামের বহু পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতি সমাজের অধীনা নহে অথচ সমাজ প্রকৃতিকে ছেড়ে চলতে পারে না। সমাজ দুর্ব্বল-বলবানের মর্য্যাদানুসারে আপনার কাজ গুছিয়ে নেয়; প্রকৃতি তাহা জানে না। ধনী, নির্ধন, ছোট, বড় সবই তার কাছে সমান। সমাজের অনুজ্ঞা সকলকে মেনে নিতে হয় না; কিন্তু আপামর সকল প্রকৃতির শাসনাধীন।

কালের এই বিরাট পরিবর্ত্তনের মধ্যে হৃত সর্ব্বস্ব হয়েও যারা ছিল, তারা কোন রকম জীবনমৃতাবস্থায় আছে। নবীনের স্মৃতিটা একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে। এই পরিবর্ত্তনের ছায়া দত্ত মহাশয়ের পরিবারেও প্রতিবিম্বিত হয়ে পড়েছে। উত্তরোত্তর তিনটী মেয়েই শঙ্খ সিঁদূর মুছে পিতৃগৃহে আশ্রয় নিয়েছে। দু'টী উপযুক্ত পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েছে। কয়টী পুত্র কন্যা শিশুকালেই জীবনলীলা সম্বরণ করেছে। খাতক

ভিখারী হয়েছে। নিজে জরামৃত্যুর মাঝখানে ভীত চকিত মেয়ে জীবনের ভুলটা কোন স্থানে তাহাই খুঁজে খুঁজে শেষ দিনের জবাবের জন্যে প্রস্তুত হতেছিলেন।

ঠিক এম্‌নি সময় একদিন এক শীতের প্রভাতে শোকদগ্ধা দত্ত গৃহিণী মনোরমা এক অজানা দেশে ছুটে চলে গেলেন। শোকে, দুঃখে, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে দুনিয়াদার দত্ত মহাশয়ের বুকখান কঠিন হয়ে গেছিল। কিন্তু এ আঘাত তিনি সহ্য কর্‌তে পারলেন না। মনোরমার মৃত্যু তাঁর সংসারটাকে উলট পালট করে দিয়ে গেল। তিনিও শয্যা গ্রহণ কর্‌লেন। পত্নীর জীবদ্দশায় তিনি তার গৃহস্থালীর সাক্ষীগোপাল ছিলেন, এই সংসারে তার প্রয়োজন কিংবা মূল্য কতটুক—তাহা বুঝ্‌তে পারেন নাই। গৃহিণীর সুরে, ঝঙ্কারে, হুঙ্কারে নিজ দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝবার প্রয়াস পাইতে গিয়ে—আপনার নির্ভরশীল সত্বা জান্‌তেই পার্‌তেন না। পত্নীর অভাব এখন তার স্থান নির্দ্দেশ করে দিল; কিন্তু শক্তিহীনের কর্ত্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান তাকে মৃত্যুশয্যায় টেনে নিল। দত্ত মহাশয় বুঝলেন তার সময় সঙ্কীর্ণ।

* * * *

ভরাবর্ষা। বৃষ্টির বিরাম নাই। এই বাদলার দিনে ঘরের বাহিরে যাবার জোটা নাই। দত্ত মহাশয় মৃত্যুশয্যায়! বিপদ চতুর্দ্দিক হতেই আসে। চিকিৎসার টাকা নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই, পরিচর্য্যার লোক নাই। যে পরের দুঃখ ঘটাইয়া জীবন অতিবাহিত করেছে; আজ কে তাহার দুঃখে আসবে? বিশেষ এই দুর্য্যোগে কে কার কাছে যায়, কে ডাক্তার ডাকে, কে পথ্য দেয়? আর পথ্যের টাকাই বা দেয় কে? অনন্তের যাত্রী দত্ত মহাশয়ের অদৃষ্টে শেষ মুহূর্ত্তের জন্যও ভগবান শান্তি লিখেন নাই; কুমারী মেয়ে 'পুতুল'—এই গেল বোশেখে যোল ছেড়ে সতরোতে পা দিয়েছে। এই ডাগর মেয়েকে কার হাতে দিয়ে তিনি যাবেন—? এই চিন্তাই তাকে কাতর করে তোলে বেশী!

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত; বাহিরে বাদলার ভীষণ দুর্য্যোগ, তার উপর সূচিভেদ্য অন্ধকার। ঘরে দত্ত মহাশয়ের ঘন ঘন শ্বাস বইতেছে। সময় বাকী নাই মনে করিয়া তিনি অঙ্গুলী সঙ্কেতে পুতুলকে নিকটে ডাকিয়া তার কাছে বসতে বললেন। এই সময় দরজায় কে আঘাত করল। পুতুল দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

আগন্তুক এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী রোগীর নিকটে দাঁড়ায়ে জিজ্ঞাসা করল—"এখন কেমন আছেন কর্ত্তা?"

প্রতাপ বাবু অতি নিম্ন স্বরে বলিলেন—'কে'?

সন্ন্যাসী আর একটু অগ্রসর হ'য়ে বলল—"আমি নবীন আপনাকে দেখ্‌বার জন্যে এসেছি। আর আসছি—ঋণ পরিশোধ করতে—অন্তিমকালে এ অধমকে আর ঋণ পাপী রে'খে যাবেন না।"

দত্ত মহাশয় একটু উত্তেজিত স্বরে বললেন—"নবীন, নবীন, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ কি? আমি তোমাকে দেশত্যাগী করেছিলাম, কিন্তু এদেশে আমার স্থান হল না। আমি পরদেশে চললাম। আমার বাড়ী, ঘর সব তোমাকে দিলাম। তুমি এখানে থেকে আমার পুতুলকে দেখো।"

নবীন বলিল—"আমি ঋণ মুক্ত হতেই এসেছি। স্বর্গীয় পিতাকে ঋণমুক্ত করতে এসেছি; আমি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, আপনার ঐশ্বর্য্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই; তবে আপনার আদেশ পালন করব। পুতুলকে দেখব—তাহার সুব্যবস্থা করব—এই আপনার সেই ৩৷৴৬—এখন বলুন আমাকে মুক্তিদান করলেন?"

উত্তেজনায় দত্ত মহাশয়ের শ্বাস আরো ঘন বইতে লাগল। তার শব্দ বন্ধ হইল। পর মুহূর্ত্তেই নবীন "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল" বল্‌তে বল্‌তে শব বাইরে নিয়ে এল।

শ্রীসচ্চিদানন্দ রায়।

কালো।

যদিও হোক্ সে কালো,
এ হৃদয় মাঝে,
সুরে সুরে বাজে,
—গভীর আঁধারে আলো!
সে যে বসন্তের ফুল,
তার নাই ভুল,
তারে আমি বাসি ভালো!

মধুকর।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, Dacca
and Published by Kedar Nath Mozumdar Research House, Mymensingha.

সৌরভ

নবম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩২৭। { ষষ্ঠ সংখ্যা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ। *

যখন আপনাদের পক্ষ হ'তে আপনাদের প্রতিনিধি আমাকে আপনাদের সভার সভাপতিত্ব কর্‌বার জন্য নিমন্ত্রণ কর্‌তে গেলেন তখন আমি একটু একটু ইতস্ততঃ কর্‌লাম। বিলেৎ থেকে আসবার পর দুই তিন মাস যাবৎ নানা কার্য্যে ঘুর্‌ছি। আমি একাধারে শিক্ষক ও ছাত্র, কেননা ছাত্র না হ'লে শিক্ষক হওয়া যায় না। তাই ইতস্ততঃ করেও আনন্দের সহিত আপনাদের এই শিক্ষক সম্মিলনীর সভাপতির কার্য্য কর্‌তে রাজী হলেম। আমি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে একেবারে অপরিচিত নই। অনেক গুলির নাড়ী নক্ষত্র সম্বন্ধে আমার বেশ জ্ঞান আছে। আমাদের গ্রামেও একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। আমি মাঝে মাঝে অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার গ্রামে গিয়ে থাকি। নিজের গ্রাম দেখ্‌তে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। কবির ভাষায় বল্‌তে গেলে

"নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়।"

আজ আপনারা বাংলা দেশের সাড়ে আট শ ইস্কুল থেকে ১০০ একশত প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছেন। এটাত খুব আশার কথা। আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি। কংগ্রেস যখন প্রথম বৎসর টাউন হলে বসে তখন ক'জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন? আর এখন? তাই বল্‌ছি আপনাদের এই উপস্থিতি অত্যন্ত আশাপ্রদ। এ বছর একশ ডেলিগেট্ হয়েছে; আগামী বার পাঁচশ হবে, তার পরের বছর এক হাজার হবে।

আচ্ছা, এই সাড়ে আটশ ইস্কুলের প্রত্যেকটাতে গড়ে আড়াইশ করে ছাত্র হবে। কি বলেন, ঈশান বাবু! (রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) হবে না? হাঁ! এই সাড়ে আটাশকে আড়াইশ দিয়ে গুণ কল্লে কত হয়? দুইলক্ষের কিছু উপরে হয়। এই দুইলক্ষ ছেলের শিক্ষার ভার আপনাদের উপর ন্যস্ত। দেখুন আপনাদের কাজ কত দায়িত্বপূর্ণ। দেশের ভবিষ্যৎ এই ছেলেদের উপর নির্ভর কর্‌তেছে, সুতরাং তাহা আপনাদের উপর নির্ভর কর্‌তেছে। আপনারা এদেরে যেরূপ গড়ে তুল্‌বেন এরা সেরূপ হবে। কুম্ভকার যেমন মাটি দিয়ে সরা গড়ে, হাঁড়ি গড়ে, পাতিল গড়ে সেইরূপ।

আচ্ছা, এখন আপনাদের এই সাড়ে আটশ ইস্কুলের মধ্যে গড়ে প্রত্যেক স্কুলে আড়াইজন ক'রে গ্রাজুয়েট আছেন। তা হ'লে ধরুণ দুই হাজার। এই সাড়ে আটশ স্কুলের দুই হাজার বি, এ, এম্, এ আপনারা কেন পড়ে পড়ে মারখান? একজন বি, এ পাশ করে যদি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ হন্ তাহ'লে তিনি আরম্ভ করেন আড়াইশ টাকাতে। আর আপনারা বি, এ পাশ করে আরম্ভ করেন ৩৫৲ পঁয়ত্রিশ টাকাতে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ই এই কথা বলেছেন। কেন? এই অবস্থা কেন? আপনারা তাদের চাইতে কিসে কম? আপনারা কি দুচা'র পাতা লিখ্‌তে পারেন না? বল্‌তে পারেন না? তবে এরূপ ব্যবস্থা কেন?

কথায় বলে 'যে ছেলে কাঁদে সেই দুধ পায়'। তাই বল্‌ছি আন্দোলন করুন, অবশ্যই আপনাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে।

প্রত্যেক স্কুল থে'কে মাসে একটি ক'রে টাকা দিন। বলুন ত কে পার্‌বেন না? নিজের ইস্কুল থেকে মাসে

---

* গাইবান্ধা নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের অভিভাষণ। সংগ্রহ কারক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর ধর।

একটি ক'রে টাকা পাঠাতে পারবেন না এমন কে আছেন? বলুন, আমি উত্তর জানতে চাই। হেড্ মাষ্টার মশায় যিনি তিনি আট আনা দিন। অন্যান্য মাষ্টাররা আর আট আনা দিন। বেশ সহজ বিষয়। তাহ'লে ৮৫০ সাড়ে আটশকে ১২ দিয়ে গুণ করলে প্রায় দশহাজার হয়। না? আচ্ছা, এই দশ হাজার টাকা দিয়ে আপনারা সারা বৎসর আন্দোলন চালান। একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করুন, তাঁর মাইনে দিন আড়াইশ টাকা। অবৈতনিক কর্ম্ম টর্ম্ম আমি পছন্দ করি না। বেতন ভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করতে হবে। আমি একজন ব্যবসাদারও বটে। চার পাঁচটা কোম্পানির সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট। আরও ২৫ পঁচিশ লক্ষ টাকা মূলধন দিয়ে একটা কারবার (একটা পেপার্ মিল্) খুলবার জন্যে শীঘ্রই আসাম যাচ্ছি। আমি অবৈতনিক কর্ম্মের পক্ষপাতী নই। অডিটার পর্য্যন্ত বেতনভোগী করতে হবে। অবশ্য আমি সারাজীবন অবৈতনিক ভাবেই এসব কাজ করেছি যাই হোক্। মাদ্রাজে অনেক Educational Journal আছে। মাদ্রাজ যা পারে আমরা তা পারবোনা কেন? কিসের দৈন্য?

আজকাল মেথর মুদ্দোফরাস্ পর্য্যন্ত combined হয়ে কাজ করছে। দেখবেন তাদের মোকদ্দমায় তারা ভাল ভাল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করছে। আমরা কি তাদের চাইতেও অধম?

আমি সেদিন বিলেৎ থেকে আসলাম। সেখানকার চাষাভূষো প্রভৃতি সকলেই আজকাল বলে "গন্ধী কে? আর ননকো-অপারেশন্ কি?" দেখুন আন্দোলনের কত ফল। তাই আমি বলি—

"Agitate, agitate, agitate"

Anticorn law League এর কথা।

ছোট বেলায় শুনতাম যে কোলকাতার লোকের ধারণা যে ধান গাছে উঠতে হলে মই দিয়ে উঠতে হয়। আমাদের সেনেটের মেম্বাররাও ঐরূপ। মফঃস্বলের স্কুলগুলি সম্বন্ধেও তাদের ওরূপ ধারণা। তাঁরা মফঃস্বলের স্কুলগুলির আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই অবগত নন, অনেক ইস্কুলে যে হেড্মাষ্টার ৭৫৲ টাকা মাইনে নেন্ বলে লিখে থাকেন কিন্তু পান যে ৬৫৲ টাকা, তার খবর তাঁরা রাখেনই না। বলুন দেখি, তাঁরা কোন্ আইন অনুসারে এই নিয়ম করলেন যে প্রত্যেক স্কুলকে ১০০৲ অথবা ৫০৲ করিয়া জরিমানা দিতে হবে? আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না, থাকলে তীব্র প্রতিবাদ করতাম। It is the cruellest and most inimical af all principles.

আমি নিজে আইনজ্ঞ নই কিন্তু একজন ভাল আইন ব্যবসায়ীকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞেস্ করেছিলাম, তিনি বল্লেন।

If you test the legality of this, it won't stand.

আপনারা ত জানেন—No taxation without representation. আপনারা যে ট্যাক্স দিবেন আপনারা কি সেনেটে represented হন্? কোলকাতা য়ুনিভার্সিটি কোথায় সাহায্য করবেন, না জুলুম করতে চায়! এই কি স্বরাজ?

M. L. C. এক একজন ৬৪০০০৲টাকা করে নেবেন। যা আছে সব নিজেরা ভাগ বাঁটওয়ারা করে নিয়ে গেলেই হলো।

Oriental Seminaryতে প্রায় ১২০০ ছেলে। সেখানকার হেড্মাষ্টার রসময় বাবু প্রভৃতি তাঁহাদের স্কুলের রিপোর্ট্ বের করেছেন। তাতে তাঁরা এক জায়গায় লিখেছেন "One even comes across a class sleeping away the fatigue."

কি করবে? প্রাইভেট্ টিউশন করে অনেকে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে ক্লাসে সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে আসেন। Standard of living তিন বৎসরে double হয়ে গেছে। আগে ছ আনা দশ পয়সা হ'লে হোটেলে খাওয়া গেছে, এখন চার আনা পাঁচ আনার কমে হয় না।

মণ্টেগু সাহেব I. E. S. এর জন্য দশলক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। তারপর A. C. S., L. S. C. S. প্রভৃতির জন্য কত লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। তার উপর তাদের travelling allowance আছে। ঐ Lord

Bishop থেকে আরম্ভ করে Chaplain পর্য্যন্ত সকলেরই travelling allowance আছে।

Unto them much is given to whom much is given. যে যত বেশী গরিব সে তত কম পাবে—এই হলো তাঁদের ব্যবস্থা।

বিলেতে পর্য্যন্ত শিক্ষকদের অবস্থা ভারী খারাপ। তাই Allen সাহেব একজায়গায় শিক্ষকদের বেতনের হার সম্পর্কে বলেছেন It is below any standard that is reasonable. আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন—These have revealed a state of things that is scandalous.

Reception committeeর president মহোদয়ই বলেছেন—যদি কোনও বি, এ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ হন তবে তিনি আরম্ভ কর্‌বেন ২৫০৲ টাকাতে আর আপনারা বি,এ পাশ কর্‌লে আরম্ভ কর্‌বেন ৩৫৲ টাকাতে।

উচিত ছিল, এই সভায় অভিভাবকদেরেও ডাকা। তা হ'লে ভাল হতো।

কেবল গভর্ণমেণ্টকে দোষ দিলে চল্‌বেনা। আমাদের নিজেদের কাজ কর্‌তে হবে।

Russel সাহেব বিলাতের একজন বড় গণিতজ্ঞ। তিনি শিক্ষকদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা ঐ রসময় বাবুদের রিপোর্টের সঙ্গে মিলে যায়। যাই হোক্। কথায় বলে All the roads lead to Rome. স্বাধীন ভাবে কোনও বিষয় চিন্তা কর্‌লে দুইজনের মত মিলে যাবে। Russel সাহেব লিখেছেন,—আপনারা বইখানা প'ড়ে দেখ্‌বেন, বইখানা খুব ভাল,—

"Teachers can reasonably be expected to work as many hours as bank clerks with intense fatigue and irritable nerves." দেখুন তিনিও fatigue এর কথা বলেছেন, তাঁদের লেখাতেও fatigue আছে। তিনি আরও বলেছেন "obedience seems necessary because a large class is managed by an overworked teacher."

মাষ্টার শুধু পড়িয়ে যাবেন, ছেলেরা শুধু শুন্‌বে, কিছু জিজ্ঞেস কর্‌তে পার্‌বে না। ছেলেদেরে জোর করে বাধ্য রাখা হয়।

মাষ্টারদের কি অবস্থা দেখুন। মাড়োয়ারীদের পিঁজরাপোল আছে। অকর্ম্মণ্য রুগ্‌ণ পশুদিগকে তারা পিঁজরাপোলে পাঠায়। কিন্তু একজন মাষ্টারের ব্যারাম হ'লে

He is left to die by roadside, unwept, unhonoured, unsung and uncared for.

আপনাদের পাঠ্য পুস্তকের তালিকায় দেখ্‌তে পাই পাটীগণিত কতরকম আছে। দুই দুগুণে চার, তিন দুগুণে ছয়, চার দুগুণে আট—একি ঢাকা বিভাগে এক রকম, রাজসাহী বিভাগে একরকম আর বর্দ্ধমান বিভাগে আর একরকম? ইউক্লিড্ পড়্‌বো। কার ইউক্লিড্ তা দিয়ে দরকার কি? Chemistry পড়্‌ব। কার কেমিষ্ট্রী তা দিয়ে দরকার কি। এক কেমিষ্ট্রীতে কি লেখা আছে অক্সিজেনের এই গুণ, আর এক কেমিষ্ট্রীতে কি লেখা আছে অক্সিজেনের আর একগুণ? তা হলে ত বিজ্ঞান হলোনা। তাই বল্‌ছি এই একশ রকমের পাটীগণিত পাঠ্য করে লাভ কি? আমার একবন্ধু—একজন মুন্সেফ্ বল্লেন তিনি বছরের মধ্যে তিনবার বদ্‌লি হয়েছেন। তাঁর বারে বারে ছেলে পিলেদের ভিন্ন ২ বই কিন্‌তে কিন্‌তে কত টাকা নষ্ট হয়ে গেছে।

ছেলেদের স্বাস্থ্যের কথা। শীতপ্রধান দেশে physical exercise করা যায়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ততটা পারা যায় না। Englandএ children's health সম্বন্ধে অনেক journal আছে। আমাদের দেশে ওরূপ কিছু নেই। আমার ত মনে পড়েনা When I ceased to be a student. অথচ আমি এখনও লেবরেটরিতে ৭।৮ ঘণ্টা ক'রে কাজ কর্‌তে পারি। ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিকে আমরা মোটেই দৃক্‌পাত করিনা। যেমন বেশী খেলে আর রুচি থাকেনা, তেমন বেশী mental labour কল্লে মন অবসন্ন হয়ে পড়ে।

স্যার নীলরতন সরকার পরীক্ষা করে বলেছেন "আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে 66p.c. have got some sort of organic complaints.

এরূপ অবস্থায় লেখা পড়া শিখে কি হবে? কাজেই তাদের 'যজ্জীবতি তৎস্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ।'

যখন আমি শুনি কেউ গ্রাজুয়েট্ হয়েছে তখন আমার palpitation হয়। ভাবি যে ওই যাঃ সব গেছে। ওর ভিতরে যা ছিল সব বেরিয়ে গেল। Volcanoটা strained হয়ে গেল।

অনেক মা বাপ গর্ব্ব করেন—"আমার ছেলে য়ুনিভার্সিটিকে দুবছর ফাঁকি দিয়ে অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলে বয়েস কম লিখিয়ে পরীক্ষা পাশ করেছে।" এতে যে ছেলের কি সর্ব্বনাশ হলো তা তাঁরা বুঝেন না।

Precocious development is followed by premature decay. ছেলেদেরে ইঁচড়ে পাকান হয়। জাঁকদিয়ে পাকান যাকে বলে। তার বীজে গাছ পর্য্যন্ত হয় না।

অভিভাবক সম্বন্ধে আমি অনেক কথা বলেছি। সে সব ছাপা হয়েছে, আপনারা পড়ে দেখ্‌তে পারেন। সেই সম্বন্ধে এখানে আর কিছু বল্‌বোনা। ইংলণ্ডে একটা ভাল breeding bullএর দাম দেড় লাখ টাকা। আর আমাদের দেশে মানুষেরও যেমন cattle এরও তেমনি অবস্থা। চারটের পরে আজকাল দেখ্‌তে পাই অনেক ছেলে বই নিয়ে বসে। তখন যে বই ছুঁতেই নেই। কোল্‌কাতায় অনেক সময় দেখি চারটের পর ছেলে বাসায় এলো। বাড়ীর মধ্যে গিয়ে মা'র কাছথেকে জলখাবার খেল, তখনই ঝি এসে সংবাদ দিল "মাষ্টার এসেছে।" আর ছেলে মেয়ে পড়্‌তে বস্‌লো। চারটের পরে ছেলেরা একটু জল খেয়ে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দৌড়োদৌড়ি যত ইচ্ছা করুক।

আজ অর্দ্ধশতাব্দী সবই ত দেখ্‌ছি। ছেলেদের নাড়ী নক্ষত্র সবই জানি। ছেলেদের মুখেও আজকাল হাসি নাই। Saddler সাহেবও তাঁর রিপোর্টে এই কথা লিখেছেন—"বাংলায় কোনও ছেলেকে মন খুলে হাসতে দেখি নাই।" কোথায় সেই—And the loud laughter that speaks the vacant mind. আমাদের ছেলেদের মধ্যে দেখি life টা যেন একটা dismal valley of tears.

ইংলণ্ডে সব ছেলে মেয়ে একটু গাইতে বাজাতে পারে। আর আমাদের দেশে ওটা যেন একটা মহা পাপ। অভিভাবকের সাম্‌নে গান কর্‌বে একথা ভাব্‌লে ছেলেরা মরমে মরে যায়। আজকাল কোনও গ্রামে সভাসমিতিতে গান গাওয়াতে হলে গ্রামশুদ্ধ খুঁজে ছেলে পাওয়া যায় না। ওটা একটা divine gift. ওরজন্ম prize দেওয়া উচিত।

এখন শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বল্‌ব। শিক্ষক এমন করে পড়াবেন যেন ছেলে উপন্যাস শুন্‌ছে। যেন তন্ময় হয়ে থাকে। যাঁরা যত experienced তাঁদের তত juniormost classএ দিতে হয়। যাঁরা কম পাশ করেছেন তাঁদেরে উপরের classএ দিতে হয়। উপরের classএর ছেলেরা সেরে নিতে পারে। Presidency collegeএ ত আমি I. A. I. Sc. Class জোর করে—ঝগড়া করে নিতাম।

আর একটা প্রথা হচ্ছে নোট্ দেওয়া। এর মতন খারাপ প্রথা আর নাই। Court martial স্থাপন করে why not shoot them down ?

আমার একটি বন্ধু বল্‌তেন "আমার ছেলেটা বি,এ পাশ কর্‌তে পার্‌বেনা, ও সারাদিন কেবল foot ball খেলে কাটায়, বই এর সঙ্গে ওর কোনও সম্বন্ধ নেই।" কিন্তু পরীক্ষার আগে দেখ্‌লাম ও এর কাছে থেকে অমুক প্রফেসরের ভাল নোট্‌খানা ওর কাছ থেকে অমুক নোট্‌খানা সংগ্রহ করে বেশ পরীক্ষা পাশ করে ফেল্‌লো। ওরা কুকুরের মত বেশী খেয়ে বমি করে আসে।

Emerson বলেছেন—"যে ছেলে যত out book থেকে বেশী উত্তর দিতে পারে সে ছেলে তত ভাল।"

আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তঃ এখানে ইস্কুল দেখবার জন্যে আমাকে ডেকে নিতে পারেন। কিন্তু তা কর্‌বেন না। খাল কেটে কুমীর নেবেন না। আমি গেলেই ছেলেদেরে আউট্‌বুক্ থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর্‌ব। ঐ যে দেখিয়ে দেবেন অমুক পৃষ্ঠা থেকে অমুক পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়েছে সেটা আমি দেখ্‌বনা। দেখ্‌ব—কে কেমন আউট্‌বুক্ থেকে উত্তর দিতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় কোনও ছেলে হয়ত mathematics এর ক্লাসে "নেপোলিয়ন্" পড়্‌ছে। তখন মাষ্টার মহাশয় হয়তঃ তাকে ধরে বেত্রাঘাত করেন।

সেটা কিছুতেই উচিত নয়। বরং তাকে তখন নেপো-লিয়নের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি জিজ্ঞাসা করুন।

এই সব আমাদের শিক্ষা প্রণালীর দোষ। তবে যে জগদীশ বোস্ বের্ হয়েছেন—

Is it because of the system or inspite of it? আমি ত বলি inspite of it.

বাঙ্গালার মধ্যে যাঁরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁরাত বরাবর Universityর সঙ্গে আলেকুম্-সেলাম দিয়ে চলেছেন। যথা—রবীন্দ্রনাথ।

R. N. Mukherjea, যদি এঞ্জিনিয়ারিং পাশ কত্তেন তা হলে বড় জোর একজন ভাল এঞ্জিনিয়ার হতে পাত্তেন।

J. C. Banerjeeকে এপ্রেন্টিস্ ক্লাসে দুইবার রাষ্টিকেট্ কল্লে। তারপর তাঁর স্বাধীন ব্যবসায় কর্‌বার প্রবৃত্তি জাগ্‌লো।

রাধাচরণ পাল মিউনিসিপাল্ এড্ মিনিষ্ট্রেশনে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়ে গিয়েছেন।

নিবারণ চন্দ্র ঠাকুর—Prince of coal merchants তিনিও একজন কৃতি পুরুষ। তিনি বলেছেন—"1 p.c. of what I know, I owe to school, and 99 p. c. to what I did not read in school.

আজকাল একজন এম্ এ কে ইউরোপের একখানা ম্যাপ্ দিয়ে বলুন—"বার্লিন দেখাও ত অথবা প্যারিস্ দেখাওত"। সে তখন অন্ধের মতন ম্যাপের উপর হাত্ড়াতে থাক্‌বে। কিংবা ভারতবর্ষের ম্যাপ্ দিয়ে বলুন "কান্‌পুর দেখাও কি দিল্লী দেখাও।" তখনও সে তাই কর্‌বে। দেখুন কি রকম গণ্ডমূর্খ হয়ে এম্, এ পাশ করে বের্ হয়। এরা হচ্ছে শিখিপুচ্ছধারী বায়স অথচ বিদ্বান্ বলে অভিহিত। School final পরীক্ষা হ'লে বেশ ভাল হয়। পরীক্ষা বিভীষিকার চাপে ছেলে-দের health যে কি রকম মাটি হচ্ছে তা বলা যায় না। পরীক্ষার আগে অনেক প্রফেসর্ আমাকে বলেন 'কি কল্লেন? আজও ক্লাস্ ছাড়্‌লেন না।" আমি কিন্তু ক্লাস্ ছাড়ি না। আমি চাই মানুষ তৈরি কত্তে।

লর্ড রোণাল্ড্‌শে বলেছেন "Calcutta Universityর মস্ত দোষ। Dr. Roy ২৫ বৎসর শিক্ষকতা করেন আজও junior ছেলেদের সঙ্গে মিশ্‌তে পারেন না।" তিনি আমার কথাই বলেছেন। আমি কিন্তু চেলা সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘুরি। সেদিন আমি মান্দ্রাজে বলে এসেছি, "I never travel in silence. I always travel with *chelas*.

আমাদের দেশের মুসলমানেরা যে বছর বেশী পাটের টাকা পায় সে বছর একটা করে নিকে করে। তাদের সঙ্গে অনেক হাঁটানো ছেলে আসে। অবশ্য কথাটা শুন্‌তে ভাল শোনা যায় না; কিন্তু কলেজে আমরা এই-রূপ হাঁটানো ছেলে সব পাই। আমি আমার কৃতীছাত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে বরদা, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে বেড়াতে গিয়েছিলুম। ঝাল্‌ওয়ারের মহারাজা আমার বিছানা দিলেন তাঁর palaceএ আর জ্ঞানেন্দ্র ঘোষের বিছানা দিলেন তাঁর দেওয়ানের বাড়ীতে। আমি বল্লাম "মহারাজ কচ্ছেন কি? আমার বিছানা দিয়েছেন এখানে, আর তাঁর বিছানা ওখানে?" তখন তিনি তাঁর কথা শুনে বল্লেন "Oh. then he is my friend also." তারপর আমার সঙ্গে তাঁর বিছানা দেওয়া হলো।

Lord Ronaldshey উপস্থিত হয়ে জ্ঞানেন্দ্র ঘোষের অনেক প্রশংসা করেছেন। Ghosh's Law জগতে নূতন আবিষ্কার।

ডাঃ মেঘনাদ সাহার মত Mathematician ভারত-বর্ষে জন্মায় নাই। তিনি এখন জার্ম্মেনীতে গিয়েছেন। Sciller, গেটে প্রভৃতি তিনি সব পড়েছেন। তিন জন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক তাঁকে জিজ্ঞেস্ কল্লে "Do you know Dr. Ghot, ডক্টার্ ঘট্?"

তিনি ভাব্‌লেন একি ঘট্ ঘট্ কি বলে। তখন তারা বল্লে Law of dilution যিনি আবিষ্কার করেছেন। তখন তিনি বুঝ্‌লেন জ্ঞানেন্দ্র ঘোষের কথা বল্‌ছে। তিনি বল্লেন "Sirs, we pronounce it as Ghosh." তারা তাঁর বই সম্বন্ধে বল্লে "It is an epoch-making work." মেঘনাদ সাহা লণ্ডনের D. Sc. উপাধি

নিচ্ছেন না। তাঁকে সাধতেছে, তবু তিনি নিচ্ছেন না। কেন নেবেন? আবার Calcutta University কোন্ অংশে London Universityর চেয়ে ছোট। জাপানীরা এরূপ উপাধি নেয়না। সুইডেনের লোকেরাও নেয়না।

আর এক কথা এই,— আমাদের মাতৃভাষাকে প্রধান ভাষা কত্তে হবে। কয়েক বছরআগে আমি রাজসাহীতে সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব করেছিলাম। সেই সভায় রাজসাহীর একজন মুসলমান,—তিনি এখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছেন,— একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন— "বঙ্গীয় মুসলমানদের ভাষা কি?" আমি তাঁকে সভার মধ্যেই আলিঙ্গন করেছিলাম। তাঁর নাম ইয়াকাদালী। তিনি বলেছিলেন মুসলমান ও হিন্দু উভয়েরই মাতৃভাষা বাঙ্গালা। আমাদের এই মাতৃভাষাকে প্রধান স্থান দিতে হবে। আরবী, পার্শী, সংস্কৃত থাক্ optional. আমার ঐ বহুবিধান, ণত্ববিধান, আত্মনেপদ বা পরস্মৈপদ এসব শিখে সময় নষ্ট কর্‌লে চল্‌বে না। আচ্ছা, আপনারা কজন জার্ম্মেন্ শিখে প্লেটোর কথা পড়েছেন? কজন গ্রীক্ শিখে সক্রেটিসের কথা পড়েছেন? জার্ম্মান্ ভাষায় কেমিষ্ট্রীর বিষয় অনেক শিখবার আছে। আমি একজন কেমিষ্ট্‌। আমি জার্ম্মান্ শিখি বটে কিন্তু শুধু ঐ কেমিষ্ট্রী শিখ্‌বার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু শিখি তার বেশী শিখিনা। তার বেশী শিখ্‌বার আমার সময় নেই। বিলাতে অনেক জাপানী ছাত্র আছে। তারা বেশী ইংরেজী শেখেনা। তাদের বিজ্ঞান শিখ্‌বার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু মাত্র শেখে। Science কি না? কতক গুলি technical term শিখে নিলেই হলো। জাপানী কোনও ছাত্রের সহিত যদি ইংরেজীতে আলাপ করেন তাহা হইলে সে বল্‌বে "Sir, I understand you with difficulty, but please excuse me I can't express my idea in English."

ইংলণ্ডের তারা অনেক বেশী শেখে কারণ তারা মাতৃভাষায় শেখে।

জগতে এরূপ হাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই যে আমরা যা কিছু শিখি সব ইংরেজীতে শিখি। আমাদের মাতৃভাষাকে কর্‌তে হবে সর্ব্বপ্রধান ভাষা। English হবে Secondary language.

আমরা ত Miltonএর Paradise Lost অনর্গল মুখস্থ বলে যাই—

Of man's first disobedience
And the fruit of that forbidden tree
Whose mortal taste brought death into the world
And all our woe ইত্যাদি।

অন্যান্য দেশের লোকেরা ত আমাদের মুখের দিকে চেয়ে তাক্ লেগে থাকে।

আচ্ছা বলুন ত আপনাদের মধ্যে চণ্ডীদাস কজন পড়েছেন? মুকুন্দরাম কজন পড়েছেন?

সেই—
"তৈল বিনা করি স্নান—
উদক করিনু পান—
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।" বাংলার তখনকার জাজল্যমান চিত্র বেশ সুন্দর বর্ণিত হয়েছে। তখন দেশে নবাবের অত্যাচার। অথচ এই সমস্ত ভাষা কেমন সরল। বেশ সুন্দর, পড়্‌লেই বুঝা যায়।

আজ কাল এম্ এ তে বাংলা পড়ান হচ্ছে। সে বাংলা কত দূর?

আমাদের shall, will এর difference কি, আর accuse *of*, replete *with* এ সমস্ত পড়ে২ সময় নষ্ট কর্‌লে কি হবে।

আর সংস্কৃত শিখে কি হবে? অনেকে বল্‌বেন, "আমরা শাস্ত্র পড়্‌বো।" আচ্ছা বলুন দেখি আপনারা কজন সংস্কৃত শিখে মূল মহাভারত পড়েছেন? পূজারি ব্রাহ্মণ কজনে পানিনি পড়েছেন? দেব নাগর হরপ চিনেন কিনা সন্দেহ।

তাই বল্‌ছি অনুবাদ পড়ুন, অনুবাদেই কাজ হয়। কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারত—অতি সুন্দর বিশুদ্ধ ভাষায় অনুবাদ। তা-পড়ে ফেলুন।

কজন মুসলমান আরবী প'ড়ে কোরাণ পড়েছেন?
অনুবাদের সাহায্যে সব পড়্‌তে হয়।

আর কৃষি শিক্ষা দিতে হবে। Agricultural Class—নিজহাতে জিনিষ পত্র তৈরি কত্তে শিখুন।

Students of today make the nation of tomorrow. জন্ ব্রাইট্ এই কথা বলেছেন। চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া ত ভালনা। শিক্ষকদের দায়িত্ব কত তা আপনারা বুঝুন। ভাব্বার দরকার নেই যে আপনাদের বেতন কম। আপনাদের vocation এর কথা মনে রাখ্বেন। Vocation কথাটা বড় পবিত্র। Voco, to call.

ছেলেদের হৃদয় অতি পবিত্র। তাদের মধ্যে কোনও কুচিন্তা নাই। এদেরে আপনারা মানুষ করে তুলুন।

শিক্ষকদের চরিত্রের উপর ছেলেদের নজর খুব বেশী। কোন্ কাতার গোদাবীর ধারে বৈকালে বেড়াতে গেলেই বুঝ্তে পারবেন। আমি মাঝে মাঝে তাদের মন্তব্য ও সমালোচনা শুনে থাকি।

একজন শিক্ষক যদি মদ্যপায়ী হন তা হ'লে ছেলেদের কত অনিষ্ট হয় একবার ভেবে দেখুন। অবশ্য তা হ'লে সব ছেলেই যে মদ্যপায়ী হবে, তা নয়, কিন্তু কিরূপ কুদৃষ্টান্ত একটা তারা চোকের সাম্নে দেখ্তে পায়?

To mould the boys,—এর মত ভ্রমাত্মক কাজ আর নাই। The teacher's duty is to draw out what is best in the boy. The child is the father of the man এটা মনে রেখে আপনারা কাজ কর্বেন।

আমাদের ত জীবন সন্ধ্যা। দেখ্বেন দশ বছরের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হবে। আমি political যুগান্তরের কথা বল্ছি না। Bengal is going to have a grand future. ভাবুন দেখি 1500 আমাদের Indian I. C. S. নিযুক্ত হয়েছেন। ভাবুন দেখি—একজন বাঙ্গালী—Governor of a province. দশবৎসর পূর্ব্বে এই কথা ভাব্লে আমাদের মূর্চ্ছা হত। লর্ড রোণাল্ড্সে ত মহাদেবের মত কৈলাস পর্ব্বতে বসে আছেন। মন্ত্রী সব আমাদের। তাঁরাই ত দেশ শাসন কর্ছেন। অবশ্য অনেক ভাল লোক Councilএ যান্ নাই,—একথা না বল্লে—noncooperationist রা আমাকে ধরে মার্বে।

বাঙ্গালা ভাষা এখন পৃথিবীর মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে গণ্য হয়েছে, যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ লিখেন।

এখন ইংরেজীতে চিঠি লিখ্লে লজ্জা হয়; এখন আর মাতৃভাষাকে উপেক্ষা কর্লে চল্বেনা। মাতৃ ভাষাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতেই হবে। আমার শেষ কথা এই,—

Awake, arise, or be for ever fallen.

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

স্রোতের ফুল।

৯

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের পুত্র গঙ্গাধর গ্রামের নবকুমার কবিরাজের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িত ও সঙ্গে সঙ্গে নিদান মুখস্থ করিত। গঙ্গাধর আজ চার বৎসর যাবতই দুস্তর নিদান সমুদ্র অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেছিল। বিবাহের পূর্ব্বে হরিহর বাবু শুনিয়াছিলেন জামাতা কবিরাজি করিয়া বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন, এদিকে প্রফুল্ল ও যমুনা আসিয়া দেখিল, তিনি এখন ও কবিরাজের টোলেরই ছাত্র। এবিষয়ে হরিহর যে ঠকিয়াছিলেন তাহা কালীতারা দেবীকে বুঝাইয়া বলিবার কেহ ছিল না।

গঙ্গাধর প্রফুল্লকে বেশ্ সম্মান দেখাইত; সময় সময় প্রফুল্লর সহিত তাহার ২।১টা হাসি ঠাট্টার কথাও হইয়াছে, কিন্তু সে অধিকাংশই বিবাহের সময় মালকায়। সেখানে এরূপ সুযোগ যত অধিক মিলিয়াছিল, এখানে—নিজগৃহে তেমন সুযোগ তার এপর্য্যন্ত হয় নাই। আজ মাতার অভিযোগের বিচার করিতে যাইয়া সে প্রফুল্লকে সহিত অনেক ক্ষণ আলাপ করিবে ইহাই মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল।

রাত্রির আহার হইয়া গেলে সে প্রফুল্লকে নিজেই তাহার ঘরে ডাকিয়া আনিল। প্রফুল্ল একা একা আসিল দেখিয়া গঙ্গাধর মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সই কোথায় সই?"

প্রফুল্ল গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিল—আজ সই কে মাঐ মা সঙ্গে রাখিবেন।

গঙ্গাধর হাসিয়া বলিল—"তবে বদলে চলিবে আজ?"

প্রফুল্ল মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

গঙ্গাধর তাহার বিবাহে প্রাপ্ত পালঙ্কে শয়ন করিয়া ছিল। রসিকতার কথা বলিয়া প্রত্যুত্তর না পাইয়া গঙ্গাধর একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। পালঙ্কের নীচে এক খানা জলচৌকিছিল, প্রফুল্লকে তাহা দেখাইয়া বলিল—দাঁড়াইয়া কেন, ঐ জল চৌকি খানা টানিয়া লইয়া বসো সই!"

প্রফুল্ল চৌকিতে না বসিয়া মাটিতেই উপবেসন করিল। মালঙ্কায় প্রফুল্ল গঙ্গাধর ও যমুনার সহিত এক বিছানাতেই উপবেশন করিয়াছিল; গঙ্গাধর সে কথা স্মরণ করাইয়া হাসিয়া বলিল—"এই সম্মান জ্ঞান টুকুতো মালঙ্কায় ছিল না সই, বোধ হয় বয়সের সহিত রাতে রাতে বাড়িয়া চলিয়াছে।"

প্রফুল্ল বলিল—"সেটা ছিল নিজ বাড়ী, যা করিয়াছি, শোভা পাইয়াছে........।"

গঙ্গাধর—"আর এটা?"

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল।

গঙ্গাধর—"যাক্। আজ মার সঙ্গে তোমার কোন বিষয় তর্ক হইয়াছিল কি? তুমিতো কাহার সহিত উচ্চবাচ্য কর না, তবে মা এমন কথা বলেন কেন?"

প্রফুল্ল—"অবশ্য কোন কথা হইয়াছে বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন। তিনি মিথ্যা কথা বলেন নাই।"

গঙ্গা—"এরূপ হইল কেন?"

প্রফুল্ল বলিল—"আমি দোষের মনে করিয়া কিছুবলি নাই।........."

গঙ্গা—"মার কোন কথায় রাগ করিও না সই, মা বড় রাগী........।"

প্রফুল্ল—আমার তেমন রাগের শরীর নয় যে কথার উপর রাগ করিব।... তবে যাহাকে যে কথা বলা উচিত নয়, তাহাকে তেমন কথা বলিতে শুনিলে দুঃখ হয়। আপনাদের আনিবার অনিচ্ছা প্রকাশ পাইলে সই আমাকে সঙ্গে আনিত না। সেখান হইতে তাঁহারা আমাকে তাহার সঙ্গে দিয়াছেন, আপনারাও সঙ্গে আনিয়াছেন, এখন আমার ভাত-খোরাকির জন্য যদি উঠ্‌তে বস্‌তে কথা হয়—মাঐ মা সইকে খোঁটা দেন, দুর্ব্বাক্য বলেন—তবে সে নূতন বউএর পক্ষে চক্ষের জল ব্যতীত উপায় অন্তর কি? আমারইবা দু একটা কথা না বলিয়া........."

গঙ্গাধর মাথা নাড়িয়া বলিলেন "সেতোঠিক কথা।"

কালীতারা বাহিরে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি প্রফুল্ল ও গঙ্গাধরের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। গঙ্গাধর প্রফুল্লর কথায় সায় দেওয়ায় তিনি আর নিজকে সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না—চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ কি রসের আলাপনই চলিতেছে—এ বাঁদী এ বাড়ীতে থাকিলে দেখিতেছি পুলা বুড়া সকলের মাথাই ঘুলাইয়া দিবে।.....

মায়ের কথা শুনিয়া গঙ্গাধরের চৈতন্য হইল। গঙ্গাধর ঘরের ভিতর হইতেই বলিল—"ছি মা, কি বলিতেছ, একেবারে যে যা ইচ্ছা তাই—এরতো আমি কোন দোষ..."

পুত্রের কথা মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই কালীতারার গর্জ্জন সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া গঙ্গাধরের স্বরকে ডুবাইয়া দিল।

অবস্থা বুঝিয়া প্রফুল্ল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

১০

কালীতারা ছেলে বিবাহ করাইয়া বউ ঘরে আনিয়া কথায় কথায় যেমন বধুর সহিত অপ্রীতিকর ব্যবহার করিতেছিলেন, তেমনি বউকে পিত্রালয়ে ছাড়িয়া দেওয়া লইয়া নূতন কুটম্ব বেহাই বেহাইনের সহিতও তেমনি অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর যথারীতি দিন স্থির থাকা সত্বেও মালঙ্কার লোক আসিয়া দুই তিন দিন বসিয়া থাকিয়া বাড়ীর কাহারও কোন সম্মতির লক্ষণ না পাইয়া চলিয়া গেল।

তার পর ক্রমে চারি পাঁচ মাস চলিয়া গিয়াছে। হরিহর বাবুর লোক মাসে মাসে পত্র লইয়া আসিতেছে, কেহ কোন উত্তর দিতেছেন না; ভট্টাচার্য্য সম্মতি দিতেছেন তো গিন্নি রাজি হইতেছেন না, গিন্নি নিমরাজি হইতেছেন তো ছেলের মন উঠতেছেনা; সুতরাং পত্র বাহকের আগমন ও প্রতিগমন ব্যতীত আর কোন ফল হইতেছেনা। প্রফুল্লও যমুনার অবস্থা ভাবিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছে না।

জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠী। হরিহর বাবু আদর করিয়া জামাই মেয়ে একত্র নেওয়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লোক পাঠাইলেন। এই বার কালীতারা বেহাইনের নিকট শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া লিখিলেন—

"বধু মাতা বোধ হয় অন্তঃবত্বা আছেন। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন ভগবান আমাদের এ বাসনা সত্য করুণ, তাহা হইলে সপ্তামৃতের সাধ খাওয়াইয়া আপনার মেয়েকে

জামাতার সহিত আপনাদের নিকট পাঠাইয়া দিব। তখন দীর্ঘ কাল মেয়ে আপনার নিকট থকিতে পারিবে। ভগবান মঙ্গল করুন।"

সুসংবাদ পাইয়া ঘোষাল দম্পতী সুখী হইলেন।

পৌত্র-মুখ দর্শন করিবেন চিন্তাকরিয়া কালীতারারও আনন্দ হইয়াছিল বটে কিন্তু সেই আনন্দের চিন্তায় ডুবিয়া তিনি তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। বধুকে ও প্রফুল্লকে, স্বামীকে ও ছেলেকে সমানে জালাতন করিতে লাগিলেন।

বিবাহের এক বৎসর মধ্যে গর্ভ হওয়া মেয়েরা অকল্যাণের বিষয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এরূপ হইলে নাকি পতি-পুত্রের অমঙ্গল নিশ্চিত। কালীতারা বধুর প্রতি রাগ হইলেই এই কথাটীর উল্লেখ করিয়া যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিয়া বধুকে পীড়ন করিতেন।

অনবরত কথা শুনিয়া শুনিয়া যমুনারও সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। সেও অতঃপর শাশুড়ির মুখে মুখে জবাব দিতে ত্রুটী করিত না। ফলে কালীতারা বধুর গায়ে হাত উঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেন না। এরূপ স্থলে প্রফুল্লর সহিত হাতধরাধরি করাও তাহার পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর যে বিচার হইত, তাহাতে যদি পতি পুত্র বধুর পক্ষ অবলম্বন করিতেন তবে বাড়ীতে সে দিন বিষম কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়া যাইত।

মালঞ্চা হইতে জামাই ষষ্ঠীর যে তত্ত্ব আসিয়াছিল তাহা কালীতারার চক্ষে বড়ই অকিঞ্চিতকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এক দিন সেই কথা তুলিয়া কালীতারা বলিলেন "বেল্লিকের ঝি বিবাহ করাইয়া জাতও গেল পেট ও ভরিল না; ইহার উপরও সাতটা আট্‌টা মাস দুই দুইটা পেট ভরাইয়া কেবল অপমানই সার করিলাম......"

শুনিয়া যমুনার রাগ হইয়াছিল। সে তেমনি স্বরে বলিল—"রাক্ষসের পেট কি মানুষে ভরাইতে পারে? আর যে যা খাওয়াইয়াছে কেহ বাপের ঘর হইতে আনিয়া খাওয়ায় নাই—সকলেই যাহার তাহার শরীর খাটাইয়া হকের ভাত খাইয়াছে।"

বধুর উত্তর শুনিয়া কালীতারার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্যা হইয়া তিনি দৌড়াইয়া আসিয়া যমুনার পৃষ্ঠে সবেগে প্রহার করিলেন। যমুনা দৌড়িয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, পারিল না; কিন্তু খাইয়া দরজার চৌকাঠের উপর পড়িয়া গেল, তারপর গড়াইয়া বাহিরে নীচে পড়িয়া গেল।

প্রফুল্ল ঘাট হইতে জলের কলসী লইয়া আসিতেছিল, যমুনা পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সে কলসি নামাইয়া রাখিয়া চীৎকার করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল। গদাধর নিজ ঘরে বসিয়া ঘুড়ির 'কাযানী' প্রস্তুত করিতেছিল। সেও প্রফুল্লর চীৎকার শুনিয়া বাহির হইয়া আসিয়া যমুনাকে ধরিল।

প্রফুল্ল চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। গঙ্গাধর তাহার দুই হাতের সবল বাহুতে সতর্ক যত্নে যমুনার সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া আগলাইয়া আনিয়া নিজ শয়ন ঘরের পালঙ্কে রাখিয়া মাথায় জল ঢালিতে লাগিল। বাহির বাড়ী হইতে গদাধর ভট্টাচার্য্য চীৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিলেন এবং পুত্র-বধুর অবস্থা দেখিয়া ভয়ে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

প্রফুল্ল তাঁহাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো বসিয়া থাকিলে কি হইবে শীঘ্র কবিরাজ লইয়া আসুন—দেখিতেছেন না রক্তে ঢেউ খেলিতেছে..."

হতবুদ্ধি গদাধর দৌড়িয়া কবিরাজ বাড়ী গেলেন। কবিরাজ আসিল, ধাই আসিল, ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা হইল, তুক্‌তাক্‌ও করা গেল। প্রসব করাইবার চেষ্টাও যথা সম্ভব হইল; কিছুতেই কোন ফল হইল না। সংজ্ঞাহীন যমুনার মুখে দারুণ যন্ত্রনার লক্ষণ সকল ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

শেষ রাত্রে সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে যমুনার শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। প্রফুল্ল উন্মাদিনীর ন্যায় যমুনার উপর পড়িয়া আপনার অসহায় মর্ম্ম বেদনা অন্তর্য্যামীর উদ্দেশ্যে ছড়াইয়া দিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

১১

প্রফুল্ল ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না—এখন

তাহার কি কর্ত্তব্য। এই জনপূর্ণ বিশাল পৃথিবীটা তাহার নিকট যেন জন হীন, আশ্রয় হীন শ্মশানের মত বোধ হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল—এখন কি করি, কোথায় যাই ?

প্রফুল্ল যখন মনে প্রাণে এই ভাবনাই ভাবিতে ছিল তখন গঙ্গাধর আসিয়া তাহাকে বলিল—তোমার এখানে কষ্ট হইতেছে, চল তোমাকে মালঙ্কা রাখিয়া আসি,—চির দিনের জন্য তাঁহাদের নিকট হইতেও বিদায় হইয়া আসি; একবার না গেলে সেখানে তাঁদের প্রাণেও সান্ত্বনা আসিবে না...”

প্রফুল্লও তাহাই চাহিতেছিল, সুতরাং এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবিয়া দেখিবার তাহার আর কিছু ছিল না। সে গঙ্গাধরের প্রস্তাবে সায় দিল এবং পরদিনই তাহার সহিত নৌকায় মালঙ্কা যাত্রা করিল।

নৌকা খানা ছিল এক মাল্লাই—নিতান্ত ছোট। দিনে দিনেই পঁহুছাইবে বলিয়া বড় নৌকার প্রয়োজন বা সঙ্গে তৃতীয় মানুষের প্রয়োজন কেহ অনুভব করে নাই। প্রফুল্লরও তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না; কেননা, সে যে এ বাড়ী ত্যাগ করিতে পারিলেই বাঁচে।

নৌকা ছাড়িলে গঙ্গাধর ছৈএর দুই মুখে পর্‌দার মত করিয়া দুখানা কাপড় ঝুলাইয়া দিয়া প্রফুল্লকে ছৈএর ভিতর রাখিল, আর সে নিজে পরদার বাহিরে বসিয়া হুকা কলিকার সম্বন্ধ ঘনিষ্ট ভাবে বৃদ্ধি করিয়া লইয়া বৃদ্ধ মাঝির সহিত 'দুনিয়ার খবর আলোচনা করিতে লাগিল।

ঝপ্‌ ঝপ্‌ করিয়া এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। গঙ্গাধর একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পর্দ্দা ঠেলিয়া বসিতে চেষ্টা করিলে প্রফুল্ল বলিল—আপনি ভিতরেই আসিয়া বসুন, ভিজিয়া যাইতেছেন যে।”

গঙ্গাধর তাহাই চাহিতেছিল। প্রফুল্লর অনুমতি পাইয়া সে আগুনের আলিসাটী ও তামাকের সাজ সরঞ্জাম গুলি লইয়া পরদার ভিতরে আসিয়া বসিল। প্রফুল্ল একদিকে কোণ ঠেঁসা হইয়া সঙ্কোচ ভাবে রহিল।

গঙ্গাধর বলিল—“এমন করিয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকিবে সই। এই সতরঞ্চটা ভাল করিয়া বিছাইয়া দেই, তুমি শুইয়া থাক; আমি এ দিকে বসিয়া গল্প করি।”

বলিয়াই গঙ্গাধর সতরঞ্চটা ভাজ খুলিয়া বড় করিয়া বিছাইয়া দিয়া প্রফুল্লকে সুন্দর একটু স্থান করিয়া দিল।

বৃষ্টি থামিল না, বরং বাতাস সঙ্গে লইয়া ছুটিল। গঙ্গাধর নৌকা বাঁধিয়া ফেলিতে বলিয়া 'থাপার' আটিয়া গলই নায়ের মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। মাঝি নৌকা বাঁধিয়া উপরের অতিরিক্ত ছৈ খানা টানিয়া দিয়া নিজের জন্য একটুকু স্থান করিয়া লইয়া শীতার্ত্ত আর্দ্র শরীরকে আগুণের পাতিলের উপর ঝুকাইয়া দিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ক্ষুদ্র খালের পথ। সুতরাং ঝড় খুব ভয়ের কারণ হইল না। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। গঙ্গাধর এই অবসরে প্রফুল্লর নিকট গল্প জুড়িয়া দিল। গঙ্গাধর ঝড়ের গল্পই আরম্ভ করিল।

“ঝড়ের গল্প তুমি কি জান সই! তুমি তো সে দিনের মানুষ, শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে—ঝড় হইয়াছিল, সেবার দৌলত খাঁয়! সে কি ঝড়! কিন্তু বড় আরামের ঝড় ছিল সে ঝড়? লোক মরিয়াছিল বিস্তর, কিন্তু বড়ই আরামে মরিয়াছিল। ঘুমের মধ্যেই মহানিদ্রা। সুধারামের মুন্সেফ ছিলেন ঘরে স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘুমাইয়া। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখেন—কোথায় ঘর—এ যে মস্ত একটা বট গাছের উপর তাহার চৌকি খানা আটক হইয়া রহিয়াছে। তখন তিনি না পারেন নামিতে, না পারেন নড়িতে চড়িতে! তাঁহার স্ত্রীতো ভয়ে কাঁপিয়া কাঁপিয়া মূর্চ্ছা গেলেন। ছেলেটা ছিল অত্যন্ত অস্থির, সেটা চৌকির উপর হইতে পড়িয়া যে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহার খোঁজই পাওয়া গেল না!...”

মাঝি গল্প শুনিতেছিল। এ গল্প সেও জানিত কিন্তু বোধ হয় কিছু অসম্পূর্ণ—সে তাহার অভিজ্ঞতা পূরণের জন্য জিজ্ঞাসা করিল—মুনছুব বাবু এই কয় দিন কোম্পানীর কাজ করিলেন না কি ?”

গঙ্গাধর বলিল—করিলেন বৈ কি, কোম্পানী বাহাদুরের কাজকি বন্ধ থাকিতে পারে। যত দিন জল না কমিল তত দিন তিনি গাছে থাকিয়াই কাজ করিলেন?

মাঝিবলিল—তেনারা নামিলেন কেম্‌নি ?

গঙ্গাধর—কোম্পানীর কল আনিয়া, তারপর কত

কিছু কছরত্ করিয়া মুন্সেফ ও তাঁহার স্ত্রীকে নামান হইয়াছিল।”

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

বৃষ্টি থামিলে পুনরায় নৌকা চলিল। গঙ্গাধর আর পরদার ভিতর হইতে বাহির হইল না।

গঙ্গাধর প্রফুল্লর জীবনের কোন কথাই জানিতনা। সে শুধু তাহাকে তাহার স্ত্রীর সই বলিয়াই জানিত; আর জানিত প্রফুল্লর পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন কেহ নাই। গঙ্গাধরের এ বিশ্বাসটা দৃঢ় ছিল যে প্রফুল্ল ডাক্তারী শ্রেণীর লোক; কেননা ভদ্র কায়স্থের মেয়ে এ ভাবে কোন ভদ্র গৃহস্থ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় না। তবে প্রফুল্ল যমুনার বাল্য সহচরী ও সই বলিয়া তাহার যে সম্মানে একটু বিশেষত্ব ছিল তাহা সে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। সে জন্য গঙ্গাধর তাহাকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখিত কিন্তু এই প্রীতির ভিতর সৌন্দর্য্য উপভোগ স্পৃহা গঙ্গাধরের ছিল। সুন্দর জিনিসকে কে চক্ষের তৃপ্তি মিটাইয়া না দেখিতে চায়?

গঙ্গাধর ছিল নির্দ্দোষ—পতঙ্গেরই মত নির্দ্দোষ। এখন বহ্নিমুখে পতঙ্গের মত হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পুড়িয়া মরিতে বসিল।

নৌকা চলিতেছিল; গঙ্গাধর মাঝিকে ডাকিয়া বলিল—“দিনটা তো মাটি হইল, রাতের উপায় কি? ডাকাতের ভয় বিলক্ষণ, বাঘের ভয়ও কম নয়? ডাঙ্গায় বাঘ, জলে ডাকাত—একটা ভাল রাস্তা দেখ, যেন সুবিধা মত যাওয়া যায়। রাতটা বসিয়াই কাটাইতে হইবে। এমন জানিলে কি তোমার এই তোষের ডিঙ্গিতে চলি?”

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল “আজ পঁহুছান যাইবে না?”

গঙ্গাধর বলিল—ঝড় বৃষ্টিতে বড়ই গোলমাল বাধাইয়াছে। নদীর পথে যাওয়া গেল না—ঝড়ে সে পথ নিরাপদ নহে। রাত্রিতে ও বৃষ্টি হইবে সুতরাং প্রবাস না করিয়া উপায় নাই। তা সই তুমি ওখানে বেশ ঘুমাইতে পারিবে, আমি আর হারাধন ঐ জল ডরাতে বসিয়া কোন মতে রাতটা কাটাইয়া দিব। কাটাইব তো বলিতেছি—“যে মশা! নাঃ! আজ রাতে আর প্রাণ থাকিবেনা।”

প্রফুল্ল বলিল—“তা এক রাত কোন মতেসতে কাটাইতেতো হইবেই।”

প্রফুল্লর নিরুদ্বেগ উত্তর শুনিয়া গঙ্গাধর আশ্চর্য্য হইল। সে প্রফুল্লকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—“সই মনকে আর বিকল করিয়া রাখিলে কি হইবে? যে গিয়াছে, সে গিয়াছে, ভগবানের রাজ্যে গিয়াছে, তাঁহার আদেশে আসিয়াছিল, তাঁহার কাজ সমাপন করিয়া, তাঁহার কাছে জবাব দিতে চলিয়া গিয়াছে; তবে মায়া—সই মায়ায়ই আমরা অস্থির! মায়া একটা বিরাট ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদে এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ আছে, সে গুলি জানি বলিয়াই দুঃখ ভুলিতে পারিয়াছি।”

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“পুরুষের আবার দুঃখ কি? যার যায়, তার যায়; আপনিতো আবার বিবাহ করিবেন...”

গঙ্গাধর বাধা দিয়া বলিল—“না সই, আর না; আর ওই ঝঞ্ঝাটে—পা দিব না; বড় দাগা দিয়াছে যমুনা, আর না, আর না...”

প্রফুল্ল যেন একটু আরাম বোধ করিল? বলিল—“বিবাহ না করিয়া থাকিবেন?”

“নিশ্চয়!”

প্রফুল্ল সরল শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে গঙ্গাধরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গঙ্গাধর বলিল—“সই কিছু মনে না করিলে তোমার সম্বন্ধে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? তোমার সহিত এত খানি আত্মীয়তা থাকা সত্বেও তোমার কিন্তু নাড়ী নক্ষত্র কিছুই জানিতে পারি নাই। কাল হইতে হয়ত জীবনে আর সাক্ষাৎই হইবেনা—”

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—‘আমার পিতা মাতা কেহ নাই—নিরাশ্রয় আমি—সই ছিল আমার আশ্রয়— এখন পুনরায় সেই নিরাশ্রয়। আমার সম্বন্ধে আর জানিবার কিছু নাই।”

গঙ্গাধর—“মালঞ্চাতেই তোমার বাড়ী? থাকিবেওতো সেখানেই, তাঁহাদের বাড়ীতেই......”

প্রফুল্ল—“যত দিন তাঁহাদের স্নেহ ভালবাসা আছে, আর যত দিন ভগবান অন্ন রাখিয়াছেন, থাকিব; না থাকিয়া গতি কি?”

গঙ্গাধর—"বিবাহতো করিবে?" গঙ্গাধরের স্বর বাঁধিয়া গেল।

প্রফুল্ল বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"না।"

প্রফুল্ল মনের কথা চাপা দিতেছে বুঝিয়া গঙ্গাধর আলাপের গতি ফিরাইয়া লইয়া একেবারে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"নবদ্বীপ যাইবে সই? যার কেহ নাই, শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপীঠই তাহার পক্ষে মহাআশ্রয়—স্বর্গধাম।"

প্রফুল্ল গঙ্গাধরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তেমন সৌভাগ্য কি আমার হইবে?"

গঙ্গাধর বলিল—"আমি সেখানে যাইয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইব বলিয়াই বাহির হইয়াছি। তোমাকে মালকা রাখিয়া, তাঁহাদের নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া শ্রীপাটে যাইব। সেখানে গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ করিয়া যাহা হয় একটা করিব।"

প্রফুল্ল উত্তর করিল না।

মাঝি বলিল "একটা জাগা দেখা যায়, নাও রাখ্‌ব কি দাদা ঠাকুর?"

সন্ধ্যা হইয়াছে। গঙ্গাধর বাহির হইয়া স্থানটা দেখিল, তারপর বলিল—"আর যে কোন নৌকার গতায়াত দেখা যায় না, বাহিয়া চল; আর একটা চলন্ত নৌকা পাইলে তাহার সাথেই পাড়া বাঁধিও।"

নৌকা চলিতে লাগিল। পরিস্কার আকাশে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। সঙ্গীতরসপ্রিয় বৃদ্ধ মাঝি বাহির নদীতে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া ভাটিয়াল রাগিণীতে গান ধরিল:—

ও প্রাণ কানাই ও বারনা বছরের কালে
এই না দুখু প্রাণে রইল, বাইরুম্ বাইরুম্ করেরে
ও প্রাণ কানাই ও!

ও প্রাণ কানাই ও তৈলের বাটি গামছা হাতে
চল যাই যমুনার ঘাটে, কলসি ভাসাইয়া নিল সুতেরে
ও প্রাণ কানাই ও!

ও প্রাণ কানাই ও বন্ধু যদি আপন হইত
ওগো কলসি আনিয়া দিত, কলসি ভরিয়া
আনতাম জল ওরে ও প্রাণ কানাই ও!

প্রফুল্ল গানটী মুগ্ধচিত্তে শুনিতেছিল।

গঙ্গাধর বলিল—"এখন সই কিছু চিড়াগুড় খাইয়া আজকার মত একটু ঘুমাও। আমরা দেখি, পথে ঘাটে নিশ্চিন্তে ঘুম ভাল নয়—আর নিশ্চিন্তে চক্ষু বুজিবার কি জোগাড় আছে—যে মশার ডাক!"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল—"আগে ব্রহ্ম ভোজ্যি হোক তার পরতো হইবেই......"

গঙ্গাধর চিড়া ভিজাইয়া তেঁতুল-গুড়-লবণ সংযোগে ভক্ষণ করিতে লাগিল। ওদিকে প্রফুল্ল সতরঞ্চের উপর একখানা কাঁথা বিছাইয়া বালিস দিয়া গঙ্গাধরের জন্য বিছানা করিয়া গলইর দিকে খালি পাটিতে নিজের বালিসটি পাতিয়া রাখিল।

গঙ্গাধর আহার করিয়া কলিকায় তামাক টিকিয়া ধরাইয়া ঠিক হইয়া বলিল—"এইবার সই বাহির হইয়া আইস, আমি ভিতরে যাইয়া বসি; তুমি এখানে বসিয়া খাও—জল তুলিয়া রাখিয়া আসিব কি?"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল—আমি জল তুলিতে পারিব; বামুনের তোলা জলে কোন্ কাজ হইবে?

প্রফুল্ল পরদার বাহিরে গেল, গঙ্গাধর ভিতরে আসিল

গঙ্গাধর বলিল—এ বেশ বিছানা হইয়াছে। ও দিকে পাছায় মাঝি থাকিবে, তুমি মাঝে থাক, আমি এই আগা নায়ে বসিয়া পাহারা দিব।"

প্রফুল্ল চিড়া ভিজাইয়া কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল—"না ওই পাটিতেই আমি থাকিব, এদিকে আপনি থাকুন; না ঘুমাইয়া আপনি পারিবেন না।"

প্রফুল্লর স্বর অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ, যেন তাহার পরলোকগতা সই আজ তাহার স্বামীটীর সম্পূর্ণ যত্নের ভার তাহার উপর রাখিয়া গিয়াছে।

গঙ্গাধর জিহ্বার চক চক্ শব্দে পূর্ণ সহানুভূতি জানাইয়া বলিল—"শোন কথা, তিনি পাহারা দিবেন, আর আমরা ঘুমাইব? গলায় দড়ি আমাদের! আচ্ছা আমি ঠিক করিয়া দিতেছি; একরাত কোন মতে চলিবেই।"

গঙ্গাধর তামাক টানিতে লাগিল। তারপর তামাক শেষ করিয়া রাখিয়া সতরঞ্চটা নৌকা জুড়িয়া ফেলিয়া নিজের স্থানে একখানা কাঁথা ও প্রফুল্লর স্থানে আর একখানা কাঁথা ফেলিয়া প্রফুল্লকে ভিতরে আসিতে ডাকিল।

প্রফুল্ল আসিয়া প্রথমে সঙ্কুচিত হইল, তারপর সঙ্কোচ কাটাইয়া সে ধীরে ধীরে পা গুটাইয়া শুইয়া পড়িল। গঙ্গাধর মাঝির জন্য চিড়া গুড় লবণ তেঁতুল, পৃথক করিয়া রাখিয়া দিয়া পুনরায় তামাক ভরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল এবং মনে মনে উদ্দেশ্য চিন্তা করিতে লাগিল।

গঙ্গাধরের নৌকা মালঞ্চার দিকে না যাইয়া ঢাকার পথে যাইতেছিল। গঙ্গাধরের এই মতের পরিবর্ত্তন, নৌকায় উঠিয়া হইয়াছিল—প্রফুল্লর সহিত স্বাধীনভাবে, মুক্তভাবে আলাপ করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াই হইয়াছিল। পতন সর্ব্বদাই এইরূপ সুযোগের অপেক্ষা করে। নির্দ্দোষ গঙ্গাধর এই সুযোগে পতনের পথ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিল। অতঃপর কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তামাক টানিতে টানিতে সে তাহাই চিন্তা করিতেছিল।

"হো—রে ভাটিয়াল মাঝি—হো।"

পশ্চাৎদিক হইতে ডাক শুনিয়া মাঝি বলিল, "দাদা ঠাকুর গতিক ভাল না—ডাকাইতের নাও পাছ ধরিয়াছে, দাঁড় লও।"

গঙ্গাধর বাহির হইয়া আসিয়া দেখিয়া বলিল—"একি এক ডালার বাঁকে নৌকা! সর্ব্বনাশ, উপায় নাই! চালাও, জোড়ে চালাও।"

গঙ্গাধরও সম্মুখের গলইতে যাইয়া বসিয়া দাঁড় ধরিল। তখন নৌকা দ্রুতবেগে চলিল।

প্রফুল্লও ডাকাতের কথা শুনিয়াছিল, তাহার মুখে কোন কথা সরিল না। গঙ্গাধর দাঁড় টানিতে টানিতে অস্পষ্ট স্বরে বলিল—"সই ডাকাতের নাও আসিতেছে, টাকা পয়সা জিনিস পত্রের মায়া ছাড়িয়া দাও।" কোন চিন্তা নাই। গঙ্গাধরের স্পষ্ট কথা বাহির হইতে ছিল না।

প্রফুল্ল কম্পিত কণ্ঠে বলিল—হাতের দু গাছা রূপার বালা ছাড়া, আমার আর কি আছে।

ঝপ্ ঝপ্ বৈঠা ফেলিয়া তীর বেগে দুইখানা নৌকা আসিয়া দুইদিকে লাগিল।

মাঝি বলিল—"কি চাও ভাই, চরণদার আছে, জেনেনা লোক—সাবধান।"

ডিঙ্গির মাঝি বলিল—আগুন চাই, থামাও বৈঠা।"

দুইটা লোক নৌকার উপর উঠিয়া পড়িল।

গঙ্গাধর বলিল—আরে, আরে, নৌকাটা যে কাত হইয়া পড়িল!"

লোকটা বলিল—"কি কি আছে শীগ্‌গির দেও।" বলিয়াই সে পরদাটা টানিয়া ফেলিয়া দিল। প্রফুল্ল কাঁপিতেছিল।"

গঙ্গাধর কম্পিত কণ্ঠে বলিল—নৌকার যাহা কিছু আছে সকলি লইয়া যাও! স্ত্রীলোকের শরীরে হাত দিও না—সাবধান।"

ডাকাতরা গঙ্গাধরের পরিধান বস্ত্র খুলিয়া তাহার গাঁটে বাধা টাকা গুলি লইল। তারপর প্রফুল্লর মুখের সম্মুখে প্রদীপ লইয়া দেখিয়া বলিল—"খুপ্ ছুরৎ চিজ।"

দুইটা ভীষণকায় লোক তখন গঙ্গাধরের উপর পড়িয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিতে লাগিল, এবার প্রফুল্ল চীৎকার করিয়া তাহাকে ধরিতে চাহিল; পারিল না। আর দুইটা লোক প্রফুল্লকে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। প্রফুল্ল চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ডাকাতের নৌকা প্রফুল্লকে লইয়া চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ মাঝিকে ডাকাতরা স্পর্শই করে নাই। ডাকাইত চলিয়া গেলে গঙ্গাধর বলিল—"রাধানাথ উপায় কি?"

রাধানাথ গঙ্গাধরের হাত পায়ের বাঁধ খুলিতে খুলিতে বলিল—"মনে পাপ ছিল, তাই এই অঘটনটা ঘটিল দাদা ঠাকুর।"

———

পল্লী-বন্দনা।

(১)

পূর্ব্ব-গগন শুভ্র-আলোকে চির-উষা যবে জাগে,
কুঞ্জে কোথায় বিহগকুল গাহে কার প্রেম রাগে!
অবাক্ ফুলের অবাক্-গন্ধে কাহারে স্বর্গ মানি!
কবি-বন্দিতা চির-নন্দিতা সে যে গো পল্লীরাণী!

(২)

মেঘেরা মাদল বাজায়ে কাহারে সিনান্ করাতে আসে!
নদী-পথে কোথা কলসী কাঁকালে বধূরা মধুর হাসে!
কে গো সে রূপসী 'বৌ-কথা-কও' কহে যারে মধু-বাণী।
কবি-বন্দিতা চির-নন্দিতা সে যে গো পল্লীরাণী!

(৩)

কোথায় বাতাসে ঘুম ভেসে আসে পরীদের দেশ থেকে!
কার সুষমায় হিংসুক পাখী 'চোখ গেল' মরে ডেকে!
দোয়েল কোথায় শিস্ দিয়ে দিয়ে করে অত কাণাকাণি!
কবি-বন্দিতা চির-নন্দিতা সে যে গো পল্লীরাণী।

(৪)

খঞ্জন কোথা রঞ্জনে' হিয়া, বুল্‌বুল্ গাছে নাচে!
সকালে বিকালে মরাল কাহার জলে গান গেয়ে বাঁচে!
জ্যো'সনা-বসনে আবরি' শরীর কেগো টানে প্রাণখানি
কবি-বন্দিতা চির-নন্দিতা সে যে গো পল্লীরাণী!

(৫)

ঘুঘু-সঙ্গীতে মনে পড়ে কোথা অতীতের কথা খালি!
কাহারে হেরিতে দেবতারা নভে জাগে তারা-আলোজ্বালি
ঘাটে মাঠে কার কুঞ্জে বসিলে দূরে যায় শত গ্লানি!
কবি-বন্দিতা চির-নন্দিতা সে যে গো পল্লীরাণী!

(৬)

'কুহু'-তানে কোথা মুহু-মুহু প্রাণ কি জানি কেন যে কাঁদে?
ষড়ঋতু কারে সাজায়ে হরষে চরণে পড়িয়া সাধে!
কারে না সেবিলে সকলি মিথ্যা, জীবন ব্যর্থ মানি!
কবি-বন্দিতা চির-নন্দিতা সে যে গো পল্লীরাণী!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

কপোত।

কপোত শব্দটী যোগারূঢ়; ক—বায়ু—পোত—নৌকা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদগণ বলেন মিসরের পঞ্চম রাজবংশের সময় হইতেই কপোত মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং খৃষ্ট শকের চতুঃসহস্র বৎসর পূর্ব্বে কপোত জাতি মনুষ্য সমাজে সাহচর্য্য লাভ করিয়াছে বলিয়াই তাহারা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার আরও পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণের সময়েও এক্ষুদ্র কপোত জাতি যে সমাদরে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহারও প্রমাণ বিরল নহে।

আর্য্য দেশ হইতে বহুবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান যেমন ইউরোপ খণ্ডে গিয়া সমাদর ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে এই ক্ষুদ্র পারাবত কুলও সেইরূপ আর্য্যদেশ হইতে নীত হইয়া তথায় মনুষ্যের বহু প্রয়োজন সাধন ও নানারূপ আকৃতিগত সৌন্দর্য্য লাভ দ্বারা অর্থাগমের পন্থা সুপরিষ্কৃত করিয়াছে।

প্রকৃতির প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহা হইতে প্রয়োজন সাধন ও অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন প্রথা ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। কুকুর যেরূপ শিকারে, প্রহরীর কার্য্যে, লোকানুসরণে ব্যাপৃত থাকিয়া মনুষ্যজাতির প্রভূত উপকার সাধন করিয়া থাকে এবং নানা জাতীয় কুকুরের সহিত সংমিশ্রণ দ্বারা যেরূপ নানা প্রকার বলিষ্ঠ ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত সারমেয় জাতির উৎপত্তি করিয়া থাকে তদ্রূপ পারাবতও ইহাদের নানা প্রকার শারীরিক সৌন্দর্য্য বিকাশের দ্বারা ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে বার্ত্তা বহন দ্বারা বিপন্ন পরিবারের ও দেশের নানা উপকার সাধন করিয়া মনুষ্যের নিকট অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ভাজন ও সমাদৃত হইয়াছে। ভারতে এই গুণ গ্রাহিতা ও অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির অভাবে ক্রমে ইতর প্রাণী হইতেও যে উপকৃত হওয়া যায় এইজ্ঞান ভরতবাসীর এখন প্রায়ই নাই।

অরণ্যে কপোত জাতীয় নানাপ্রকার পাখীই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ঘুঘু, হুড়মা, হরিতাল ইত্যাদি।

আবার নির্জন মনুষ্যবাসেও একপ্রকার পারাবত

দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে লক্ষ্মীপায়রা বা আশালী কপোত বলে। এই জাতীয় কপোত ভারতের নানা স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বিভিন্নপ্রকার জল বায়ু বর্ত্তমানেও ইহাদের মধ্যে কোথাও বর্ণ বৈষম্য দেখা যায়না; সকল কপোতই এক-বর্ণে রঞ্জিত। ভারত বাসী কপোত প্রতিপালকগণ এই বর্ণকে "হরা" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। গৃহপালিত পারাবত নানা বর্ণ ও নানা প্রকার মনোহর আকৃতিতে ভূষিত দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় বিভিন্ন আহার এবং নানাবর্ণের ও আকৃতির সংমিশ্রনেই নানাপ্রকার মনোহর বর্ণের উদ্ভব হয়। ইহাই মনোহর আকৃতি উৎপত্তির মূলীভূত হেতু। ইউরোপ খণ্ডে জীবজন্তুদিগের বৈজিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়া বর্ণের সংমিশ্রন প্রণালী দ্বারা নূতন আকৃতিতে পরিণত করিবার কৌশল, গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার ফলে সুরঞ্জিত ও সুগঠিত কপোত জাতির উৎপত্তি হয় এবং তাহা ভারতে এবং নানাদেশে প্রেরণ করিয়া ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ প্রচুর অর্থোপার্জ্জন ও নিজেদের নানা প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিতেছে। তথায় ব্যবসায়ীগণ মেষের লোমের ব্যবসা করিয়া কোটী কোটী টাকা লাভ করিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে বহু মেষ প্রতিপালিত হইলেও তাহাদের লোম দ্বারা যে অর্থাগম হইতেপারে সে ধারণা অনেকেরই নাই। দিন দিন ভারতে ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবে দারিদ্র্য প্রভৃত পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এখন নূতন উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা নূতন নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না হইলে আত্মরক্ষা বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইবে।

আরণ্য কোন্ জাতীয় পাখীহইতে এই কপোত জাতীর মূল আহৃত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সাধারণতঃ এই কপোত শ্রেণীকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। কতগুলি কেবল দর্শন সুখ উপভোগের জন্য প্রতি পালিত হইয়া থাকে, আর কতগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে বার্ত্তা বহন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া মনুষ্যের বিপন্নাবস্থায় সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লক্কা, মুগী, গলাফুলা, জাকোবীন, সিরাজী, আউল, মুনিয়া ইত্যাদি সৌন্দর্য্যের জন্যই প্রতিপালিত হইয়া থাকে এবং ইহাদের সৌন্দর্য্যের তারতম্যানুসারে মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বর্ণ মিশ্রনের ফলাফল ও আকৃতি গঠন-প্রথা আমাদের জ্ঞাত থাকিলে আমাদের অর্থপ্রাপ্তির পন্থা পরিষ্কৃত হইতে পারে। অনুসন্ধিৎসার ফলে ইহাদের আহারদ্বারা ও বর্ণমিশ্রণ দ্বারা নূতন সৃষ্টি করিতে পারিলে বহু অর্থ সমাগমের পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে। অপর কতকগুলি কপোত বার্ত্তাবহ নামে প্রসিদ্ধ। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, পারাবত কুল যেখানে ইচ্ছা আজ্ঞামাত্রই সংবাদ লইয়া চলিয়া-যায়। বাস্তবিক তাহা নহে। জন্মভূমির স্মৃতি ও প্রীতি ইহাদের এই কার্য্যের মূলীভূত কারণ। কপোতদিগকে যেখানে নিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সেইস্থান হইতে অতিক্রত গতিতে নিজের আবাস স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রকৃতির এইতত্ত্ব অবগত হইয়াই মানবগণ ইহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংবাদ বহন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কথিত আছে ওলন্দাজ বণিকগণ কর্ত্তৃকই পারাবত প্রথম ভারতবর্ষ হইতে ইয়োরোপে নীত এবং যুদ্ধ কার্য্যের সংবাদ বহন কার্য্যে নিয়োজিত হয়। হইলেও ১৮৭০—৭১ খৃঃ অব্দে যখন ফ্রাঙ্কো জর্ম্মান যুদ্ধ হয় তখন হইতেই যে যুদ্ধক্ষেত্রে বার্ত্তা বহনের কাজে পারাবত নিয়োজিত হইয়াছে একথা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন রেলপথ বন্ধ, টেলিগ্রাম শত্রুহস্তে; তখন ফরাসীগণ আকাশ পথ উন্মুক্ত দেখিয়া এই কপোত কুলদ্বারা বার্ত্তা-বহনের কার্য্য করাইয়াছিলেন।

পারস্য বা বোগদাদ, কপোত, ড্রাগোরে, লেজোয়া, আভাবসোরা এই চারি জাতীয় কপোতকুল দ্বারা শঙ্কর জাতি উৎপাদন হইয়া থাকে। ইহারাই সংবাদ বহন কর্য্যে নিয়োজিত হয়। ইউরোপ খণ্ডে ইহাদের রীতিমত জন্মতালিকায় বংশাবলির গুণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমার বোধ হয় সুদক্ষ বিলাতী কপোত গণ যে যে গুণের আধিক্যে এই বার্ত্তা-বহনকার্য্যে সমর্থ হয় গিরাবাজ পায়রাদিগের মধ্যেও সেই গুণের পরিমাণ অল্প নহে। কিন্তু ভারতে এই বার্ত্তাবহন প্রথা একে-বারেই অপরিজ্ঞাত। সুতরাং এদেশে গিরাবাজ পায়রা গুলিকে কেবল উড়াইয়া আমোদ উপভোগের জন্যই

ব্যবহৃত হয়। উড্ডীনশীল গিরাবাজ নানাস্থানে পাওয়া গেলেও সাহাবাজপুর, রামপুর, মুর্সিদাবাদ ও ঢাকার পারাবতই উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সাহাবাজপুরের হর বর্ণের অর্থাৎ লক্ষী পায়রা গুলিকে হরা বলে। রামপুরে কাগজী অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাদাবর্ণ, মুর্শিদাবাদে চুনিয়া অর্থাৎ চক্ষু কালবর্ণ হইয়া সমস্ত শরীর সাদা এবং ঢাকার ধূসর বর্ণের পায়রাকে খাকি বলে। কপোতজাতির মধ্যে অন্য বর্ণের পারাবত অপেক্ষা ঐ সমুদয় বর্ণের মূল্য অধিক। কপোতের প্রতিপালক দিগের নিকট যেমন ইহাদের শারীরিক বর্ণ সমাদর লাভ করিয়াছে ইহাদের চক্ষুর তারকা তদপেক্ষা অল্প আদৃত হয় বলিয়া মনে হয় না।

সাধারণতঃ তিন প্রকার চক্ষুর নমুনা দেখা যায়; মতিচুর, আনারদানা ও জারচা। যাহার চক্ষে অতি ক্ষুদ্র কালচিহ্ন চতুর্দ্দিকে মৌক্তিক বর্ণদ্বারা গোলক পরিবেষ্টিত তাহাকে মতিচুর বলে এবং যাহার ঐ শুভ্র বর্ণের গোলকের মধ্যে লাল বিন্দু সুশোভিত তাহাকে আনারদানা এবং যাহার চক্ষু গোলক কেবল লালবর্ণে রঞ্জিত তাহাকে জারচা বলে। পক্ষীজাতি মাত্রই দেখা যায় যে নীড়ে শাবক উৎপাদন করিয়া আহারান্বেষণে বহুদূর গমন করিয়াও অভ্রান্তচিত্তে আবার নিজ আবাস স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। কপোত জাতির মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর এই শক্তি অত্যধিক পরিমাণে পরিস্ফুট। জন্মভূমির প্রতি, প্রীতি, দাম্পত্যপ্রেম, দূরদর্শন, স্মৃতিশক্তি, আহার্য্য দ্রব্যে অত্যাসক্তি প্রভৃতিগুণ সর্ব্বশ্রেণীর পারাবতে দেখাগেলেও শ্রেণীবিশেষে তাহার আধিক্য দেখা যায়। যাহাদের এই সমুদয় গুণ অধিক রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহারাই বার্ত্তাবহন কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়া থাকে। জন্মভূমি হইতে অনেকদূরে নিয়া ছাড়িয়া দিলেও আকাশের উচ্চস্থান হইতে জন্মভূমির চিহ্ন দেখিতে পাইলেই দ্রুত গতিতে আসিয়া নিজ বাসস্থানে উপস্থিত হয়। মানবগণ এই শক্তির সন্ধান লইয়াই ইহাদিগকে বার্ত্তাবহন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কপোতজাতি সাধারণতঃ বৎসরে ৯ মাস পর্য্যন্তই অণ্ড প্রসব ও শাবক উৎপাদন করিয়া থাকে। একযোড়া কপোত যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিলে তাহা দ্বারা বৎসরে ৬ যোড়া শাবক প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ষার প্রারম্ভ কাল হইতেই প্রায় ইহাদের পক্ষ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া থাকে। এই সময় ইহারা সন্তান উৎপাদন হইতে বিরত থাকে এবং এই সময় ইহাদের স্বাস্থ্য প্রায়ই ভঙ্গ হইতে দেখা যায়। কদাচিৎ এসময়ে শাবক উৎপাদন হইলেও উহারা অল্পায়ু ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। ইহারা এক সপ্তাহ পর্য্যন্তই গর্ভধারণ করে। তৎপর ক্রমে দুইটী অণ্ড প্রসবকরে, একটী অণ্ড প্রসবের পর ৪৮ ঘণ্টা অন্তর আর একটী অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। অণ্ডগুলি ১৮ দিন তা দিলেই ঐ অণ্ড হইতে শাবক উৎপাদিত হইয়া থাকে। জরায়ুজ জীবজন্তু যেমন মাতৃকুক্ষীতে অবস্থান কাল পর্য্যন্ত মুখদ্বারা আহার গ্রহণ না করিয়া নাড়ীর নালদ্বারা আকর্ষিত রক্ত দ্বারাই দেহের পুষ্টি সাধন করে সেইরূপ অণ্ডজ পক্ষীশাবকও নাড়ীর নালদ্বারা আহার গ্রহণ করিয়াই দেহের উন্নতি লাভ করে; ভগবানের অপার করুণাবলে যেসময় ইহাদের অণ্ডাভ্যন্তরস্থ খাদ্য নিঃশোষিত হইয়া যায় এবং নাড়িরনালী সম্পূর্ণরূপে উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেই সময়ই শাবক শরীর স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করে। ক্রমে এই স্পন্দন ক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া অতি অল্প সময়েই অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইয়া শাবক নির্গত হইয়া থাকে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখাযায় যে অণ্ড বহুল পরিমাণে স্নায়ুরাশি দ্বারা বিজরিত থাকে। সময় সময় কোন কোন কপোতী অতি কোমল অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। অনভিজ্ঞ কপোত প্রতিপালক ইহাকে অকালপ্রসূত বলিয়াই মনে করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। এইরূপ স্থানে ডিম্বের আবরণ শক্ত করিবার জন্য শুষ্কচূণ আহারীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে ডিম্ব শক্ত আবরণে আবৃত ও গঠিত হইয়া থাকে। ডিম্ব গঠনের অবস্থায় চূণ পদার্থের অভাব হইলে ঐরূপ কোমল অণ্ড প্রসব করে।

কপোত জাতি আকাশের অতি উচ্চ স্থানে উড়িতেই ভালবাসে। উর্দ্ধগামী পিতামাতার সংমিশ্রণে উৎপন্ন শাবক

ক্রমোন্নত লাভ করিয়া থাকে। আকাশের নীচের অপেক্ষা ক্রমেই উপরের স্থিরবায়ুতে উড্ডিনশীল পারাবত গুলি যতই উর্দ্ধ গমন করে ততই শ্রমের লাঘবতা অনুভব করে। এই জন্য ইহারা ২।১বার উর্দ্ধে গমনে অভ্যস্ত হইলেই আর নীচে থাকিতে ইচ্ছা করেনা। অভ্যস্ত পায়রাগণ অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই মনুষ্যের দৃষ্টি শক্তির বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে। দ্রুত গমনে তাড়িত বার্ত্তাবহও ইহাদের নিকট যেন পরাভূত। সুদক্ষ পারাবত-গুলি একদিনে ৬।৭ শত মাইল পর্য্যন্ত যাইতে পারে। ৩০০।৪০০মাইল পর্য্যন্ত অনায়াসেই যাইতে পারে। শুনাযায় একদা একটী পারাবতকে স্পেন দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, ঐস্থান পারাবতের বাসস্থান হইতে ৯৮০ কিলোমিটার দূরবর্ত্তী (১ কিলোমেটার=১০৯৪ গজ) ঐ কপোতটী ৬ ঘণ্টায় নিজের বাসস্থানে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিল।

মিসর ও সিরিয়া প্রদেশেও পারাবত দ্বারা সংবাদ প্রেরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। সংবাদ প্রেরণের জন্য তাহারা একপ্রকার পাতলা কাগজ ব্যবহার করিত। তাহা পাখীর কাগজ বলিয়াই বিখ্যাত। কিন্তু কাগজে অধিক সংবাদ প্রেরণের সুবিধা হইতনা। কাগজে সামান্য সংবাদ লিখিয়া কপোত-পুচ্ছে বাঁধিয়া দেওয়া হইত, তখন জন্মভূমির প্রবল প্রীতির আকর্ষণে কপোত অতি দ্রুত গতিতে স্বভবনে উপস্থিত হইত। গৃহস্বামী ঐ কপোতের পুচ্ছ হইতে পত্র খুলিয়া সংবাদ জানিতে পারিত। ফ্রাঙ্কো প্রসিয়ার যুদ্ধের প্রাক্কালে পারাবতের এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ঐ ঐ দেশবাসীগণ তাহার উন্নতি সাধনে যত্নশীল হন। তখন কি উপায়ে লঘু ও বহুসংবাদ একত্রে যাইতে পারে তাহার চিন্তায় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মন প্রাণ নিয়োজিত হয়। অভাবই উদ্ভাবনী শক্তির জননী। যখন প্যারিস নগর জর্ম্মান কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ, রেল পথ বন্ধ, তাড়িতবার্ত্তা—শত্রুহস্তে নিপতিত, তখন কেবল আকাশ পথেই পারাবতের সাহায্যে সংবাদ প্রেরিত হইতে পারে এই চিন্তার উদ্ভব হইয়াছিল।

ইহার ফলেই মিক্রো ফটোগ্রাফের সৃষ্টি। এই ফটোদ্বারা এত ক্ষুদ্র অক্ষর হইত যে সে অক্ষর অক্ষরের প্রকৃত আকৃতির $\frac{1}{৮০০}$ ভাগমাত্র হইত। জিলেটীন ও পটাসীয়মের ব্রোমাইডের পাত দ্বারা প্লেট প্রস্তুত করিয়া তাহাই ব্যবহৃত হইত। ঐ পাত তুলিয়া লইলে তৎক্ষণাৎ আপনি গুটাইয়া যাইত। এইরূপ ১৫।১৬ খানি প্লেট একত্র করিয়া একটী কলমের চুঙ্গীর মধ্যে ভরিয়া কপোতের পুচ্ছে বাঁধিয়া দেওয়া হইত। পুচ্ছের মধ্য যে পক্ষ স্বচ্ছ ও নূতন উদ্গত দৃঢ় বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাতে ঐ পেনের চুঙ্গী শক্ত সূত্র দিয়া বাঁধিয়া দিত। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংবাদবাহী কপোত উপনীত হইলে তাহার পুচ্ছ হইতে ঐ চুঙ্গী খুলিয়া লইয়া এমোনিয়ার জলে ডুবাইয়া প্রবল অনুবীক্ষণ যন্ত্র যোগে উহা পঠিত হইত। এইরূপ ১৬ খানা বড় পত্রে যত সংবাদ ধরে ২০ খানা প্লেটে তদপেক্ষাও অধিক সংবাদ প্রেরিত হইত। এই ২০ খানা প্লেটের ওজন ১৫½ গ্রেনের অধিক হইত না।

সকল বিষয়ই শিক্ষা সাপেক্ষ। যদিও বংশের গুণানুসারে উচ্চে আরোহন ও দূরদেশ হইতে আগমন করা কপোতের স্বাভাবিক শক্তি তথাপি কিয়ৎ পরিমাণে ইহা শিক্ষা সাপেক্ষ। সদবংশজ কপোতগুলি স্থান সম্বন্ধে কখনও ভুল করেনা। তাহারা সংবাদ নিয়া আসিয়া তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে। তখন গৃহস্বামীকে সংবাদ গ্রহণ জন্য কপোতের নিকটবর্ত্তী হইতে হয়। সাধারণ কপোতের পক্ষে তাহা হয় না, তাহারা প্রায়ই সঙ্কেত স্থানের গোলমাল করিয়া থাকে।

ভারতবাসী কপোত পালকগণ পারাবতদিগের বসিবার জন্য একটী ছত্রি প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকে। ঐ ছত্রিতে কয়েকটী পুরাতন কপোত বসাইয়া দুই চারিটী অল্প বয়স্ক নূতন শিক্ষার্থী কপোত রাখিয়া আহার দিয়া ডাকিলেই নীচে আসিতে অভ্যস্থ হয় এবং এইরূপ অভ্যস্থ হওয়ার পরে পুরাতন পারাবত উড়াইয়া দিলে যখন উহারা নীচে আসিতে থাকে তখন নূতন শিক্ষার্থী কপোতদিগকে ছাড়িয়া ঐ সঙ্গে উড়াইয়া দিলে উহাদের ছত্রিতে বসা অভ্যাস হয়। এইরূপ নূতন পারাবত অভ্যস্থ হইলে ক্রমে ক্রমে পুরাতন পারাবতের সংখ্যা হ্রাস করিয়া কেবল নূতন গুলি উড়াইয়া অভ্যাস করিতে হয়।

অল্প বয়স্ক পারাবত সুশিক্ষিত হইলেও ইহাদের আসঙ্গ লিপ্সা এত প্রবল হয় যে দূরে অন্য পায়রা দেখিয়া দৌড়াইয়া যায় এবং তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া উড়িতে থাকে। ইহার পরে ক্রমে দূর হইতে আসার অভ্যাস করাইতে হয়। এই শিক্ষার সময় দূরে যে খাচায় করিয়া নেওয়া হয় তাহা সম্পূর্ণ আবরণহীন করিয়া রাখিতে হয়। কারণ যাইবার সময় যাহাতে উহারা বৃক্ষাদি ও অন্যান্য চিহ্নগুলি দেখিয়া পথের স্মৃতি মনে জাগাইয়া রাখিতে পারে। প্রথম প্রথম দূর হইতে আসিবার জন্যও কয়েকটী পুরাতন পায়রা সঙ্গে রাখাই সুবিধাজনক। অভ্যস্ত হইলে আর পুরাতন কপোত রাখার আবশ্যক হয়না। ক্রমে ক্রমে এইরূপ দূরত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। এইরূপে ক্রমে সংবাদ বহন কার্য্য শিক্ষা দিতে হয়।

পারাবতের ভোজ্যস্থলীতে দুই একদিনের আহার সঞ্চয় রাখিতে পারে। আহারের পর প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কৃত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জলপানের অল্পতা হইলে ভোজ্যস্থলীতে নানাপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। সপ্তাহান্তে ইহাদের স্নানের ব্যবস্থা করা দরকার। বর্ষার জলে, ভিজিতে দিলে পক্ষ পরিবর্ত্তন অতি সুচারুরূপে সত্বর সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীশিবকৃষ্ণ সিংহ।

মানব জীবন।

শাস্ত্রে বলেন যে মানব জন্মের মত দুর্লভ জন্ম আর নাই। স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা। নারকীরা অর্থাৎ নরকবাসী দুঃখার্ত্ত প্রাণীগণ এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যকযোণিতে জাত জীবগণত এই মনুষ্য দেহ কামনা করেই, স্বর্গবাসী দেবদেহধারী ভোগসুখের আতিশয্যপ্রাপ্ত পুরুষগণও এই দেহ প্রার্থনা করেন। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে জীব তাহার কর্ম্ম অনুসারে লক্ষ লক্ষ দেহ ধারণ করে। তন্মধ্যে অনেক প্রকার দেহ পাপজনিত দুঃখভোগের জন্যই গ্রহণ করিতে হয়। অনেক প্রকার দেহ পুণ্যজনিত সুখাতিশয্যসম্ভোগের সুবিধার জন্য লাভ হয়। কিন্তু সকল প্রকার দেহ অপেক্ষা মনুষ্যদেহ উৎকৃষ্টতম। হিন্দুশাস্ত্র নানাভাবে নানাভাষায় এই কথাটী জোর করিয়া বলা হইয়াছে। শুধু হিন্দুশাস্ত্রে কেন, অন্যান্য ধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থেও এই সত্যটী স্বীকৃত হইয়াছে। খৃষ্টান শাস্ত্রের মতে মানুষকে ভগবান্ তাঁহার নিজের ছাঁচে গঠন করিয়াছেন এবং তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমপুত্র মানুষদেহ গ্রহণ করিয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহুদী ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেই মানুষকে এইরূপ শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হইয়াছে।

ইহার উদ্দেশ্য কি? কেন মানুষ শুধু অন্যান্য প্রাণী হইতেই শ্রেষ্ঠ নয়, দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ? কেন মানুষ দেহ দেবতারও আকাঙ্ক্ষণীয়? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্‌শ্রীকৃষ্ণউদ্ধবকে বলিয়াছেন— সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যাং উভয়ং তদসাধকম্। মনুষ্যদেহেই জ্ঞান ও ভক্তির সাধন হয়, স্বর্গীয় বা নারকীয় দেহে তাহা হয় না। নারকীয় দেহের কথা, তির্য্যকদেহের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্, কারণ সে সব দেহে আহার নিদ্রা মৈথুনাদিজনিত যৎকিঞ্চিৎ সুখ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু দুঃখের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, এবং তাহা কাহারও ঈপ্সিত নয়। কিন্তু জীব পুণ্যবলে যে দেবদেহ লাভ করে, তাহা সুখভোগেরই উপযুক্ত দেহ। তাহাতে এত অধিক সুখভোগের শক্তি এবং উক্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে মানুষ তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে না। কিন্তু তথাপি শাস্ত্র বলিতেছেন যে দেবযোনি হইতে মানবযোনি উৎকৃষ্টতর। সুখভোগের প্রচুর উপকরণ লাভ করা এবং সেই পরিমাণে ভোগের সামর্থ্য প্রাপ্ত হওয়া যদি জীবের সম্যক্ কল্যাণ বা কল্যাণের পথ হইত, তবে দেবতা অপেক্ষা মানুষ বড়, একথার মিথ্যাত্ব বলা মাত্রই প্রমাণিত হইয়া যাইত। কিন্তু কোন শাস্ত্রই সুখভোগকে জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ বা পুরুষার্থ বলে না। মানুষের অভিজ্ঞতা সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেয়। মানুষ কখনও ভোগে তৃপ্ত হয় না। মানুষের ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ বহির্মুখ হওয়ার দরুণ মানুষ প্রথমতঃ ভোগের জন্যই চেষ্টা করে। মানুষ ভোগের দ্বারা তৃপ্ত

হইবার উদ্দেশ্যে কত রকম প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, কতপ্রকার পন্থার উদ্ভাবন করিয়াছে, কখনও স্বতন্ত্রভাবে, কখনও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কতপ্রকার পথে ছুটিয়াছে, মানব ইতিহাস তাহার পরিচয় দিয়াছে। এই সব উপায়ে সুখ যে মানুষ পায় নাই তাহা নয়, মানবদেহে মানব সমাজে যতপ্রকার সুখভোগ সম্ভব, মানবের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহা আবিষ্কার করিয়া তাহাকে ভোগ করাইয়াছে ও করাইতেছে। সুখভোগ মানব অনেক করিয়াছে, কিন্তু তৃপ্ত হইতে কখনও পারে নাই। সুখ যদি মানুষের পুরুষার্থ হইত, তবে সুখভোগে সে তৃপ্ত হইত। দেবতা যাহা পাইয়া হাজার হাজার বৎসর মত্ত হইয়া থাকিতে পারে, মানুষ তাহা লইয়া শত বৎসরও তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারে না। তাই উপনিষৎ বলিতেছেন—"ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ।" বিত্ত দ্বারা অর্থাৎ কোন ভোগ সামগ্রীদ্বারা মানুষকে তৃপ্ত করা সম্ভব নয়। মানুষযে ভোগে অতৃপ্ত, ইহা তাহার মহত্বেরই লক্ষণ। মানুষের প্রাণ যে বস্তু চায়, তাহা সুখভোগ অপেক্ষা অনেক বড়। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যে মানুষ বুঝিতে পারে, অন্তরাত্মার বাণী যে শুনিতে পারে, সে সুখভোগে বিতৃষ্ণ হয়, তাই দেবত্বও তাহার আকাঙ্ক্ষণীয় হয় না। দেবতা সুখ ভোগে হাজার হাজার বৎসর মত্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু চিরশান্তি তাহার ভাগ্যে নাই। সে ভোগ ছাড়িতে পারে না, ভোগের শরীরে সে চিরশান্তির পথে অগ্রসর হইবার সুবিধা পায় না। সুতরাং যে দেহে সে বিষয়ে সুবিধা হয়, সেই দেহ তাহার আকাঙ্ক্ষণীয়। সেই দেহই মনুষ্য দেহ। মনুষ্যদেহ সেই চিরশান্তির, সেই আত্যন্তিক কল্যাণের সাধক এবং তাহার সাধন জ্ঞান ও ভক্তি। মানব জীবনে জ্ঞান-ভক্তি সাধনের সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় আছে বলিয়া ইহা উৎকৃষ্টতম জীবন।

এই দুর্লভ মানব জীবনকে সার্থক করিতে হইলে ইহাকে সুখের অন্বেষণে নিয়োজিত না করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্তির সাধনে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট করিতে হইবে।

এই মানব জীবন যেমন দুর্লভ, তেমনি অধ্রুব। শাস্ত্র বলেন—দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্। মানুষ জন্ম দুর্লভ, কেননা ইহা অর্থদ অর্থাৎ পরমার্থপ্রদ। কিন্তু ইহা আবার অধ্রুব। কখন যে পুরুষার্থ সাধনের প্রধান অবলম্বন এই দুর্লভ জীবনের অবসান হইবে তাহা অনিশ্চিত। সুতরাং ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করিতে নাই। যখন এই বোধ জন্মিল যে আমি মানব জীবনরূপ অতুল সম্পদ লাভ করিয়াছি, তখন হইতেই জ্ঞান ভক্তি সাধন রূপ সদ্ব্যবহারে ইহাকে নিয়োজিত করা প্রয়োজন।

যে তাহা না করিয়া ভোগের জন্য ইহাকে নিযুক্ত করে, সে উজ্জ্বল রত্ন পাইয়া তাহাকে দর্পন রূপে ব্যবহার করে, সে বৃক্ষ চূড়ায় আরোহণ করিয়া স্বেচ্ছায় ভূমিতলে পতিত হয়। শাস্ত্র তাহাকে বলিয়াছেন আত্মহা অর্থাৎ আত্মহত্যাকারী, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের মনুষ্যত্বের বিনাশ সাধন করিয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।

মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ এই কথাটাই ভাল করিয়া বুঝিয়া সংস্কারে পরিণত করিতে হইবে যে আমি মানুষ, আমি একটি বিশেষ দায়িত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে দায়িত্ব আমার নিজের কাছে, মনুষ্য সমাজের কাছে এবং সর্ব্বোপরি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের কাছে তদনুসারে এই জীবনকে সার্থকতার দিকে লইয়া যাইতে আমি বাধ্য এবং তত্বজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি লাভের নিমিত্ত পৌরুষ অবলম্বনেই ইহার সার্থকতা। বাল্য জীবনে এই কথাটী দৃঢ়রূপে যাহাতে হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, ভবিষ্যৎ জীবনে কার্য্যক্ষেত্রে যাহাতে আপনা হইতে চেষ্টা সেই দিকে ধাবিত হয়, তদনুরূপ শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকতাব্রত-ধারী মনুষ্যের অন্যতম কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ মানব জীবনের এই দায়িত্ব জ্ঞানের ভিত্তর উপর দুইটী স্তম্ভ গাঁথিয়া উঠাইতে হইবে একটী সত্যনিষ্ঠা, দ্বিতিয়টী বিচার। এই দুইটী ব্যবহারিক জীবনের মূল সূত্র। বিচারের দ্বারা যখন সেটীকে সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইবে, তখন তাহাতে এমন ভাবে লাগিয়া যাইতে হইবে যেন ফলাফল চিন্তারূপ পাটওয়ারী বুদ্ধি আর তাহার গন্তব্য পথের অন্তরায় না হইয়া দাঁড়ায়; যেন সেই সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে দ্বিধা বোধ না হয়। আবার বিচার দ্বারা পূর্ব্বের কোন কর্ম্মকে যদি ভ্রান্তি জনিত বলিয়া জানা যায়, তখন তাহা

প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রথম কথাটী যদি হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, যদি এটুকু প্রাণ দিয়া বুঝা যায় যে সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি, যশ অপযশ, এমনকি বাঁচা মরা ও আমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়, বিবেচনার বিষয় ও নয়, আমি মানুষ এবং আমার লক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি, সুতরাং তাহার পথে আমি চলিতেছি কিনা এই টুকুই আমার বিবেচনার বিষয়,—তাহা হইলে সত্যের অনুরোধে দুঃখ-অপমান, এমন কি মরণ আলিঙ্গন করিতেও ভয় আসিবে না। সত্যের উপরই যে মানুষ জীবনের অই আত্যন্তিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত। "সত্যাৎ পরতরং নাহি" সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অবলম্বন আর কিছু নাই। মানুষের জীবনে মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া পশুত্ব যখন প্রধান হইয়া উঠে, তখন সত্যের জন্য মরণ অপেক্ষা দীর্ঘ জীবনকে বেশী আকাঙ্ক্ষনীয় মনে হয়। যে বীর-বালক ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত আশা ভরসা বিসর্জ্জন করিয়া সত্যের জন্য পিতার আদেশে স্বেচ্ছায় দহ্যমান জাহাজের মাস্তলের নীচে দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রসন্ন বদনে ভস্মীভূত হইয়া গেল, তাহার জীবন সেই এক মুহূর্ত্তে যত খানি সার্থক হইল, সে তখন সত্যভঙ্গ করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে নেপোলিয়নের মত বহু দেশ জয় করিয়া বহু যশ অর্জ্জন করিয়াও ততখানি সার্থক করিতে পারিত না।

বৃষশ্চতুষ্পাদ্ ভগবান্ ধর্ম্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।

বৃষরূপী ভগবান্ ধর্ম্মের চারি পাদ এবং তিনি সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।

ব্যবহারিক জীবনে সত্য ও বিচার ঠিক থাকিলে এই দুই স্তম্ভের উপর পরিমার্থিক জ্ঞান ও ভক্তির সৌধ নির্ম্মিত হইয়া মানব জীবনকে চরম কৃতার্থতার শোভায় শোভিত করিবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃতজ্ঞতার মূল্য।

সদ্য পত্নীহারা শৈলেশ ডাক্তার শোকে ও দুঃখে একেবারে মৃয়মান হইয়া পড়িয়াছিল। নিকটে বসিয়া সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতে ছিলাম বটে, কিন্তু সে প্রবোধের বাক্যগুলিতে তাহার অন্তরের ঘা ঢাকিতে ছিল না, ঢাকিতে পারেও না। দুই একটা সান্ত্বনা বাক্যের পরেই আমি একটু উৎসাহের ভাবে বলিলাম "পুরুষের পত্নী বিয়োগে এত দুঃখের বিষয়ইবা কি আছে ভাই? ছেলে মেয়ে থাকিলে সে অবশ্য একটা মস্ত ক্লেসাদের কথা এবং বিপদের বিষয় হইত। তবে হাঁ পোষা পাখীটা মরিয়া গেলেও মনে কষ্ট হয়—আর এতো কলিজার অর্দ্ধেকটা যেন ছিঁড়িয়া গেল। যাক্, পুরুষের মনের দৃঢ়তা সর্ব্বদাই দরকার—

একটা দীর্ঘ নিশ্বাসে মর্ম্মান্তিক বেদনা ঝাড়িয়া ফেলিয়া শৈলেশ আমার এই কথার উত্তর দিল। শৈলেশ বলিল—"প্রবোধ দিবার বিষয় কি আছে ভাই! মৃত্যু সেতো সকলেরি হইবে, হইতেছেও সর্ব্বদা; যাহা জীবনের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা—চক্ষের সম্মুখে আমাদেরই হাতে নিত্য কত ঘটিতেছে—ঘটাইতেছি, সে সম্বন্ধে প্রবোধ বাক্য নিষ্প্রয়োজন। তবে দুঃখ এই নিজে ডাক্তার হইয়া একটা ভোজ দিবার অবসর পাইলাম না—একবার ভাল করিয়া দেখিবার—পরীক্ষা করিবারও ফরসুত জুটিল না—ইহার অধিক মর্ম্মান্তিক দুঃখ আর কি হইতে পারে?"

আমি বলিলাম—"সেতো কথাই; কিন্তু ওতেও ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। প্লেগ—সাক্ষাৎ সমন; ভোজ তুমি ইহার কি দিবে শৈলেশ? "এ যে তোমাদের ফার্ম্মোকোপিয়ার জুরিশ্ ডিক্সনের বাইরের ব্যারাম! তোমাদের ভোজে যদি সারিতো তাহা হইলে আর ডাঃ ঘোষের বংশটা নিপাত হইয়া যাইত না, হারাধন ডাক্তারেরও কাল এই সর্ব্বনাশ হইত না।"

শৈলেশ আমার উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিবার ভাবে ছিল না; হঠাৎ আমার মুখে হারাধন ডাক্তারের বিপদের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিল—"হারাধন বাবুর কথা কি বলিলে? তাঁহার আবার কি?

আমি বলিলাম—"কেন, শুননাই? তার বড় ছেলে অতুলবাবু পরশু রাত্রে প্লেগে মারা গিয়াছে! ছোট মেয়েটীরও প্লেগ হইয়াছে।"

শৈলেশ ইজিচেয়ারে বসা ছিল, একেবারে উঠিয়া গিয়া আলনা হইতে কাপড় লইয়া বদলাইতে আরম্ভ করিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন কোথায় যাইতে চাও—এই সময়।"

"একবার হারাধন বাবুর বাড়ী যাইব। বিকালটায় তুমি একবার এদিকে আসিও।" এই সংক্ষেপ উত্তর দিয়া শৈলেশ বাহির হইয়া গেল।

স্কুল ছুটী হইলে শৈলেশের বাসায় গিয়াছিলাম। তাহাকে পাইলাম না। বেহারা বলিল—"তিনি বারটায় আসিয়া স্নান-আহার করিয়া পুনরায় চলিয়াগিয়াছেন।"

সন্ধ্যার পর গিয়া শৈলেশকে পাইলাম। শৈলেশ তাহার উপরের বারান্দায়—ইজিচেয়ারেই চিৎ হইয়া শুইয়া উদাস ভাবে সিগারেট টানিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কখন আসিলে, আমি ছুটির পর আসিয়াছিলাম—সেখানে কেমন দেখিয়া আসিলে?"

শৈলেশ সংক্ষেপে উত্তর করিল—"সন্ধ্যায় আসিয়াছি, অবস্থা বিশেষ ভাল নয়।"

"সারাদিন সেখানে কি করিলে? এখন তোমার একটু শান্তির দরকার তো—...।"

"সে খানে থাকিবো বলিয়াই গিয়াছিলাম; ভদ্র লোক বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন—বিশ্রাম করিয়া পুনরায় যাইব মনে করিতেছি।" কথা বলিয়া শৈলেশ উদাস দৃষ্টিতে আমারদিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম—"তোমার এ সময়ে—মানসিক এই অবস্থায় রাত্রি জাগরণ—দৌড়াদৌড়ি—এগুলি ভাল মনে করি না।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শৈলেশ বলিল—"এ কার্য্যে শান্তি পাইব বলিয়াই গিয়াছি—শান্তি পাই নাই, একথা বলিতে পারিব না। নিজের ঘরে যাহা করিতে অবসর পাই নাই ভগবান যদি সে রূপ অবসর পরের উপরেও দেন—সুযোগ জীবনকে ধন্য করিবে...।"

আমি বলিলাম—"ডাক্তারের পক্ষে একথা অ... কথা। ইচ্ছা থাকিলে তোমাদের এ অবসরতো ... কিন্তু মানসিক অবস্থা এখন তোমার ভাল নয় বলিয়া..."

আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া শৈলেশ ... —"ওতে মনের অবস্থা ভাল হইবে বলিয়াই আ... করিতেছি—যদি রোগী রক্ষা পায়। অন্ততঃ অনেকটা সান্ত্বনা যে পাইয়াছি সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই।"

শৈলেশের কথার বিশেষ অর্থ গ্রহণ আমি করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম—"হইতে পারে, সে তুমি জান!"

ইহার পর আমরা উভয়ই অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। আমার নিকট তাহার কথা গুলি প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছিল। স্ত্রী বিয়োগের পর রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই যে সেই সদ্য-ক্ষত হৃদয় লইয়া যাইয়া সারা দিন-রাত পরের বাড়ীতে প্লেগ রোগীর পরিচর্য্যা করা—বিশেষ নিজে ডাক্তার হইয়া—রবাহুত ভাবে—হউক না কেন রোগ আর এক ডাক্তারের বড়ীতে—সে আমার নিকট কিছুতেই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতেছিল না। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি বলিলাম—"কৈ হারাধন বাবুকে তো তোমার স্ত্রীর ব্যারামে আসিতে দেখি নাই; আসিয়াছিলেন কি?"

শৈলেশ আমার কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিল—ভাই বিপদ কাহারও বসিয়া থাকেনা. সে আইসে, আবার বলিয়া যায় কিন্তু সে যে পরীক্ষায় মানুষকে ফেলিয়া যায়, সেই ভীষণ পরীক্ষাই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা—বন্ধুরপরীক্ষা—এক দিন এই রূপ পরীক্ষার ভিতর দিয়া কালোকে আমি পাইয়া ছিলাম—সে অনেক দীর্ঘ কাহিনী...।

শৈলেশের স্ত্রীর ডাক নাম ছিল "কালো।" তাহার স্ত্রীর নামের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ জড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সে আর কথা কহিতে পারিল না। খানিক ক্ষণ উর্দ্ধদিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"ভাই, কালো কাল ছিল সত্য কিন্তু তার প্রাণটা ছিল, অতি সাদা, অতি মুলায়েম—।"

আমি বলিলাম—"সেকি আমরা দেখিনাই।"

শৈলেশ বলিতে লাগিল—সে আখ্যায়িকা তোমরা যদি শোন, দেখিবে—সে এক খানা জীবন্ত করুণ রসাত্মক কাব্য—...।"

শৈলেশের ইচ্ছা যেন সে এখনই আমার নিকট তাহার মৃত পত্নীর সুদীর্ঘ কাহিনী বলিয়া তাহার হৃদয়ের গুরুভার কতক পরিমাণে লাঘব করিয়া লয়। আমি তাহার মনের ভাব এইরূপ অনুমান করিয়া লইয়া বলিলাম—"সে কথা কি তুমি এখন বলিতে ইচ্ছা কর?"

"বলিতে পারিলেই যেন আমার বুকটা পাতল হইত। ...রর কথা অবশ্যি, তথাপি যেন বন্ধু বান্ধবকে আজ হৃদয় ...দিয়া তাহাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

আমি সাগ্রহে বলিলাম—"বেশ তো, যাহাতে তোমার প্রাণের ভিতর শান্তি পাও, তাহাকর। আমার অবসর যথেষ্ট, ছেলেদের কতগুলি Exercise দেখার বাকী—তা বরং কাল প্রাতে স্কুলের পূর্ব্বে দেখিব।"

শৈলেশ বলিল—"তুমি যদি শোন, তবে তাহা বলিতে আমাকে বেশী কিছু বেগ পাইতে হইবে না, আমার ডাইরিতেই তা লিখিত আছে—তুমি নিজেও পড়িতে পার। দ্বিপ্রহরে আমিয়া সেই গুলি পড়িয়া চিহ্নদিয়া রাখিয়াছিলাম—" বলিয়া শৈলেন তিন খানা বাঁধা খাতা আমার সম্মুখে রাখিয়া তাহা হইতে এক খানা খুলিয়া ধরিয়া বলিল—পড়! একটু পূর্ব্বদিক হইতেই পড়; শুনিলে আমার নিজের মনেও একটু শান্তি পাইব।"

আমি শৈলেশের ইঙ্গিত মত তাঁহার চিহ্নিত অংশ গুলিই কেবল পড়িয়া যাইতে লাগিলাম। সে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় অংশ পাঠ হইলেই বলিত "তার পর পড়।"

* * *

২১ অগ্রহায়ণ, বুধবার—বাড়ী হইতে বাবা লিখিয়াছেন হারাধন বাবুর পরিবারের সহিত তোমার এরূপ ঘনিষ্ঠতা আমি একেবারেই পছন্দ করিতেছি না। কোন পিতাই তাঁহার কোন পুত্রকে কোনরূপ উশৃঙ্খলতার পথে যাইতে দিতে ইচ্ছা করেন না। ক্লাস পরীক্ষার পর তুমি বাড়ী চলিয়া আসিবা। বাড়ী আসিয়া পরে যেখানে খুসি যাইও। * * *

২৩ অগ্রহায়ণ শুক্রবার। বউ দিদির চিঠি পাইলাম, তিনি লিখিয়াছেন—ঠাকুর পো, শুনিলাম তুমি নাকি লভে পড়িয়া পেয়েনো বাজুনিয়া এক পরীর পাছ ধরিয়াছ! এ যে একটা নুতন কিছু—সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। বাস্তবিক আমাদের মত ঘোমটা পড়া বউ কি তোমাদের মত সহরে ডাক্তার সাহেবদের মন যোগাইতে পারিবে? অবশ্য বাড়ীর কাহারও মত হইবে না, কিন্তু এ পরী পোষিতে হইবে। শুনিলাম তুমি তাঁহাদের সহিত কাশী চলিয়াছ। সেখানেই কি শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইবে? * * ঠাকুরের অমত, তোমার দাদাদের অমত, তবু মনে প্রাণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হউক। • • •

১৭ পৌষ মঙ্গলবার। হারাধন বাবু তাঁহার স্ত্রী, দুই কন্যা—কমলা ও বিমলা, পুত্র সতীশ, বেহারা, মটরু ও আমি—অদ্য সন্ধ্যার ট্রেইনে কাশী যাত্রা করিব। কেন যাইতেছি, বলিতে পারি না। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে বাড়ী যাইব। হারাধন বাবুর বোধ হয় ইচ্ছা—আমার পিতার অসম্মতি হইতে পাছে আমারও ক্রমে মতের বৈপরীত্য দেখা দেয়—সেটা কোন মতে না হইতে দেওয়া। বিমলার আমার প্রতি সহানুভূতি খুব সুস্পষ্ট। সতীশেরও ইচ্ছা খুব সুস্পষ্ট। কমলার মতি * * আমার মন দুদোল্যমান—একদিকে কিশোরী রূপ, অন্যদিকে পিতার ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি। • • • এ যাত্রার উদ্দেশ্য আপাততঃ বারাণসী দর্শন। * *

১৮ পৌষ বুধবার। বেশ সুন্দর বাড়ী; তেতালায় আমাদের স্থান। নীচে নানা লোকের গোলমাল, এক এক কোঠা এক এক শ্রেণীর যাত্রিকেরা ভাড়া করিয়া আছে। ইহাদের কেহ অন্নছত্রে আহার করে, কেহ নিজে রাঁধিয়া খায়, কেহবা বাড়ীওয়ালী ব্রাহ্মণীর পাকে পয়সা দিয়া আহার করিয়া থাকে। • • • আমরা উপরে বেশ স্ফূর্ত্তিতেই থাকিব। * *

৩০শে পৌষ রবিবার। খুবপ্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিলাম। হারাধন বাবু কিম্বা তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেহই গেলেন না। আমার নিতান্তই সখ হইল, তাই বিনোদ বাবুর সহিত যাইয়া গঙ্গায় ডুবাইয়া আসিলাম। সারাদিন দিলখোস আরাম বোধ হইতে লাগিল। • •

সন্ধ্যায় হারাধন বাবু, তাঁহার স্ত্রী, মধ্যম পুত্র সতীশ, বড় কন্যা কমলা ও আমি একত্র বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। হঠাৎ হারাধন বাবু বলিলেন—"শৈলেশ আমার ইচ্ছা তুমি বিলক্ষণ জান, ওদেরও ইচ্ছা—বিশেষ সতীশের একান্ত জেদ—এক তারিখেই তোমার সহিত বিমলারও বিবাহ হইয়া যায়।" সতীশ বলিল—"এই ১২ তারিখেই হইয়া যাউক; তাতে আর শৈলেশের অমতের তো কোন কারণ নাই। সেতো এক রকম তার মত বলিয়াই দিয়াছে।" গৃহিণী বলিলেন—"আমাদের প্রাণের কামনা কি শৈলেশ জানে না? ওতে তার অমত হইবে কেন? কমলা আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল—সে ইঙ্গিতে আমাকে সম্মতি দিতে বলিল—মুখে কোন কথা বলিল না। অবস্থা বুঝিয়া মনে হইল—ইঁহারা সকলেই এক মতলবে মিলিত হইয়া আমাকে আজ পাকুর করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয় পূর্ব্ব-পরামর্শের ফল। আমি সুবোধ শিশুটীর মত টেবিলের উপরস্থিত সংবাদ পত্রিকা খানার উপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কিছু কাল নীরবে কর্ত্তন করিলাম, তারপর ধীরে ধীরে বলিলাম—"আমার কোন অমত নাই, এবং থাকিতেও পারে না, তবে বাবার চিঠি খানা মাঝ খানে আসিয়া একটা অনর্থ স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা ঠেলিয়া ফেলিবার কোন অজুহাত দেখিতেছি না।" এই বলিয়া আমি আমার গরম কোটের পকেট হইতে ২০শে পৌষের প্রাপ্ত চিঠি খানা হারাধন বাবুর হাতে দিলাম। • • হারাধন বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বেশ ভাল কথা, পিতার সম্মতি না

হয়, না হইবে। উপযুক্ত পুত্র, পিতার মনে আঘাত দেওয়া কদাপি সঙ্গত নহে। দেখিলাম, হারাধন বাবুর মন্তব্যের পর সকলেরই মন যেন মেঘাচ্ছন্ন হইয়াগেল।

২রা মাঘ মঙ্গলবার। ০ ০ ০ গতকল্য সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়াছিলাম। উপরের সিড়ির পথে একটী স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিলাম—বিশ্বনাথ বাবা বিধবার কোল শূন্য করিও না বাবা, দোহাই তোমার! আমি পথের কাঙ্গালিনী! ০ ০ স্ত্রীলোকটী যেন দৌড়িয়া উপর হইতে নীচে নামিতেছিল—উন্মাদিনীর ন্যায়। আমি দুইপা নীচে নামিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটী আমার হাতে ধরিয়া ফেলিল—দেখিলাম আমাদের নীচের তালার একটী অধিবাসিনী—বিশেষ পরিচয় নাই। স্ত্রীলোকটী আমার হাতে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল—"বাবা তোমাদের খোজে নীচে উপরে দৌড়িতেছি—আমাকে রক্ষা কর, আমার বুকের ধন—অন্ধের নড়ী—চলিয়া যায়, বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয় গো—আমার কলিজা ছিড়িয়া যমে লইয়া যাইতেছে। * * তাহার কথা হইতে বুঝিলাম, তাহার মেয়েটীর কোন ব্যারাম হইয়াছে সেজন্য সে আমাদের অনুসন্ধানে উন্মাদিনীর মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। ০ ০ তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া দুর্গন্ধ হইতেই বুঝিলাম—মেয়েটীর কলেরা হইয়াছে। দেখিলাম—এসিয়াটিক কলেরা। লোকের ভয়ে কলেরার কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। ঘরখানা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আমার যতদূর বিদ্যা তাহা প্রকাশ করিলাম। বিধবাকে সান্ত্বনা দিয়া হারাধন বাবুর অপেক্ষা করিলাম। তিনি অবস্থা শুনিয়া আমার প্রেস্‌ক্রিপসন একটু পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। * সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নীচে যাইয়া ঔষধ খাওয়াইলাম এবং শেষ রাত্রে মেয়েটাকে দ্বিতলের একটী স্বাস্থ্যকর কোঠায় আনিয়া ফেলিলাম। ভগবান দীনের মধ্যে দীনভাবে অবস্থান করেন; দীন নিরাশ্রয়ের সেবাই ভগবানের সেবা?

৬ই মাঘ শনিবার। বিধবার মেয়েটী আমার ঔষধেই সারিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বনাথের ইচ্ছায় আর কোন ভয়ের কারণ নাই। আমার এই ৪ দিন রাত্রি জাগরণ স্বার্থক হইয়াছে। আজ সন্ধ্যা হইতেই ঘুমাইবার সুযোগ করিব। ......

৯ই মাঘ মঙ্গলবার। কাশীতে বসন্তের প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা আজ ৭টায় সিকরোলে বাসা পরিবর্ত্তন করিলাম। কমলার বিবাহ হইয়া গেলেই প্রয়াগ চলিয়া যাইব। বিধবাটী আমার নিকট কত কৃতজ্ঞ—হাতে ধরিয়া বলিয়া দিয়াছেন যেন প্রতিদিন আসিয়া তাহার রোগা মেয়েটীকে একবার করিয়া যাইয়া দেখি। ০ ০

১২ই মাঘ শুক্রবার আজ কমলার বিবাহ। বিমলার যেন আমার প্রতি কত রাগ। দেখা হইলেও কথা বলে না। উপায় নাই! ... ...

১৩ই মাঘ শনিবার ০ ০ ০ কাল বিধবাটী নাকি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ০ ০ ০ আমার অপেক্ষা করিয়াছিলেন। আমি নানা কাজে ব্যাপৃত থাকায় সাক্ষাৎ হয় নাই। বিবাহের কাজে এই কয়দিন তাহাদের বাড়ীতেও যাইতে পারি নাই। কাল একবার যাইতে চেষ্টা করিব। ০ ০

১৪ই মাঘ শনিবার। * * পকেটে এক টুকরা কাগজ পাইলাম—লেখা "তোমার সাথে আড়ী।" চিনলাম, বিমলার হাতের লেখা, ভাব বুঝিতে পারিলাম না। * * বিকালে যাইয়া বিধবাটীকে দেখিয়া আসিলাম। মেয়েটী সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু এখনও দুর্ব্বল রোগা—শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। বিধবাটীর সহিত অনেক কথা হইল। যাইবার পূর্ব্বে আর একদিন আসিব বলিয়া আসিয়াছি। একটা টনিক পেটেণ্ট ঔষধ দিয়া আসিলাম। কত কৃতজ্ঞতা! দরিদ্রের কৃতজ্ঞতাই আশীর্ব্বাদ—পবিত্র জিনিস। তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত বিশ্বনাথের চরণে তাহার করুণ নিবেদন ব্যক্ত করিলেন। ০ নানা স্থানে ঘুরিয়া বাসায় আসিলাম।

আর ডাইরি লিখা নাই। আমি বলিলাম "ইহার পর লিখ নাই কেন? না অন্য খাতায় লিখিয়াছ?"

শৈলেশ বলিল—"বাকী কথা সংক্ষেপে আমি বলিব। আর লিখিতে পারি নাই। রাত্রিতে ডাইরি লিখিয়া থাকি। ১৪ তারিখ রাত্রিতে ভয়ানক জ্বর হয়। পরদিন শরীরে বিষম বেদনা অনুভব করি। হারাধন বাবু বলিলেন "বসন্তের প্রকোপ সহরে বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে—বসন্ত হওয়া অসম্ভব নহে, সাবধান।"

দ্বিপ্রহরে ঘুম হইয়াছিল নিদ্রাভঙ্গ হইলে শুনিলাম সতীশ তাহার মাতাকে লইয়া পূর্ব্ব বাসায় চলিয়া গিয়াছে। কেবল বিমলা ও তাহার পিতা যান নাই। সন্ধ্যার পর বোধ হয় তাঁহারাও চলিয়া গেলেন। বিবাহের হাঙ্গামায় বাড়ীটা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বোধ হয় তাঁহারা বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। এই অবস্থায় আর ডাইরি লিখিবার শক্তি ছিল না। তাই ডাইরি লিখিতে পারি নাই। ভাল হইয়া পরে লিখিয়াছিলাম...।"

শৈলেশ বলিতে লাগিল—"আমার বসন্তই হইয়াছিল। কয়েকদিন এক রকম অজ্ঞানই ছিলাম। অজ্ঞান অবস্থার কথা বলিতে পারি না। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবারও বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। আরোগ্য লাভ করিয়া স্মৃতির সাহায্যে পরে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তোমাকে আমি সেই দুএক দিনের কথা মাত্র বলিব। তাহা শোন—

"বসন্তগুলি বাহির হইয়া গেলে জ্বরটা কমিয়া গেল। আমার জ্ঞান হইলে চক্ষু মেলিয়া যখন আমি প্রথম চাহিলাম—আমার চক্ষে পড়িল—সেই বিধবার মূর্ত্তি—যেন পবিত্র মাতৃ মূর্ত্তি রুগ্ন সন্তানের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পাখার বাতাসে তাহার সমস্ত ক্লান্তি দূর করিয়া দিতেছে। আমি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিয়াছিলাম না, তাঁহাকে হঠাৎ চিনিয়াও উঠিতে পারিয়াছিলাম না। আমি যখন বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছিলাম—তখন আমার দক্ষিণ পার্শ্বেই সেই রুগ্না মেয়েটীর প্রতি আমার দৃষ্টি নিপতিত হইল। আমার অবস্থা বুঝিয়া সেই বিধবা বলিলেন—বাবা ভয় নাই—বিশ্বেশ্বরের কৃপায় কোন ভয়ের কারণ নাই। তিনি আমার ক্ষুধা পাইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিলাম। সংক্ষেপে বলিতেছি—হারাধন বাবু স্ত্রী পুত্র ও কন্যা লইয়া পূর্ব্বেই এলাহাবাদ চলিয়া গিয়াছিলেন। হারাধন বাবু আমার খরচ পত্রের ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছিলেন। বোধ হয় মনের দুর্ব্বলতাই তাঁহাকে এই অবস্থায় স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

"আমার বসন্ত খুব সামান্যই হইয়াছিল। ৫।৭ দিন বোধ হয় খুব যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম; তাহাও সেই মাতৃপ্রতিম বিধবার সেবা শুশ্রূষায় তত কঠোর বলিয়া মনে হয় নাই। বাড়ীতে বাবাকে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম; দাদা কাশীতে গিয়াছিলেন। এত সহজে যে কেহ বসন্ত হইতে সারিয়া উঠে, তাহা চিকিৎসকদেরও জানা নাই। কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছা—আমি একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেই আমার সেই শুশ্রূষাকারিণী বিধবাটী ভয়ানক ভাবে আক্রান্ত হইলেন। দাদা বলিলেন করণীয় কি? আমি বলিলাম—আমি প্রাণ থাকিতে কৃতজ্ঞতার মূল্য শোধ না করিয়া শান্তি পাইব না। দাদা বলিলেন—"ঠিক কথা, মনুষ্যত্বের পরিমাণ এইরূপ কার্য্যের উপরই নির্ভর করে।"

আমি বলিলাম—"আমার একবার বসন্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বারের আর ভয় নাই, আপনার সে আশঙ্কা পূর্ণ মাত্রায় আছে; আপনি বরং অন্যত্র গিয়া থাকুন, আমি দেখি। মেয়েটী তার মাকে ছাড়িতে পারিবে না, সে আমার সাহায্য করুক।

দাদা বলিলেন—ভগবান যে দিন যাহার জন্য যে ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, সে দিন তাহার ভাগ্যে তাহা ঘটিবেই। নিরর্থক ভয় আমার নাই।" তিনি অন্যত্র গেলেন না।

আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করিলাম। মেয়েটা রাতদিন খাটিয়া খাটিয়া তাহার রুগ্ন ও ভগ্নদেহ নষ্ট করিয়া ফেলিল, তাহার খাটুনীর পুরস্কার ও ক্রন্দনের সান্ত্বনা ভগবান দিলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিধবা তাহার সেই নিরাশ্রয়া মেয়েটীকে আমার হাতে সপিয়া দিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।"

বলিতে বলিতে শৈলেশ কাঁদিয়া ফেলিল।

চক্ষু মুছিয়া শৈলেশ বলিল—"দাদা বলিলেন—মেয়েটীর গতি কি হইবে?"

আমি বলিলাম—"আমার যে গতি, এ মেয়েরও সেই গতি।"

দাদা বলিলেন—"তা দেখা যাইবে'খন।"

বাবা ও মা সকল অবস্থা শুনিয়া কালোকে, পুত্রবধু করিয়া লইলেন। আমার কৃতজ্ঞ অন্তকরণ কৃতজ্ঞতার মূল্য পরিশোধ করিয়া শান্তি লাভ করিল।"

শৈলেশ থামিয়া পড়িল। আমি বলিলাম—করুণ কাব্যই বটে!

শৈলেশ হতাশ ভাবে বলিল—"ভাই কালোর সেই অসহায় চাহনি যেন আজ চারিদিকে ফুটিয়া রহিয়াছে—তার মার চিকিৎসায় সময় যেমন সে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার দিকে নিরাশ ভাবে চাহিয়া থাকিত, তাহার নিজের বেলায়ও তেমনি অসহায় ভাবে চাহিয়া থাকিয়াই চলিয়া গেল—একটী ফোটা ঔষধও ব্যবহার করিতে পারিলাম না...."

হারাধন বাবুর ব্যবহার সম্বন্ধে এখন আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া আমি সাময়িক সান্ত্বনার সুরেই বলিলাম—

"ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই। তবে তুমি যে সেই নিরাশ্রয় বালিকাকে গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলে এবং প্রাণে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিয়াছিলে সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।"

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, DACCA
and Published by Kedar Nath Mojumdar Research House, Mymensinghz.

সৌরভ

নবম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮। | সপ্তম, অষ্টম সংখ্যা।

শিক্ষা সমস্যা।

শুধু আমাদের দেশে নয়, সমগ্র সভ্যজগতে যত প্রকার জটিল সমস্যার আলোচনা বর্ত্তমানে মনীষিগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছে, শিক্ষা সমস্যা তাহাদের অন্যতম। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে সর্ব্বপ্রকার সমস্যার মধ্যে শিক্ষা সর্ব্বপ্রধান, কারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন, অর্থাৎ জীবনের সকল বিভাগই শিক্ষাদ্বারা নিয়মিত হয়। শিক্ষার দ্বারাই সভ্যতার ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে আদর্শ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সভ্যজগৎ অগ্রসর হইতেছে, তাহা যদি মানবজাতিকে পরমকল্যাণের পথে চালিত করিবার উপযুক্ত না হয়, এতদিনের অভিজ্ঞতা যদি প্রমাণ করিয়া থাকে যে মনুষ্যজীবনকে পরিপূর্ণ সফলতার দিকে নিয়া যাইবার জন্য এই আদর্শের আংশিক বা সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, তবে বালক বালিকা, যুবক যুবতীদের শিক্ষার পরিবর্ত্তনের দ্বারাই তাহা সংসাধিত হইতে পারে। আমাদের ব্যক্তিগত, জাতীয় ও সামাজিক চেষ্টা কোন্ পথে কোন্ আদর্শের অভিমুখে ধাবিত হওয়া উচিত, শিক্ষার সঙ্গে ২ তাহা আমরা অবগত হই এবং আমাদের হৃদয়ে তদনুরূপ আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির বীজ রোপিত হয়। সুশিক্ষা মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করিতে পারে, কুশিক্ষা তাহাকে পশুত্বে অবনত করিতে পারে। শিক্ষার প্রভাবে মানুষ স্বাধীনতাকে আদর করিতে শিখে এবং স্বাধীনতার অভাবে জীবন দুর্ব্বহ মনে করে, বিপরীত শিক্ষার ফলে দাসত্বকেই অঙ্গের ভূষণ রূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। একরকম শিক্ষার গুণে মানুষ উপবাসে মরিতে প্রস্তুত, তবু পরাধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়; অন্য রকম শিক্ষার দোষে মানুষ স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জনে কোনরূপ কষ্ট ও পরিশ্রমের সম্ভাবনা দেখিলে আত্ম বিক্রয় তদপেক্ষা ভাল বোধ করে। উচ্চ আদর্শে শিক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটিলে যে মানুষ 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেও আনন্দ অনুভব করে, নীচ আদর্শে শিক্ষা পাইয়া সেই মানুষই ভোগের জন্য বা অর্থের জন্য সর্ব্বপ্রকার নীচতা ও কুৎসিত উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কোন কোন দেশে বালকবালিকাদিগকে পাঠশালাতেই শিক্ষা দেওয়া হয় যে তাহাদের দেশ, তাহাদের জাতি, তাহাদের সমাজ ও ধর্ম্ম পৃথিবীর অপরাপর সকল দেশ, জাতি, সমাজ ও ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে বিজাতীয় লোককে ঘৃণার চোখে দেখিবার সংস্কার সহজে দূর করিতে পারে না, এবং অনেক সময় তাহাদের আত্মশ্লাঘায় কোন ব্যক্তি বা জাতি আঘাত করিলে তৎপ্রতিঘাতে অমানুষিক অত্যাচার করাও তাহারা মনুষ্যত্বের অবমাননা মনে করে না। কোন কোন জাতির শিক্ষার মূলমন্ত্রই এই যে—সব মানুষ সমান, সকল ধর্ম্মই সমান ভাবে কল্যাণের পথ, কোন মানুষের অপরকে ঘৃণার চোখে দেখিবার অধিকার নাই, এবং সেই জাতির লোক কর্ম্মক্ষেত্রে চাক্ষুষ ঘটনার বিরুদ্ধ সাক্ষ্যসত্বেও এই সংস্কার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে না। আবার কোন কোন দুর্ভাগ্য দেশের ছাত্রগণ শিশুকাল হইতেই শিখিতে আরম্ভ করে যে তাহাদের জাতি অকর্ম্মণ্য, পরের কৃপায় সে জাতি কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া

আছে, তাহাদের ধর্মের ও সমাজের নীতিসমূহ কুসংস্কারের প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ, কোন উন্নত জাতীয় প্রভুর অধীনে দাসত্ব করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারিলেই তাহাদের জীবন সার্থক হইল ; এরূপ শিক্ষার ফলে যে সব মানুষ তৈয়ারী হয়, তাহাদের অধিকাংশ উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিহীন, ভীরু, পরাণুকারী, অলস ও স্বজাতিদ্রোহী হওয়া মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। মোট কথা, যে ব্যক্তি পরিণত বয়সে যে ভাবে চলে, যে জাতির অধিকাংশ লোকের শক্তি ও চরিত্র যতদূর বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং যে পথে নিয়োজিত হয়, যে সমাজের রীতিনীতি ও আদর্শ যেমন হইতে দেখা যায়, তজ্জন্য সেই ব্যক্তি, জাতি বা সমাজের শিক্ষাই বিশেষভাবে দায়ী। সুতরাং জীবনের কোনও বিভাগে কোন সংস্কার প্রয়োজন হইলে তদুদ্দেশ্যে শিক্ষার সংস্কার অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং সেই দিকে মনীষিদের চিন্তা ও শক্তি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

রাজ সরকার আইনের দ্বারা, বিচারাদালতের দ্বারা, পুলিশের শক্তির দ্বারা প্রজাবর্গকে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে অতি অল্পমাত্রায়ই সাহায্য করিতে পারে। দেশের 'শান্তিরক্ষা' প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা গৌণ প্রয়োজন, নির্ব্বিঘ্নে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রয়োজন। যে সরকার ইহাই একমাত্র বা মুখ্যতম প্রয়োজন মনে করিয়া ইহার জন্যই তাহার সমস্ত বা বেশীর ভাগ শক্তি নিয়োজিত করেন, তিনি বাহিরে যাহাই ঘোষণা করুন না কেন, অন্তরে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন যে তিনি মানুষের উপর রাজত্ব করিতেছেন, পশু বা জড়পদার্থের উপর নয়। আইন মানুষের মনকে ন্যায়পরায়ণ করিতে পারে না, পুলিশের নিগ্রহ মানুষকে শান্তিপ্রিয় করিতে পারে না। আইন হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে পারে নাই, আইনের চক্ষে সকল মানুষ সমান হইলেও হিন্দুদের জাতিভেদ উঠিয়া যায় নাই এবং ইংরেজেরা ভারতবাসীকে নিজেদের সমান বলিয়া ব্যবহার করিতে শিখে নাই। এ সকলই সম্ভব মনের শাসনের দ্বারা, এবং মনের শাসন সম্ভব উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা। সুতরাং প্রজার প্রকৃত কল্যাণের জন্য যদি রাজশক্তির প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে প্রজাদের ভিতরে উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তারই রাজশক্তিরও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে এবং যে ভিত্তির উপর এই শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত, তাহা দ্বারা দেশবাসীদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হইতেছে কিনা, তাহা দেশের পক্ষে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত কিনা এবং তাহা আমাদিগকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে কিনা, সে বিষয়ে একটা প্রবল সন্দেহ দেশের অধিকাংশের মনকে সম্প্রতি আন্দোলিত করিতেছে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ ত্রুটী যে অনেক আছে, ইহার সকল বিভাগই যে সংস্কারের অপেক্ষা করিতেছে,অনেক নূতন বিষয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত যে প্রয়োজন, দেশের আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও নৈতিক পরিবর্ত্তন অনুসারে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগেও যে অনেক পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই শিক্ষা ব্যবস্থা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, যে মূল ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই আমাদের দেশের, সমাজের, জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের অনুকূল কি না, এই শিক্ষার মূলেই কোন গোল আছে কিনা এবং ইহার আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে কিনা, সেই সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য দুইটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, আমাদের প্রচলিত শিক্ষার আদর্শ কি এবং সেই আদর্শ মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য লাভের জন্য কতদূর সহায়ক ; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সর্ব্বাংশে আমাদের পক্ষে উপযুক্ত কিনা ?

অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও এইরূপ ধারণা অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী পোষণ করিতেন যে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে ভালরূপ অধিকার জন্মিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল। এই ধারণা যে শিক্ষার ফল, তাহাকে কুশিক্ষা বলিতে আজকাল কেহ আপত্তি করিবেন না।

আজকাল অনেকে মনে করেন যে যেসব বিষয়ে

জ্ঞানলাভ করিয়া জগতের সভ্যজাতি সমূহ এত প্রবল হইয়াছেন, তদ্রূপ কতকগুলি বিষয় অবগত হওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এইরূপ ধারণাও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ণ মনে করেন। কারণ প্রথমতঃ কতকগুলি বিষয়ের অবগতি দ্বারাই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধিত হয় না, দ্বিতীয়তঃ পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইবার অধিকার প্রত্যেক মানবের থাকিলেও প্রত্যেকে অনেকগুলি বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না, তৃতীয়তঃ কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও মনুষ্যত্বের হিসাবে অত্যন্ত নীচের স্তরে থাকিতে পারে ইহা অনেক সময় দেখা যায়। যাহারা ছাত্রজীবনে প্রকৃতি প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের প্রভাবে সাহিত্য, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান বা অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জন বা কোন লাভজনক দাসপদবীপ্রাপ্তিকে বিদ্যার সার্থকতা বোধ করেন, তাহারা যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া থাকিলেও শিক্ষা যে বিন্দুমাত্রও প্রাপ্ত হন নাই, সে কথা বলা বাহুল্য।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যের অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদন। মানুষের চিত্তে বহুবিধ বৃত্তি ও বহুবিধ সংস্কার বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি সৎ, কতকগুলি অসৎ, অর্থাৎ কতকগুলি মনুষ্য জীবনকে চরম উৎকর্ষের পথে লইয়া যাইবার জন্য সাহায্যকারী, এবং কতকগুলি তাহার বিপরীত। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি সুপ্ত, কতকগুলি দুর্ব্বল এবং কতকগুলি প্রবল। মনুষ্য জীবনের উৎকর্ষের নিমিত্ত সুপ্ত সদ্বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করিতে হইবে, দুর্ব্বল সদ্‌বৃত্তিগুলিকে প্রবল করিতে হইবে, প্রবল সদ্‌বৃত্তিগুলিকে অধিকতর বিশুদ্ধ করিয়া নিঃশ্রেয়সের পথে নিয়োজিত করিতে হইবে, এবং অসদ্‌বৃত্তিগুলিকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল করিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে হইবে অথবা তাহাদের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া কল্যাণ লাভের অনুকূল করিতে হইবে। ছাত্রজীবন চিত্ত বিশুদ্ধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। যখন জীবন সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠে নাই, সংসারের ঘাত প্রতিঘাত যখন তাহাকে আকুল করিতে আরম্ভ করে নাই, অথচ তাহার অন্তরের বৃত্তিগুলি যখন মস্তক উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু কোনও বৃত্তিই অদম্য হইয়া উঠে নাই, জীবনের এই অবস্থাই মানুষকে খাঁটি মানুষরূপে তৈয়ারি করিবার উপযুক্ত সময়। তাহার ভিতরের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত ও প্রকটিত করিবার জন্য, মনুষ্যত্বের আবরণরূপ অসদ্‌বৃত্তিগুলি তিরস্কার করিয়া তাহার অঙ্গীভূত সদ্‌বৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য, যেরূপ সংসর্গ, যেরূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন, যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রয়োজন, এই সময়ে তাহার যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। ইহারই নাম শিক্ষা। এই সময়ে শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা হইলে বিঘ্নবহুল সংসারসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াও মানুষ আত্মহারা হয় না, একমুষ্টি অন্নের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেয় না, ছাত্রজীবনে "উত্তম ছাত্র" হইয়াও পরীক্ষোত্তরণের পরই জ্ঞান লাভে বিতৃষ্ণ হয় না। এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের জীবন দুইভাগে বিভক্ত হয়—প্রথম, পরীক্ষা পাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ইহা একটী বই মুখস্থ করিবার কল, দ্বিতীয়, পরীক্ষা পাশের পর হইতে, ইহা একটী টাকা উপার্জ্জনের কল। মনুষ্যত্ব বিকাশের অভাববশতঃ ছাত্রজীবনে পরীক্ষায় পাশ করিবার উদ্দেশ্যেও তাহারা অসদুপায় অবলম্বন করিতে আত্মগ্লানি অনুভব করে না, এবং পরজীবনে গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে তোষামোদ, কপটতা, মিথ্যাচার, উৎকোচ গ্রহণাদি নিতান্ত হীন কাজ করিয়াও আপনাকে শিক্ষিত মানুষ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লজ্জাবোধ করে না। ছাত্রজীবনে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ছাত্রের হৃদয়ে চিরজীবনের জন্য অঙ্কিত হয় যে মনুষ্যত্ব অর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সত্য রক্ষার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন মিথ্যাশ্রয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ অপেক্ষা আদরণীয়, স্বকীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চিরদিন অর্দ্ধাহারে পর্ণকুটীরে বাস অন্যের নিকট মস্তক বিক্রয় করিয়া বহুজনের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তারূপে রাজপ্রাসাদে বাস অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষনীয়। মোট কথা এই যে মানুষকে খাঁটি মানুষ হইতে সাহায্য করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই শিক্ষা লাভে অধিকার আছে।

দৈহিক ও পারিবারিক সর্ব্ববিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন করিয়াও এবং অশেষ প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও মনুষ্যত্ব রক্ষা করা এবং মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করা যেমন মানবের কর্ত্তব্য এবং মানবজীবনের আদর্শ, দৈহিক ও পারিবারিক সুখের প্রতি আসক্তি এবং যন্ত্রণার হাত এড়াইবার চেষ্টাও তেমনি মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সুতরাং আদর্শের প্রতি অনুরাগ যাহাতে বর্দ্ধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা যেমন প্রয়োজন, মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম যাহাতে তাহার আদর্শানুযায়ী জীবন গঠনের পথে অনতিক্রমণীয় বাধাস্বরূপ না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তদুদ্দেশ্যে মুখ্যতম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু শিক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির হওয়া প্রয়োজন যাহাতে মনুষ্যত্বের অবমাননা না করিয়া, স্বাধীনতা ও সত্য বিসর্জ্জন না করিয়া সে তাহার নিজের ও পরিবারের জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় এবং আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার জন্ত তাহাকে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে পতিত হইতে না হয়। সমাজবিধি এবং রাষ্ট্রবিধিও তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে এবং তদনুরূপ জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

শিক্ষার অন্ত বিশেষ উদ্দেশ্য বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের নানা তত্ত্বের সহিত মানুষের পরিচয় সংঘটন। মানুষের বুদ্ধির ক্ষুধা দেহের ক্ষুধা অপেক্ষা অনেক বেশী তীব্র। দেহের ক্ষুধা সহজেই তৃপ্ত করা যায়, বুদ্ধির ক্ষুধা তৃপ্ত করা যায় না। মানুষ যত জানে আরও তত জানিতে চায়। যে পর্য্যন্ত এমন কোন তত্ত্ব সে জানিতে না পারে যাহা জানিলে সকলই জানা হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত তাহার জানিবার আকাঙ্ক্ষা কিছুই নিবৃত্ত হয় না। দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেই যাহার সকল শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়, দৈহিক প্রয়োজন ভিন্ন যাহার বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলিত হয় না, তাহাকে মানুষ বলা যায় না, কারণ পশুর সহিত তাহার পার্থক্য খুব বেশী নয়। মানুষের ইহা বিশেষ মহত্বের পরিচায়ক যে দেহের তৃপ্তিতে বা বাহ্য সম্পদের প্রাচুর্য্যে সে পরিতৃপ্ত হয় না। বিনা প্রয়োজনে মানুষ জ্ঞান লাভের জন্ত প্রবৃত্ত হইয়া অনেক কষ্ট স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হয়, কারণ জ্ঞানলাভই তাহার বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজন দৈহিক প্রয়োজন অপেক্ষা গুরুতর।

ছাত্রজীবনে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে এমনভাবে অনুশীলিত ও মার্জ্জিত করা প্রয়োজন, যাহাতে তখনই সে ভিতরের এবং বাহিরের কতকগুলি সত্যের সহিত পরিচিত হয় এবং পরবর্ত্তীকালে ভূয়োদর্শন, স্বাধীন চিন্তা ও পূর্ব্বতন মনীষিদের লেখনীপ্রসূত পুস্তকের সাহায্যে গুহ্যতর তত্ত্বসকলের জ্ঞানলাভ করিতে পারে। তত্ত্বসকলের আলোচনা এমনভাবে এবং এমন শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর দিয়া করা প্রয়োজন, যেন শিশিক্ষুর বুদ্ধিবৃত্তি সহজে তাহাতে সায় দেয় এবং তাহাতে রস পায়। যে পর্য্যন্ত জ্ঞানানুশীলনে রস পাওয়া না যায়, এবং তত্ত্ব আপনার বলিয়া গৃহীত না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না বুঝিতে হইবে। শিক্ষাব্যবস্থায় এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

যাহারা শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের একটী কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে কোন মানুষই একেবারে রিক্ততা নিয়া জন্মগ্রহণ করে না। প্রত্যেকের ভিতরেই কতকগুলি সংস্কার আছে। ব্যবহারক্ষেত্রে মানুষকে কতকগুলি সংস্কারের জীবন্তমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সংস্কারসমূহের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তিগত, কতকগুলি সমাজগত, কতকগুলি জাতিগত, কতকগুলি যৌন। এই সব সংস্কারের মূল কারণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ যাহাই নির্দ্দেশ করুন না কেন, ইহাদের অস্তিত্ব এবং জীবনগঠনে ইহাদের প্রভাব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সব সংস্কারের সম্যক উন্মেষ ও শোধনের ভিতর দিয়া বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয় এবং সম্যক্ জ্ঞানের দিকে ধাবিত হইয়া মনুষ্যত্বকে বিকশিত করে। যাহারা এই সত্যটীকে অস্বীকার বা অবহেলা করিয়া শিক্ষার বিধান করিতে প্রয়াসী, তাহারা কার্য্যতঃ মানুষকে মানুষরূপে গ্রহণ না করিয়া জড়পদার্থরূপে ব্যবহার করেন এবং মনে করেন যে তাহাদের ইচ্ছানুসারে বালক বালিকাদিগকে যে কোন ছাঁচে ফেলিয়া যে কোন আকারে গঠন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে পারেন। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মূলে

ত এই ভুলটী রহিয়াছে বলিয়া খাঁটি মানুষ গঠিত হইবার পক্ষে ইহাতে অনেকখানি বাধা জন্মাইতেছে।

মানুষ হিসাবে সকল মানুষের স্বভাবে অনেক বিষয়ে সাম্য থাকিলেও বৈষম্যকেও অস্বীকার করা চলে না। কেহই শুধু সার্ব্বভৌমিক মানবত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে না; কেহ ভারতীয়, কেহ ইউরোপীয়, কেহ বাঙ্গালী, কেহ পাঞ্জাবী, কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ পুরুষ, কেহ স্ত্রী, এইরূপ বৈষম্য লইয়াই সাধারণ মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং এইরূপ বৈশিষ্ট বীজাকারে সংস্কাররূপে প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্তে লুক্কায়িত থাকে। বৈশিষ্ট্যের বিনাশ করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিয়া সহজ পথে ইহাকে শ্রেয়ের দিকে চালিত করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিতে হয়। যে যেরূপ বিশিষ্টতা নিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে তদনুরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহার ভিতরের মানুষটীকে প্রকাশিত করা প্রয়োজন। বাঙ্গালী বালকবালিকার উপর প্রথম হইতেই ইংরেজোচিত শিক্ষার বোঝা চাপাইলে সে যাহা হয় তাহা খাঁটি মানুষ ত নয়ই, ইংরেজও নয় বাঙ্গালীও নয়। বালিকাকে সম্পূর্ণ পুরুষোচিত শিক্ষা প্রদান করিলে তাহার নারীত্বের বিকাশ হয় না, পুরুষত্বের উৎপত্তি হয় না, মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধনে কাজেই ব্যাঘাত ঘটে। মনুষ্যোচিত শিক্ষা প্রত্যেক মনুষ্যকেই দেওয়া প্রয়োজন, সে বাঙ্গালী হউক বা ইংরেজ হউক, পুরুষ হউক বা নারী হউক। কিন্তু সে শিক্ষা তাহার বিশিষ্ট স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক, সে শিক্ষার প্রণালী এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে তাহার চিত্তের সংস্কারসকল যথোচিতভাবে উদ্বোধিত ও সংশোধিত হইয়া তাহাকে সত্য ও আনন্দের অভিমুখী করে, নচেৎ সে শিক্ষা তাহার বুদ্ধি ও স্মৃতি বিস্বাদ ঔষধের মত গ্রহণ ও ধারণ করিলেও তাহার প্রাণ তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত ও সক্ষম হয় না, সুতরাং শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যও সফল হয় না।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

স্রোতের ফুল।

১৩

মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে প্রফুল্ল ভয়ে ভয়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিল দিনের আলোতে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সে একটা বড় ব্যাপারী নৌকায় শুইয়া আছে এবং তাহার নিকটেই তাহার ন্যায় আরো ৭।৮টী যুবতী, কিশোরী ও বালিকা বসিয়া আছে। দৃশ্যটী তাহার নিকট যেন স্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল।

প্রফুল্লর মনে ভয় না হইয়া তৎ পরিবর্ত্তে বেশ একটু কৌতূহল জন্মিয়াছিল, সে তাহার সম্মুখের ছোট বালিকাটীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি দিদি?"

বালিকা বলিল—"সবজান।"

প্রফুল—"তুমি মুসলমান?"

বলিকা বলিল—"হাঁ।"

প্রফুল্ল তাহার সমবয়স্কা আর একটী সুন্দর কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি?"

দ্বিতীয়া উত্তর করিল—"আমার নাম কাদু।"

প্রফুল্ল—"কি জাতি?"

মেয়েটী বলিল—"আমরা চাঁড়াল।"

এই সুন্দর মেয়েটীকে দেখিয়া প্রফুল্লর মনের ভিতর একটু ভাব দাঁড়াইয়াছিল; হঠাৎ তাহার মুখ হইতে 'চাঁড়াল' পরিচয় পাইয়া যেন মনের সে ভাব হটাৎ ঘৃণায় পিছাইয়া গেল।

প্রফুল্ল কাদুর মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল —"এমন সুন্দর মেয়ে হয় চাঁড়ালের ঘরে!"

কাদু প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কোন্ জাত গো!

প্রফুল্ল ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিল—"আমরা কায়েত।"

কাদু বলিল—"আমরা এখানে বার জাতের মানুষই আছি।......"

প্রফুল্ল ইহার পর কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে ঠিক পাইতে ছিল না, তাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বৃহৎ নৌকা। নৌকার চালে উলু-ছনের ছানি।

তাহার উপর বোঝাই করা মাটির বাসন—কলসী, পাতিল, হাঁড়ী, মাল্‌সা—ইত্যাদি। নৌকায় ৪।৫ জন মাল্লা। এই নৌকাকে পূর্ব্ব বঙ্গে 'ব্যপারীর নাও' বলে।

ব্যাপারীরা বর্ষা কালে ঘাটে ঘাটে ব্যবসায় জিনিসের 'ভরা' লইয়া বিক্রয় করিতে যায়। গ্রামবাসী ধান্যের পরিবর্ত্তে এই সকল দ্রব্য প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই নৌকার ভিতরে ঘরের মত স্থান, তাহাতে ছিল—অন্যান্য জিনিসের সহিত এই বার জাতের মেয়েরা।

বেলা প্রায় দেড় প্রহর সময় একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া ব্যাপারী নৌকায় আসিল। বৃদ্ধ আসিয়া দুয়াত কলম কাগজ লইয়া লিখিতে বসিল। ব্যাপারী বাহিরে রহিল।

বৃদ্ধ নৌকার পাটাতনে আসন করিয়া বসিয়া লিখিবার উদ্যোগ করিতে যাইয়া প্রথমেই কাদুকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, তোমার নাম কি?"

বৃদ্ধের মিষ্ট সম্ভাষণ শুনিয়া কাদু তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধ বলিল—"মা, আমি তোমাদিগের উপকার ব্যতীত অপকার করিব না। আমারও স্ত্রী কন্যা আছে, আমিও মানুষ, ওদের মত ডাকাত নই—কাল দেখিলেই তাহার প্রমাণ পাইবে। এখন তোমাদের পরিচয় বল—"ইহার পর বৃদ্ধ চুপি চুপি বলিল—"আমি কোম্পানী বাহাদুরের সিপাহী আনিয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইব। আমি যাহা বলি এখন তোমরা সকলেই তাহা করিও। নাম, বাপের নাম, জাতি—যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করি আমাকে বলিয়া যাও, লিখিয়া লই।"

কাদু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমার নাম কাদু, বাবার নাম রামকেশব, জাতি চাঁড়াল, বাড়ী লক্ষীর চর—কোটালীপাড়ার কাছে। জল আনিতে নদীতে গিয়াছিলাম, ইহারা ধরিয়া নায় তুলিয়া লইয়া আসিয়াছে।......"

কদু কাঁদিয়া পুনরায় বৃদ্ধের পা জড়াইয়া ধরিল। কাদুর কান্নায় মেয়ে গুলি সকলেই কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্লও চথে জল রাখিতে পারিল না।

সবজান বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে বলিল—"নাম সবজান, বাবার নাম টুকানি, বাড়ী খলা, জাতি মুসলমান, থানা জানি না......

বৃদ্ধ প্রফুল্লর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলে প্রফুল্ল বলিল—"আমার নাম প্রফুল্ল, পিতার নাম গৌরমোহন চৌধুরী, জাতি কায়স্থ, নিবাস হরিণা, জেলা সুধারাম। মালক্ষা যাইতে ছিলাম......

বৃদ্ধ বলিল—"ঐ সকল কথা এখন প্রয়োজন হইবে না। পরে প্রয়োজন হইলে বলিও। আমি আর একদিন আসিব, তখন তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিতে হইবে শিখাইয়া দিব। আমাকে তোমরা তোমাদের একজন উপকারী বন্ধু বলিয়াই মনে করিও।"

প্রফুল্লর দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বলিল—"তোমাকে মা বেশ বুদ্ধিমতী দেখাইতেছে; তুমি যদি আমার বাড়ীতে থাকিতে চাও—লইয়া যাইতে পারি কিনা দেখিব।

প্রফুল্ল বৃদ্ধের আচরণে বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছিল; বৃদ্ধের গলায় উপবীত দেখিয়া তাহার পায়ে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিয়া চরণ ধূলি লইল; তারপর বলিল—"আমি এখানে খাইব না বাবা, আপনার চারিটী প্রসাদ চাই। আমাকে আপনার বাড়ীতেই লইয়া যান।"

"আচ্ছা দেখি মা, কি ব্যবস্থা করিতে পারি, ডাকাতের হাত হইতে উদ্ধার করা কি এতই সহজ? যাহা হউক না লইতে পারিলেও তোমার জন্য চারিটা ভাতের বন্দোবস্ত করিব।......"

বৃদ্ধ সকলেরই পরিচয় লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

নৌকার মধ্যে প্রফুল্লই ছিল উচ্চ জাতের মেয়ে; সে জন্য তাহার প্রতিই বৃদ্ধের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রফুল্ল বৃদ্ধের কৃপায় দ্বিপ্রহরে প্রসাদ পাইয়া আপাততঃ জাতি রক্ষা করিল। পর দিন বৃদ্ধ আসিয়া প্রফুল্লকে নিজ গৃহে লইয়া গেল।

১৪

বৃদ্ধের নাম মৃত্যুঞ্জয় ঘটক। বৃদ্ধ প্রফুল্লর গালে মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল "মা তোর অদৃষ্ট ভাল যে আমার হাতে পড়িয়াছিলে, নতুবা আজ কোন্ হাড়ি চাঁড়ালের হাতে পড়িয়া কলঙ্কের ডালিমাথায়

লইতে! যা মা নিশ্চিন্তে গিয়া তোর মার নিকট হইতে এখন কাজের কথা শোন! আমি একটা অন্য ......"

বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

বৃদ্ধের আদর ও স্নেহে প্রফুল্ল যেন গলিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরের আহারাদি করিয়া ঘটক গৃহিণী-প্রফুল্লর চুল বাঁধিতে বসিলেন। তিনি বলিলেন—"দেখ দেখি, কেমন মেয়ে, না আছে শরীরের যত্ন, না আছে চুলের যত্ন, না আছে এক খানা ভাল কাপড়!"

প্রফুল্ল বলিল "মা আমি দীন দুঃখী, আমার যত্ন করিয়া কি হইবে?......"

প্রফুল্ল চক্ষে জল রাখিতে পারিল না। ঘটক গৃহিণীর মধুর মাতৃভাবের প্রলেপে তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ জমাট আবেগ তরল হইয়া ঝড়িয়া পড়িল।

গৃহিণী বলিলেন—"ছিঃ মা, কাঁদিও না, তোর জন্য তিনি বর খুজিতে গিয়াছেন, এমনি দয়ার শরীর তার! বয়স্থা কুমারী কন্যা দেখিলে তাঁহার আর আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকে না। যে দিন তোকে দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই দিন হইতে আর তাঁর নিবৃত্তি নাই। সাত কুড়ি টাকা ডাকাইতকে দিয়া তবে মা তোকে উদ্ধার করিয়াছেন—বেচু গাঙ্গুলীর নিকট হইতে সব টাকা কর্জ্জ করিয়া—এখনি পরের জন্ত তাঁর ভাবনা! তারপর হইতে ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছেন; কোথায় তোর বিবাহ দিবেন, কি প্রকারে তুই সুখে থাকিবি—কেবল এই চিন্তা"

শুনিয়া প্রফুল্ল চিন্তিত হইল! তবে কি তিনি আমার বিবহ দিয়া সেই উপায়ে এই ঋণ পরিশোধ করিবেন? তা না করিয়াই বা এই ঋণ পরিশোধের তাঁহার উপায় কি? আর কেনইবা তিনি আমার জন্ত ঋণ গ্রস্ত থাকিবেন! প্রফুল্লর চিন্তার বিরাম নাই!

তৈল সিন্দুর দিয়া সুন্দর করিয়া মাথা বাঁধিয়া ঘটক গৃহিণী এক খানা নূতন নীলাম্বরী শাড়ি প্রফুল্লর হাতে দিয়া বলিলেন—"কাপড়টা বদলাইয়া পর, পিন্ধন কাপড়টা কাল কলার কার দিয়া ধুইয়া ফেলিও!"

প্রফুল্লর মন দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতে ছিল সুতরাং তাহার নীলাম্বরীর প্রতি লক্ষ্য ছিল না, সে হাত বাড়াইয়া শাড়ি খানা লইয়া তাহা পরিধান করিল এবং পরিত্যক্ত ময়লা কাপড় খানা ধুইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

ঘটক গৃহিণী বলিলেন—"আজ অবেলায় আর কার জল ছুইয়া কাজ নাই, বামুনের মেয়ের বামুনের আচারই রক্ষা করা উচিৎ।"

প্রফুল্ল কথাটা বুঝিতে না পারিলেও নিষেধটা বুঝিল। তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া আসিয়া অন্ত কার্য্যের আদেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল:

গৃহিণী বলিলেন—"চল এখন পাকসাকের যোগাড় করা যাউক।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মৃত্যুঞ্জয় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও লোকজন আসিল। সন্ধ্যার অল্প পরেই আহারাদি শেষ হইয়া গেল।

তারপর মৃত্যুঞ্জয় প্রফুল্লকে হাতে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার ঘরের কোণে ঘাটে বাঁধা নৌকায় উঠিলেন। গৃহিণী বড় গলায় প্রফুল্লকে শুনাইয়া বলিলেন—"কালই কিন্তু মাকে লইয়া ফিরিও! মা আমার লক্ষী।"

প্রফুল্ল কিছুই বুঝিল না, বুঝিতেও চেষ্টা করিল না; অথবা মনে মনে সন্দেহ করিয়াও কোন কথা বলিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইল না; বাজিকরের হস্তধৃত ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় বৃদ্ধের ইঙ্গিত অনুসরণ করিল।

১৫

শুভলগ্নে বিবাহ আরম্ভ হইল। লগ্নমুহূর্ত্তে আসিয়া কন্যার নৌকা ঘাটে পঁহছায় কন্যাকে আর ঘরে না তুলিয়া একেবারেই নিয়া বরের সম্মুখে বসান হইল।

বরপক্ষের পুরোহিত মন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন, এইবার কন্যা পক্ষের পুরোহিতও ব্রতী হইলেন; কন্যা কর্ত্তা মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

বাদ্য ভাণ্ড সজোরে বাজিতে লাগিল, সে তাণ্ডবে বিবাহের মন্ত্র দূরে থাকুক উচ্চ চীৎকারও কাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে ছিল না।

প্রফুল্ল এইবার স্পষ্ট বুঝিতে পারিল—তাহার বিবাহ হইতেছে। এইরূপ জাতি নাশক কার্য্যকে বিনা বাক্য

ব্যারে অনুষ্ঠিত হইতে দিতে কিছুতেই তাহার মন বিদ্রোহ ঘোষণা না করিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। সে মন্ত্র পাঠের দিকে কর্ণ পাত না করিয়া বলিল—"আমার বিবাহ একবার হইয়াছে, আর হইতে পারে না; আমি মন্ত্র পড়িব না।"

তাহার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনী কাহারও কর্ণগোচর হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া সে ঘোমটা ফেলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

এইরূপ অভাবনীয় ব্যাপারে সকলেরই দৃষ্টি পাত্রীর উপর নিপতিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য বাদ্যভাণ্ড ও চীৎকার-কোলাহল থামিয়া গেল।

প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"আমি কায়স্থ কন্যা, আমার বিবাহ হইয়াছে, স্বামী বর্ত্তমান ... ...

প্রফুল্লর কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। পাত্রপক্ষ বাজকরদিগকে ধমক দিয়া বলিলেন—"বাজাও, বাজাও।"

পাত্রের পুরোহিত বলিলেন—"এরূপ স্থলে প্রাশ্চিত্ত্যের ব্যবস্থা আছে, শোধন করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; আপাততঃ মন্ত্র চলুক,—কি বলেন—তর্করত্ন খুড়া?"

তর্করত্ন ভিন্ন গ্রামের নিমন্ত্রিত ব্যক্তি; তিনি এত গোলমাল জানিতেন না, সুতরাং বাদ্য বন্ধ করিয়া দিয়া উপস্থিত তর্কের মীমাংসার আলোচনায় বলিলেন—

"তর্ক যখন উঠিয়াছে, তখন মীমাংসা প্রয়োজন; কি বলেন ন্যায়পঞ্চানন—আর বিশেষ এ অতি কুৎসিত বিভৎস আপত্তি..."

ন্যায়পঞ্চানন বলিলেন—"তা বটেইতো, তা বটেইতো, রঘুনন্দন কিন্ত বলিয়াছেন—

নষ্টে ভ্রষ্টে কায়স্থে পতিতে পতিতং···

প্রায়শ্চিত্যই যথেষ্ট..."

তর্করত্ন ন্যায়পঞ্চাননের বিদ্যার পরিধি বুঝিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"নাহে এ ব্যাপার বড়ই প্রাঞ্জল হইয়া উঠিয়াছে; বিবাহিতা, তাহাতে আবার কায়েস্থ কন্যা! না—না—এ কখনই হইতে পারে না—"

তর্করত্নকে কথা বলিতে না দিয়া বরের পিতা বলিলেন—"বৃষ্টি আগতপ্রায়—মন্ত্রটা হইয়া যাউক, তারপর বাকী অনুষ্ঠান—আপনারা বিচার বিতর্ক করিয়া যাহা সাব্যস্ত করেন—তদনুসারে হইবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা অতি প্রবল।"

তর্করত্ন ঊর্দ্ধ নেত্রে হাঁ করিয়া থাকিয়া বরের পিতার কথা শুনিতেছিলেন।

তখন বরের ভ্রাতা প্রফুল্লকে ধরিয়া আনিয়া আসনে বসাইতে চেষ্টা করিল।

প্রফুল্ল চীৎকার করিয়া বলিল—"দোহাই আপনাদের সকলের! আমি বিবাহিতা কায়েস্থ কন্যা—আমাকে ডাকাতেরা পথ হইতে ডাকাতি করিয়া আনিয়াছিল—এখন ব্রাহ্মণের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া ইহারা আমার জাতি-ধর্ম্ম নাশ করিতেছে। আপনারা ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক সকলে সাক্ষী! ......

তর্করত্ন এই বিভৎস কার্য্য দেখিয়া ঘৃণায় ও ক্রোধে মাথা নাড়িতে ছিলেন, এবং কাছা বাড়িতে ছিলেন। প্রফুল্লর কথা শুনিয়া স্থির ভাবে প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কায়স্থের কন্যা? তোমার বাড়ী কোথায়?"

প্রফুল্ল বলিল—"মালঞ্চা।"

একটী যুবক উঠিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল—'মালঞ্চা! কোন মালঞ্চা?"

মালঞ্চা এ দেশে কতটা আছে, প্রফুল্ল জানিত না, সে বলিয়া ফেলিল—"হরিহর ঘোষালের বাড়ী যে মালঞ্চা।"

যুবক অগ্রসর হইয়া প্রফুল্লর নিকট আসিয়া তাহার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল—"তুমি কি প্রফুল্ল?"

প্রফুল্ল মুখ নত করিয়া বলিল—"হাঁ।"

তর্করত্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুশীল তুমি ইহাকে চিন?"

সুশীল বলিল "হাঁ পরিচিত বলিয়াইতো দেখিতেছি।

বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল। বরকর্ত্তা কৃত্রিম ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"কন্যাদাতাকে আটক কর, সে আমার জাতি নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কি ভয়ানক কাণ্ড! কে আছিসরে...

তখন কন্যাকর্ত্তা বা পুরোহিত কাহাকেও পাওয়া গেল না।

প্রথম রাত্রের সুতহিবুক যোগ এইরূপে পণ্ড হইয়া গেল।

১৬

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বিবাহের বাজার অন্যরূপ ছিল। রাঢ়ির শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের প্রচুর অর্থ না থাকিলে বিবাহ হইত না। এক একটী ব্রাহ্মণ কন্যার জন্য হাজার দুই হাজার টাকা পণ লাগিত। এরূপ অবস্থায় গরীব এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক বিবাহের নাম লইতে সাহসী হইতেন না; কেহ কেহ অল্প ব্যয়ে নীচ জাতীয়া কন্যাও সংগ্রহ করিতেন। এই অল্প পণে কন্যা সংগ্রহের ব্যাপার দক্ষিণ বঙ্গে এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে অসমর্থ পরিবারের ব্রহ্মণেরা কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান কন্যা পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতে অনুমাত্র বিচার করিতেন না। এই সকল কন্যাকে সমাজে 'ভরার মেয়ে' বলিত।

ভরার মেয়ে সংগ্রহের ব্যাপার ছিল বিচিত্র। পথ-ঘাট হইতে দস্যুরা অসহায়া মেয়ে ধরিয়া আনিয়া ব্যবসায়ের সওদার মত তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ ঘটক দিগের নিকট বিক্রয় করিত। ঘটকগণ যথা সম্ভব অল্প মূল্যে ঐ সকল মেয়ে ক্রয় করিয়া লইয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া পালন করিত এবং পাঁচ ছয় শত টাকা পণে হস্তান্তরিত করিয়া প্রচুর লাভবান হইত। ঘটক-দিগের এই ব্যবসায়ের সাহায্যের জন্য কৃত্রিম কন্যা দাতা, পুরোহিত ও ভাণ্ডারীর অভাব হইত না; ইহারা সকলেই ঘটকের নিকট হইতে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রাপ্য প্রাপ্ত হইত। এদিকে বর কর্ত্তা অল্প পয়সায় পুত্রবধু পাইয়া সমাজের ভবিষ্যৎ নির্য্যাতনের ভয় ভুলিয়া যাইতেন; উপস্থিত সুলভতাই ছিল তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তনীয় ব্যাপার। এইরূপ বিবাহ কোন কোন স্থলে বর গৃহেও সম্পাদিত হইত।

প্রফুল্ল ডাকাতের হাত হইতে মহাজনের হাতে, মহাজনের হাত হইতে মৃত্যুঞ্জয় ঘটকের হাতে এবং তথা হইতে বর্ত্তমান বিবাহ সভায় নীত হইয়াই বিভ্রাটের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

গোলমাল বাঁধিয়া উঠিলে সুশীল প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিল—"এখন তোমার উপায় কি হইবে, তুমি কি করিতে চাও?"

প্রফুল্ল বলিল—"ধর্ম্ম আমাকে রক্ষা করিয়া আপনার হাতে দিয়াছেন; আপনাকে যদিও আমি চিনিতে পারি নাই, তবু আপনি যখন আমাকে চিনিয়াছেন, তখন আপনিই অনুগ্রহ করিয়া আমার গতি করিবেন—আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন।..."

সুশীল বলিল—"তবে আমার সঙ্গে চলিয়া আইস"

প্রফুল্ল সুশীলের অনুসরণ করিল।

প্রফুল্ল চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বরের পিতা ব্রজমোহন ভট্টাচার্য্য লাফাইয়া আসিয়া প্রফুল্লকে ধরিলেন। প্রফুল্ল চীৎকার করিয়া উঠিল। সুশীল পাছের দিকে ফিরিয়া ব্রজমোহনের কাণ্ড দেখিয়া বলিল—"ছিঃ খুড়া মহাশয়, এ কি কাণ্ড! ছাড়িয়া দিন! মেয়ে মানুষের হাত ধরিবেন না!......"

ব্রজমোহন বলিলেন—"বাবা সুশীল, সাত শত টাকা নগদ দিয়াছি বাবা; কলিজা ছিঁড়িয়া যাইতেছে—সবগুলি টাকা কর্জ্জ করিয়া দিয়াছি—এখনই ছাড়িয়া দিতে পারি কি?..."

সুশীল বলিল—"জাত থাকিবে না খুড়া মহাশয়, আর সমাজ হাসাইবেন না! এ মেয়েকে আমি উত্তম জানি; এ আমাদের একজাত—কায়স্থ। সাত শতই হউক আর চৌদ্দ শতই হউক—ইহাকে আপনি কেমন করিয়া ঘরে লইতে পারেন—পুত্রবধু করিতে পারেন? এ টাকা আপনার জলেই গিয়াছে..."

ব্রজমোহন—"সাত শত টাকা জলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার বাবা! আমি হাতের পাঁচ কিছুতেই ছাড়িতে পারি না...."

ব্রজমোহন প্রফুল্লর হাত ছাড়িয়া দিয়া শাড়ীর অঞ্চল ধরিলেন।

সুশীল বলিল—"কাপড় ছাড়িয়া দিন; চলুন, তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট।"

ব্রজমোহন ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যাও, আমি কেন যাইব?"

সুশীল পিতৃতুল্য খুড়া মহাশয়ের সহিত তর্ক বিতর্ক না করিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের উদ্দেশে ছুটিল। ব্রজমোহন প্রফুল্লকে ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন।

কৃত্রিম কন্যাদাতা ও পুরোহিতের নৌকা আটক করা হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয়ও নৌকাতেই ছিলেন। ব্রজমোহনও আসিয়া জুটিলেন। বিষম তর্কের তুফান বহিতে লাগিল। ঘরের কথা—গুপ্ত কথা; সে কথা কেহই খুলিয়া বলিতে পারেন না।

অবশেষে স্থির হইল—শেষ রাত্রে যে লগ্ন আছে,তাহার পূর্ব্বে ঘটক দ্বিতীয় কন্যা আনিয়া হাজির করিবেন। বিবাহ যেমন করিয়াই হয় আজই হইবে।

তাহাই হইল। শেষ রাত্রির শুভলগ্নে ব্রজমোহন পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করাইয়া পুত্রবধু ঘরে লইলেন।

১৭

পরদিন প্রাতে মৃত্যুঞ্জয় যখন প্রফুল্লকে লইয়া বিদায় হইতে চাহিলেন, তখন প্রফুল্লর কথা ব্রজমোহনের মনে হইল।

প্রফুল্লকে পাওয়া যাইতেছে না। সকলেই খুজিয়া হয়রাণ্ হইল—প্রফুল্ল কোথায়ও নাই। তখন একজন বলিল—"সেই কায়স্থ বউকে সুশীলের দিদি পূর্ণশশীর সহিত বউ দেখিতে দেখিয়াছিলাম।" আর একজন বলিল—"বোধ হয় তাহারই সহিত তাহাদের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে...।"

ব্রজমোহন তখনই সুশীলদের বাড়ী চলিয়া গেলেন। সুশীল তাহার ভগিনীকে লইয়া ইচ্ছা করিয়াই সারা রাত্রি বিবাহ বাড়ীতে ছিল; শেষ রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া ঘুমাইয়াছে। ভট্টাচার্য্যের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে কাঁচা ঘুম হইতে উঠিয়া বিরক্তির সহিত বলিল—"আপনাদের কারবার দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি; যে সকল বিবাহ কথা বলিতে বলিতেই সম্পন্ন হইয়া যায়, এমন সকল বিবাহের মূল্য কি খুড়া মহাশয়? পূর্ব্বে আনিয়াছিলেন একটা কায়স্থ মেয়ে; তবু সেটা ছিল—জলচল; এবার একেবারে খলার টুকানী সেকের মেয়ে সবজান? ছিঃ!..."

ব্রজমোহন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"ছেলে মানুষ, জ্যেঠামী করিও না; তুমি কেমন করিয়া জান হে মুসলমান না ব্রাহ্মণ? রাজবাড়ীর স্বর্গীয় হারু ভট্টাচার্য্যের পৌত্রী—তার ত্রিকুল বর্ত্তমান—"

সুশীল বলিল—"সাক্ষী আমার ঘরে বাঁধা খুড়া মহাশয়, এরা সব একই ভরার বেসাতি—বেশীকথা বলিবেন না..."

ব্রজমোহন চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া সুশীলের হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর চুপি চুপি বলিলেন—"বাবা মেয়েটাকে দাও, না হইলে আমি যে ধনে প্রাণে মারা যাইতে বসিয়াছি। আমার বিপদে তোমার বিপদ, তোমার বিপদে আমার বিপদ; একত্র এক পাড়ায় বাসের ইহাই ফল। বাবা আমার দাও, আমি মেয়েটাকে লইয়া যাই—"

সুশীল বলিল—"সে হইবে না খুড়া মহাশয়, আমি প্রফুল্লকে কাহারও হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিব না; সেরূপ অনুরোধ করিবেন না।..."

ব্রজমোহন মেয়ে চুরীর ভয় দেখাইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সুশীলের মুখে যে সংঘাতিক অস্ত্রের আভাস পাইলেন তাহাতে তাহার আর সে সাহস হইল না। তিনি পুনরায় নম্রভাবে বলিলেন—"মেয়েটার জন্য আমি যথা সর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়া সাত শত টাকা দিয়াছি। বাবা, এই ক্ষতি কি আমার মত লোক সামলাইতে পারে? আর আমার মত প্রতিবাসীর এরূপ বিপর্য্যয় ক্ষতি কি তোমার মত শিক্ষিত বুদ্ধিমানের করা কর্ত্তব্য। আমি যে বাবা ধনে প্রাণে মারা যাইব..."

সুশীল কথায় বাধা দিয়া বলিল—"এই ক্ষতি পূরণের জন্য যদি আপনি অধিক গোলমালে যান, আপনার অসম্মান হইবে—সকল কথা বাহির হইয়া যাইবে। মেয়েটাকে যে ঘটক ঠাকুর ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া পরিচয় দিতে শিক্ষা দিয়া আনিয়াছে, কন্যাদাতা ও পুরোহিত যে ভাড়া করা—এ সকল গুপ্ত কথাই ব্যক্ত হইবে; এ মেয়ে যে কেমন মেয়ে, তাতো কাকা কালই দেখিয়াছেন—প্রয়োজন হইলে এ মেয়ে চৌকিদার পঞ্চাইতের আশ্রয় লইবে। কাল রাত্রিতেই সে আমাকে পঞ্চাইতের কথা বলিয়াছিল। এরূপ হইলে খুড়া মহাশয় আপনাদের জাতি যাইবে—দেশে বিদেশে দুর্নাম গ্রস্ত হইবেন..."

ব্রজমোহন কথাটা বুঝিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন—"মৃত্যুঞ্জয় যে মেয়েটাকে চাহিতেছে; না দিলে সেই সাত শত টাকার দায়ে আমাকে ফেলিবে।"

সুশীল রাগ করিয়া বলিল—"সে কথার জবাব আমি কি দিব? আমি ইহাকে—মোট কথা—অন্যের হাতে দিব না। আপনারা গোল করিলে চৌকিদারের জিম্বা করিব—থানায় সংবাদ দিব। মালঞ্চায় তো এখনই চিঠি লিখিব।

ব্রজমোহন নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেলেন।

১৮

জাতি নাশের ভয়ে ব্রজমোহন ভট্টাচার্য্য ও ব্যবসায় নাশের ভয়ে মৃত্যুঞ্জয় ঘটক প্রফুল্লকে লইয়া আর কোন গোলমাল সৃষ্টি করিল না বটে কিন্তু সুশীল প্রফুল্লকে নিজ গৃহে আনিয়া একটু বিপদে পড়িল। তাহার দরিদ্র-সংসারে ছিল নিত্য অভাব; তার উপর সুশীলের মাতা ছিলেন বেজায় শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবা। প্রফুল্লকে 'ভরার মেয়ে' জানিয়া তিনি তাহাকে আর ঘরেই ঢুকিতে দিলেন না। সুশীলের অনুরোধে তাহার ভগিনী পূর্ণশশী প্রফুল্লকে লইয়া পৃথক ঘরে অবস্থান করিতে লাগিল।

প্রফুল্লর পক্ষে এ ঘৃণা-তাচ্ছল্য এ ক্ষেত্রে অম্লান বদনে সহনের বিষয় হইলেও সুশীলের নিকট তাহার মাতার ব্যবহার বড়ই বিরক্তি জনক হইয়া উঠিল।

সুশীলের পরিবারে তার এক বিধবা মাতা ও সধবা ভগিনী ব্যতীত আর কেহ ছিলনা বটে কিন্তু এই ক্ষুদ্র সংসারেরও ভরণপোষণ চলিবার মত কোন উপায় সুশীলের পিতা রাখিয়া যান নাই! সংসারের এই শোচনীয় অবস্থায়ও সুশীল নিজ অধ্যবসায় এবং উদ্যমশীলতার গুণে নিজের পড়ার বন্দোবস্ত এ পর্য্যন্ত সে নিজেই করিয়া আসিয়াছে। সে ঢাকা থাকিয়া ইংরেজী স্কুলের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। পিতার মৃত্যু হইলে যে স্কুল ছাড়িয়াছে তাহার পর আর সে ঢাকা যাইতে পারে নাই।

প্রফুল্লকে লইয়া মাতা পুত্রে একদিন বাকবিতণ্ডা হইলে সুশীল রাগ করিয়া ঢাকা চলিয়া গেল। যাইবার কালে সে পূর্ণকে পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিয়া গেল—দিদি, তুমি ইহাকে অযত্ন করিওনা বা অশ্রদ্ধা করিও না, দোহাই তোমার! আমি ঢাকা যাইয়াই মন্মথকে লইয়া আসিয়া প্রফুল্লকে তাহার হাতে দিব; এ কয় দিন মাত্র! এ কয় দিন তোমরা যা খাও—সাক্ ভাতই হউক, আর নুন ভাতই হউক—এ বেচারিকে চারিটা শ্রদ্ধার সহিত দিও—সুধু একটু মুখের আদর—আর কিছুই না..."

সুশীল ঢাকা আসিয়া মন্মথর খোজ লইল—শুনিল, মন্মথ গ্রীষ্মের ছুটির পর আর ঢাকায় আইসে নাই। যে বাসায় মন্মথ থাকিত সেখানে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া সুশীল অবগত হইল যে মন্মথর ভগিনী মারা যাওয়ায় এক মাত্র ছেলে মন্মথকে তার পিতামাতা আর ঢাকার মত দূরবর্ত্তী স্থানে রাখিয়া পড়াইবেন না; সুতরাং সম্ভবতঃ মন্মথ আর ঢাকা আসিবে না।

সুশীল চিন্তিত হইল। প্রফুল্লকে লইয়া এখন উপায় কি? দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় সুশীলের মনে হইল—ব্রজমোহন ভট্টাচার্য্য আসিয়া যখন প্রফুল্লকে নিতে চাহিয়াছিল, তখন দিয়া ফেলিলেই আজ আর এই অনর্থক চিন্তায় তাহাকে পীড়িত হইতে হইত না। কিন্তু সেই কার্য্যটা কি মানুষের কার্য্য হইত? এখন দুশ্চিন্তায় যে মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইবার পথে বসিয়াছে! একটী ক্ষুদ্র পরিবার রক্ষারও যাহার উপায় নাই, তাহার মনুষ্যত্ব রক্ষার প্রয়োজন এমন কি বেশী?

১৯

সুশীল যে বাসায় খাইয়া স্কুলে পড়িত, সে ছিল একটা বিরাট মহোৎসবের স্থান। সে বাসায় যে কত লোকে আহার করিত, তাহার নিয়তছিল না; তাহার খবর স্বয়ং বাসার কর্ত্তা রমানাথ বসুও জানিতেন না। আহারের সময় যে আসিয়া পাত লইয়া বসিতেছে, ভাণ্ডারী তাহারই পাতে নুন জল দিতেছে, বামুন ঠাকুর তাহার পাতেই ডাল ভাত তরকারী পরিবেশন করিতেছে। এইরূপ শত শত লোক এক এক বেলায় খাইয়া যাইতেছে। এই বিরাট ব্যাপারে কেহ টুঁ শব্দটী করিয়া আপত্তি করিতেছে না; বরং মাঝে মাঝে কর্ত্তা বসু মহাশয় আসিয়া ভোক্তাদিগের অবস্থা দর্শন করিয়া আত্ম তৃপ্তিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়া ভগবানের নাম স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

বসুমহাশয়ের সহিত এই আখ্যায়িকার বিশেষ কোন সম্পর্ক না থাকিলেও একেবারেই যে নাই তাহা বলা

যাইতে পারে না। সুতরাং এস্থলে ২।১ কথায় আমরা এই মহাত্মার কার্য্যের সামান্ত পরিচয় এইস্থানে প্রদান করিব। বসু মহাশয় ঢাকার জেলা কোর্টে ওকালতি করিতেন। তাহার নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলায়। তিনি ওকালতি ব্যবসায়ে প্রত্যহ যাহা পাইতেন, তাহা অন্নদানে ব্যয় করিতেন। তিনি বলিতেন—ভগবান এক-জনের হাত দিয়া দশজনকে দান ও পালন করিয়া থাকেন। আমি যাহা পাই, তাহা দশের আশীর্ব্বাদেই পাই; সুতরাং দশকে অন্নদানই আমার প্রতি ভগবানের এই করুণার উদ্দেশ্য।

বসু মহাশয়ের এক আত্মীয় আসিয়া একদিন এইরূপ বিরাট কাণ্ড দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"এমন করিয়া অন্নছত্র রাখিলে যে আপনি দেউলিয়া হইয়া যাইবেন; স্ত্রীপুত্রের জন্ম কিছুই রাখিয়া যাইতে পারিবেন না।"

বসু মহাশয় উত্তরে বলিয়াছিলেন—"সেও ভগবানেরই ইচ্ছা; রাজাধিরাজ যিনি করেন, ভিকারীও তিনিই করেন। ভগবান আমাকে যাহা দিতেছেন, তাহা যে কেবল আমার স্ত্রীপুত্রের সুখ-সুবিধার জন্ম দিতেছেন—ইহাই কি আপনি মনে করেন?"

আত্মীয়টী বলিয়াছিলেন—"নিশ্চয়। ভগবান সর্ব্বদর্শী তিনি যাহার যাহা প্রয়োজন তাহাকে তাহাই দিতেছেন; আপনাকেও আপনার প্রয়োজন মতই দিতেছেন; আপনি তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতেছেন না, ফলে নিজ ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতেছেন।"

বসুমহাশয় সেই আত্মীয় ব্যক্তির কথায় নিজের ইচ্ছাকে অতি কষ্টে দমন করিলেন। পরদিন ছিল একাদশী। যাহারা তাঁহার গৃহে আহার করিতেন, সকলকে করযোড়ে বলিলেন—"আপনারা কল্য অন্যত্র আহার করিবেন, সে ব্যয় আমিই বহন করিব, আমার গৃহে কাল আর অগ্নি জলিবে না,কাল একাদশীর উপবাস।

পরদিন বসুমহাশয়ের গৃহে অগ্নি জলিল না, নিজেও অভুক্ত থাকিয়া কাছারী করিলেন। ভগবানের এমনই ইচ্ছা, সেদিন বসু মহাশয় একটী কপর্দ্দকও পাইলেন না। সারাদিন উপবাসী থাকিয়া নিজের কষ্টে ও জনের কষ্টে শারীরিক ও মানসিক গ্লানি ভোগতো করিলেনই অধিকন্তু কোন এক ত্রুটীতে জজ সাহেবের রূঢ় কথা শুনিয়া বাসায় আসিয়া সেই আত্মীয়টীর নিকট দুঃখ ও অপমানের কথা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পরদিন হইতে বসুমহাশয়ের অন্নছত্র পুনরায় চলিল। এইরূপ অন্ন দান করিয়া সেকালে রমানাথ বসু ঢাকায় দাতা রমানাথ বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছিলেন।

দাতা রমানাথের গৃহে—বহু স্কুলের দরিদ্র বালক অন্ন পাইত, আফিসের অল্প বেতনের বহু আমলা আশ্রয় লইয়াছিল, উমেদারের জন্য তাহার গৃহ ছিল অবারিত দ্বার। অপরিচিত আগন্তুক ব্যক্তিদের পক্ষেও ছিল তাহা আপন গৃহ! ইহার উপর নিজ আত্মীয় স্বগণও মক্কল দিগের সম্বন্ধেতো কোন কথাই ছিল না।

সুশীল এই মহাত্মার অন্ন খাইয়া স্বচ্ছন্দে ঢাকায় থাকিয়া পড়িতে পাইয়াছিল। সুশীলের ন্যায় রমেশ, যাদব, মধু প্রভৃতি আরো কত নিস্সম্পর্কীয় দরিদ্র বালক যে এই মহাত্মার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছিল, তাহার সংখ্যা ছিল না। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিকট এবং দূর সম্প-র্কীয় বহু ছেলে তাহার অন্নে প্রতিপালিত হইত।

এইরূপ অসহায় অবস্থায় স্বচ্ছলতার সহিত অন্ন পাইবার সুযোগ লাভ করিয়া সকলেই যে সে সুযোগে জীবনের সদ্ব্যবহার করিতেন, তেমন নহে।

বসু মহাশয়ের বাসাটী ছিল একটী ক্ষুদ্র গলিতে; সে গলিটীর চারিদিকে ছিল বেশ্যার আড্ডা। সুতরাং যে সকল আফিসের কর্ম্মচারীদের অবসর কালে বসিবার ও ঘুমাইবার স্থান ছিল না, ঐ সকল বেশ্যালয় ছিল—তাহাদের আশ্রয় স্থল। এমন কি—উমেদার দিগের দিন ব্যাপী ঘূর্ণায়মান-কষ্টের লাঘবের এবং বসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবারও স্থান ছিল—ঐ সকল পতিতালয়। এই-রূপ কুৎসিৎ স্থানে যাতায়াতের জন্য সে কালে বিশেষ দুর্ণাম ছিল না। বরং যে ব্যক্তি নিজে পয়সা উপার্জ্জন করিয়াও একটু ফুর্ত্তিতে চলিতে না পারিত বা একটা বৈঠক খানা করিতে না পারিত, সে বেচারা সতীর্থ সমাজে 'অপুরুষ' বলিয়াই নিন্দিত হইত। স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া সেকালে সহরে বাস করা ছিল চলিত রুচি ও প্রথার বিরুদ্ধ।

বসু মহাশয়ের এক ভাগিনেয়—পরেশ ঘোষ, ছিল সুশীলের সহপাঠী। পরেশের চরিত্র পাঠ্যাবস্থায়ই এইরূপ স্থান মাহাত্মে ও সঙ্গ দোষে খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

পরেশ চিত্র আঁকিতে পারিত। তাহার সেই কৃতিত্বের গুণে ও মাতুল বসু মহাশয়ের সুপারিসে অনায়াসেই সে কালেক্টর সাহেবের আফিসে নক্সা নবিশের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছিল।

সুশীল ঢাকা আসিয়া দেখিল, পরেশ কালেক্টরীর আমলা হইয়াছে, এবং নবাবপুরে ছোট একখানা পাকা বাড়ী ভাড়া লইয়া বেশ স্ফূর্ত্তিতে বাস করিতেছে।

সুশীলের টাকার প্রয়োজন। জগতে অর্থের প্রয়োজন নাই কাহার? সুশীল পরেশের বৈঠক খানায় যাইয়া তাহাকে ধরিল—"ভাই, আমাকেও তোমার ন্যায় একটা চাকুরী যোগাড় না করিয়া দিলে চলিবে না; দেখ ভাই...

সুশীল কথা বলিতে যাইয়া যেন কাঁদিয়া ফেলিল; তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

পরেশ অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—দেখ ভাই, চাকুরী—একটু বিদ্যা বুদ্ধির দরকার; সকলেই কি চাকুরী করিতে পারে, না তাহা গাছের ফল যে ঝাঁকুনি দিলেই পাওয়া যায়?"

গরজ বড় বালাই। সুতরাং গরজীর সহ্য করিবার ক্ষমতাও থাকে অপরিসীম। সুশীলের তাহা ছিল। সুশীল পরেশের গর্ব্বিত ভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিল—"ভাই, বাড়ী হইতে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি; সেখানে এ বেলা চলেতো সে বেলা চলে না; হয়ত মা বোন আজ উপবাসীই আছেন—

সুশীল আর কথা বলিতে পারিলনা, মাটির দিকে চাহিয়া চক্ষু মুছিল।

পরেশের স্বাভাবিক সাদা অন্তঃকরণ চাকুরী মাহাত্মে যে একটু অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল, এখন সুশীলের চক্ষের জল দেখিয়া সে দৃঢ় ভাব জল হইয়া গেল।

পরেশ তাহার রৌপ্য-বাঁধা হুকায় তামাক খাইতেছিল, হুকাটী ধীরে ধীরে বৈঠকে রাখিয়া কোমরের তাগা হইতে ঝুলানো চাবি খুলিয়া একটা বড় কাঠের সিন্দুক খুলিল এবং তাহা হইতে একটা ছোট কাঠের বাক্স বাহির করিয়া তাহা হইতে দশটী টাকা গুণিয়া লইয়া বাক্স ও সিন্দুক বন্ধ করিয়া রাখিল। তারপর সুশীলের সম্মুখে টাকা দশটী রাখিয়া বলিল—এই নাও ভাই, বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও।"

সুশীল কৃতজ্ঞতায় আত্মহারা হইয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুশীলের বর্ত্তমান আচরণে পরেশ আরও নরম হইয়া গেল; সে দয়ার্দ্র চিত্তে বলিল—"তোমাদের আশীর্ব্বাদে ভাই কালই দশ টাকার কাজ পাইব; আমাকে আমার মাতুল মহাশয়ের ন্যায়ই জানিও—নরাণাং মাতুলক্রম! আচ্ছা দেখি তোমার জন্য একটা কিছু করা যায় কি না।"

সুশীল কতকক্ষণ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। পরেশের এরূপ আচরণ তাহাকে কৃতজ্ঞতায় মূক করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর সুশীল ধীরে ধীরে টাকা কয়টী তুলিয়া লইয়া নীচে নামিয়া গেল। সুশীল নীচে নামিতে নামিতে হঠাৎ ফিরিয়া পুনরায় উপরে আসিল।

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল "ফিরিলে যে?"

সুশীল বলিল—"তোমার নীচের খালি কোঠাটায় আমি থাকিতে পারি কি?"

পরেশ বলিল—"নিশ্চিন্তে।"

পরেশ হঠাৎ কথা দিয়া চিন্তিত হইল, তারপর একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল—"আমার কোন আপত্তি নাই, তবে জানতো ভাই, আমার একটু অন্য অভ্যাস আছে, তুমি আবার তাতে 'ব্রহ্মজ্ঞানী'—আমার কার্য্যে তোমার অসুবিধা না হইলে—স্বচ্ছন্দে থাকিবে; আমারও ডাকের স্থল হইবে।"

সুশীল বলিল—"আমার একটু মাথা রাখিবার স্থান হইলেই হইল—তোমার অভ্যাসে আমার কি অসুবিধা হইবে।"

সুশীল চলিয়া গেল।

২০

সুশীল বাড়ী আসিয়া শুনিল, তাহার মা প্রফুল্লকে একেবারেই দেখিতে পারেন না; এমন কি প্রফুল্ল কোন স্থানে বসিলে সেস্থানে গোবর ছড়া না দিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারেন না! পূর্ব্বর মেয়েটীকে প্রফুল্ল কোলে

লইলে তাহাকে স্নান না করাইয়া তিনি স্পর্শ করেন না। এই সকল ব্যাপার লইয়া প্রফুল্ল যেমন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—সুশীলের মাও তেমনি অতিষ্ঠ হইয়াছেন। এদিকে পূর্ণকে তাহার স্বামীর বাড়ীতে নেওয়ার জন্য তাগাদা আসিয়াছে। সুশীল ত্রিসঙ্কটে পড়িয়া অস্থির হইয়া গেল।

সুশীল প্রফুল্লকে বলিল—"মা তোমাকে মোটেই দেখিতে পারেন না, সুতরাং তোমার বড়ই বিড়ম্বনা হইয়াছে; এখন কি করা যায় বল দেখি!"

প্রফুল্ল বলিল—'আমার আর বিড়ম্বনা কি? তাঁরই ভয়ানক অসুবিধার কারণ হইয়াছি আমি। আমাকে ঢাকা নিয়া কোথাও চাকুরীতে লাগাইয়া দিন, আমি খাটিয়া খাইতে পারিব।...

সুশীল বলিল—"তোমার স্বামীর বাড়ী কোথায় বলিলে, তোমাকে না হয় সেই স্থানেই রাখিয়া আসিতে পারি।" প্রফুল্ল মুখ নত করিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল "সেখানে আমার কেহ নাই।"

সুশীল বলিল—"তুমিতো সধবা...স্বামী বর্ত্তমান..."

প্রফুল্ল চক্ষের জল অঞ্চলে মুছিতেছে, দেখিয়া সুশীল থামিয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি ঢাকা যাইতে চাও, সেখানে যে আমারই থাকিবার স্থান নাই, তারপর মন্মথও সেখানে নাই, স্থানও সে অত্যন্ত খারাপ—তোমাকে আমি তেমন স্থানে লইয়া যাইতেই সাহস করি না। বিশেষ সহরের প্রবাসী ভদ্রলোকেরা কেহই স্ত্রী-কন্যা লইয়া বাস করেন না যে তুমি কোনস্থানে খাটিয়া খাইতে পার...

প্রফুল্ল বলিল—'না হয় আমি সেখান হইতে মালঙ্কা যাইব। দিদি চলিয়া গেলে আমাকে লইয়া তাঁহার বড়ই বিপদ হইবে; তাঁহার কষ্টের ও বিড়ম্বনার কারণ করিয়া আমাকে এখানে রাখিয়া যাওয়া আপনার উচিত নহে।"

সুশীল তাঁহার মাকে অনেক বুঝাইল; কিন্তু তিনি এই অজ্ঞাতকুলশীলা কিশোরী কন্যাকে গৃহে লইয়া থাকিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা একদিন পূর্ণ ও প্রফুল্লকে লইয়া সুশীল নৌকায় উঠিল। এবং পূর্ণকে পথে তাহার স্বামীর গৃহে রাখিয়া প্রফুল্লকে লইয়া আসিয়া ঢাকা পঁহুছিল।

সুশীল পরেশ ঘোষের বৈঠকখানা ঘরের নীচের কোঠায় নিজের জন্য স্থান রাখিয়া গিয়াছিল; প্রফুল্লকে আনিয়া তথায় আশ্রয় দিল।

সুশীল তাহার অন্নদাতা বন্ধু মহাশয়কে যাইয়া নিতান্ত অকপট চিত্তে-সরলভাবে প্রফুল্লর কথা খুলিয়া বলিল এবং এই সঙ্গে নিজের একটা উপার্জ্জনের বন্দোবস্ত হইতে পারে কিনা তৎসম্বন্ধে অতি বিনীতভাবে এবং গলদ্ অশ্রু লোচনে নিবেদন করিল।

অবস্থা শুনিয়া বন্ধু মহাশয় বলিলেন—"সেই বিপন্না মেয়েটীর আহারের ব্যয়ও আমিই দিব; তোমার চাকুরী সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলিতে পারিলাম না,—থাক, খাও, সময়ে দেখা যাইবে। ভগবান কাহারও ন্যায্য বাসনা অপূরণ রাখেন না; ধৈর্য্যের সহিত উপযুক্ত সময়ের প্রতিক্ষা চাই!"

সুশীল প্রফুল্লর স্থান এবং আহারের যোগাড় করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, কেননা এরূপভাবে একটী অজ্ঞাতকুলশীলা কিশোরীর দায়িত্ব তাহার ন্যায় একটী যুবকের পক্ষে—সে কিছুতেই সঙ্গত ও নিরাপদ মনে করিতেছিলেন না। সে অন্য গতি নাই দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচভাবে এদিক সেদিক থাকিয়া—এক একটী দিন কাটাইয়া দিতেছিল।

২১

প্রফুল্ল বাঁশের বেত তুলিয়া সুন্দর সুন্দর ধামা ও ঝাঁকা প্রস্তুত করিতে পারিত, বেতের ও বাঁশের পাখা বুনিতে পারিত; খেজুর পাতার ফরাস ঝাড়ুনি প্রস্তুত করিতে পারিত। এগুলি সে মালঙ্কার যমুনার সহিত প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। সুশীলদের বাড়ীতে অবস্থানকালে পূর্ণ শশীর সাহায্যে বেত ও বাঁশ সংগ্রহ করিয়া সে কতকগুলি সের, ডালা, কুলা, ধামা, পাখা ও ঝাড়ু প্রস্তুত করিয়াছিল। ইহার কতক সে পূর্ণকে দিয়াছিল, কতক সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল।

একখানা সুন্দর বাঁশের পাখা এবং একটা খেজুর পাতার ফরাস ঝাড়ুনী সুশীলের হাতে তুলিয়া দিয়া প্রফুল্ল বলিল—"এই দুইটা বিক্রয় করিয়া কিছু বেত আনিলে বাকীগুলি বাঁধিয়া বিক্রয় করা যায়। এবং তাহাতে আমাদের মালঙ্কা যাইবার খরচ হইতে পারে।

পাখা ও ঝাড়ুনী—দুটাই সুশীলের নিকট বেশ সুন্দর বোধ হইতেছিল; সে ঐ দুটা দুই তিনবার দেখিয়া বলিল—"পরেশ বড় সৌখিন শিল্পী, সে দুঃসময়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছে; এ দুটা তাহাকে দেখাই, যদি তার পছন্দ হয়, তাহাকেই দিব। বিক্রয় করিলে আট দশ পয়সা হইবে, এই পয়সা তাহার নিকট হইতে চাহিয়াও লইতে পারিব।"

প্রফুল্ল মৌন থাকিয়া সম্মতি দিলে সুশীল নীচ তলা হইতে পরেশকে ডাকিয়া ডাকিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

পরেশ ডাকিয়া বলিল—"উপরে আইস—কেহ এখানে নাই..."

সুশীল উপরে যাইলে পরেশ বলিল—"তুমি আসিয়াছ—তার প্রমাণ পাইয়াছি; কিন্তু দুদিনের মধ্যে তোমার সাক্ষাৎ নাই, বায়ুগ্রস্ত ভূতের মত কেবল ঘুরিয়া ফির কেন? বাঃ তোমার হাতেতো দুটা বেশ পছন্দের জিনিস হে! কোথায় পাইলে?" বলিয়া পরেশ তাহার হাত হইতে ঝাড়ুটা ও পাখাটা লইয়া দেখিতে লাগিল এবং অবশেষে বাঁ হাতে পাখাটা রাখিয়া ডান হাতে ঝাড়ু দ্বারা তাহার সুন্দর ঝল্‌ঝলা পরিস্কার ফরাসটী ঝাড়িতে লাগিল।

সুশীল বলিল—"কি করি ভাই, অভাব আমাকে ভূতগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে; আমি কোন দিকেই পথ দেখিতেছি না—উপায় দেখিতেছি না। নিশ্চিন্তে নিজের পেটে ভাত দিতেছি বটে কিন্তু আমার যে আরো পেট আছে...

পরেশ বলিল—"একটী মেয়েকে মাত্র দেখিলাম, তোমার মাকে আন নাই বুঝি?...

"মাকে আনিতে গেলে আমার বিপদের আর অন্ত থাকিবে না, তিনি একান্ত 'শুচীবাই'গ্রস্ত; পুকুর আর গোবর ছড়া ব্যতীত তার মুহূর্ত্ত চলে না...

পরেশ বলিল—"সে যে কি বিপদ, তাহা আমি জানি। আমার মাসীমা ছিলেন এমন শুচীবায়ুগ্রস্ত যে পাক করিবার কাঠগুলিও পুকুরের জলে ডুবাইয়া লইয়া চৌকা ধরাইদিতেন, নুনটুকু পর্য্যন্ত ধুইয়া ব্যঞ্জনে দিতেন! আর স্নান—সেতো কথায় কথায়—দিনের মধ্যে যে কত বার হইত, তার লেখা জুখাই ছিল না..

সুশীল বলিল—"তবেতো জানই। কিন্তু ভাই এখন উপায় কি?"

পরেশ—কোন চিন্তা নাই, ভগবান একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন। আমরা খাইতে পাইলে, তুমিও খাইবে—তোমার বোন্‌ও খাইবে...

সুশীল "এখানে খাওয়ার ব্যবস্থার কোন গোল নাই, দুজনেরই কর্ত্তার বাসার ভাত পাইবার হুকুম হইয়াছে; কিন্তু কেবল ভাত হইলেই তো আর চলে না, বাড়ীতে যে একেবারে অন্ন ভক্ষ্য ধনুর্গুণেরও ব্যবস্থা নাই—তার পর ওঁকে তার বাড়ীতে পাঠাইতে হইবে—হাত পা মেলিতেই পয়সার দরকার..."

পরেশ অবহেলার সহিত বলিল—"সব হবে; তারপর—এই ঝাড়ুটা আমি রাখিলাম, পাখাটাও থাক। তুমি টাকা নেও, আর দুটা কিনিয়া লইও।"

পরেশ স্বীয় কোমরের কাপড় উল্টাইয়া একটী টাকা বাহির করিয়া লইয়া ফরাসের উপর ফেলিয়া দিল।

সুশীল বলিল—"এ দুটা তোমার জন্যই আনিয়াছি। আমার ওই বোন্‌টী এগুলি প্রস্তুত করিতে পারে; এগুলি বিক্রয় করিয়া ওর যাওয়ার খরচ সংগ্রহ হইবে। ওর প্রস্তুত এরূপ আরও আছে, কিছু বেত আনিয়া দিলে আজই আরও কয়েকটা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবে।"

পরেশ পাখা খানার দিকে খুব মনযোগের সহিত খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া একটী ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"যাও ওঁকে বেত বাঁশ আর খেজুরের পাতা আনাইয়া দাও; এরূপ শিল্পের আদর খুব হইবে।"

সুশীল বলিল—টাকাটা রাখ—ইহার মূল্য তোমাকে দিতে হইবে না। তবে কয়েকটা পয়সার প্রয়োজন, এক গাঁট বেত হইলেই হয়, তাই দাও। আমার নিকট যে তাও নাই..."

"সে জন্য লজ্জা কি? তুমি পয়সাও নাও টাকাও নাও; ওর মূলধনটা আমি দিব। লজ্জা বোধ কর—বরং বিক্রয় করিয়া টাকাটা ফেরত দিও..."

পরেশের কথায় সুশীল উৎসাহ পাইয়া বলিল—"তোমার আশ্রয়ে আছি, তুমি সর্ব্বদাই সাহায্য করিতে পারিবে; এখন আমার টাকার কোন প্রয়োজন নাই, টাকাটী রাখ, কয়েকটী পয়সা দাও—কয়েক গাছ বেত আনিতে হইবে,তাহা হইলে আরও কয়েকটা প্রস্তুত হয়..."

পরেশ বলিল—"আর কি কি আছে দেখাও দেখি।...

সুশীল নীচে যাইয়া কয়েকটা বাঁশের ও আত্ত বেতের ধামা, ছোট ডালা, সের, পেটারা, পাখা লইয়া উপরে আসিল।

পরেশ বলিল—"কুছ পরোয়া নেই; সুন্দর জিনিস ওর পাইকার হইব আমি নিজে; দিব্বি ব্যবসা হইবে। তুমি টাকাটা নাও—বেত বাঁশ প্রভৃতি আনাইয়া দাও! ভাল একটা দিন দেখিয়া আমিই ইহার কারবার করিব। তুমি আমার কারবার দেখিবে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।

পরেশ টাকাটী লইয়া উৎসাহের সহিত নীচে নামিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

গ্রীষ্ম।

প্রচণ্ড বহ্নির রথে দীপ্ত কলেবর,
কেবা ইনি রক্ত তপ্ত হিরণবরণ?
রথে বদ্ধ অশ্ব সপ্ত ধাইতেছে বেগে,
রোহিত কেশর করে অগ্নি উদ্গিরণ।

ভীমমূর্ত্তি গ্রীষ্মদেব ধাইছে যেপথে
পঙ্কজের হাস্য সেথা ক্ষীণ লুপ্তপ্রায়।
সতধা বিদীর্ণা পৃথ্বী, তারি মাঝে আজ
সরসীর নীর পঙ্ক তরাসে মিশায়।

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তেজঃ * সহিতে না পারি
কমলিনী ধনী আহা ধূলিতে লুটায়।
রুদ্রনেত্র ক্রোধদীপ্ত পতিরে নেহারি
কোমলা অবলা যেন সভয়ে লুকায়।

পত্রশূন্য তরুদল নগ্ন দৈত্যপ্রায়
গ্রীষ্ম-বজ্রপাতে হত ক্ষত শোভাহীন;
শাখি শাখে পাখীকুল নাহি আর গায়
বাজে যেন দশদিকে বেদনার বীণ!

পিপাসা-কাতরকণ্ঠ চাতকের দল
"জল দেরে" জলদেরে ডাকিয়া আকুল।
বিমল "ফটিকজল" লভিবার আশে
আকাশের পানে কেহ চাহিয়া ব্যাকুল।

প্রতপ্ত-প্রস্তর পূর্ণ পর্ব্বত কন্দরে
লুপ্তশক্তি পশুরাজ শ্রান্ত ক্লান্তকায়।
চারিভিতে মৃগকুল ছুটে জল-আশে
উহাদের পান আজি নাহি সে তাকায়।

নাহি করে কেকাবাণী নাচিয়া নাচিয়া—
মধ্যাহ্ন নিদাঘ তাপে তপ্ত শিখিরাজ।
বিশাল পুচ্ছের তলে বাসা লয় ফণী,
ফণীর ফণার ছায়ে রাজে ভেকরাজ।

নদ নদী বাপী দীঘী কাসার পল্বল
হ্রদ খাত সরোবর ঝিল বিল যত।
বিধির বিধানে, তাঁর প্রখর শাসনে,
নীরবে কাঁদিয়া মরে যেন হত যত।

কুঞ্জে কুঞ্জে জেগেছিল বাসন্তী সুষমা
ভেসেছিল এ ধরণী লাবণ্য বন্যায়;
যৌবন বিগমে এবে প্রউঢ়া প্রকৃতি
কোবিদ হৃদয়ে নাহি সেভাব জাগায়।

ফাগুনের ফাগে রাগে রঞ্জিত অধর
পাটল পুষ্পের বর্ণে রাঙা গণ্ড দেশ,
রাজে না তেমন আজ রমণীর সাজে
কামিনী-আননে নাই কোমলতা লেশ।

উষ্ণরশ্মি রশ্মিসনে মিশিয়া পবন
ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে রুদ্রবেগে ছুটিতেছে হুহু।
ধূ ধূ মরুভূমি সম কান্তার কানন,
প্রাণের আবেগে পিক নাহি গায় কুহু।

গ্রীষ্ম, শীত, রৌদ্র, বৃষ্টি, আলো ও আঁধার
করে কেলি কোলাকুলি দর্শনের দেশে।
গ্রীষ্মকে জানিলে পরে শীতের বিজ্ঞান
আঁধারের অপগমে চির আলো শেষে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

* "শুক্রন্তেজো রেতসি চ বীজ বীর্য্যেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যমরঃ॥

নবযুগের স্পন্দন

(১)

আজকের দিনে সমস্ত জগৎ জুড়িয়া যে বিপুল জীবন স্পন্দন জাগিয়া উঠিয়াছে—তাহারই উদ্দীপ্ত লীলা এই পুরাতন দৈন্যশয্যাশায়িত ভারতবর্ষের চির মুহ্যমান তন্দ্রা আচম্‌কা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার অবসন্ন হৃৎ-পিণ্ডের মধ্যে এক নূতন চাঞ্চল্য সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। এতো আমরা জানিতাম যে জন্ম হইতেই বিধাতা আমাদের ললাটে দাসখত লিখিয়া দিয়াছেন—কোন রাষ্ট্রতন্ত্রই হোক মান্ধাতার আমল হইতে কল্পীর অবসান পর্য্যন্ত কিছুরই আজ্ঞার অধীন হইয়া নীরব হাস্যমুখে অন্তহীন দাস্যের বোঝা বহিয়া যাইব ইহাতেই আমাদের সনাতন

অস্তিত্ব রক্ষিত হইবে—এমনকি একথাও আমরা বুক ফুলাইয়া প্রচার করিতে লজ্জাবোধ করি নাই যে এমনভাবেই ভারতবর্ষ সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে। মিসর আজ রসাতলে, ব্যাবিলন চিহ্নহীন কিন্তু ভারতবর্ষ! সে এখনও বহুকালের জীর্ণ পুরাতন মমীটির মতই টিকিয়া আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ যদি কোনো সৃষ্টিছাড়া জায়গায় স্থান পাইত, যেখানে সবই নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য, তবে একরকম করিয়া বরাবর টিকিয়া যাইত সন্দেহ নাই, কিন্তু অদৃষ্ট দোষে সে এমন পৃথিবীতেই স্থান পাইয়াছে, যে তার আশে পাশের মানুষগুলো বরফের মত প্রবাহ-হীন ও কঠিন নয়—ঝরণার মতন ও চলনশীল—বাহির হইতে তাই উদার চিত্তস্রোত তার এই আড়ষ্ট-মনকে সজোরে আঘাত দিতেছে—এক মুহূর্ত্তও চুপ করিয়া নিঝুম ঘুমের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে দিতেছে না।

একটা জাতি যতই ম্রিয়মান হোক, একথা সত্য যে তার অন্তর মরে না; অন্তরের মধ্যে তার জীবনের অনন্ত-প্রবাহ বহিয়াই যায়, সে কেবল বাহিরে বিকশিত হইতে পারে না, এইমাত্র! কিন্তু বাইরের জীবন্ত প্রাণ যখন তার সুপ্ত চেতনাকে আঘাত দেয় তখন তার প্রতিঘাতে জীবনীশক্তি উদ্বোধিত হইতে বাধ্য—কেননা এজগতে জড়তার হাজার অত্যাচার সত্বেও জীবনই অমর, যৌবনই অক্ষয়।

এই ভারতবর্ষেই তার সূচনা প্রকাশ পাইয়াছে। আজকের দিনে তাই নবীন ভারত বিশ্বসভায় তার মনুষ্যত্বের—তার কর্ত্তৃত্বের দাবি নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিতেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে ও সে আজ প্রবীনের তিরস্কার ও শাস্ত্রের লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াও স্বাধীন বিচার, ও স্বাধীন ব্যবহারের দাবি চাহিতে লজ্জা বোধ করিতেছে না।

(২)

বর্ত্তমান সময়ে বিশ্বহৃদয়ে এই সুমহৎ সত্যটি ক্রমশই নানান্ অন্ধকার কাটাইয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, যে সামাজিক বা রাষ্ট্রীক্ সমস্ত আইন কানুন্ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকে অতিক্রম করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের ভিতরে এমন একটি গৌরবময় সত্বার সিংহাসন পাতা রহিয়াছে বাইরের শাসন যাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। সেখানেই মনুষ্যের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বের মূল্যে দীন দরিদ্রেরও মূল্য মহান্—সে কাহারো ক্রীতদাস নহে—সমাজই বলো আর সাম্রাজ্যই বলো, কিছুরই খাতিরে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষেরও মধ্যকার ভাগবত সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে কিছুমাত্রও ক্ষুন্ন করে না! আত্মার সেই আনন্দময় স্বারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সকলেই রাজাধিরাজ।

কিন্তু অন্তরের সেই স্বাধীনতা তো শুধু অন্তরকে লইয়াই সমাপ্ত নয়—বাইরে সে তার অবাধ অবারিত ব্যপ্তি। সে চায় সমস্ত জড়তার বন্ধন চূর্ণ করিয়া বিশ্বের উন্মুক্তপথে আপনাকে বহাইয়া লইয়া যাইতে। সে চায় তার বিশেষ অহঙ্কারটিকে সুখে দুঃখে মণ্ডিত করিয়া তুলিতে। জীবনের সমস্ত সম্ভোগকে সে চাহে, সমস্ত কর্ম্মকে। বিশেষ আভিজাত্যের দোহাই দিয়া মানুষকে যতই উৎপীড়ন করোনা কেন, মানুষের এই বিচিত্রতার স্পৃহা, তাহার অন্তরতম ও অফুরন্ত প্রাণটাকে আপন সুবিধামত একটি নির্দ্দিষ্ট কৃত্রিম পরিমাপের মধ্যে বদ্ধ করিবার ফরমাইস করিলেও সে তাহা মানিবে কেন?

জ্ঞানে, ভোগে ও কর্ম্মে স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিবার একটা প্রচণ্ড বাধা উৎপাদন করিয়া সমাজ ও সাম্রাজ্য মানুষকে যে জড়পদার্থ বানাইতে চাহিতেছে মানুষের সমস্ত ঐষণাতার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছে। মানুষের ভোগ প্রেরণাকে সেই জন্যই আর কৃত্রিম নিয়মে সংযত করিয়া রাখা দায় হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমিক্ বলিতেছে বণিককে যে, "তুমি তোমার বিরাট্ অট্টালিকায় অতৃপ্ত ভোগের চরম চরিতার্থতায় আপনাকে ফুঁকিয়া দিবে, আর আমরা নিশিদিন বুকের রক্ত জল করিয়া তোমাদের উপকরণ যোগাইব আর বিনিময়ে পাইব না কানাকড়িও! এ চলিবেনা! সুখের অধিকারী তোমার ন্যায় আমিও—কেননা আমরা উভয়েই মানুষ।" সমাজকারকে এই জন্য তরুণমনা যুবক বলিতেছে "তোমার শাস্ত্র বচনে আমি আমার জ্ঞানস্পৃহা ও ভোগস্পৃহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবনা।"

নবীন আত্মা চাহিতেছে জগৎকে উপভোগ করিতে ও জগৎকে জানিতে—যে জড় সমাজ তার বাধা, তাকে সে পুড়িয়া ছাই করিতে প্রস্তুত।

প্রাচীন নীতিবিশারদগণ ইহাতে চকিত হইয়া কহিতেছেন "একি। এযে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতার আয়োজন।"

কথাটা খুব মিথ্যা নয়। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে ভয় পাইলে চলিবে না। বহুযুগের শৃঙ্খলকে ভাঙিয়া প্রথমে জাগরণের যে উন্মেষ হইবে তাহা প্রথমতঃ যে খুব নিয়ম মানিয়া চলিবে তাহা নয়; তাহাতে অনেক অসঙ্গতি ও অনিয়মও দেখা যাইবে কিন্তু ক্রমশঃ স্বাধীনতা আপনার আনন্দেই সেই নিয়মকে মানিয়া চলিবে। যাহা আত্ম বিরোধী নহে—সেই নিয়ম, যাহা কোনো সঙ্কীর্ণ দেশ কালে বদ্ধ নহে—যাহা চিরন্তন—বিশ্বের সমস্ত ব্যাপারকে যাহা ছন্দিত করিয়া তুলিতেছে—কেননা শৃঙ্খলই আত্মার পক্ষে বন্ধন, শৃঙ্খলাতে তার মুক্তিরই বিকাশ। বিশ্বশৃঙ্খলার মধ্যে কোথাও ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করিবার কোনো কথা নেই—মানুষ যতই সম্পদশালী ও গৌরব মণ্ডিত হোক, সে তাকে নীচে নামাইবে না—সে প্রবৃত্তিকে বাসনাকে দাবাইয়া রাখেনা—তাহাকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট হইতে বাধা দেয় না। সে আপনাকে সমস্ত সুখদুঃখের আড়ালে রাখিয়া সে সকলকে দিতেছে একটি বৃহৎ সঙ্গতি-সামঞ্জস্য। কিন্তু তথাপি স্বাতন্ত্র্যের প্রথম উত্তমে সেই শৃঙ্খলা সেই সঙ্গতি অকস্মাৎ ভঙ্গ হইয়া যাইবেই। একথা মনে রাখিতে হইবে—শৃঙ্খলাই সব চেয়ে বড় ব্যাপার নহে, বড় কথা লীলা। জীবনের আনন্দ একবার জাগিয়া উঠিলে তাহা উচ্ছৃঙ্খল হইলেও উত্তম। কেননা সে ক্রমশই একটি সামঞ্জস্য আবিষ্কার করিয়া লইবে, তবু সে পুঁথির বাঁধ স্বীকার করিবে না। যদি বল যে শুধু অনিয়ম নয়, ইহা হইতে আসিবে অমঙ্গল। তবে বলি, যে যেখানে সমস্তই নিযুপ্ত নিস্পন্দ সেখানে যে সমস্তই জড়: যেখানে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাতে যদি পাশবিকতা আসিয়া পড়ে, মৃত্যুর চেয়ে সেই যৌবনের কলঙ্কও ভালো; —কেননা কলঙ্ক মুহূর্ত্তেই ধুইয়া যায়—জড়তার নিষ্ক্রমণকে বিনাশ করিতে বহুযুগের প্রয়োজন। চিত্ত একবার জাগিয়া উঠিলে পাপ, অন্যায় ও লাম্পট্যকে সেই নবোদ্বোধন অবলীলায় পুণ্যে, প্রেমে ও যথার্থ জীবনে আকারান্তরিত করিতে পারে। যতদিন তা না পারে, ততদিন সমস্ত ব্যভিচারকেও আমরা সহ্য করিব, কিন্তু পশুত্বকে দমন করিতে গিয়া তাকে জড় পদার্থে পরিণত করিব না। আত্মার আনন্দ আপনা হইতেই পাপকে পুণ্য করিয়া তুলিবে।

বস্তুতঃ স্বাধীন চিত্তের উন্মেষের ফল অমৃতই হোক্ আর হলাহলই হোক্ এগুলোকে আমি মানব ইতিহাসের একটি পরম ধর্ম্ম ব্যাপার বলিয়া মনে করি। ইহাতে রহিয়াছে অন্তরাত্মার সেই অনন্ত ঈষণা।

(৩)

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র জড়প্রাণে চেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। একথা মনে রাখিতে হইবে, মানবযুগের কোনো এক নবীন-বসন্ত দিনে যখন কোনো জাতি একবার স্বাধীন যৌবনের গান গাহিয়া উঠিয়াছে তখন সেই ফাল্গুনের লীলায় সব জাতিকেই একবার নাড়াচাড়া দিয়া উঠিতেই হইবে; কেননা ইহাই প্রাণের ধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্মের প্রেরণায় ভারতবর্ষ আজ জাগিয়াছে। সে আজ এই কথাটুকু বুঝিতে পারিয়াছে—জীবন্মৃত হইয়া যুগযুগান্ত কোনোমতে পৈতৃক প্রাণটিকে জিয়াইয়া রাখারচেয়ে এক নিমেষের স্ফূর্ত্ত স্পন্দিত জীবনের জন্যে মরাও শ্রেয়। এইটুকু সে আজ বুঝিয়াছে, যে, যে তামসিকতার অচল অটলতা তাকে এতদিন ধরিয়া ঘিরিয়াছিল, তার অন্ধ আওতা হইতে কোনমতে আজ তাহাকে বিশ্বের চিরতরঙ্গিত প্রাণ-লীলার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে—তাহাতেই হইবে তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তি।

এই স্বাধীনতার প্রথম উত্তেজনায় অবশ্য ভাঙনের দিকটাই প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল—গত শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহা বেশ বোঝা যায়। জীবনের বিকাশের জন্য একটি যুগের প্রয়োজনও খুবই ছিল। কিন্তু আমাদিগকে আরো অগ্রসর হইতে হইবে। এখন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গড়িবারও শক্তি থাকা চাই—নহিলে শুধু নর্ত্তন-কুর্দ্দন ও লম্ফঝম্ফই সার হইবে।

বস্তুতঃ সৃষ্টি করিবার প্রতিভাই প্রাণের। প্রাণ বিকাশশীল। বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে পরিবর্ত্তন

অর্থাৎ ভাঙা ও গড়া। এই ভাঙিবার ও গড়িবার প্রতিভা লইয়া নব নব কর্মক্ষেত্রে সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে যেমন থাকিবেনা—জড়তার বন্ধন, তেমনি থাকিবে না—গঠনসামর্থ্যহীন উন্মত্ততার ফেনিলোচ্ছল চঞ্চলতা।

একমাত্র য়ুরোপের অনুপ্রেরণায়ই আমরা শুধু ভাঙিতেই পারিব—কিন্তু গড়িতে হইলে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে—নকলগিরিতে চলিবে না। য়ুরোপের কাছথেকে যাহা পাইব, তাহাকে নিজস্ব করিয়া নিজেরই আকারের মধ্যে মিলাইয়া লইতে হইবে। এই নিজত্বের মধ্যে অতীতের প্রভাব রহিয়াছে অনেকখানি—সেইজন্ত অতীতকেও ভুলিলে চলিবে না। অতীতের মধ্যে যাহা চিরন্তন, বর্তমানকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহারি ছাঁচের ভিতরে ঢালাই করিয়া। যুগান্ত ধরিয়া যে একটি সনাতন রূপ, একটি শাশ্বত আকার ভারতবর্ষ ধারণ করিয়াছে—বর্তমান যুগে প্রকাশ পাইবে তাহারি একটি নব-বিকশিত লীলা। অতীতকে আমরা বহু বহু নকল করিব না সত্য—কিন্তু তবুও তাহার সহিত যোগভ্রষ্ট হইব না। এইভাবে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ থাকিয়াই য়ুরোপের সহিত সম্মিলনে ও য়ুরোপের নিত্য আদর্শ গ্রহণে ভিতরে ভিতরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

কিন্তু ভারতবর্ষের যাহা যথার্থস্বরূপ তাহাকে আমরা ভুলিয়া গিয়া তাহার গাত্রমল কতকগুলি আবর্জনাকেই চরম মূল্য দিতেছি। এই আত্মবিস্মৃতিই হইয়াছে এ জাতির সনাতন জড়ত্বের নিদান।

ভারতবর্ষীয় সাধক বলিতে আমাদের মনে এমন এক কিম্ভুতকিমাকার অরণ্যচারী কৃশ শরীর তপস্বীদের কথা মনে পড়ে—শুষ্কতা ও দৈন্তই যারা বরণ করিয়াছিল। জগৎকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া যারা কেবলি জপই করিত; মাধুর্য্যকে বলি দিয়া যারা কঠোর নিবৃত্তিমার্গের নির্মম তামসিকতাকে সাত্বিকতার অন্ধ মোহে আরাধনা করিত; অলস ঔদাসীন্তে যারা সুখদুঃখময় কর্মসংসারকে হেয় জ্ঞান করিত।

ভারতবর্ষীয় সমাজ বলিতে আমাদের চোখে সেই এক গণ্ডী পরায়ণ সমাজেরই স্মৃতি ভাসিয়া উঠে—যাহা কেবল চতুর্দিককে দূর দূরই করিয়াছে, নিষ্ঠুর অহঙ্কারে যাহা বিজাতির সহিত বিজাতিকে পানাহারের সংমিশ্রণ ও যৌন মিলনকে বর্জন করিয়া চলিয়াছে; দুৎমার্গেই যে সমাজ নিরর্থক কতকগুলি নিয়মাবলী দ্বারা আপনাকে জড়াইয়া অষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে জীবনকে বাঁধিয়া অন্ধ অচলায়তনে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের তাহা গাত্র-মল মাত্র, তাহার অঙ্গ লাবণ্য নহে। ভারতবর্ষের সভ্যতা সেই উদারতম সভ্যতা—যাহার প্রতিষ্ঠা কর্মময় ও ভোগময়; এই বিশ্বজীবনে যৌবনের আবেগে যাহা সকলকে আপন করিয়া লয়, ইতর ভদ্রের গণ্ডীবিচার যে করে না; যে সভ্যতা সৃজনশীল—গতিশীল, যুগে যুগে যাহা নব নব আন্দোলন লীলার মধ্য দিয়া আপনাকে বিচিত্রভাবে হিল্লোলিত করিয়া তুলিয়াছে; যে সভ্যতা এক যুগের নিয়ম অনুষ্ঠানকে শুষ্ক কুসুমের ন্তায় পরিত্যাগ করিয়াছে অপর যুগে; ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়া যাহা অনন্তের অভিমুখে ঘূর্ণিবার গতিতে বিকসিত হইতে চলিয়াছে; যে সমাজের স্থিতি সহজভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া ও গতি-জীবনের সমস্ত অংশকে বিচিত্রভাবে লীলায়িত করিয়া; যে সমাজ অন্তের কাছ থেকে এমন কি অনার্য্যের কাছ থেকে পর্য্যন্ত শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই, বিধর্মীকেও যে একমাত্র আনন্দময়-বিবাহ বন্ধনে আপনার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। যে সমাজ স্বাধীন জীবন ও স্বাধীন জ্ঞান-ধারার উৎস ছিল, উপনিষদের যুগে যে সভ্যতা ব্রহ্মের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, পুরাণের নব নব কল্পনায় যাহা আপনার নিরাকারত্বকে এক অপরূপ অনির্বচনীয় মূর্তিতে সাকার করিয়া তুলিয়াছিল—গীতার কর্মযোগে যাহা জীবন্ত—যে সভ্যতা একদা বুদ্ধের সাত্বিক তপঃপূত আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া বৃথা-আচারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধকার গুলিকে অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছিল—তান্ত্রিক শাক্তধর্মে ও বৈষ্ণবীয় ভক্তিধর্মে যাহা বিচিত্র ভঙ্গিমায় একদিন পরমানন্দে নৃত্য করিয়াছিল, যে সভ্যতার অবনতির যুগেও কবীর নানক প্রভৃতি ঋষিগণ মুসলমান হিন্দুকে মিশাইয়া লইয়াছিলেন, চৈতন্তদেব যাহার প্রেম-

তরঙ্গ প্লাবনে বিশাল ভারতবর্ষকে ভাসাইয়াছিলেন। যে সভ্যতা কপিল, শঙ্কর, রামানুজের মত দার্শনিক, কালিদাস ভবভূতি চণ্ডীদাসের মত কবিকে জন্ম দিয়াছে; যাহা সঙ্গীতে ও শিল্পে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে; যে সভ্যতা বিশ্ববিজ্ঞানে এত সমুন্নত ছিল যে তার কতক টুক্‌রা যাহা এখন রসায়ন, আয়ুর্ব্বেদ ও যোগশাস্ত্রে পাওয়া যায়—তাহা বিশ্বকে চমৎকৃত করিতেছে। যে সভ্যতা আপন স্বদেশের গণ্ডীটুকুতেই সন্তুষ্ট না হইয়া দেশদেশান্তে বাণিজ্য সংস্থাপন করিয়াছে —অর্থাৎ যে সভ্যতা যৌবনের ও প্রাণের আধার ছিল— হিন্দু সভ্যতা তাহাই।

কিন্তু হিন্দুসভ্যতার এই সোনার যুগ—সত্যযুগ আর রহিলনা। দিন দিন সে নিস্তেজ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল। জীবনের বদলে সে পাইল কঠিন জ্ঞান; সে জানিল ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই মিথ্যা মন্ত্রকে সে সকলের উপরে সমুন্নত করিল—এই মিথ্যা মন্ত্রকে সে ঘরে ঘরে নিনাদিত করিয়া তুলিল—এই মিথ্যা মন্ত্রের আদর্শে সে ঘর গড়িল সমাজ গড়িল—অবশেষে এই মিথ্যা মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই শুষ্ক হৃদয়ে রুদ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধনেত্রে ও বদ্ধ অন্ধকারে কখন আপনার অজ্ঞাতসারে অবশ হইয়া গাঢ়তম তমের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় হইল।

তারপর বহু শতাব্দী কাটিয়া গেছে তবু সে আপন তামসিকতায় অচল অটল—স্থাণুবৎ অবিকম্পিত। কিন্তু বিধাতার প্রাণ দিয়া গড়া এই হিন্দুজাতি কি এই দুর্গতির অজ্ঞানের মধ্যে চিরাবসানপ্রাপ্ত হইতে পারে? তাই তিনি প্রেরণ করিলেন য়ুরোপকে ইহার উদ্ধার কল্পে—তাই আজ সহসা পশ্চিম দিক হইতে সূর্য্যদেব আসিয়া তরুণ কিরণ ছটায় চৌদিক্ রঞ্জিত করিয়া প্রাচীর ললাটকে স্পর্শ করিয়াছে।

য়ুরোপ হইতে আনন্দ-মলয় আসিয়া ফুটাইয়া তুলিল— অবসন্ন ম্লান ভারতহৃদয়ের সহস্রার শতদলটীকে; ভারতের জড়সমাজে স্পর্শ করিল—জাগ্রত জীবন্ত লীলাময়ী য়ুরোপীয় প্রকৃতির একটি প্রচণ্ড উন্মেষণা।

আজ ভারতবর্ষ এই অভিনবযুগের এক রেনেসাঁসের নববসন্ত বেদনার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল যে— তার আশার, তার ভরসার আর সীমা নাই। সে দেখিল— তার মাথার উপরে ঝলমল করিতেছে—আলোক ভরা এই উদার আকাশ, আর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে—ধন ধান্য পুষ্পশোভিতা সমৃদ্ধিশালিনী সুবিশাল বসুন্ধরা। এই নবযৌবন যাত্রার জন্য আকাশে বাতাসে কোন এক চির পিপাসিত বাঁশরীর ধ্বনি বেদনার সুরে তাহার কর্ণকুহরে বাজিয়া উঠিতেছে। তাহা তাহাকে পাগল করিয়া দিয়া তাহার সব আগল ভরিয়া দিতেছে। আজ তাইত সেই যাত্রার জন্য, সেই জাগরণের জন্য ব্যাকুলতা; অনন্ত জীবনকে ফুটাইয়া তুলিবার সেই ব্যাকুলতা আজ শুনিতেছি নবযুগের নবীন সন্ন্যাসীদের জাগ্রত মন্ত্রে।

রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের কণ্ঠ তাই আজ ঝঙ্কারিত করিয়া তুলিতেছে সেই উদ্বোধনের সঙ্গীত— আজ তাহারি রণন অশ্রুত সুরে দিগন্ত নন্দিত করিয়া তুলিয়াছে।

রামায়ণে গুপ্তচর।

মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়াছেন, চক্ষু যেমন সতত দেহের সৌষ্টব সংবর্দ্ধনার্থ নিযুক্ত থাকে, প্রজাহিতার্থী নৃপতিও তদ্রূপ রাষ্ট্রের হিতে অবহিত থাকেন। নীতিবিদগণের মতে চরগণ রাজার চক্ষুস্বরূপ। রাষ্ট্রকে সুসংগৃহীত রাখিবার জন্য রাজনীতিশাস্ত্রে যে পন্থাসমূহের নির্দ্দেশ আছে, চর বা প্রণিধীপ্রয়োগ তাহাদের অন্যতম। শত্রুর বলাবল নির্দ্ধারণে, শত্রুব্যূহের সন্নিবেশ অবধারণে, প্রতিপক্ষের সংহতিভেদনে এবং তাহাদের অপচয়কর অন্যান্য বহুবিধ কার্য্যে গূঢ়চর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রব্যাপারে চরের প্রাধান্য কিদৃশ, তাহার প্রমাণ কূটরাজনৈতিক আন্দোলনে বিলোড়িত এবং বিগ্রহে বিলিপ্ত বর্ত্তমান জগতে অপ্রতুল নহে, প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রমণ্ডলীর পরিচালনে চারশক্তি যে কিরূপ বহুধাপ্রযুক্ত হইত মন্বাদিনীতিশাস্ত্র এবং পুরাণাদিতে তদুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের ধীরজ্জু নিবদ্ধ মুক্তি মৌর্য্যেন্দ্র রাজলক্ষ্মী প্রনিধীপ্রয়োগ নীতি সাফল্যের একটি জলন্ত সাক্ষ্য।

কাব্য জগতের মণি শিরোমণি রামায়ণ কত দিনের গ্রন্থ, তাহা সুনির্দ্দেশিত হয় নাই; কিন্তু ইহা যে ভারতের

একখানি প্রাচীনতম গ্রন্থ তাহাতে আর ভুল নাই। আর্য্য এবং কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অসভ্য অনার্য্য জাতির তৎকালীন রাষ্ট্রের ছবি কবির কল্পনাময়ী লেখনী কৌশলে ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। কবিস্বভাব সুলভ বৈচিত্র্যময় অতিরঞ্জনের আবরণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া ইহাতে তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রমণ্ডলীয় পরিচালন পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, তাহার মূল্য সামান্য নহে। সভ্যতার প্রখর আলোকে প্রদীপ্ত নবীন চেতনার উদ্দাম স্পন্দনে প্রমথিত জাতিসমূহের নিকট তাহার মূল্য যৎকিঞ্চিৎ হইলেও অতীতে নিহিত-সর্ব্বস্ব ভারত সন্তানগণের নিকট উহা আশার উৎস এবং সঞ্জীবনী সুধার আধার স্বরূপ।

রামায়ণে আর্য্যশাসিত রাজ্যের মধ্যে অযোধ্যা রাজ্যেরই বিবৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অভ্রংলিহ স্ফাটিক প্রাসাদমালা পরিহিতা, অবিরল জনরোল নিনাদিত রথ্যারাজি পরিশোভিতা, বশিষ্ঠাদি সুসচিববর্গে সুশাসিতা অযোধ্যার লোকবিস্ময়কর অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয়ে পাঠকের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠে। অযোধ্যা ব্যতীত রামায়ণে আর দুইটি উল্লেখযোগ্য অনার্য্যশাসিত রাষ্ট্রের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি চারুচিত্র লতাযুক্ত সর্জ্জার্জ্জুন শোভিত কিষ্কিন্ধ্যার ক্রমময় বানররাজ্য, অপরটি লবণাম্বুধিকৃতমেখলা, শৌর্য্যসম্পদশালিনী, স্বর্ণসৌধকিরীটিনী, রাবণভুজপালিতা লঙ্কা। উক্ত তিনটি রাজ্য পরস্পর সন্ধি বা বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। রামায়ণের গুপ্তচর বলিতে উপর্য্যুক্ত রাজ্যত্রয়ের প্রনিধীবর্গকেই বুঝা যায়।

প্রথমতঃ আর্য্য বীর্য্যপালিতা, অযোধ্যা নগরীর কথাই ধরা যাউক। অযোধ্যাপতি সর্ব্বজন মান্য রামচন্দ্র যে চারচক্ষু নৃপতি ছিলেন, রামায়ণে তাহার উল্লেখ আছে। বিমাতার চক্রান্তে রামচন্দ্র যৎকালে কাননান্তে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন তৎকালে কিয়দ্দিবসের জন্য তিনি চিত্রকূটের সানুদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অগ্রজ-প্রাণ ভরত তাঁহাকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তিত করিবেন এই আশায় তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ভরতকে প্রশ্নচ্ছলে যে সমস্ত রাজনৈতিক বিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে চর নিয়োগ প্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছিল। রামচন্দ্র ভরতকে কহিয়াছিলেন—"পরাধিকারে মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুরাধিকৃত, কারাগারিরক্ষক, ধনাধ্যক্ষ, দূত, বিচারকগণ, ব্যবহারদর্শী, ব্যবহার নির্ণেতা, সেনাগণের বেতনাধ্যক্ষ, কর্ম্মাবসানে বেতনগ্রাহী নাগরিক, রাজ্য সীমাপালক, দুষ্টগণের দণ্ড দানের অধিকারী এবং জল, স্থল, পর্ব্বত ও বন, দুর্গ সকলের পালক এই অষ্টাদশ ব্যক্তি এবং আত্মাধিকারে মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ এই ব্যক্তিত্রয় ব্যতীত উক্ত পঞ্চদশ ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্য বিষয়ে পরস্পরের অপরিজ্ঞাত ও অন্যের অবিদিত তিন তিনটি গুপ্তচর দ্বারা তাহাদিগকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতেছত ?"

কেবল যে ভরতকে উপদেশ দিবার ছলেই রামচন্দ্রের মুখে প্রনিধীপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহার কার্য্যেও তাহা প্রকটিত হইয়াছে। লঙ্কাযুদ্ধে তৎকর্ত্তৃক যে প্রনিধীবর্গ প্রযুক্ত হইয়া ছিল এবং তিনি যে সতর্কতা সহকারে পরকীয় গুপ্তচরগণের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিতেন, তহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সোদর সঙ্গ ত্যাগীবিভীষণকে তিনি যে সমস্ত উদ্দেশ্যে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ করেন প্রনিধীপ্রয়োগ তাহাদের অন্যতম। রাক্ষসরাজরূপে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে বিভীষণ রাঘবের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে তিনি গুপ্তচর সহযোগে লঙ্কাস্থ শত্রু শিবিরের সন্ধান সুনিপুণ ভাবে অবগত করাইবেন। বিভীষণের তৎকালীন উক্তি—

> রাক্ষসানাং বধেসাহ্যং
> লঙ্কায়াশ্চপ্রধর্ষণে
> করিষ্যামি যথাপ্রাণং
> প্রবেক্ষ্যামি চবাহিনীম্।

রাক্ষস গণের বধে এবং লঙ্কার প্রধর্ষণ কল্পে আমি যথা প্রাণ সাহায্য করিব। গুপ্তচর দ্বারা শত্রুর বাহিনীতে প্রবিষ্ট হইব। রামচন্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে লঙ্কাপুরীর অবস্থা অবগত হইবার উদ্দেশ্যে লঙ্কাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমাতি নামক চারিজন রাক্ষস অমাত্য বিভীষণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ছিল। তাহারা লঙ্কাপুরে প্রবিষ্ট হইয়া রাক্ষস গণের ব্যূহ সন্নিবেশ পদ্ধতি অবগত হইয়া আইসে এবং বিভীষণকে নিবেদিত করে";

বিভীষণ সেই প্রণিধীবাহিত বার্ত্তা রামচন্দ্রের নিকট জ্ঞাপন করিয়া ছিলেন। রঘুরাজ শত্রুর সৈন্যবল এবং পরাক্রমবিদিত হইয়া তদনুসারে স্বীয় সৈন্য সন্নিবেশিত করিতে বানর বাহিনীর নায়কগণকে আদেশ করিয়াছিলেন। রাক্ষসগণের গুপ্তচর বর্গের হস্ত হইতে স্বীয় বলরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র সৈন্য-নায়কদিগকে জ্ঞাপিত করিয়া ছিলেন—

এষা ভবতু নঃ সংজ্ঞা
যুদ্ধেঽস্মিন্ বানরেরণে,
বানরা এব বশ্চিহ্নং
স্বজনেঽস্মিন্ ভবিষ্যতি।
বয়ং তু মানুষেণৈব সপ্ত
যোৎস্যামহে পরান্
অহমেব সহ ভ্রাত্রা
লক্ষ্মণেন মহৌজসা
আত্মনা পঞ্চমশ্চায়ং
সখা মম বিভীষণঃ

আমার এই সঙ্কেত থাকিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে বানরগণ যেন মনুষ্যের বেশ ধারণ না করে। যুদ্ধস্থলে বানর বেশকেই আমাদের স্বচিহ্ন বুঝিবে। একারণ, ঐ চিহ্নধারী বর্গ অবধ্য ; কেবল আমরা সাতজন মনুষ্য বেশে যুদ্ধ করিব। আমি, মহাতেজা লক্ষ্মণ, সখা বিভীষণ এবং তাঁহার সচিব রাক্ষস চতুষ্টয় ; এতদ্ব্যতীত অপর যাহাকে মনুষ্যের বেশে সৈন্য মধ্যে দেখিবে তাহাকেই হত্যা করিবে। চর নিয়োগে রাক্ষসবর্গের অসাধারণ পটুতা ছিল ; রামচন্দ্র যে সেজন্য বিশেষ সতর্ক ছিলেন তাহা উদ্ধৃত বচন হইতেই বুঝা যায়।

রামচন্দ্রের নিযুক্ত গূঢ়চরগণ বারংবার লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শত্রুর সন্ধান অবগত হইয়াছিল ; প্রথমে সুগ্রীব তৎপর অঙ্গদকে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিতে দেখা যায়, তাঁহাদিগকে প্রকৃত পক্ষে চর বলা চলে না—তাঁহাদের কার্য্যকে দৌত্যবলাই সঙ্গত কিন্তু রামচন্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে বিভীষণ এবং সুগ্রীব প্রেরিত প্রণিধীকুল যে লঙ্কার রাজ নৈতিক মণ্ডলে একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল, রাক্ষসবর্গের প্রতি লঙ্কাধিরাজ যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। অমিতবলশালী রক্ষগণ বারংবার পরাজিত হইলে, অতিকায়, অকম্পন, প্রহস্ত রাজনীতিজ্ঞ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি লঙ্কার শূরকুল-গৌরব রত্নরাজী রুধিরে আপ্লুত হইয়া বিমলিন হইলে রাক্ষস রাজ নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সন্ধানী শত্রুগণ গূঢ়চর প্রয়োগে তদীয় বলাবল এবং রহস্যসমুদয় অবগত হইয়া রাক্ষসের দুর্দ্দম ভুজবীর্য্যের লাঘব করিতেছে। লঙ্কাপতি ঘোষণা করিলেন—

অপ্রমত্তৈশ্চ সর্ব্বত্র গুপ্তৈ রক্ষ্যা পুরী ত্বিয়ম্
অশোক বণিকা চৈব যত্র সীতা চীরক্ষ্যতে।
নিষ্ক্রামো বা প্রবেশো বা জ্ঞাতব্য সর্ব্বথৈব বঃ
যত্র যত্র ভবেদ্ গুল্মস্তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ
সর্ব্বতশ্চাপি তিষ্ঠধ্বং
সৈন্যৈঃ পরিবৃতা বলৈঃ
দ্রষ্টব্যঞ্চ পদং তেষাং বাণরাণাং নিশাচরাঃ
প্রদোষে বার্দ্ধরাত্রে বা প্রত্যুষে বাপি সর্ব্বশঃ

যাহা হউক, হে রাক্ষসগণ, তোমরা সকলে যে স্থানে সীতা রক্ষিতা হইয়াছেন, সেই অশোকবন বাটিকা এবং অপরাধী বর্গের বিচারালয় প্রভৃতির সহিত এই সুন্দর পুরীকে অপ্রমত্ত চিত্তে রক্ষাকর। অশোকবন, রাজপুর বা অপরাধিগণের আবাস ও বিচারালয় মধ্যে যে কেহ প্রবেশ করিবে, অথবা তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে, তাহাদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। হে রাক্ষসগণ তোমরা সকলে সৈন্য-পরিবৃত হইয়া অবস্থান কর এবং চতুর্দ্দিকে বানরগণের যাতায়াত বিষয়ে তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিত্য নিরলস হইয়া জাগ্রত থাক। কি প্রদোষে কি অর্দ্ধরাত্রে কি প্রভাতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে।

শুধু যুদ্ধ ব্যাপারেই যে রাঘবের চর নিয়োগ পটুতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নহে, সীতানির্ব্বাসন—অযোধ্যা রাজের স্বরাজ্য শাসনে চর প্রয়োগ রীতির প্রমাণ। রামচন্দ্র, বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র দণ্ডবক্ত্র, সুমাগধ প্রভৃতি অমাত্য বর্গের সহিত অলাপ প্রসঙ্গে সীতাপবাদ বিষয়িনী জনশ্রুতি

অবগত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত অমাত্যবর্গ রামচন্দ্র কর্তৃক পৌরচর রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রনিধী কার্য্যে প্রেষিত অমাত্যবর্গের মধ্যে ভদ্র রাঘবের নিকট প্রকাশ করেন—মহারাজ ভবে শুনুন, বন, উপবন, বিপণি পূর্ণ আপণ শ্রেণী, গৃহ প্রাঙ্গন এবং রাজপথে জনগণ এক হইলে আপনার দোষ গুণ সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করিয়া থাকে ; রাম সাগরে দুষ্কর সেতুবন্ধন করিয়াছেন, ইহা কি রাজা, কি দানব এমন কি দেবতা গণ কেহই কখন শুনে নাই। রাম দুরাধর্ষ রাবণকে বধ করিয়াছেন, এমন কি বানর, রাক্ষস, এবং ভল্লুক-গণকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি কি প্রকারে—যে সীতাকে রাবণ স্পর্শ করিয়াছিল তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিলেন ? রাবণ সীতাকে বলপূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে লইয়া যাওয়া স্বত্বেও রামের হৃদয়ে সীতা সম্ভোগের সুখ কি প্রকারে হইতেছে ? ইহা কি ঘৃণার কথা নহে ? রাজা যাহা করেন, প্রজারা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। রাজার এরূপ ব্যবহারে আমাদিগকেও এখন স্ত্রী গণের দোষ সহিতে হইবে। দুর্ম্মুখ ভদ্রের ঐ উক্তিই যে সীতা নির্ব্বাসনের মূলীভূত কারণ, ইহা কাহারো অবিদিত নহে। সীতা হরণের সহিতও চরের সংস্রব আছে। রাবণ প্রেরিত গুপ্তচর মারীচ কর্তৃক বিড়ম্বিত হইয়া রামচন্দ্র কাননান্তরে নীত হইলে রাঘবশরে বিদ্ধ হইয়া দুরাত্মা মারীচ হা লক্ষ্মণ! হা লক্ষ্মণ। বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। পতিপ্রাণা সীতা তাহা শ্রবণে লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে বলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে পরিহার পূর্ব্বক রাম-চন্দ্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন ; সেই অবসরে সীতা হরণার্থী লঙ্কাধিপতিকে স্বয়ং গুপ্তচর বেশে উপস্থিত দেখিতে পাই।

রাক্ষসপুরী লঙ্কা সমুদ্র পারে অবস্থিত ছিল। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ ছিন্ন হইলে শোকাভিভূতা সূর্পণখা রুদ্ররূপে রাবণ সভায় উপস্থিত হয় এবং দশাননকে তীব্রভাবে তিরস্কার করিতে থাকে। সূর্পণখার তিরস্কার বাণীর মধ্যে রাবণ যে চরনিয়োগে দক্ষ ছিলেননা, ইহা বারংবার উক্ত হইয়াছে। রুধিরে প্লুতা সূর্পণখা বারংবার রোষে গর্জ্জিয়া উঠিয়া রাবণকে বলিতেছে—অযুক্ত চারশ্চপলঃ কথং রাজা ভবিষ্যসি। তুমি চরনিয়োগ করনা, তুমি চঞ্চল, তোমার আবার রাজাগিরি কেন ? 'অযুক্ত চারং যাং মন্যে প্রাকৃতৈঃ সচিবৈর্বৃতম্' আমার বিশ্বাস তুমি চর নিয়োগ করনা এবং তোমার অমাত্যগণও নীচ বংশোদ্ভব, কেননা তোমার অধিকৃতজনস্থানে বিজাতীয় প্রবেশ এবং তোমার আত্মীয়গণের নিধনবার্ত্তা তুমি এখনো জানিতে পার নাই !

যস্ত্ত রাবণ দুর্ব্বুদ্ধি গুণৈ রেতৈ
বিবর্জ্জিতঃ
যস্ত তেঽবিদিতশ্চারৈ রক্ষসাং
সুমহান্ বধঃ।

রাবণ, রাজগণ চর প্রয়োগে সুদূর বিষয় অবগত হইয়া থাকেন এজন্য তাহাদিগকে দীর্ঘচক্ষু বলা হইয়া থাকে, তোমার সে সব কোন গুণ নাই। ধিক্ তোমাকে, তুমি চরদ্বারা রাক্ষসের এই ভীষণ ধ্বংস কাহিনী অবগত নহ। যে রাজা চর নিযুক্ত করেন না, সেই দুর্ভাগ্য অস্বাধীন নৃপতিকে লোকে নদী মধ্যস্থ পঙ্কদীপের ন্যায় দূরে পরিত্যাগ করে।

সূর্পণখা রাবণকে উক্তরূপে অভিযোগ করিলেও লঙ্কা-ধিপতি যে চরপ্রয়োগে সুনিপুণ ছিলেন, তাহার পরিচয় লঙ্কা সমরে প্রচুররূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বানরসৈন্য সাগর পারে সমবেত হইয়াছে,এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়াই রাক্ষসরাজ শার্দ্দূলনামক এক মহাপরাক্রান্ত সমরনীতিবিদকে চররূপে প্রেরণ করিয়া শত্রুর বলাবল অবগত হইয়াছিলেন। তৎপরে রাক্ষসেশ্বরের আদেশে শুক নামক চর ব্যোমমার্গে বানর সৈন্যের উপরে আগমন করিয়া বানরাধিপ সুগ্রীবকে রামচন্দ্রের দল পরিহার করিতে পরামর্শ দান করে। বানরগণ শুককে বন্দীভূত করে। সেনানী অঙ্গদ তাহাকে রাক্ষসের গুপ্তচর বলিয়া রামচন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। শুক রামচন্দ্রের শরণাগত হওয়াতে রামচন্দ্র তাহাকে মুক্তি দান করেন। বানর সৈন্যসহ রামচন্দ্র লঙ্কার তটভাগে অবতরণ করিলে রাক্ষসরাজ সারণ (পুনর্ব্বার) শুককে বানরবাহিনীর বলাবল বিশেষরূপে নিদ্ধারিত করিবার জন্য চররূপে

প্রেরণ করেন। তাহাদের উপরে আদেশ ছিল।—

'রামেরসহিত কত বানরসৈন্য আসিয়াছে তাহা জানা কর্ত্তব্য; তোমরা অদৃশ্যভাবে বানর বাহিনীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সংখ্যা, তাহাদের বীর্য্য, তন্মধ্যে যাহারা প্রধান, যাহারা রামের মন্ত্রী, যাহারা সুগ্রীবের সহচর, যাহারা সেনানী এবং যে বানরগণ বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ— যেরূপে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে; যেভাবে মহাবল বানরগণ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা, এবং মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণের কার্য্যপ্রণালী বল ও অস্ত্রাদির বিষয় প্রকৃতরূপে জানিয়া আইস। যৎকালে বানরগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে সেতুযোগে সাগর পার হইতেছিল তৎকালে শুক, শারণ, তাহাদের কর্ত্তব্যের সমাধানে তৎপর ছিল। তীক্ষ্ণদর্শী রক্ষঃ মর্ম্মবিৎ বিভীষণের দৃষ্টি অতিক্রমে তাহারা অসমর্থ হয়। বিভীষণ তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রামচন্দ্রের নিকট লইয়া যান। রামচন্দ্রের আদেশে তাহারা মুক্তি লাভে সমর্থ হয়। শুক ও শারণ রাক্ষস সভায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রামচন্দ্রের বাহিনীর বিপুলবিক্রম দশানন সকাশে কীর্ত্তিত করে। শুক ও সারণের সাহায্যে রাবণ লঙ্কার সৌধচূড়ে উঠিয়া বানরগণের ব্যূহসন্নিবেশ প্রত্যক্ষ করেন। শুক ও সারণ রাক্ষসরাজের নিকট রামচন্দ্রের কিঞ্চিৎ প্রশংসা ও তদীয় বলবীর্য্যের উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং রাঘবের সহিত সন্ধিই বাঞ্ছনীয় ও যুক্তিযুক্ত এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এজন্য রাবণ তাঁহাদিগকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

অতঃপর দশানন পুনর্ব্বার একদল উপযুক্ত চর নির্ব্বাচন করিতে তদীয় অমাত্য মহোদয়কে আজ্ঞা দান করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত চরগণ রাবণের সমক্ষে উপস্থিত হইলে রাক্ষসপতি তাহদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলেন,—

ইতো গচ্ছত রামস্য ব্যবসায়ং
পরীক্ষিতুম্।
মন্ত্রেষভ্যন্তরা যেহস্য প্রীত্যা
তেন সমাগতাঃ
কথং স্বপিতি জাগর্ত্তি
কিমন্য চ করিষ্যতি।
বিজ্ঞায় নিপুণং সর্ব্বমাগন্তব্য
মশেষতঃ।
চারেণ বিদিতঃ শত্রুঃ
পণ্ডিতৈর্ব্বসুধাধিপৈঃ
যুদ্ধে স্বল্পেন যত্নেন সমাসাদ্য
নিরস্যতে।

তোমরা রাম এবং তাহার সহিত প্রীতিবন্ধনে আগত মন্ত্রিবর্গের কার্য্যকলাপ পরীক্ষার জন্য অবিলম্বে এস্থান হইতে যাত্রা কর; তাহারা কিরূপে নিদ্রা যায়, জাগরিত অবস্থায় কি করে এবং অদ্যই বা কি করিবে স্থির হইয়াছে কৌশলে নিঃশেষরূপে এই সমস্ত জানিয়া আসিবে; কেননা পণ্ডিত বসুধাধিপগণ চর দ্বারা শত্রুগণের অবস্থা জানিতে পারিলে রণক্ষেত্রে অনায়াসেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন।

এবারও চরগণ যৎকালে সুবেল পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে অবস্থান করিয়া বানরসৈন্যগণের উক্ত পর্ব্বতারোহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল তৎকালে তাহারা বিভীষণ কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দীভূত হইল। বিভীষণ চরনায়ক শার্দ্দূলকে বন্ধনকরতঃ রামচন্দ্রের নিকট লইয়া গেলেন; অপরাপর চরদিগকে নির্য্যাতিত করিয়া নিজেই মুক্তিদান করিলেন; শার্দ্দূল বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়া লঙ্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে দশানন বিষণ্ণবদনে সমাগত শার্দ্দূলকে জিজ্ঞাসা করেন—

চারিতা ভবতা সেনা—
কেৎস্ন শূরাঃ প্লবঙ্গমাঃ
কিংপ্রভাঃ কীদৃশাঃ সৌম্য!
বানরা যে দুরাসদাঃ
কস্য পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ
তত্ত্বমাখ্যাহি সুব্রত!
তথাত্র প্রতিপৎস্যামি
জ্ঞাত্বা তেষাং বলাবলং
অবশ্যং বলসংখ্যানং
কর্ত্তব্যং যুদ্ধমিচ্ছতা।

সৌম্য, তুমিত সেই বানর সৈন্যের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছ, বল দেখি, সেই মহাবলশালী বানরগণ কাহার পুত্র, কাহার পৌত্র, তাহাদের শরীরের লাবণ্য কিরূপ?

তাহাদের মধ্যে কাহারা বীর নামে খ্যাত ?—আমার নিকট এতৎ বিবরণ বিস্তৃতভাবে বল। কারণ যুদ্ধ করিতে হইলে শত্রুর বলাবল এবং শত্রু সৈন্তের সংখ্যা বিদিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করা শ্রেয়ঃ। তোমার বিস্ময় হইবার কারণ কি ?

রাক্ষস রাজ যে বানর বাহিনীর বলাবল বিদিত হইবার জন্ত নিরন্তর ব্যাকুল ছিলেন—এবার সেই বানর গণের কথা বলিব। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের উত্তরাংশে তৎকালীন কিষ্কিন্ধ্যাপুরী স্থাপিতা ছিল। বানরভুজ পালিতা কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি সামান্ত ছিল না, যে রক্ষোরাজ রাবণের প্রখর বাহুবীর্য্যে তৎকালীন নৃপতি সমাজ প্রকম্পিত ছিলেন কিষ্কিন্ধ্যাপতি মহাবল বালী সেই রাক্ষস পতিকে মহাহবে পর্য্যুদস্ত করেন। দশানন অগ্নিসাক্ষী করিয়া বালীর সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। মহারাজ বালী যে চর নিয়োগে দক্ষ ছিলেন রামায়ণে তাহার প্রমাণ আছে। বালীকর্ত্তৃক বিতাড়িত সুগ্রীব মুষ্টিমিত পরিজন সহ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা বালীর ভয়ে ভীত থাকিতে হইত, রামায়ণে কথিত আছে—বালীভয়ে সুগ্রীব সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সৌরকরদগ্ধ ঊষর মরুভূ, তুহিনাস্তৃত উত্তুঙ্গ গিরিশিখর এমন কি সৌরালোক বিরহিত মেরুজ্যোতিরালোকিত দেশেও তাঁহাকে আশ্রয়ের অন্বেষণে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। বালীর চর কুত্রাপি তাহাকে স্থির থাকিতে দেয় নাই। মাতঙ্গ নামক এক মুনির অভিশাপ ছিল বলিয়া ঋষ্যমূক বালীর অনধিগম্যছিল। এই স্থানে সীতান্বেষণতৎপর রামলক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের সাক্ষাৎকার ঘটে। ধনুর্দ্ধারী ভ্রাতৃদ্বয়কে সন্ন্যাসীবেশে দেখিয়া সুগ্রীব—তাহারা বালীর প্রেরিত চর—ইহাই মনে করিয়াছিলেন। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে মাতঙ্গমুনির আশ্রম সীমায় প্রবিষ্ট হইলেন ; ভয়ে তাঁহার কণ্ঠ বিশুষ্ক হইয়া আসিল, পানাহারে কিঞ্চিন্মাত্র রুচি থাকিল না। তথায় উপনীত হইয়া সুগ্রীব তদীয় সহচরবর্গকে আহ্বানকরতঃ রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—

> এতৌ বনমিদং দুর্গং বালীপ্রনিহিতৌ ধ্রুবং
> ছদ্মনা চীর বসনৌ প্রচরন্তাবিহাগতৌ।

ঐ দুই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বালীকর্ত্তৃক এই দুর্গম কানন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। উহারা চীরবাসী হইয়া ছদ্মবেশে বিচরণ করিতে করিতে এখানে আসিয়াছে।

সুগ্রীবের সচিবশ্রেষ্ঠ হনুমান তাঁহাকে অশেষরূপে বুঝাইলেন কিন্তু সুগ্রীবের চিত্ত সহজে প্রবোধ মানিবার নহে, তিনি বেপথু সহকারে হনুমানকে কহিলেন—

আমার আশঙ্কা হইতেছে ইঁহারা বালীর প্রেরিত চর। রাজাদিগের মিত্রতা কাহার সহিত না হইতে পারে। সুতরাং এস্থলে বিশ্বাস করিতে পারিনা। বিশ্বাসের অযোগ্য ছদ্মবেশী শত্রুকে বিশ্বাস করিলে তাহারা ছিদ্র পাইয়া বিশ্বাসকারীকে নিগৃহীত করিয়া থাকে। আমি জানি এই সমস্ত কর্ত্তব্যে বালীর বিশেষ লক্ষ্য আছে।

রামচন্দ্রের সাহায্যে বর্দ্ধিতবীর্য্য হইয়া সুগ্রীব যখন কিষ্কিন্ধ্যার সিংহদ্বারে হুঙ্কার ছাড়িতেছিলেন তৎকালে বানর রাজ বালীমহিষী তারার সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। বুদ্ধিমতী তারা সুগ্রীবের অভূতপূর্ব্ব সাহসের অন্তরালে যে বিশেষ কিছু আছে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তারার কথায় বালী প্রেরিত প্রণিধীবর্গের সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তারা বালীকে বলিয়াছিলেন—এই যে হুঙ্কার ছাড়িবার ঘটা, ইহার কারণ সামান্ত নহে, আমার মনে হয়, সুগ্রীব কখনই অসহায় হইয়া আইসে নাই। আজ কুমার অঙ্গদ বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল। তোমার নিযুক্তচরগণ তাহার নিকট বলিয়াছে যে অযোধ্যাপতি ইক্ষাকুবংশজাত দশরথের দুই পুত্র কোন কারণ বশতঃ বনবাসী হইয়াছেন। তাহাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ ; তাঁহারা প্রভূত পরাক্রমশালী। সম্ভবতঃ তাহারা সুগ্রীবের কল্যাণার্থী হইয়াছেন।

মানবশাস্ত্রে আছে—চরগণ নিভৃতে রাজসকাশে প্রত্যাহিক বিবরণ প্রকাশ করিবে, তাহা শ্রবণ করিবার পর রাজা অন্তঃপুরে গমন করিবেন। সুতরাং বালীর প্রতি তারার উক্তি এস্থলে কতকটা অস্বাভাবিক। কিন্তু বানর রাণী তারা রাজ্য সম্বন্ধে নিজে অনেক সংবাদ রাখিতেন, তিনি রাজকার্য্যে বালীর সহায়িকা ছিলেন। বালীবধের অব্যবহিত পরে তিনি প্রখরা বুদ্ধিপ্রয়োগে ও

অসামান্যাতেজস্বিতা সহকারে বানরবাহিনীকে পুরী রক্ষার্থে প্রয়োচিত করিয়াছিলেন এবং সুগ্রীবের প্রতি ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের ক্রোধোপনোদনতরে তিনি যে যুক্তিযুক্ত বাগ্মিতার অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিলে চার বিষয়ক তথ্যরাজী যে তাহার অবিদিত ছিলনা, তাহা বুঝা যায়।

বানররাজ সুগ্রীবকে সর্ব্বপ্রথম আমরা হনুমানকে চররূপে প্রেরণ করিতে দেখিতে পাই। সুগ্রীব হনুমানকে তৎকালে বলিয়াছিলেন, রাজাদের শত্রু বিনাশে বিবিধ উপায়জ্ঞ সুতরাং উদাসীন বেশধারী চর পাঠাইয়া শত্রুর উদ্দেশ্য জানা উচিত। সুগ্রীবের আদেশে হনুমান সন্ন্যাসীবেশে সুগ্রীবের চর হইয়া ঋষ্যমূকোপান্তচারী দাসরথির সান্নিধ্যে উপনীত হন! বুদ্ধিমান হনুমান তাপসচরবেশে রামলক্ষ্মণের পরিচয় অবগতহন এবং কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকে সুগ্রীবের সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

সুগ্রীব সীতার সন্ধান অবগত হইবার নিমিত্ত দূরদেশে চর প্রেরণ করিয়াছিলেন, গুপ্তভাবে সীতার সন্ধান লইয়া আসাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। লঙ্কাযুদ্ধক্ষেত্রে বানররাজ সুগ্রীব যে সুদক্ষ চরপ্রয়োগের অবসরের অসদ্ব্যবহার করেন নাই তাহা বলা বাহুল্য। বিভীষণকে মিত্রভাবে আগত দেখিয়া সুগ্রীব প্রথমতঃ কিছুতেই তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। বিভীষণ রাবণ প্রেরিত চর, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া ক্রোধসহকারে বলিয়াছিলেন—প্রভো, কয়েকজন শত্রুসৈন্য অলক্ষিতভাবে আমাদের সেনাসন্নিবেশ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হয়, বায়সগণকে পেচকের ন্যায়, ইহারাও সুযোগ পাইলে আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে। সুতরাং আমাদের মঙ্গলের জন্য কার্য্যাকার্য্য বিচার, সেনাসন্নিবেশ, সৈন্যগণের শিক্ষাবিধান এবং শত্রুর বলবীর্য্যাদির বিষয় জানিবার জন্য চর নিযুক্ত করা উচিত।

সীতার সন্ধানকল্পে সুগ্রীব যে সমস্ত চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে হনুমানই সাফল্য লাভ করেন।

বানরগণের মধ্যে হনুমান গূঢ়চরের কার্য্যে অসাধারণ পটুতা দেখাইয়াছেন। তিনি নিশাযোগে ছদ্মবেশে লঙ্কায় প্রবেশ করেন। তাহাকে সতত সতর্কতার সহিত এবং সুবিবেচিতভাবে চারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল; কারণ তিনি জানিতেন, রাক্ষসগণ অত্যন্ত তীক্ষ্ণদর্শী এবং আত্মরক্ষণে তৎপর। লঙ্কাপ্রবেশকালে হনুমানকে আমরা চিন্তাকুল দেখিতে পাই—

> অদৃষ্টো রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা
> ন বিনশ্যেৎ কথং কার্য্যং রামস্য বিদিতাত্মনঃ

কি উপায়ে আমি দুরাত্মা রাবণের দৃষ্টিপথে পতিত না হইয়া জনকদুহিতাকে একাকী দেখিতে পাইব? অজ্ঞাতে রামের কার্য্যই বা কিরূপে সাধিত হইবে? হনুমান চিন্তা করিতে লাগিলেন—

> ভূতাশ্চার্থা বিনশ্যন্তি দেশকাল বিবোধিতাঃ
> বিক্লবং দূতমাসাদ্য তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা
> অর্থানর্থান্তরে বুদ্ধি নিশ্চিতাপি ন শোভতে
> ঘাতয়ন্তীহ কার্য্যানি দূতা পণ্ডিতমানিনঃ

অবশ্যম্ভাবী কার্য্য সকল দেশকালবিবেক বিহীন চরের সন্নিহিত এবং অনুচিত দেশ ও কাল বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হয়। অমাত্যগণসহ নৃপতি যদিও কার্য্যা কার্য্য সম্বন্ধে উত্তমরূপে অভিজ্ঞহয়েন, দূতের দোষে তাহা সুফল প্রসব করেনা। রাক্ষসগণ যদি আমাকে দেখিতে পায়, তবে রাবণের অনর্থাকাঙ্খী রামচন্দ্রের কার্য্য পণ্ড হইবে। কিন্তু উপায় কি? অন্য কোন বেশের কথা দূরে থাকুক, রাক্ষস দেহ ধারণ করিয়াও রাক্ষসগণের অদৃশ্য হইয়া এ প্রদেশের কোন স্থানে থাকা অসম্ভব। আমার মনে হয় এদেশে কোন প্রাণীর গতিই এই ভীমকর্ম্মা রাক্ষস দিগের অবিদিত থাকিতে পারে না।

সীতা সন্দর্শন কার্য্যের সমাধা হইলে হনুমান রাক্ষস দিগের বলাবলাদি পর্য্যবেক্ষণে নিরত হন। তাঁহার মুখেই আমরা শুনিতে পাই, আমার প্রধান কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন অল্পমাত্র করণীয় আছে।

> ইহৈব তাবৎ কৃত নিশ্চয়োহ্যহং
> ব্রজেয়মস্য প্রবগেশ্বরালয়ম্
> পরাত্মসমার্দ বিশেষতত্ত্ববিৎ
> ততঃকৃতং স্যানম তত্ত্বশাসনম্

যদি ও প্রথমতঃ আমি সীতা দেবীর অন্বেষণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াই এখানে আসিয়াছি; তথাপি যদি যুদ্ধ করিয়া শত্রু ও আমাতে কতদূর পার্থক্য তাহা জানিয়া সুগ্রীবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারি তবে প্রভুর আদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয়। এই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া হনুমান প্রকাশ্যে শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ততঃ সমাসাদ্য রণে দশাননং
সমন্ত্রিবর্গং সবলহায়ায়িনমং
হৃদিস্থিতং তস্য মতং বলঞ্চ তৎ
সুখেন মত্বাহমিতঃ পুনর্ব্রজে

দশাননকে মন্ত্রিবর্গ ও অনুচারীগণ সহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাইলে আমি তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ও বল অক্লেশে জানিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।

কিন্তু হনুমান দুর্দ্দম অররুপুরে বিনাক্লেশে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। এতদর্থে তাঁহাকে প্রাণব্যয়ী সাধনায় ব্রতী হইতে হইয়াছিল। দুরাধর্ষ রাক্ষসগণ তাঁহাকে ভুজবীর্য্যসঞ্চালনে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। হনুমান রাক্ষসগণের হস্তে বন্দীভূত হইয়াছিল; দুর্দ্দশার চরম সীমায় তিনি নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু কর্ত্তব্যকঠোর মারুতি ক্ষণেকের তরেও চারব্রতের সাধনায় সিদ্ধিলাভে নিরাশ হয়েন নাই। যৎকালে রাক্ষসগণ তাঁহার দেহে অগ্নিসংযোগ করিতেছিল তখন ও তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছে—

রাত্রৌ নহি সুদৃষ্টা মে দুর্গকর্ম্মবিধানতঃ
অবশ্যমেব দ্রষ্টব্যা ময়া লঙ্কা নিশাক্ষয়।

রাত্রিযোগে আমি দুর্গের কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে দেখিতে পারি নাই। নিশাকালে লঙ্কা পরিদর্শন সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইবে। যখন রাক্ষসেরা তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া 'বানর চরদেখ' 'বানর চরদেখ' বলিয়া জয়োল্লাসের ধ্বনিতে লঙ্কার পুরপথ মুখরিত করিতেছিল তখনও হনুমান বিচিত্র বিমান সমূহ, প্রাচীর বেষ্টিত ভূমিভাগ, সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনরাজী, উভয় পার্শ্বে নিবিড় গৃহমালাশোভিত রাজপথ, চতুষ্পথ, ক্ষুদ্রপথ এবং গৃহমধ্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। রাক্ষস হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াও তিনি আত্মরক্ষার দায়ে বিব্রত হইয়া স্বকার্য্যের পূর্ণতা সাধনে শ্লথ যত্ন হইয়াছিলেন না। তখনো মারুতির মনে বাসনা—

বলৈকদেশঃ ক্ষয়িতঃ শেষদুর্গ বিনাশনং
দুর্গে বিনাশিতে কর্ম্মে ভবেৎ সুখপরিশ্রমং।

কিছু বল ক্ষয়িত করিয়াছি, দুর্গ বিনষ্ট করা বাকী আছে। দুর্গ বিনাশ করিতে পারিলে আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে। রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হনুমান লঙ্কার দুর্গ সন্নিবেশাদি বিষয়ে যে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় চারবৃত্তি সাফল্যের পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে সুদীর্ঘ কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ উদ্ধৃত করিবার অবসর এস্থলে নাই। হনুমান তাঁহার কার্য্যে কীদৃশ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। হনুমান রামচন্দ্রের নিকট বলিয়াছিলেন—

তে ময়া সংক্রমাভগ্নাঃ পরিখাশ্চাবপুরিতাঃ
দগ্ধা চ নগরীলঙ্কা প্রাকারাশ্চাবসাদিতা।

আমি সেতুপথ সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছি এবং লঙ্কা দগ্ধ করত প্রাচীর সকল ভগ্ন করিয়া পরিখাসমূহ পূর্ণ করিয়া আসিয়াছি।

রাক্ষসগণের দ্বারা বন্দী ভূত—হইয়া হনুমান লঙ্কাধিপের নিকট—তিনি শ্রীরামের চর এই বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। রামায়ণের কয়েকটি স্থলে দূত এবং চর সমস্যায় পতিত হইতে হয়। নীতি শাস্ত্রানুসারে দূত অবধ্য তদ্ধেতু চর গণ বিপত্তিকালে তাহারা দূত ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইত রাক্ষসের চর শুক বানর গণের দ্বারা ধৃত হইলে আত্মরক্ষার দায়ে শ্রীরাম চন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—

ন দূতান্ ঘ্নন্তি কাকুস্থ!
বার্য্যতাং সাধো বানরাঃ
যস্তু হিত্বা মতং ভর্ত্তুঃ স্বমতং
সমপ্রধারয়েৎ
অনুক্ত বাদী দূতঃ সন্ স দূতো
বধমর্হতি।

কাকুস্থ দূতদিগকে বধকরা অনুচিত ...নরূপ দূত প্রভুর

মতানুসারে না চলিয়া স্বেচ্ছায় অনুবর্ত্তী হয় সেই বধের যোগ্য। প্রকৃত পক্ষে তাৎকালীন চরগণ প্রবঞ্চনার সাহায্যে আত্মরক্ষার যেরূপ চেষ্টা করিত প্রতিপক্ষও তাহাকে চর বলিয়া সুনির্দ্দেশিত করতঃ দণ্ডদানে প্রয়াস পাইত। শুককে বন্দী করিয়া অঙ্গদ তাহাকে রাঘব সকাশে উপস্থাপিত করিয়া বলিয়াছিলেন—

নায়ং দূতো মহাপ্রাজ্ঞ চারকঃ প্রতিভাতি মে
তুলিতং হি বলং সর্ব্বং অনেনং তব তিষ্ঠতা
গৃহ্যতামাগমল্লঙ্কা এতদ্ধি মমরোচতে।

মহাপ্রাজ্ঞ, এ রাক্ষস, দূতনহে, ইহাকে চর বলিয়া মনে হইতেছে। এই রাক্ষস এস্থলে থাকিয়া আপনার বলাবল পরীক্ষা করিতেছে সুতরাং ইহাকে লঙ্কায় ফিরিতে না দিয়া অবরুদ্ধ করা হউক।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

দুর্ভাবনায়।

(১)

দুঃখ-বন্যায়, অশ্রু-বর্ষায়,
স্বার্থচিন্তায় সত্য প্রাণ যায়!
আপনজন কই! কেউ তো নাই ভাই!
পিতৃহীন তাই, বিঘ্ন পায় পায়!
মস্তদায় মোর, ভাব্না রাত্-ভোর্!
আজ্কে জোচ্চোর, চক্ষে বয় লোর!
অর্থবান্ দীন—স্বার্থপর সব,
অন্ধকার দেশ, দৃষ্টি ঘোর-ঘোর!

(২)

সুখের কৈশোর, প্রথম যৌবন,
আবার পাই কই! সদাই উন্মন!
এখন হরদম্ কেবল গোলমাল,
জীবন দুঃখের, ভীষণ জঞ্জাল?
পেটের চিন্তায় তোমার দিনরাত্,
বিবেক-বিক্রয় দশের সাথ-সাথ!
মালিক-তুষ্টির বিকট চেষ্টায়,
হৃদয় হয়রাণ পরের দেশটায়!

(৩)

হয় তো এরপর, দুঃখ বিস্তর
ভুগবো প্রাণ-ভর, ফাটবে পঞ্জর!
কাঁদবো রাতদিন, ফেলবো নিশ্বাস,
আসছে দুর্দ্দিন, শুকবে অন্তর!
ভাগ্যে দুঃখই, আজ্কে যাই কই!
সত্য সত্যই টাট্কা শোক-সই!
ব্যর্থ ভাব্নায় চিত্ত মশ্গুল্!
চক্ষে ভরপূর অশ্রু থই থই!

(৪)

নারীর আজকাল কোথায় হিম্মৎ।
রূপের দাম নাই! কেমন কিস্মৎ!
কনের বাপভাই কোথায় নির্ভয়!
কাজেই হিন্দুর জীবন সংশয়!
বরের বাপ ভাই সবাই জল্লাদ!
শিকার দেখলেই বেজায় আহ্লাদ!
নারীর ইজ্জৎ এখন যায়-যায়,
পণের তৃষ্ণায় ভোগের ঝঞ্ঝায়!

(৫)

শঙ্খ-ফুৎকার শুনছি এইবার,
জাগছে নিঃসাড় বিশ্বসংসার!
লক্ষ্মী আসছেন, হাসছে দিকদেশ,
মুছবে বোন সব চক্ষু জল-ভার!
বিত্ত চায় সব কুত্তা গর্দ্দভ,
চিত্ত দুর্লভ, তাই এ বিপ্লব।
শুক্র বিক্রয় করছে বজ্জাৎ,
চাচ্ছে টাকশাল ষণ্ড পুঙ্গব!

(৬)

দেশের বন্দন, দশের মঙ্গল,
হৃদয়-বিস্তার প্রাণের সম্বল!
থাকুক্ শোক-তাপ, মানুষ সত্যই!
দুখের মো-টুক্ কেবল চুপ্ রোই।
নারীর বন্ধন্-ছেদন চায় প্রাণ,
রাখুন ঈশ্বর নারীর সম্মান!
বিপদ অন্তর কোথায় অন্তর?
জপুক্ দিন্‌রাত টাকার মন্তর!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ভরতপুরে ও ধোলপুরে।

ভারতের দেশীয় রাজগণ দেশের এক একটা স্তম্ভ বিশেষ। অমিত তেজশালী বৃটিশরাজও ইহাদিগকে সম্মান করিয়া চলেন। দেশীয় রাজগণ দেশের জাতি, ধর্ম্ম, সামাজিকতা রক্ষা করিয়া আছেন। ইহারা না থাকিলে আমাদের কিছুই থাকিত না। ভারতবর্ষ বিশালতায়, অতি প্রকাণ্ড দেশ কিন্তু ইহার অধিবাসীগণ এক ধর্ম্মাবলম্বী নহেন, তজ্জন্যই ইহার উন্নতি সুদূর পরাহত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত রাজগণের শক্তি যদি এক হইত এবং তাহারা সকলে এক ধর্ম্মাবলম্বী হইতেন, তবে আজ ভারতের অবস্থা অন্যরূপ হইত। আমাদের ভারতে পৃথিবীর সর্ব্বদেশের নমুনাই আছে। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইলেও স্থানে স্থানে শীতের অভাব নাই। পর্ব্বত আছে—যাহার দ্বিতীয় নাই, নদী আছে—উহারাও শ্রেষ্ঠ, মহাসাগর আছে—তাহাও শ্রেষ্ঠ; বনভূমি, মরুপ্রদেশ, হ্রদ সবই শ্রেষ্ঠ। বীরপুরুষ, বিদ্যাবীর, যুদ্ধবীর—নাই কি? ভারতে সবই আছে, অভাব শুধু একপ্রাণতার ও স্বাধীনতার।

আগরা হইতে ভরতপুর ও ধোলপুর অধিকদূর নহে, কিন্তু যাইতে হয় দুই দিকে দুই রেলপথে। রেলপথ বিস্তারিত হওয়ায় কোন প্রদেশকেই এখন আর আমরা তেমন দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে করি না; তাহা না হইলে এক জনের একজীবনে সমগ্র প্রদেশ পরিদর্শন করা অসম্ভব হইত।

আমি প্রথমে আগরা হইতে ভরতপুর যাত্রা করিলাম। আগরার বন্ধুগৃহ হইতে মধ্যাহ্নে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছি, কয়েক ঘণ্টা পরই রাজপুতনারেলে ভরতপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বর্ত্তমান রাজা নাবালক তাঁহার অভিভাবক ইংরেজ এজেন্ট। তিনি সমস্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন; আছেন মাত্র এক বাঙ্গালী-ডাক্তার, তাঁহার নিবাস কলিকাতা অঞ্চলে; তিনি কায়স্থ। পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালী ছিলেন তাহারা অন্য রাজধানীতে কর্ম্ম লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। সেই হইতে তাহাদের অন্ন ভরতপুর হইতে জন্মের মত উঠিয়াছে। আমার আগরার বন্ধু "নবেধন নীলমণি" সেই একমাত্র বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুর নিকট আমার তথায় দুই চার দিন অবস্থানের বিষয় পত্র দিয়াছিলেন! কয়েক ঘণ্টা পরই আমরা ভরতপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম।

বাঙ্গালী বাবুর বাসস্থানের সন্ধান লইতেছি। আমি যে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ছিলাম, বাবু ঘাসীরাম নামক একজন ভরতপুরবাসী ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে সেই গাড়ীতেই আগরা হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি আগে জানিতেন না যে আমি ভরতপুরেই নামিব। তাঁহার সঙ্গে আমি নামিয়া পড়ায় তিনি আমার পরিচয় পাইয়া কহিলেন "মহাশয়, আপনি আমার গৃহেই দুই চার দিন অথবা যত দিন ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারেন। আমি ভরতপুর রাজের আত্মীয়। আপনার যদি এদেশীয় ব্রাহ্মণের হাতে খাইতে বাধা না থাকে তবে আমার প্রতিবাসী তেমন ব্রাহ্মণ দ্বারায় আপনার রন্ধন কার্য্য চালাইয়া দিতে পারিব।" তিনি ক্ষত্রিয়। আমি অগত্যা ঘাসিরামবাবুর অপ্রত্যাশিত আদর প্রত্যাহার করিতে পারিলাম না।

ঘাসিরাম বাবুর গৃহ হইতে লোক ও গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়াছিল। ঘাসিরাম বাবু এ রাজ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি। ষ্টেশনেই বহুলোক তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিল।

আমি একাকী। বাবু ঘাসিরাম আগরা গিয়াছিলেন। কেন গিয়াছিলে, তিনি আমাকে বলিতেছিলেন।

আমরা যখন আগরা ছিলাম তৎকালে একদল ডাকাত আগরায় সেসন আদালতে বিচারার্থে নীত হইয়াছিল। যখন বিচার চলিতেছিল তখন সৈনিক বেশে কয়েকটী অশ্বারোহী আদালতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, সকলে মনে করিল দেশীয় রাজ্য হইতে উহারা আসিয়াছে। সেসন জজের আদালতের সম্মুখে উহারা দণ্ডায়মান হইয়া সেসন জজকে লক্ষ্য করিয়া গুড়ুম গুড়ুম করিয়া আওয়াজ করিল, গুলি জজের গায় লাগিল না। আদালত ছত্রভঙ্গ হইল। যে যারমতে পারিল দৌড়িয়া আত্মরক্ষা করিল। সৈন্য বেশী দস্যুরা আদালত গৃহে প্রবেশ করিয়াই আসামী দিগকে এক একটী ঘোড়ায় তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল। এইরূপে যাহারা একজন করিয়া

আসিয়াছিল, যাইবার সময় এক এক ঘোড়ায় দুইজন দুইজন করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। চারিদিকে ডাকাত ধরিবার আয়োজন পড়িয়া গেল কিন্তু ডাকাত আর ধরা পড়িল না। এই ডাকাতগণ পলায়ন করায় ডাকাতদিগকে ধরিয়া দিবার জন্য ঘাসিরাম প্রভৃতি দেশের বড় বড় লোকদিগের প্রতি ইংরেজ রাজ নোটীশ জারী করিলেন। ঘাসিরাম সেই উপলক্ষেই আগরা গিয়াছিলেন। বাবু কেদারনাথ আগরায় তাহার উকীল, তিনি বলিয়া আসিয়াছেন "কে বা কাহারা ডাকাত, আমরা জানিনা, উহারা কোন প্রদেশ বাসী আমরা তাহাও অবগত নহি সুতরাং ডাকাত ধরিতে আমরা অপারগ।" ডাকাতেরা মাঝে মাঝে আগরার ন্যায় বৃহৎ সহরে আসিয়াও উপদ্রব করে। আমাদের আগরা বাস কালেও একদিন আগরা সহরে ডাকাত পড়িয়াছিল। ডাকাতেরা কয়েক জন ধনীর বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া লক্ষ অর্থ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। ফলতঃ দেশীয় রাজ্য সমূহেই ডাকাতের আড্ডা। ভীল জাতীয় অসভ্য লোকেরাই প্রসিদ্ধ ও সাহসী ডাকাত। খৃষ্টান মিশনরীরা ইহাদিগকে তদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অপারগ হইয়াছেন।

বাবু ঘাসিরাম আমাদিগকে এই সকল কথা কহিতে কহিতে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। প্রকাণ্ড মাঠে ঘাসিরামের বৃহৎ অট্টালিকা; আমি তাহাতে আশ্রয় পাইলাম। তাহার ভৃত্যগণ আমাকে তত্ত্ব করিতে লাগিল। বিদেশ ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে দেশ অপেক্ষাও সহজে বন্ধু লাভ ঘটে। দেশের বন্ধুদের সঙ্গে স্বার্থ আছে কিন্তু বিদেশে স্বার্থের গন্ধ মাত্র নাই সুতরাং সেবন্ধুত্বে কৃত্রিমতা মোটেই থাকিতে পারে না।

এদেশের গ্রামগুলি বড় সুন্দর। যেখানে ক্ষেত্র বা চাষের জমী তাহার নিকটে বাড়ী নাই। বাড়ীগুলি একত্র ঘন সন্নিবেশিত, পরস্পর গৃহগুলি সংলগ্ন ডাকাতের উপদ্রবেই বোধ হয় এরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে। ধান্য বা অন্যান্য কৃষিক্ষেত্র তাহা হইতে অনেক দূরে। বিকালে ঘাসিরাম বাবুর গৃহে জলযোগ ও রাত্রে লুচি, মিষ্টান্ন ভোজন হইল।

প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখি রবিয়া আমাদের জন্য গরম জল করিয়া রাখিয়াছে। শীতকালে এখানে গরম জলই ব্যবহার ব্যবস্থা। এখানে শীত যেমন বেশী, গ্রীষ্মকালে গরমও তেমন অধিক সে গরমের উপদ্রবে তিষ্ঠান যায় না। কার্ত্তিক মাস, তখনও শীত পুরামাত্রায় পড়ে নাই। তথাপি বাঙ্গলায় পৌষের শীতের মত। রবিয়া ঘাসিরামবাবুর ভৃত্য। আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া এদেশের অভ্যাসমত চা পান করিলাম; সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ জলযোগও হইল। বাহিরে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। ঘাসিরামবাবু কহিলেন "এখন নহে, পাশ আনাইয়া দেই, দুর্গ দেখিতে যাইবেন।" আমি কিন্তু তাহার পাশের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম না। সহর বেড়াইব, যেখানে যাহা ভাল তা দেখিব, বরং পরে ওবেলায় দুর্গ দেখিতে যাইব। প্রথমেই বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুর ওখানে গেলাম। তাঁহাকে আগরার বন্ধুর পত্র দিলাম, এবং তাঁহার বাড়িতে না উঠিবার কারণ বলিলাম। তিনিও বলিলেন "ঘাসিরামবাবু খুব ভদ্রলোক, সেখানে উঠিয়া মন্দ করেন নাই। বাঙ্গালীরা এদেশে আসিয়া কোন কষ্ট ও অসুবিধায় না পড়েন ইহা আমাদের দেখা কর্ত্তব্য।" ডাক্তারবাবু তাঁহার চাকরী থাকিবে না বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন, তাহার স্থানে একজন ইংরেজ ডাক্তার আনিবার কথা হইতেছে, কেবল রাজমাতা অনুরোধ করিয়া রাখিতেছেন; তাহাইবা আর কত কাল! ডাক্তারবাবু তাহার গৃহে আমাকে একদিন আহার করাইলেন; ইহা তাঁহার স্বজাতি প্রিয়তার নিদর্শন।

সেদিন প্রাতেই দুর্গের চারিদিক ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম। দুর্গ সুদৃঢ় মৃত্তিকার প্রাচীরে বেষ্টিত। যে ভরতপুরের দুর্গের কথা ইতিহাস ও পুস্তকাদিতে পাঠ করিয়াছি আজ চর্ম্ম চক্ষে তাহার বহির্ভাগ দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করিলাম। মাটীর এত বড় সুদৃঢ় প্রাচীর ও দুর্গ, পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই দুর্গের অনেক স্থান বিদ্রোহীদিগের কামানের গোলায় ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা মেরামত হইয়াছে। নানাসাহেব তখন বিদ্রোহীদিগকে সহায়তা করিবার জন্য তৎকালীন মহা-

রাজের নিকট আসিয়াছিলেন কিন্তু মহারাজ স্বীকার না হওয়ায় তিনি চলিয়া যান। বিদ্রোহ অবসান হইলে নানাসাহেব নেপাল রাজ্যে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। নানাসাহেবের বাড়ী ছিল কানপুর জেলার বিটুর গ্রামে। এখনও নানাসাহেবের ভগ্ন বাড়ী পড়িয়া আছে। নানাসাহেবের কন্যার কন্যা তখনও বিটুর অবস্থান করিতেছিলেন। আমি সে বৃদ্ধা রমণীকে তথায় দেখিতে গিয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্টের সামান্য বৃত্তি পাইয়া তিনি তাঁহার বৈধব্য জীবনের অবসান করিতেছিলেন। রমণীর প্রত্যেক কথায় যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইতেছে। এত বড় যুদ্ধার বংশে শিখের ঔরষে শিখ রমণীর গর্ত্তে তাঁহার জন্ম সুতরাং তাঁহার কথায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিবে অসম্ভব কি? রমণী নানাসাহেবের অট্টালিকায় বাস করেন না, তিনি সামান্য পর্ণকুটীরে দীনবেশে বাস করিয়া থাকেন। ইহাকে দেখিলে ভক্তি করিবার ইচ্ছা হয়। যাক্ সে সব কথা!

গৃহে আসিয়া দেখি দুর্গ দেখিবার জন্য পাশ আসিয়াছে। আহারাদি শেষ করিয়া একজন ভাল লোক সঙ্গী লইয়া দুর্গ দেখিতে গেলাম। অস্ত্রগোলাগুলি দুর্গে অপ্রচুর নহে। সবই যেন সজ্জিত, যেমন যুদ্ধের ডাক পড়িলেই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধে গমন করিতে পারে, সৈন্যগণ প্রস্তুত। দুর্গ ব্যতীত আরও সৈন্যবাস আছে, তাহা বৃহৎ মাঠে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদ, কাছারী বাড়ী প্রভৃতি দেখিবার জিনিষ বটে। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার একই হাকিম করিয়া থাকেন। শুনিলাম সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন ইংরাজরাজ ভারতীয় দণ্ডবিধির অন্তরালে অস্ত্র আইনটাকে ফেলিয়া দিলেন তাহার কিছু দিন পর ইংরেজরাজ ভরতপুরের মহারাজকে তাঁহার দেশে অস্ত্র আইন চালাইতে উপদেশ দিলেন। মহারাজ রাজ্যের যত সব সর্দারকে লইয়া সভা আহ্বান করিয়া সকলের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। দেশের লোক উত্তেজিতভাবে বাধা দিয়া কহিল "আগে ইংরেজের অস্ত্রের সহিত আমাদের অস্ত্রের সংগ্রাম হউক, যদি আমরা পরাস্ত হই, তবে আমাদের দেশে আইন চালাইব।" মহারাজ ইংরেজরাজকে এই বিবরণ জানাইলে পর হইতে এপর্য্যন্ত অস্ত্র আইনের নাম মাত্রও আর এদেশে করা হয় না। এদেশে বা এদেশের নিকটবর্ত্তী ইংরেজের রাজ্যেও অস্ত্র আইন প্রচলিত নাই, বীরের দেশ কিনা, বীরপুরুষেরা অস্ত্র আইন ঘাড়ে লইতে চাহিবে কেন? ধন্য বীরভূমি—ধন্য তোমার বীরপুরুষগণ।

দুর্গ দেখিয়া আর গৃহে গেলাম না। মাঠে যেখানে সৈন্যাবাস, সেদিকে অগ্রসর হইলাম। বৃহৎ মাঠ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাকা কুটীর, তাহাতে এক এক কুটীরে এক বা দুই জন করিয়া সৈন্য স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। শিখসৈন্য ও কয়েকজন আছে। শিখেরা হিন্দু হইলেও মুরগী খায়। পূর্ব্বে রাজার কাছে চাহিয়া ইংরাজগণ রাজসৈন্য নিতে পারিতেন। এখন এই সকল সৈন্য কখন শিমলায়, কখন সীমান্তে ইংরেজের কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সৈন্যগণের বাসভূমি দেখিতে দেখিতে নগর পরিভ্রমণে বহির্গত হইলাম। নগরের পার্শ্বস্থ বনভূমিতে অগণিত হরিণ, হরিণী, ময়ূর, ময়ূরী বিচরণ করিতেছে। হরিণীগণ বঙ্কিমগ্রীবা হেলাইয়া আমাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দৌড়িয়া বনান্তরালে পলায়ন করিতেছে। অহো! কি মনোরম স্বভাব শোভাই না দেখিলাম। এমন নয়নারাম আনন্দ বুঝি জীবনে দেখিব না। ময়ূর, ময়ূরীগণ আমাদের আগমন বুঝিতে পারিয়াও হরিণের ন্যায় দ্রুতগতিতে পলাইল না, কিন্তু তাহাদিগের সুন্দর গ্রীবা উত্তোলন করিয়া আমাদের প্রতি যে কটাক্ষপাত করিল তাহার শোভাও অনির্ব্বচনীয়। এমন স্বভাব সুন্দর ভঙ্গি বন্যজাত পশুপক্ষীগণ কোথায় পাইল, কেইবা তাহাদিগকে এমন সুন্দর স্বভাবনৃত্য শিক্ষা দিল?

মাটীর অবস্থা দৃষ্টে বুঝা যায় এদেশের মৃত্তিকায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় না। জল বহু নীচে, নীচ হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্রের ফসলে দিতে হয়। ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে কূপ প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। মরুভূমি সদৃশ বালুকারাশিতে বিনা জলে কি আর ফসল জন্মে।

গৃহে ফিরিলাম। রাত্রিতে সংবাদপত্র পাঠ ব্যতীত এদেশীয় গীতবাদ্যের আয়োজন বাবু খাসিরামের গৃহে হইয়াছিল। সে আমোদ উপভোগ করিলাম। পরদিন

প্রাতে দিক ভবন দর্শন করিতে দিক নামক স্থানে গেলাম। খাসিরামের বাড়ীর গাড়ী আমাদিগকে লইয়া দিক্ অভিমুখে চলিল। দিকে একটী ভবন আছে, তাহার নাম "দিক ভবন।" ইহা এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে ইহার যন্ত্র পরিচালন করিলেই বৃষ্টিপাত হয় ও বিদ্যুৎ, বজ্র চমকে। আমি রাজকীয় আদেশ অনুসারে দিক ভবনে কৃত্রিম বৃষ্টির নীচে স্নান করিয়া বেলা ২টার সময় গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। পূর্ব্বে ভরতপুরের রাজা এখানে নিত্যই আসিয়া স্নান করিতেন। দিক এখান হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে বৃষ্টিপাত আমি আর কোথাও দেখি নাই।' এখানে যাহা দ্রষ্টব্য সমস্তই দেখিয়া দেখিয়া বন্ধুবর বাবু খাসিরামকে অন্তরের ধন্যবাদ দিয়া ভরতপুর ত্যাগ করিয়া অপরায় ফিরিলাম। এবং তথা হইতে ধোলপুর রাজ্য দর্শনে গমন করিলাম।

ধোলপুর।

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ধোলপুর একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। আমাদের বাঙ্গলাদেশের বড় জমিদারের মত ইঁহার বার্ষিক লাভ। হইলে কি হয়? সাপ ছোট হইলেও তার বিষ থাকে। এ রাজারও আফিস, আদালত, বিচার বিভাগ, সৈন্যসামন্ত সবই আছে। রাজা ছোট হইলেও তেজ বীর্য্য তাঁর অসীম। একবার এই রাজ্যের বর্ত্তমান মহারাজা শিমলা শৈলে যাইতেছিলেন; তিনিও একজন ভারতগবর্ণমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী ইংরেজ কর্ম্মচারী সেই গাড়ীতে ছিলেন। উঁহারা উভয়েই এক গাড়ীতে। কি জানি কি কথা লইয়া পরস্পর বচসা হয়, পরে ধোলপুরের মহারাজা তাহাকে বধ করিবার জন্য তরবারি উত্তোলন করেন। ইংরেজ কর্ম্মচারী মহারাজকে চিনিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জীবনভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। গাড়ী পরবর্ত্তী ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলে তাঁহার সঙ্গীয় সৈন্য সামন্তগণকে তিনি আহ্বান করিয়া সাহেবকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিলেন এবং ষ্টেশন মাষ্টারও সেগাড়ীতে সাহেবকে আর যাইতে দিলেন না।

ধোলপুরে বিশেষ দর্শনীয় বস্তু কিছু নাই। আমি এখানে বাঙ্গালী ঈশ্বরবাবুর অতিথি হইলাম। ঈশ্বরবাবু পূর্ব্বে ভরতপুরে কাজ করিতেন। তিনি এরাজ্যের একজন ভাল কর্ম্মচারী। আমার আগরাস্থ বন্ধুর নিকট হইতে একখান পরিচয় পত্র লইয়া আসিয়া তাঁহারই বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। পরের বাড়ীতে যেমন করিয়া আদরে বেশ উত্তম আহার নিশ্চিন্তে করা যায় এমনটী নিজ বাড়ীতে হইবার উপায় নাই!

রাজপ্রাসাদ, আর ক্ষুদ্র একটী হ্রদের উপর সুন্দর উদ্যানই এখানে দেখিবার জিনিষ। শিবমন্দির ও অন্য দেবালয় গুলিতে রাজকীয়ভাবে সেবার বন্দোবস্ত আছে।

আমি একদিন মহারাজার সহিত দেখা করিলাম। মহারাজ শিক্ষিত বলিয়াই বোধ হইল। তাঁহার সহিত অনেক বিষয়ের আলাপ হইল। সব কথাই যেন দেশের মঙ্গলের সহিত মিশ্রিত। আমার সঙ্গে আগরতলার মহারাজার বিত্ত, বিদ্যা, সামাজিকতায় তাঁহারা কিরূপ শ্রেণীর লোক—ইহাই নানাভাবে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু আগে উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। আগরতলার মহারাজা ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রকাশ করেন কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ সমাজে অচল, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্পর্শ জল পান করেন না শুনিয়া তিনি বিস্মিত ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। আমি এসকল বিষয়ের কিছু বুঝিতে না পারিয়া ঈশ্বর বাবুকে সব কথা কহিলাম। তিনি কহিলেন "আগরতলার রাজকন্যার সহিত ধোলপুরের রাজপুত্রের বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে।" ইহার কতকদিন পর জানিতে পারিলাম আগরতলার সঙ্গে ধোলপুরের সে সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

দুই দিনের বেশী আমার আর এখানে থাকিতে হইল না। এখানেও আমরা সেই বন্য হরিণ, হরিণীর ও ময়ূর, ময়ূরীর নৃত্য দেখিতে দেখিতে নয়ন মন তৃপ্ত করিতে লাগিলাম। ধোলপুর রাজ্যের রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বিলক্ষণ। এখানেও একজন পলিটিকেল এজেন্ট আছেন। ইতিপূর্ব্বে ভরতপুর ও ধোলপুর উভয় রাজ্যে একজন মাত্র পলিটিকেল এজেন্ট ছিলেন। ভরতপুরের মহারাজার মৃত্যুর পর সামান্য বেতনে একজন পলিটিকেল এজেন্ট ধোলপুরে আছেন। ধোলপুর রাজ্যের বার্ষিক আয় ৮।১০ লক্ষ টাকার অধিক হইবে না। রেলষ্টেশন হইতে ধোলপুর রাজধানী অধিক দূরে নহে, ষ্টেশন হইতে রাজপ্রাসাদ নয়নগোচর হইয়া থাকে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ।

মুক্তি।

(একবারে গল্প নহে।)

খুরসেদ আমাদের এক সাথে পড়িত। তাহার ন্যায় সৌখীন ফুলবাবু আমাদের স্কুলে আর দ্বিতীয়টী ছিল না; সুতরাং ইস্তক হেড্মাষ্টার নাগায়েৎ স্কুলের রহিমদ্দীন দপ্তরী ও শ্যামলাল দারোয়ান তাহার দিকে খুব সম্ভ্রমের সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত।

শুধু তাহাই নহে। খুরসেদ মিঞার আরও এমন কতকগুলি অনন্যসাধারণ গুণ ছিল, যাহার জন্য আমাদের আট পৌরে শিক্ষকমহাশয়গণ ব্যতীত উচ্চদরের সাহেব মহলেও তাহার আদর এবং খোসনাম যথেষ্ট ছিল। জেলার পুলিশ সাহেব এই সুন্দর যুবকটীকে দেখিলে বুকে টানিয়া লইতেন, জজসাহেব তাহাকে হেণ্ডসেক করিয়া সম্মান করিতেন। জেলাম্যাজিষ্ট্রেট তাহার সহিত ইংরেজীতে কথা বলিয়া সতীর্থ সমাজে তাহার গৌরব বাড়াইয়া দিতেন। এমনই ছিল—খুরসেদের উচ্চ সাহেব মহলে প্রভাব-প্রতিপত্তি এই আদর আপ্যায়নের মূলে যে খুরসেদ মিঞার চেহারাটীই ছিল তাহার কেবলমাত্র সম্বল, তাহা নহে; তাহার হাতের লেখা ছিল ছাপার কপিবুকের লেখার ন্যায় সুন্দর, আর তার মুখে ইংরেজী বুলি আসিত—অনর্গল। ইহার উপর সাহস ছিল তার অসীম।

ব্রহ্মপুত্রের মুক্ত জলহাওয়ার উপর পীর জাফরের দরগার সান্নিধ্যে ছিল তাহার বাসাখানা। তাহার সেই জনবিরল বাসপ্রকোষ্ঠে বসিয়া আমরা প্রায় প্রতিদিনই তাহার নিকট হইতে তাহার দৈনন্দিন সাহেব সুবার সহিত মুলাখাতের কথা শুনিতাম, আর অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতাম তাহার সেই অসীম গৌরবময় মুখমণ্ডলের প্রতি, আর ভাবিতাম শুধু তার সুদুর্লভ সৌভাগ্যের কথা।

আজ এই সুদীর্ঘকাল পরেও সেই সুদূর অতীতের পানে স্মৃতির নিশানা ফিরাইয়া যখন তাকাই, তখন গদাধরের বেতের বাড়ি ও জগদানন্দের দাঁত কিরিমিরির সহিত সতীর্থ খুরসেদ মিঞার দেলখোলাসা গুন্ গুন্ স্বর লহরী ও উদার সরল দৃষ্টি এখনও স্মৃতির পর্দাকে মৃদু আঘাতে আর্দ্র করিয়া কাঁপাইয়া দেয়।

(২)

একদিন স্কুলে যাইয়াই শুনিলাম—আমাদের খুরসেদ মিঞা আর স্কুলে আসিবে না; পুলিশের বড়সাহেব তাহার হাতের লেখা দেখিয়া তাহাকে তাঁহার আফিসের কেরাণী করিয়া লইয়াছেন। সে এখন হইতে চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সরকারী ইংরেজী চিঠি পত্র লিখিবে। শুনিয়া আমরা তাহার উদ্দেশে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলাম; তাহার উপর আমাদের শ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গেল।

পণ্ডিতমহাশয়ের ঘণ্টায় আমরা দল বাঁধিয়া সেদিন আফিসে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম বাস্তবিকই খুরসেদ তখন চেয়ারে বসিয়া টেবিলের দিকে তাহার সুবিন্যস্ত আলবার্ট টেরিযুক্ত মস্তকটী কোণকোণিভাবে হেলাইয়া দিয়া খুব মনোযোগের সহিত লিখিতেছে।

আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধার সহিত তাহার এই রাজসম্মান অনুভব করিতে লাগিলাম এবং নিজ নিজ ভবিষ্যৎ ভাগ্যের আদর্শ কল্পনা করিতে লাগিলাম।

খুরসেদ আমাদিগের আগমন লক্ষ্য করিয়াছিল। এবং নিজ হাব ভাবকে আরও একটু অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া লইয়াছিল; সে আমাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে দূরে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিল। আমরা নীরবে তাহার ইঙ্গিত অনুসরণ করিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই সে তাহার হাতের ষ্টিলপেনটী কলমদানিতে রাখিয়া ব্লটিং কাগজ দ্বারা লেখাটীকে চাপিয়া রাখিয়া থুথু ফেলিবার সুযোগে বাহির হইয়া আসিল এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি কয়টী কায়দার সহিত ঊর্দ্ধে তুলিয়া আমাদিগকে সম্ভাষণ করিল:—

"গুড্ মর্ণিং মাই ডিয়ার ফেলো ফ্রেণ্ডস্।"

এই বয়সে যে রকমের কথাবার্ত্তা যুবকদের মধ্যে হইয়া থাকে এখানেও সেই রকমেরই কথাবার্ত্তা হইল। খুরসেদের সৌভাগ্যের কথা উঠিলে খুরসেদ বলিল—এতো বেশী কিছু নয় ভাই! হাতের লেখা ভাল করিতে পারিলে, আর মর্জ্জি বুঝিয়া ইংরেজের সহিত অনর্গল কথা বলিতে পারিলে—এ খুব সৌভাগ্য নয়; চেষ্টা করিলে সকলেই এ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে।

সে দিন হইতে আমরা—সেই দলের প্রায় সকলেই হাতের লেখা পরিষ্কার করিতে ও ঘাটে পথে ইংরেজী বলিতে আরম্ভ করিলাম।

সে দিন গিয়াছে এমন এক দিন, যখন হাতের লেখা ভাল হইলেই গবর্ণমেণ্টের আফিসে চাকুরী হইত। বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষা যাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এখন বাল৷ হইতে বসিয়াছে, তাহাতো ছিল রাজর্ষী দেবর্ষী দের মত কার্যের জন্য উপযোগী। জাতীয় শিক্ষা নামে যে অর্থকরী শিক্ষার প্রস্তাবনা বর্ত্তমানে চলিতেছে, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে হয়ত তাহাও আবার নিরর্থক শিক্ষা হইয়া দাঁড়াইবে। সময়ের স্রোতে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

(৩)

ইস্কুল রূপ ভারত মহাসাগর হইতে যখন আমাদের জীবন তরণী আসিয়া ইউনিভার্সিটি রূপ বিস্তৃত প্রসান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করিবার পথে পঁহুছিল তখন দিন রাত করিয়া সেই সংকীর্ণ প্রবেশিকা প্রণালীটা পার হইবার জন্য চোখ মুখ বুঁজিয়া দাঁড় ঠেলিতে লাগিলাম।

এইরূপ অবস্থায় একদিন শীতের প্রভাতে যখন লেপ মুড়িদিয়া বসিয়া হিষ্টরী অব ইংলণ্ড খানা মুখস্থ করিতেছিলাম—সেই সময় একটী লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ইনিস্পেক্টার বাবু—কি বাসায় আছেন ?'

মনোযোগের সহিতই পড়িতেছিলাম, সুতরাং প্রশ্নটী কর্ণে—প্রবেশ করিলেও, তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়া ভোর বেলাকার পাঠে ব্যাঘাত উৎপাদন করা সঙ্গত মনে করিলাম না। যে রূপ ভাবে পড়িতেছিলাম সেরূপ ভাবেই অখণ্ড মনোযোগের সহিত মাথা—গুঁজিয়া পড়িতে লাগিলাম।

লোকটী দুই তিন বার প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর না পাইয়া নিশ্চয়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিরক্তির সহিত আমার দিকে তাহার সুন্দর সুচিক্কণ লোলিহান বেত্র দণ্ড আস্ফালন করাইয়া বলিলেন—"ওহে ও ছোকরা —শুনছনা যে, দেখ দেখি শম্ভুবাবু আছেন কি না।"

লোকটার "ছোকরা" সম্বোধনে ভয়ানক রাগ হইয়াছিল। আমি বিরক্তির সহিত ভদ্রলোকটীর দিকে চাহিয়াই দেখি—"বাঃ আমাদের খুরসেদ মিঞা যে? এখন কোথায় আছ ভাই ?"

খুরসেদ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"নিকলীর থানায় আছি। ইনস্পেক্টর বাবু বাসায় আছেন কি ?"

'না। তিনি খুব ভোরে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।"

"ইনিস্পেক্টর বাবু তোমার কি হন ?"

"মাতুল।"

কথার উত্তর দিয়াই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,'—তুমি নিকলীর থানায় কি কর হে ?"

"থানার দারোগা।"

আমি অবাক হইয়া রহিলাম। থানার দারোগা! এত বড় কাজ করে আমাদের খুরসেদ!

"থাক্, দেখা হবে আফিসে।" বলিয়া শিশ দিতে দিতে বেত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুট জুতার মস্ মস্ শব্দে খুরসেদ চলিয়া গেল।

* * * * *

বহু চেষ্টা চরিত্র করিয়াও প্রবেশিকার সংকীর্ণ পথটী উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হইয়া যখন নিরুপায় হইয়া পড়িলাম তখন অতীতের সে উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষার কল্পনা সব তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙ্গিয়া গেল। জীবনকে কোন মতে চালাইয়া লইবার জন্য একটী কাপড়ের দোকান করিয়া বসিলাম।

তখন খুরসেদের ন্যায় অনেক সতীর্থের কথাই স্মৃতির পট হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছিল। ইন্ধন ব্যতীত অগ্নির অবস্থা যেমনটী হয়, দেখা সাক্ষাতের অভাবে সহপাঠির পরিচয়-বন্ধুত্বের অবস্থাও তেমনি হয়।

খুরসেদের স্মৃতিও যখন বিস্মৃতির প্রভাবে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এই সময় একদিন সংবাদ পত্রিকায় পাঠ করিলাম—মেঘনা গর্ভে'লোহিত' জাহাজের নিমজ্জন সংবাদ। আর দেখিলাম—লোহিত জাহাজের সাহিত ডুবিয়া যে অগণিত লোক সলিল সমাধি লাভ করিয়াছে, তাহাদের নামের একটী তালিকা; এবং তাহার মধ্যে রহিয়াছে—গোর দী থানার খুরসেদ আহাম্মদের নাম।

(৪)

তাহার পর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। বাল্য ও কৌমারের সতীর্থ—যাহাদিগকে স্মরণ করিয়া রাখিবার

কোন কারণই ছিলনা, তাহাদের স্মৃতি বিস্মৃতির প্রলেপে মনের পটে স্বাভাবিক নিয়মে ঢাকা পড়িয়া গেল।

এই সময় বাঙ্গালার আবহাওয়ায় নবীন চিন্তার স্রোত বহিতেছিল। এই নবীন যুগের স্বদেশী আন্দোলনে আমার দোকানের অবস্থা রাতারাতি ফিরিয়া গেল।

বার্দ্ধক্যের ভোগের কল্পনা যখন আমার প্রৌঢ় দেহ-মনে একটু সুখের তরঙ্গ তুলিয়াছিল এই সময় এক দিন হটাৎ চক্ষে ধরা-পৃষ্ঠ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

ছেলে দুটী কলেজে পড়িতেছিল, হঠাৎ শুনিলাম, তাহাদিগকে পাওয়া যাইতেছে না। তাহাদিগকে খুজিয়া বাহির করিবার জন্য সরকার হইতে সরকারী খরচায় বিরাট রাজকীয় অনুসন্ধান চলিতেছে। * *

কয়েকদিন পরে ছেলের অভাবে ছেলের পিতাকেই আসিয়া সরকারী লোক ধরিয়া লইয়া গেল। তারপর অদৃষ্টে যাহা ছিল—ষষ্ঠি জাগর বাসরে বিধাতার নিযুক্ত চিত্র গুপ্ত ললাটে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন—ভোগ করিয়া আসিতে হইল।

মাসাধিক কাল দুর্ভোগ ভোগ করিয়া যখন গৃহে আসিলাম, তখন শুনিলাম, পুত্র দ্বয়ের স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে—বঙ্গোপসাগরের মৃদুমন্দ সমীর সেবিত চড় লরেন্সে!

(৫)

বার্দ্ধক্যের মুখে এরূপ দুর্ভোগে পড়িয়া নিজের উপর যেমন ধিক্কার আসিয়াছিল হতভাগা পুত্র দের উপর ও তেমনি ঘৃণা এবং ক্রোধ হইয়াছিল। এমন হতভাগা পিতৃ হন্তাদিগের জন্য আর এক পা এদিক সেদিক হইব না, স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিলাম। এইরূপে আরো দুইটী বৎসর চলিয়া গেল। পিতার প্রাণ ইহার মধ্যে যে নিশ্চিন্তে ছিল, অবশ্য তাহা বলা যায় না, কিন্তু উপায়ই বা কি ছিল? দেশে ভুক্তভোগীর অভাব ছিল না। শক্তিহীন জড় প্রকৃতিগ্রস্ত লোকের পক্ষে ইহা ছিল একটা মস্ত সান্ত্বনা। এই মহাজনেরা যে পন্থা অবলম্বন করিলেন—পুত্রহারা জননীর হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ও দীর্ঘ নিশ্বাসের শক্তি শেষটা আমাকেও সেই পন্থা অনুসরণ করাইতে বাধ্য করিল।

গোয়ালন্দ মেলে কলিকাতা যাইতেছিলাম। রাত্রি ৯টার গাড়ীতে চাপিয়াই বার্থে শয্যাটী পরিপাটী করিয়া বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি দেড়টায় হটাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখি, আমার সম্মুখের বার্থে যিনি শয্যা লইয়াছিলেন তিনি উঠিয়া তাঁহার দখলীয় স্থানের অর্দ্ধাংশ আর একজনকে আপোসে ছাড়িয়া দিয়া দেহটীকে অপেক্ষাকৃত সঙ্কোচিত করিয়া বসিয়া আছেন। ষ্টেশনের সম্মুখের বার্থে দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি খুব খোস মেজাজে তাকিয়া ঠেস দিয়া অর্দ্ধশয়ান-উপবেশন অবস্থায় গুড়-গুড়ির লম্বা নলে তামাক টানিতেছিলেন। অম্বরী তামাকের ধূমের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছিল। তাম্রকূট সেবীর মেজাজ গম্ভীর—সে গাম্ভীর্য্য প্রত্যেক টানে টানে প্রমাণ দিতেছিল।

সেকেণ্ড ক্লাসে বসিয়া এরূপ আপত্যজনক বে-আদবি অবশ্য যাহার তাহারই করিবার ক্ষমতা নাই। তাম্রকূট অনাশক্ত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ চিন্তার অবকাশ আছে; মনে মনে তাহাই করিতেছিলাম।

তখন গল্পালাপ চলিতেছিল। কোন্ বিষয়ে কে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তৎপর কে কোন্ বিষয়ের কিরূপ আপত্তি করিলেন বা সমর্থন করিলেন, তাহা অবগত হইবার অধ্যবসায় হটাৎ নিদ্রোত্থিতের পক্ষে সমীচীন নহে বিবেচনায় একটু ধৈর্য্য ধরিয়া তাহা শুনিতে লাগিলাম। আলাপ তর্ক যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল, তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম এবং মনোযোগের সহিত তর্কের সূত্রটী ধরিবার জন্য মনে মনে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

আলাপ প্রসঙ্গে বুঝিলাম, আমার সম্মুখের নবীন আগন্তুক ভদ্রলোকটী উকীল ও অপর দুইজন পুলিসের লোক। উকীল বাবুটী বলিলেন—"মোটের উপর পুলিসের চাকুরীতে ইহকালে বিপদ ও পরকালে নরক ভয় যতই থাকুনা কেন—ইহার উন্নতি অতি দ্রুত এবং—

তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিটী তাঁহাকে কথা সমাপ্ত করিবার অবকাশ না দিয়াই বলিলেন—"উন্নতি দিবার যে মালিক সে নিতান্তই খামখেয়ালের নয়। তাঁরও একটা Principle আছে—একটা বিচার বিবেচনায় ধারা আছে;—অযোগ্যকে কখনই যোগ্য বলিয়া এবং যোগ্যকে

অযোগ্য বলিয়া সে কখনই সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। আর দ্বিতীয় কথা এই—অধ্যবসায়ী ও নিপুণ কর্ম্মীর পুরস্কার চিরদিনই পৃথিবীতে থাকিবে—তা তিনি পুলিস বিভাগেই থাকুন আর 'বারেই' থাকুন। কি বলেন মশাই ?

আমাকে সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া ভদ্রলোকটী এই দায়িত্বপূর্ণ মীমাংসার ভারটী আমার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিলেন।

আমি হটাৎ এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এ দুর্দ্দিনে ঘাড়ের উপর গুরু বোঝা লইয়া আসিয়া পুনরায় পুলিসের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়া অনাহেতু নূতন বিপদ আহ্বান করা ও পূর্ব্ব বিপদ সঙ্গীন করিয়া তোলার আমি মোটেই পক্ষপাতি হইলাম না। আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া ভদ্রলোকটীর শেষ মন্তব্য সমর্থন করিলাম—

"যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহই নাই।"

এ প্রসঙ্গ এই স্থানেই থামিয়া গেল। আমার সমর্থনে সন্তুষ্ট হইয়া সেই বক্তা ভদ্রলোকটী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন ?"

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম; মুহূর্ত্তমধ্যে নিজের মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করিলাম। ইহার পর সত্য বলিব কি গোপন করিব, তাহার বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটী আর কোন প্রশ্ন করিলেন না।

আমার উত্তর শুনিয়া সেই অম্বরী সেবী ভদ্রলোকটী আমার দিকে একটী সহানুভূতির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"ময়মনসিংহে কি আপনার বাড়ী ?"

"আজ্ঞা হঁা।"

"কোন মহকুমায় ?"

"আপনি কি সে সকল স্থান জানেন ?"

"ভদ্রলোকের বাস-গ্রাম গুলিতো প্রায়ই জানি; আমি সেরপুর, দুর্গাপুর, কেন্দুয়া—অনেক থানাতেই কাজ করিয়াছি—।"

বুঝিলাম, ভদ্রলোকটী আমাদের জেলার প্রায় সকল মহকুমার খবরই রাখেন। আমি আমার বাসস্থানের নাম বলিলাম।

তখন আমাদের অঞ্চলের অনেক পুরাতণ কথাই তিনি বলিতে লাগিলেন। শুনিয়া আমিও সাহস পাইয়া সে কালের দুই একটা কথা তাঁহাকে শুনাইলাম। বেশ পরিচয়ের ভাবেই আলাপ হইল বটে কিন্তু ভদ্রলোকটী কে, কিছুতেই তাহা জিজ্ঞাসা করিবার মত সৎ সাহস হৃদয়ের ভিতর জমাইয়া তুলিতে পারিলাম না। তিনিও আমার সম্বন্ধে আর কোন প্রকার নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আমাকে বিপন্ন করিলেন না। যাহা হউক, আমি খুব বিশেষ ভাবে তাহার সুরৎহাল লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

দীর্ঘ গোঁফ, ফ্রান্স কাটে কটা দাঁড়ি, মাথায় স্বল্প কেশ, শ্যাম বর্ণ চেহারা, পরিধানে কোট প্যান্ট। ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ—বুঝিতে পারিলাম না। বয়স মনে হইল পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয় নাই, দাঁড়ি গোঁফ কেশ তেমন পাকিয়াছে কি না উজ্জল আলো সত্বেও তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

ইতি মধ্যে একটা ষ্টেষনে গাড়ী থামিলে ভদ্রলোকটীর চাপরাসী আসিয়া তাহার গুড় গুড়ির কলিকাটী বদলাইয়া দিয়া গেল। তিনি নীরবে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন।

আমার ন্যায় গল্পাতুরের নিকট গল্প চর্চ্চার পর হঠাৎ একেবারে এরূপ নীরবে থাকা পোষাইতেছিল না, অথচ ভয়ও মনে প্রবল ছিল—কোন্ কথার উপর কোন্ কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। নানা রূপ ইতস্তত করিয়া অগত্যা তিনি আমাকে যতটুকু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ততটুকুই আমারও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, স্থির করিয়া অতি সাবধানে প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি কোথা হইতে ...... ?"

তিনি উত্তর করিলেন—"ফরিদপুর হইতে আসিয়াছি।"

অপর ভদ্রলোকটী ইতিমধ্যে যাইয়া উপরের ব্যাঙ্কে শয্যা রচনা করিয়া ধীরে ধীরে সিগারেট টানিতে ছিলেন। আমার এইরূপ বেয়াদবি হইতেছে দেখিয়া তাহার শ্রীমুখটী ঝুলাইয়া নীচের দিকে নামাইয়া আমার কাণে সমঝাইয়া দিলেন "ইনি ফরিদপুরের D.S.P."

আমি আমার ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া জিহ্বা দংসন করিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া লইলাম। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সহানুভূতের সহিত

বলিলেন "আমার বাড়ীও আপনাদের ডিষ্ট্রিক্টেই—টাঙ্গাইল সবডিভিসনে।"

এই পরিচয়ের উপর অনুমানেই আমি তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলাম। এবং দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলাম। তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন।

এমন সকল উচ্চ পদে দেশের বহু লোক অবস্থিত নহেন,—কোটীতে গুটিমাত্র। সুতরাং টাঙ্গাইল মহকুমা নিবাসী পুলিসের এসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু মহাশয়কে আমি কখন না দেখিলেও অনুমানেই স্থির করিয়া লইতে আমার কাল বিলম্ব হইল না।

প্রতিনমস্কার করিয়াই তিনি—ময়মনসিংহের প্রাচীন পুলিস কর্ম্মচারী শম্ভুবাবু, কালীকৃষ্ণ বাবু, হরিমোহন বাবু প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি একজন পুলিসের উচ্চপদস্থ সহৃদয় ব্যক্তিকে আপনার জন বলিয়া বুঝিয়া লইবার সুবিধা পাইয়া অত্যন্ত সাহসের সহিত ময়মনসিংহের সেকালের প্রসঙ্গ স্বাধীন ভাবে আলোচনায় নিযুক্ত হইলাম।

আমাদের এই আলোচনার পূর্ব্বেই আমার সম্মুখের সেই ভদ্রলোকটী তাঁহার শয্যাটী উপরে লইয়া গিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, সুতরাং উকিল মহাশয়ও সেই স্থানে দখল স্বত্ব কায়েম করিয়া লইয়া তাহা নাসিকার উচ্চধ্বনি সহযোগে প্রচার করিয়া ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া আমার মাতুল শম্ভুবাবুর কথা তুলিয়া অতি সাবধানে নিজ পরিচয় দিলাম। পুলিস সাহেব বলিলেন—"আমি শম্ভুবাবুর অধীন চাকুরী করিয়াছি। তিনি আমাকে প্রথম থানার চার্জ্জ দেন; আপনি তাঁহার ভাগিনেয়?"

আমি তাঁহার অহঙ্কারশূন্য ভাব দেখিয়া সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি সাধারণ দারগা হইতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন......?

তিনি সাগ্রহে বলিলেন—"সামান্য কনেষ্টবল হইতে ক্রমে দারগা হইয়াছি—"

তাঁহার এই উত্তরে আমার হৃদয়ের বহুকালের বিস্মৃতির প্রলেপ যেন সরিয়া গেল এবং তাহাতে খুরসেদ মিঞার সুন্দর টেরিকাটা ছবি খানা ভাসিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—"অমাদের সেকালের একটী সহপাঠির সম্বন্ধে আমি এরূপ জানি—তিনিও সামান্য কেরাণী গিরি হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই পুলিসের ইনিস্পেক্টর হইয়াছিলেন—বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় আরো উন্নতি করিতে পারিতেন। তাহার নাম ছিল খুরসেদালী।" পুলিস সাহেব আগ্রহের সহিত বলিলেন—খুরসেদালী—তার বাড়ী কোথায় ছিল জানেন?

আমি—সে ছোট বেলাকার কথা, বাড়ী কোথায় ছিল, অতশত তো জানিনা। তার সঙ্গে একত্র পড়িতাম, একত্র খেলিতাম—এই মাত্র। হাতের লেখাটী ছিল তার অতি সুন্দর—সাহেব সুবারা তাকে বড়ই ভাল বাসিতেন; ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেইলি সাহেব তাহাকে ডাকিয়া নিয়া চাকুরী দিয়াছিলেন? লোহিত জাহাজ ডুবায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে—আজ কাল থাকিলে বোধ হয়..."

শেষটায় তুলনায় সমালোচনা আসে দেখিয়া আমি এই স্থানেই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কথাটা শেষ করিলাম।

পুলিস সাহেবও আমার সহিত একটী দীর্ঘ নিশ্বাসে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"খুরসেদকে আমি খুব চিনি—সে আমাদের এক সময়েরই লোক। আপনার বেশ প্রাচীন কথা স্মরণ থাকে দেখিতেছি—"

আমি উৎসাহ পাইয়া খুরসেদ আলি সম্বন্ধে আমার জানা অজানা অনেক কথারই অবতারণা করিয়া আলাপ প্রসঙ্গটী জাঁকালো করিয়া তুলিলাম। এইরূপ গল্প কথায় ভিতর যে ষোল আনা কথাই সত্যছিল, তাহা এখন হলপ করিয়া বলা কঠিন। এবং কথার যে সকল অংশই পুলিশ সাহেব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহাও নিশ্চয়ই বলা যায় না। কেননা তাঁহারা পুলিসের লোক, সত্য হইতে মিথ্যাকে ছাকিয়া ফেলিয়া এবং মিথ্যা হইতে সত্যকে ছাকিয়া তুলিয়া খাতেমা লিখেন। কিন্তু গল্পের সময় এটা আমার মোটেই খেয়াল ছিল না; এখন তাহা মনে হইতেছে।

আমার গল্পের প্রাদুর্ভাব যে পুলিস সাহেবের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল, সে কথাটা আমার হটাৎ খেয়াল হইল নিজের ক্লান্তির অবস্থা অনুভব করিয়া।

এইবার আমি তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া বলিলাম—"এইবার ঘুমান যাক্।"

পুলিস সাহেব আমার পৃষ্ঠভঙ্গের আশঙ্কা বুঝিয়া উপসংহারে আমাকে আমার কলিকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্য এবং কোথায় অবস্থান করিব, সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ফরিদপুরের পুলিস সাহেবের নিকট আমার বিপদের কথা বলিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই, চিন্তা করিয়া কাঁদি-

কাতা যাওয়া সম্বন্ধে আমার একটী গৌণ উদ্দেশের উল্লেখই করিলাম এবং যে বন্ধুর বাসায় স্থান লইব তাহার ঠিকানা বলিলাম।

পুলিস সাহেব বলিলেন—"আপনার ঘুম পাইয়াছে, আচ্ছা আপনি ঘুম যান, আমিও একটু চেষ্টা করি। আমাদের আজ কাল সুনিদ্রা দুর্লভ, তাতো বুঝিতেই পারেন.....।

লোক উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে যে অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, এ জ্ঞান আমার এতদিন খুব টন্‌টনা ছিল; আজ আমাদের জেলাবাসী এই বাঙ্গালী পুলিস সাহেবটীর সহিত আলাপ করিয়া আমাকে সে জ্ঞান পরিত্যাগ করিতে হইল।

শিয়ালদহে আসিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পুলিস সাহেব বলিলেন—"তবে চলুন আর কি—নাঁবা যাক্‌!"

আমার সামান্য শয্যাটাকে নিজেই গোছাইয়া লইয়া একটা কুলীর মাথায় চাপাইয়া দিয়া পুলিস সাহেবকে অভিবাদন করিলাম। তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া প্লেটফরমে অবতরণ করিলেন এবং দক্ষিণ হস্তটী বাড়াইয়া দিয়া আমার দক্ষিণ হস্তটী হাতে তুলিয়া লইলেন।

আমার হটাৎ মনে হইয়াছিল—পুলিসের মৌখিক আদর আপ্যায়ন এইরূপই হইয়া থাকে বটে! কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সম্বন্ধে যে আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি, তাহা ভাবিয়া নিজকে অপরাধীই মনে করিলাম।

পুলিস সাহেব আমার হাত ধরিয়া রাখিয়াই বলিলেন —"বেয়াদপি মাপ করিবেন, আপনার নাম খানা…"

আমি আমার নাম বলিলাম। নাম বলিতে আমার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল; মুখ যেন শুখাইয়া গেল। পুলিস সাহেবের নিকট Political Suspectএর নাম।

পুলিস সাহেব আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার সে হাত কপালের দিকে নিয়া ইংরেজী কায়দায় বিদায় অভিবাদন করিলেন। আমি নত মস্তকে প্রত্যভিবাদন করিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া পড়িলাম।

(৬)

আমি মনে প্রাণে নিজকে নিরপরাধ বলিয়া জানিলেও সরকার হইতে আমার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিবার জন্য পাহারার বন্দোবস্ত ছিল। তাহারা লক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমার গন্তব্য পথ অনুসরণ করিত এবং তাহা করিয়া আমার বিদেশে বন্ধু বান্ধবের আশ্রয়ে সসম্মানে দু এক দিন বাস্তব্য করিবার পথ কণ্টকিত করিয়া তুলিত। এই হেতু আত্মীয় বন্ধু বান্ধবও আমার সহবাস আকাঙ্খা করিতেন না। আমার এই কলঙ্কিত সংশ্রবের মারাত্মকতা যে আমি নিজে অনুভব করিতাম না, তাহা নহে; কিন্তু উপায় কি? সরকার বাহাদুর নীরবে হোটেলে বাস করিবার ব্যাপারেও নানারূপ বিপত্তিকর ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় বন্ধু গৃহে আশ্রয় লওয়াই যুক্তি স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম; এখন তাহাই করিলাম। ভরসা ছিল—সকল বন্ধুই সমান নহেন।

বন্ধুটী আমাকে দেখিয়া প্রকাশ্য ভাবে একেবারে শিহরিয়া না উঠিলেও খুব সুস্থ মনে যে আমার অভ্যর্থনা করিলেন না, তাহা বেশ অনুভব করিলাম। ইহার পর আমার অনুসরণকারীদিগের ঘন ঘন অনুসন্ধানের উপদ্রবে তাহার বিরক্তি পূর্ণ মাত্রায় মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিল। তিনি উপায় হীনের মত হইয়া আমাকে সেই দিনই রাত্রিতে বিশুদ্ধ হিতোপদেশ বাণী শুনাইয়া বলিলেন—"তোমার বেশী দিন বাড়ী ছাড়িয়া থাকা উচিত নহে।"

আমি তাহার অবস্থা বুঝিয়া বলিলাম—"দেখি, দুই এক দিনের মধ্যেই যাহা হয় একটা হেস্তনেস্ত করিয়া চলিয়া যাইব। সপ্তাহের বেশী কিছুতেই বাড়ী ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।"

সপ্তাহের কথা শুনিয়া বন্ধু বলিলেন—"কিছুতেই কলিকাতায় তোমার সপ্তাহকাল থাকা সঙ্গত নহে, সহরের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন—"

আমি বলিলাম—"কাল পলিটিকেল সেক্রেটরীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, তারপর যাহা হয় একটা করিতেই তো হইবে; তবে যত মনে কর তত ভয়ের বিষয় কিছু নাই—"

বন্ধু বিরক্তির সহিত বলিলেন - তোমার ভালর কথাই বলিলাম। কাল কাল করিলে কি কার্য্য হাসিল হয়? কেন আজ পলিটিকেল সেক্রেটরীর নিকট গেলে না?

আমি—"আজ উকিলের নিকট যাইয়া দরখাস্তটা লিখাইয়া আসিয়াছি ও কি বলিতে হইবে তাহা জানিয়া আসিয়াছি; আর হটাৎও কোন কাজ হয় না—"

"এই বাড়ী পঞ্চাশের একের নম্বর?"

বাহির হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল।

বন্ধু উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে? কি চাও।"

বাহির হইতে উত্তর হইল "দরজা খুলে দিন দিকি?"

বন্ধু উঠিয়া কপাট খুলিয়া দিয়া বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "কি চাও?"

কি সর্ব্বনাশ? একটা পাগড়ী আটা জীবন্ত কনেষ্টবলের মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বন্ধুর হস্তে একখানা চিঠি দিয়া বলিল—"এ চিঠির মালীক এখানে আছেন কি?"

বন্ধু চিমনির আলোতে কভার পড়িয়া বিরক্তির সহিত তাহা আমার কোলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

আমি কম্পিত হস্তে চিঠিখানা তুলিয়া লইলাম; বন্ধুর মুখে চোখে ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছিল; তাহার মুখে কথা ফুটিতেছিল না।

খুব উচ্চ দরের সরকারী খামে চিঠিখানা মোড়া ছিল; দেখিলাম—তাহার উপরে আমার নামই লেখা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"চিঠি দিয়াছেন কে?"

বন্ধু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"খুলিয়া দেখিলেই হয়?" খাড়া ওয়ারেণ্ট বোধ হয়—"

বন্ধুর আচরণে আমার বড়ই দুঃখ বোধ হইতেছিল!

আমি ভয়ব্যাকুল চিত্তে চিঠি খুলিয়া পাঠ করিলাম। চিঠিতে লিখা ছিল :—

Dear Sir,

I am desired by the Dy. Inspector General of Police (C. I. D.) to request you to see him kindly to-morrow at 8 30 A.m. at his residence

* * *

Yours truly.
K. Bose.

চিঠিখানা পড়িলাম এবং বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইলাম। বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কনেষ্টবলকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম; সে চিনির বলদপ্রায় কিছুই বলিতে পারিল না। আজ্ঞার হুকুম তামিল করিল মাত্র।

আমি শেষ তাহাকে বলিলাম—"তুমি কাল ৭টায় আসিয়া আমাকে অন্ততঃ ডিপুটি ইনিস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হয়, তোমার ভদ্রতা অবশ্যই আমি করিব।

সে স্বীকৃত হইয়া সেলাম দিয়া চলিয়া গেল।

ইহা কি ফাঁদ? আমার ন্যায় নগন্য ব্যক্তির জন্য এরূপ ফাঁদ? চিন্তার বিরাম ছিল না! শেষ চিন্তার ফলে, আবিষ্কার করিয়া লইলাম—আমার রেল সহযাত্রী ফরিদপুরের পুলিস সাহেব ক্ষেত্রবাবুর লেখা এই চিঠি। কিন্তু তাঁহাকেতো আমার এই কলঙ্ক কাহিনীর বিন্দু বিসর্গও জানিতে দেই নাই! তখন মনে হইল, পুলিসের অগোচর কিছু নাই। আপাততঃ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(৭)

৮টার পূর্ব্বেই কনেষ্টবলটী আসিয়া আমাকে ডেপুটী ইনসপেক্টর জেনারেলের গৃহে লইয়া চলিল।

পথে যাইতে যাইতে মনে হইল, সাক্ষাতের কারণ সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গও না জানিয়া একেবারে ডিপুটী সাহেবের নিকট যাওয়া কি সঙ্গত? প্রথমতঃ K. Bose. মহাশয়ের খোজই লওয়া হউক। তিনি যদি আমার চিন্তা আবিষ্কৃত ফরিদপুরের পুলিশ সাহেব ক্ষেত্র বাবুই হন, তবেতো চিন্তাই নাই, তা না হইলেও তাঁহার নিকট হইতে এ অনুগ্রহ-অনুরোধের মূল্য অবগত হওয়া যাইবার সুবিধা হইতে পারিবে।

আমি কনেষ্টবলকে পত্র লেখক বোস মহাশয়ের নিকট প্রথমে আমাকে লইয়া যাইতে বলিলাম।

কনেষ্টবল বলিল—"আপনি কাহার নিকট লইয়া যাইতে বলিতেছেন?"

আমি তখন তাহাকে পরিষ্কার করিয়া সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম—আমাকে কিজন্য যে ডিপুটী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনা। এই চিঠিতেও ব্যক্ত নাই; সুতরাং এইচিঠি তোমাকে যে ভদ্রলোক কাল দিয়াছেন, আমাকে প্রথমে তাঁহার নিকট লইয়া যাও, তাঁহার নিকট হইতে সকল অবগত হইয়া পরে ডিপুটী সাহেবের নিকট যাইব।

কনেষ্টবল বলিল—"তবে আপনি কেরাণী বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চান।"

আমি—"হঁ, তাহাই কর; ব্যাপারটা আগে অবগত হওয়া যাক্।"

গাড়ি চলিতে লাগিল। "আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"পত্রের লেখক কি কেরাণী বাবু?"

কনেষ্টবল বলিল—"তাহা আমি জানিনা; চিঠী তিনিই আমাকে দিয়াছিলেন, কে, লিখিয়াছিল, আমি জানিনা, জানিবার কথাও নয়।"

চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। গাড়ী বিস্তর অলি গলি ঘুরিয়া আসিয়া কেরাণী বাবুর বাড়ীর দরজায় ঠেকিল।

কেরাণী বাবুকে বাহিরেই পাইলাম। কনেষ্টবল তাঁহার নিকট আমার পরিচয় দিলে, তিনি সাগ্রহে আমাকে বলিলেন—আপনি অনুগ্রহ করিয়া D. I. G.র নিকট যান; তিনিই কাল আমাকে আপনার নিকট চিঠি লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন।"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার নামই কি K. Bose.?"

তিনি বলিলেন "আজ্ঞে হাঁ, আমারি নাম।"

আমি—"D. I. Gর নিকট আমার কি প্রয়োজন, তাঁরইবা আমার নিকট কি প্রয়োজন, আমিতো কিছুই জানিনা। আপনি কিছু জানেন কি?"

তিনি—"আজ্ঞে না, আমি কিছুই জানিনে; ত আপনি গেলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে'খন। অতি ভাল লোক তিনি।"

আমি বুঝিলাম, ক্ষেত্র বাবু সম্বন্ধীয় আমার কল্পনা

ভুল। তবে এক্ষেত্রে কি করণীয়? যখন আদেশ, তখন সাক্ষাৎ করিতেই হইবে। আমি বলিলাম—"বুঝিলাম না, কি করিতে হইবে, তবে আদেশ যখন হইয়াছে, তাহা পালন করিতেই হইবে।"

তিনি সন্ত্রস্ত ভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে না আদেশ নয়, অনুরোধ; আপনি ইচ্ছা না করলে নাও যেতে পারেন। সে আপনার খুসি।"

যাওয়াই সঙ্গত মনে করিয়া আরও ২।১টা কথা পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম "সাহেব কিরূপ ইংরেজী বলেন, বুঝা যায় কি?"

"তিনি বাঙ্গালাতেই কথা বলেন।"

আমার সাহস হইল জিজ্ঞাসা করিলাম—"তিনি কি বাঙ্গালী?

"হাঁ তিনি বাঙ্গালী, মুসলমান।"

"নাম কি?"

"খাঁন বাহাদুর মহম্মদ খুরসেদ আলি।"

নামটী আমাকে স্বভাবতই একটু আকর্ষণ করিল। হায় দুর্ভাগ্য খুরসেদ, জীবিত থাকিলে তুমিও এমন তরই কিছু হইতে নাকি!

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—"আপনাকে ত্যক্ত করিলাম, এখন যাই, দেখি কি হয়। খানবাহাদুর এখানে কত দিন যাবত আছেন?"

কেরাণী বাবু—"কালই মাত্র আসিয়া চার্জ্জ লইয়াছেন।"

আমি—"ইহার পূর্ব্বে তিনি কোথায় ছিলেন?"

"ছিলেন এখানেই। তবে কতক দিনের জন্য ফরিদপুরে D.S.P. ছিলেন, কাল আসিয়া এখানে চার্জ্জ নিয়াছেন।"

আমার বাক্য স্ফুর্ত্তি হইল না; কেরাণী বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। আমার প্রাণের ভিতরে একটা কি যে অনির্ব্বচনীয় ভাব ক্রিয়া করিতেছিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

কেরাণীবাবু আমার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এরূপভাবে রইলেন যে, কি ভাবচেন?"

আমার স্তম্ভিতভাব অপসারিত হইলে বলিলাম—"কি যে ভাবিতেছি, কি বলিব? ফরিদপুরের D.S.Pর সহিত কাল আমি একগাড়ীতেই আসিয়াছি। তিনি কি মিঃ ক্ষেত্রনাথ বসু নহেন?"

"আপনি কাহার সহিত এসেছেন জানি না? ক্ষেত্র বাবু এখন চট্টগ্রামের D. S. P. খাঁ বাহাদুর ফরিদপুরে ছিলেন, এখানে এসে কাল Join করেছেন—আপনি যান, সাক্ষাৎ করুন, বোধ হয় তিনিও ভুল করেচেন, আপনিও ভুল করেচেন। উভয়ের ভুল ভেঙ্গে যাবে'খন।"

বিষয়টা মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার পক্ষে একটা প্রহেলিকার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল। আমি ধীরে ধীরে উঠিলাম।

গাড়ী D. I. Gর বাড়ীর লক্ষ্যে ছুটিল। ভাবিতেছিলাম—ফরিদপুরের পুলিস সাহেব যে ক্ষেত্রবাবু, তাহাতো আমি বলিতেছি; তিনি নিজেতো তাহা বলেন নাই। তিনিতো শম্ভুবাবুর অধীন প্রথম আমার কার্য্য গ্রহণ করেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যদি খুরসেদ তবে লোহিত জাহাজে মারা গেল কে?"

এইরূপ কত কিছু ভাবিতেছিলাম। চিন্তার শৃঙ্খলা ছিল না। তবে বিষয়টা এইবার পরিষ্কার হইবে এটী খুব মনে হইতেছিল।

ঠিক ৮ ৩০মিনিটের সময়ই আসিয়া D. I. Gর কুঠিতে পঁহুছিলাম। কনেষ্টবল আমার নামের কার্ড লইয়া মোতায়েন কনেষ্টবলকে দিল। তার পরমুহূর্ত্তেই আমার ডাক পড়িল।

হৃদয়ে পুঞ্জিভূত ভয় বিস্ময় ও কৌতূহল লইয়া গিয়া দেখি, খাঁ বাহাদুর খুরসেদ আলী বলিয়া যাহাকে কেরাণী বাবু পরিচয় দিয়াছেন তিনিই আমার সেই সহযাত্রী পুলিস সাহেব। মাথা নত করিবার পূর্ব্বেই তিনি আসিয়া আমার বাহু যুগল ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

আমার মুখ হইতে বাক্য স্ফুরিত হইলনা। খাঁ বাহাদুর আমার নাম ধরিয়া সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—"* * বাবু, প্রবঞ্চককে ক্ষমা করিবেন এবং যৌবনের সতীর্থ খুরসেদ মিঞা বলিয়াই আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। আমার Friends & admirers দিগের মধ্যে আপনি কাহারও অপেক্ষা কম নহেন, তাহা সে রাত্রে হৃদয়ের সহিত অনুভব করিয়াছি। বোধ হয় এমন প্রাচীন বন্ধু আজ আমার এই সৌভাগ্যের দিনে আপনার চেয়ে বেশী কেহ নাই।"

আমি চুপ করিয়া থাকিয়া অন্তরের মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম।

খাঁ বাহাদুর বলিলেন—"লোহিত জাহাজে গৌর নদীর তালুকদার খুরসেদ মিঞা মারা গেলে আমার অনেক বন্ধু বান্ধবই আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমার পরিবারের মধ্যে Condolence জানাইয়াছিলেন।

* * * *

বাল্য বন্ধুকে ইহজগতেই ভূতের ওঝা স্বরূপ পাইয়া ভূত-মুক্তির জন্য আর অধিক হয়রাণ্ হইতে হইল না।

সপ্তাহ মধ্যেই একেবারে চর লরেন্স হইতে ছেলেমেয়েকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া তাহাদিগের মাতৃপার্শ্বে পঁহুছাইয়াদিলাম। নিজেও বিপদ মুক্ত হইলাম।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, DACCA

সৌরভ

নবম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩২৮। { নবম সংখ্যা।

শিক্ষা সমস্যা।

(২)

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে সফল করিতে হইলে মানুষের সংস্কার ও চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক গতি বিবেচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। কতকগুলি সংস্কার মানুষ মাত্রেরই সাধারণ সম্পদ, কতকগুলি জাতি বিশেষের ও সমাজ বিশেষের বিশেষত্ব, কতকগুলি ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব। সাধারণ সংস্কারও কালের প্রবাহে এবং অবস্থার বিপর্য্যয়ে পরিবর্ত্তিত হয়। শিক্ষাপদ্ধতির বিধাতাগণ মানবচিত্তের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্তঃস্থিত সাধারণ ও বিশিষ্ট ভাব সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে যদি অসমর্থ হন, তবে উপযুক্ত শিক্ষাবিধির প্রবর্ত্তনে সক্ষম হন না।

মানব চিত্তের কতকগুলি মৌলিক সংস্কার ও বৃত্তি যেমন সার্ব্বজনীন, তেমনি কতকগুলি শিক্ষনীয় বিষয় এবং শিক্ষাপদ্ধতির কতকগুলি অঙ্গও জাতি ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সাধারণ হইতে পারে, যথা বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি জড়-বিজ্ঞান ও তাহার আনুষঙ্গিক কতকগুলি বিষয় প্রাচ্যও নয়, পাশ্চাত্যও নয়, আধুনিকও নয়, পৌরাণিকও নয়। পুরুষ ও স্ত্রীর জন্য গণিত পৃথক্ নয়। মানুষের চিত্তবৃত্তি যেমনই হউক, গণিত ও বিজ্ঞানের সাধারণ সত্য সকল প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই সমান সত্য। কেহ কেহ এইনিমিত্ত বলিয়া থাকেন যে যেসব বিষয়ের জ্ঞান শুধু জ্ঞানের জন্য, শুধু বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবার জন্য, কর্ম্মের সহিত যে জ্ঞানের সাক্ষাৎভাবে যোগ নাই, সেই সব বিষয়ের জ্ঞান দেশ কাল জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই সমান ভাবে অর্জ্জন করিতে পারে, এবং তাহাদের শিক্ষায় কোন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু জীবনের অন্যান্য বিভাগের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না, এমন জ্ঞান সম্ভব কিনা তাহা বিবেচ্য। প্রত্যেক জ্ঞানের সঙ্গেই কি কর্ম্ম-জীবন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয়? গণিত বা বিজ্ঞানের আলোচনা কি আমাদিগকে শুধুই কতকগুলি তত্ত্ব জানাইয়া দেয়? সেই আলোচনার সময়ে তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্য বৃত্তিগুলির কি কোন রূপ অনুশীলন হয় না? গণিত বিজ্ঞানাদির অধ্যয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য কতকগুলি সার্ব্বজনীন তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহা আলোচনার জন্য যে সময়, যে পরিমাণ শক্তি এবং চিত্তের যে সব বৃত্তি নিয়োজিত হয় তাহা সমগ্র জীবন হইতে বিযুক্ত না হওয়ায় সে সকল বিষয় ও এমন প্রণালীতে শিক্ষাকরা সঙ্গত, যাহাতে জীবনের অন্যান্য বিভাগের ও সম্যক্ পোষণ ও উন্নতি হয়।

এক দিকের একটী দৃষ্টান্ত দিই। আমরা ইংরেজী ভাষায় ইংরেজ লিখিত পুস্তকের সাহায্যে গণিত বিজ্ঞানাদির যখন আলোচনা করি, তখন Newton. Darwin. Spencer. প্রভৃতি সর্ব্বজন পূজ্য মনীষীদের মতামত ও তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহ শিক্ষা করিয়া জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করি এবং তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরিয়া যায়। আমাদের স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ —যে দেশে যে জাতিতে এই সব প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই সব দেশ ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের হৃদয় আনত হয়। অন্যদিকে আমাদের দেশে, 'আমাদের জাতিতে, আমাদের ভাষায় এই সব বিষয়ের গবেষণা কখন হইয়াছিল কিনা জানিনা, আমরা আমাদের সংস্কার অনুসারে 'আপন' বলিয়া বোধ করিতে পারি এমন কোন ব্যক্তি এইরূপ কোন তত্ত্ব আবিষ্কার

করিয়াছিলেন কিনা, তাহার খবর রাখিনা, এমন কোন ব্যক্তির নাম ও গবেষণার ফল ইংরেজী পুস্তকে প্রাপ্ত হই না। এমন অবস্থায় তুলনায় আমাদের দেশের ও জাতির উপর কতকটা অশ্রদ্ধা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ইহাতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে কোন বাধা না হইতে পারে, কিন্তু নৈতিক অবনতি আছে। শুধু তাহাই নয়, নিজের জাতির প্রতি অশ্রদ্ধার অবশ্যম্ভাবী ফল নিজের সামর্থ্যের উপর আস্থাহীনতা, এবং তাহার ফলে, যত খানি সামর্থ্য বাস্তবিক আছে, তাহারও সম্যক্ অনুশীলন করিতে এবং তাহা মৌলিক গবেষণায় নিয়োজিত করিতে সাহস ও প্রবৃত্তির অভাব ঘটে। এইকারণেই আমাদের দেশের কত মনীষা নষ্ট হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? দেশোজ্জ্বলকারি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্যদের মত মনীষাসম্পন্ন রসায়ন শাস্ত্রাধ্যায়ী যুবক ইতঃপূর্ব্বে এই বিশ্ব বিদ্যালয়ে কখনও প্রবেশ করেনাই, একথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন কি? আচার্য্যের আদর্শ সম্মুখে না থাকিলে ইহাদের মধ্যেও অনেকে এইরূপ সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও একনিষ্ঠতার সহিত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন কিনা, সে বিষয়েও কি যথেষ্ট সন্দেহের কারণ নাই? জগতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে আমাদের জগদীশচন্দ্র, আমাদের প্রফুল্লচন্দ্র এই এই তত্ত্ব দান করিয়াছেন, আমাদের দেশেও পূর্ব্বে বহু বিজ্ঞানাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিবার জন্য বহু অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, এই সব কথা স্মরণ করিয়া ছাত্রেরা যখন বিজ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস কি অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় না? আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত শিক্ষায় সফল্যলাভ হয় না, স্বজাতি ও স্বজনের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ব্যতীত আত্মপ্রত্যয় হওয়া কঠিন। সুতরাং গণিত বিজ্ঞানাদি সাধারণ বিষয়েও আপন জনের আবিষ্কার কতদূর, তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাঁহাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন দেশীয় মনীষীদের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ—শিক্ষার সফলতার জন্য আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ কেবল মাত্র বিদেশীয় ভাষাতে এই সব বিদ্যা অর্জ্জন করিতে বাধ্য হওয়ায় ভাষার আবরণ ভেদ করিয়া তত্ত্বে পৌছিতে অনেক শক্তি ও সময়ত বৃথা ব্যয় হয়ই, তদ্ভিন্ন ইহার নৈতিক ফল ও অত্যন্ত খারাপ। ইহাতে সভ্য জাতিদের মধ্যে নিজেদের স্থান অনেক নীচে বলিয়া দৃঢ় মূল সংস্কার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়, আপনাদিগকে হেয় মনে হয়, এবং সভ্য জাতীয় লোক দেখিলে মস্তক অবনত হয়। নিজকেও নিজ জাতিকে যে এত ছোট মনে করে, সভ্য দেশের বিদ্যার্থীদের ন্যায় উন্নত আদর্শ নিয়া অধ্যবসায়ের সহিত কোন বিষয়ে লাগিয়া থাকা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠোর তপস্যার মত হয়। অনেকে বলেন যে বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিজ্ঞান দর্শনের উপযুক্ত ভাষা হয় নাই। ইহার স্বাভাবিক অর্থ এই যে বাঙ্গালী জাতি এখনও বিজ্ঞান দর্শন আলোচনা করিবার উপযুক্ত হয় নাই। চিন্তা ও ভাষার মধ্যে এই সনাতন সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে যে একটার উন্নতিতে অন্যটার উন্নতি হয়। বাঙ্গালার চিন্তা বিজ্ঞান দর্শনের গূঢ় তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ লাভ করিতে পারে, অথচ বাঙ্গালার ভাষা সে চিন্তা প্রকাশ করিতে পারে না, ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইহা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা, জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক এবং জাতিভ্রষ্টতার লক্ষণ। ইহার জন্য বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ দায়ী। সাহিত্যাচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির প্রতিভা যদি ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষায় সাহিত্য রচনা করিত, তবে বাঙ্গালা বোধ হয় এখনও উচ্চ শ্রেণীর রস সাহিত্যেরও উপযুক্ত ভাষা হইতে পারিত না। তাঁহাদের মত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ তাঁহাদের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল যদি প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতেন এবং তৎপর ইংরেজী ও অন্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া বা করাইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন, তবে এই সময়ের মধ্যেই বঙ্গ ভাষা বিজ্ঞানদর্শনের ভাষা বলিয়া সভ্য জগৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইত, এবং তাঁহাদের চেয়ে যাহাদের শক্তি কম, তাহারাও সাহসের সহিত-মাতৃভাষায়-বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পুস্তক সংকলন করিতেন। মাতৃভাষায় বিভিন্ন

জাতির মনীষীদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গবেষণার ফল প্রাপ্ত হইয়া ছাত্রগণ সহজে সেই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইত, তাহাদের শক্তি ও সময় অপব্যয় হইতে রক্ষা পাইত। তাহাদের আত্ম প্রত্যয় বর্দ্ধিত হইত এবং আকাঙ্খা উচ্চ হইত।

বিজ্ঞান প্রভৃতির সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, প্রধান প্রধান শিল্প বিদ্যা সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ব্যক্তিগত শক্তি বৈষম্য ও রুচি বৈষম্য স্বীকার করিয়া লইয়া যে ব্যক্তি যে শিল্প শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ, সে যে জাতি বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন, সেই শিল্পের কৌশল তদনুসারে পৃথক হইবে না। কিন্তু সবক্ষেত্রেই নৈতিক বল ও আত্মপ্রত্যয় বর্দ্ধনের জন্য স্বজাতির গৌরব এবং সেই ক্ষেত্রে স্বজাতির উন্নতি শিশুকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে যে শিল্পে স্বজাতীয়েরা অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছিল, সেই সেই শিল্পে আমাদের বিশেষ উন্নতি সাধনও স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন, যে প্রকার শিল্পের উন্নতিতে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হওয়া সম্ভব, যাহাতে বাহ্য সম্পৎ মনুষ্যত্ব অপেক্ষা বেশী মূল্যবান বলিয়া গৃহীত না হয়, যাহাতে মানুষকে কলে পরিণত না করে এবং অর্থের মোহে বিভ্রংশিত করিয়া মানুষের আত্মাকে মলিন না করে, সেই প্রকার শিল্পকেই জাতির ভিতরে প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত।

ভাবসাহিত্য, কলা বিদ্যা, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে জাতীয় ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য স্ফুটরূপে প্রকাশিত হয়, এবং এই সব বিদ্যা শিক্ষা করিবার সময় জাতীয় ভাবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। জাতীয় ভাবে শিক্ষার অর্থ ইহা নয় যে দেশে যাহা আছে বা পূর্ব্ব-পুরুষেরা যাহা রাখিয়া গিয়াছে তদপেক্ষা বেশী কিছু শিক্ষা করা অপ্রয়োজনীয় বা দূষণীয়। অন্য জাতির জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া জাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইয়া জাতীয় জ্ঞান ভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করা একান্ত আবশ্যক। তদ্দ্বারা সেই বিদ্যাও জাতীয় বিদ্যার অঙ্গীভূত হয় এবং জাতীয় সংস্কারের অনুযায়ী হয়। রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব সাহিত্য, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রের সাহিত্য অধ্যয়ন না করিয়া Shakespeare, Milton, Scott, Dickens প্রভৃতি বিদেশীয় সাহিত্যাচার্য্যদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া যে বাঙ্গালী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হইতে চায়, তাহার ভাব ও চিন্তা উপযুক্ত রূপ প্রসার পাইবে না, তাহার শিক্ষা প্রাণ হীন হইবে। দেশের রাষ্ট্রনীতি; ধর্ম্মনীতি, দর্শন প্রভৃতির কোন জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়া যদি শুধু বিজাতীয় পণ্ডিত, কর্ম্মী ও দার্শনিকদের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা দ্বারা জীবন অনুপ্রাণিত হয় না, শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয় না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতির ইহা একটি প্রধান দোষ যে স্বজাতীয় সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির কোন জ্ঞান লাভ না করিয়াও কেবল মাত্র বিজাতীয় ভাবে বিজাতীয় সাহিত্যদর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং সুশিক্ষিত বলিয়া সমাজে পরিচিত ও আদৃত হওয়া যায়। অনেক কৃতি ছাত্র ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী হইয়াও মাতৃ-ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে বা বলিতে পারে না বলিয়া লজ্জিত হয় না, বরং কৃত্তিবাস, কাশীরাম, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় না থাকায় মরমে মরিয়া না গিয়া গৌরব বোধ করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উজ্জ্বলতম রত্ন, ইংলণ্ডীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত, দার্শনিক সমাজে খ্যাত নামা বঙ্গের একজন কৃতী সন্তান কোনও ইংরেজী শিক্ষা বিহীন (কাজেই শিক্ষিত নামের অযোগ্য) টোলের পণ্ডিতের মুখে সংস্কৃত ন্যায়ের তর্ক প্রণালী এবং তত্ত্ব বিচার শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন যে ভারতীয় জ্ঞান ভাণ্ডারে এইরূপ জিনিষ আছে বা থাকিতে পারে তাহা কল্পনায়ও কখন আসে নাই।

অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসাদে আমরা বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত যুক্ত হইতে পারিয়াছি, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর বুঝিয়াছি, কূপ মণ্ডুকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদারমতাবলম্বী হইতে শিখিয়াছি, বর্ত্তমান উন্নত জাতি সমূহের মধ্যে আসন পাইবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছি। এই শ্রেণীর যুক্তির সত্যা সত্য কত দূর, তাহা বিশেষ ভাবে বিচার করিতে চেষ্টা না করিয়া এক বাক্যেই—

স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি যে ইংরেজী শিক্ষা হইতে আমরা অনেক মূল্যবান জিনিষ পাইয়াছি এবং আরও পাইতে পারি। যে শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইংরেজ আধুনিক সভ্যতার শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা কথঞ্চিত অনুকরণ করিয়াও আমরা যে কিছুই লাভ করি নাই, এবং আর একটু বুদ্ধিমত্তার সহিত অনুকরণ করিতে পারিলে যে আরও কিছু বেশী লাভ বান্ হইতে পারি না, তাহা বলা অকৃতজ্ঞতা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা লাভ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে হারাইয়াছি কতখানি, সে টুকু বিবেচনা করা প্রয়োজন। ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজ শিক্ষকের কাছে ইংরেজ ছাত্রের সহিত একসঙ্গে বসিয়া একই ভাবে শিক্ষা লাভ করিয়া সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলেও, সেই শিক্ষা দ্বারা ইংরেজ ছাত্রের জীবনে যে পরিমাণ কল্যাণ সাধিত হয়, ভারতীয় ছাত্রের তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ সেই শিক্ষা পদ্ধতি ইংরেজের জাতীয় পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সমসূত্রে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার জাতীয় জীবনের সহিত সেই শিক্ষা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহার চিত্তের সংস্কারের সহিত সেই শিক্ষার বিশেষ যোগ, সেই শিক্ষা তাহার চিত্ত বৃত্তির যথোচিত উন্মেষ করিয়া তাহার স্বধর্ম্মকে চিনাইয়া দিতেছে এবং স্বধর্ম্মের পথে তাহাকে চালাইতেছে। ভারতীয় ছাত্রের অন্তর্জ্জীবনের সহিত সেই শিক্ষার যোগ নাই, তাহার চিত্তের অন্তর্নিহিত সংস্কার সেই শিক্ষাপদ্ধতিতে আত্মবিকাশের যথোচিত সুবিধা না পাইয়া বিদ্রোহাচরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিজাতীয় ভাবের চাপে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার মস্তিষ্ক সেই শিক্ষা গ্রহণ করিলেও তাহার প্রাণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, প্রাণের সহিত মনের বিরোধে, স্বাভাবিক সংস্কারের সহিত আগন্তুক ভাবের বিরোধে, তাহার মনুষ্যত্ব পঙ্গু হইয়া পড়ে। এই কারণে যে শিক্ষাপদ্ধতি ভিন্ন দেশে ভিন্ন আবহাওয়ার ভিতরে ভিন্ন রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রেরণায় ভিন্ন জাতীয় ও সামাজিক সংস্কার বিশিষ্ট মানুষের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই পদ্ধতির দাসোচিত কৃত্রিম অনুকরণের ফলে আমরা কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতেছি বটে, কিন্তু প্রাণ হারাইতেছি, কতকগুলি শক্তির সন্ধান পাইতেছি, কিন্তু সেগুলিকে নিজেদের অধীন করিয়া কাজে লাগাইবার সামর্থ্য পাইতেছি না, বিশ্বের সঙ্গে কতকটা যোগ স্থাপন হইতেছে বটে, কিন্তু আপনার সহিত যোগ স্থাপন হইতেছে না, আমাদের আসল মানুষটাকে হারাইয়া 'নকল মানুষ' হইয়া পড়িতেছি। এই জাতির জীবনী শক্তি কম নয়, সহজে এজাতি মরিবার নয়, বলিয়াই এই বিজাতীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে জাতীয় সংস্কার মস্তক উত্তোলন করিয়াছে।

কোন অর্ব্বাচীন ব্যক্তিও মনে করেনা যে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শন আমাদের অমঙ্গলের কারণ। ইহারা অমঙ্গলের কারণ হইলে ইউরোপেও অমঙ্গল প্রসব করিত। বিজাতীয় শাসনপ্রণালীর কতকটা অপরাধ আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত অপরাধী আমরা। আমরা যে ভাবে, যেরূপ আকিঞ্চন ভিখারীর বেশে ইংরেজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতেই অমঙ্গল আহ্বান করিয়া আনিয়াছি। আমাদের যেন আপন বলিবার কিছু ছিলনা, আমরা যেন মনুষ্যসমাজে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত ছিলাম না, ইংরেজের সংসর্গে আসিয়া ইংরেজের বুলি কণ্ঠস্থ করিয়াই যেন আমরা মনুষ্যসমাজে আসন পাইবার সুবিধা লাভ করিয়াছি, এইরূপ ভাব লইয়া ইংরেজ শিক্ষাদাতার নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছি, সর্ব্বতোভাবে আপনাকে ভুলিয়া ইংরেজের অনুকরণে আয়াস করিয়াছি, তাই আমাদের দুর্দ্দশা। আমরা আমাদের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্যবিদ্যা গ্রহণ করিতে পারি নাই, আমাদের অন্তরের ছাঁচে সে বিদ্যাকে ঢালিয়া লইতে শিখি নাই। আমরা 'স্ব'কে অবমাননা করিয়া অন্ধভাবে পরকে অনুকরণ করিয়াছি, নিজকে কাক মনে করিয়া কাকত্ব ঢাকিবার জন্য ময়ূরের কতকগুলি পুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া গায়ে ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে নিজের প্রাণ হারাইয়াছি, পরের প্রাণ নিজেতে সঞ্চারিত করা অসম্ভব বলিয়া নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হইতে পারি নাই। স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের প্রতি যদি আমাদের যথোচিত শ্রদ্ধা থাকিত, স্বদেশের জ্ঞানভাণ্ডারে যাহা আছে, তাহা

যদি আদরের সহিত গ্রহণ করিতাম, তৎপর বিদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে গ্রহণীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়া সেই সকলকে স্বকীয় ভাবে ভাবিত করিয়া আপনার করিয়া লইয়া নিজেদের অভাব ও জ্ঞান পিপাসা পূর্ণ করিতাম, তাহা হইলে প্রকৃত কল্যাণের পথে, পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইয়া জীবন সফল ও শিক্ষা সার্থক করিতে পারিতাম।

শুধু তাহাই নয়, জগতের কাছে সম্মান পাইতে হইলে জগতের সভ্যজাতিদের সমান আসন পাইতে হইলে, ভিক্ষাবৃত্তিতে চলে না, চিরদিন 'উত্তম ছাত্র' থাকিলেও চলে না। যেমন গ্রহণ করা দরকার, তেমনি দান করা আবশ্যক। যার নিজের কিছু নাই, যে শুধু পরের কথা শিখিবে, সে দান করিবে কি, তাহাকে দাতাগণ নিজেদের সমকক্ষ রূপে স্বীকার করিবে কেন? যে নিজের ধনের খোঁজ রাখে না, যে নিজের সম্পত্তিও অন্যের কাছে হাত পাতিয়া তার প্রসাদরূপে গ্রহণ করে, তাহাকে অন্যে মানুষ বলিতে রাজী না হইলে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। মানুষের কর্ত্তব্য প্রথমে নিজের সম্পত্তির অনুসন্ধান করা, তাহা আয়ত্ত করা, তৎপর অন্যের নিকট হইতে প্রয়োজনানুরূপ গ্রহণ করা এবং অন্যকে ইচ্ছামত দান করা। ভারতবর্ষের জ্ঞানভাণ্ডারে যেসব অমূল্যরত্ন আছে, ভারতবাসী যদি জগতের বাজারে তাহা উপস্থিত করিতে পারে, তবে সভ্যজগতের অনেক অভাব পূরণ করিতে পারে, ইহ-সর্ব্বস্ব আত্মম্ভরী জাতি সমূহকে মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ এবং বিশ্বনিয়মের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের অনেক জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া দিতে পারে, এবং ভারতকে তাহাদের কাছে সম্মানিত ও পূজিত করিতে পারে।

ভারতের পুরাতন ইতিহাসেও দেখা যায় যে বিদ্যা বিষয়ে গ্রহণ ও দান উভয়ই সমানভাবে চলিত। ভারতের আর্য্যগণ আরবীয়, গ্রীসীয়, ইজিপ্সীয় প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতেও বিভিন্ন বিদ্যা গ্রহণ করিয়া নিজেদের সাহিত্যদর্শন বিজ্ঞানাদির পুষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে তাহাদের নামোল্লেখ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন নূতন চিন্তাধারার সংস্রবে আসিয়া ভারতীয় বিদ্যাকোষ ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যদিকে স্বীয় ভাণ্ডার হইতে উপযুক্ত পাত্রে বিদ্যা বিতরণ করিতে তাঁহারা কার্পণ্য করেন নাই। আরবীয় ও গ্রীসীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় বিদ্যা গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব জাতির উন্নতি-সাধন ও জগতের কল্যান বিধান করিয়াছেন। চীন, জাপান প্রভৃতিও ভারতীয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছিল। ভারতের ঋষিগণ বলিতেন যে যে ব্যক্তি কোন জ্ঞানে পারদর্শী হইয়াও তাহা উপযুক্ত শিষ্যকে দান করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে 'জ্ঞানধন', এবং সরস্বতী তাহার হৃদয়ে অবস্থান করিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করেন।

অতএব শিক্ষার সম্যক্ সাফল্যের নিমিত্ত এবং জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বজাতীয় সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, কর্ম্মনীতি প্রভৃতি অধ্যয়নও অধ্যাপনের এরূপ বিশদ বন্দোবস্ত থাকা উচিত, যেন ছাত্রমাত্রেই তাহার সহিত অল্পাধিক পরিচয় লাভ করিবার সুবিধা পায় এবং প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রগণ বিষয় বিশেষে পারদর্শিতা লাভ করিয়া পুস্তক প্রণয়নাদি বিবিধ উপায়ে জগতে তাহার প্রচার করিতে পারেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় সাহিত্য দর্শনাদি যাহাতে স্বদেশীয় ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করার সুবিধা প্রাপ্ত হয়, তাহারও সুবন্দোবস্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষাকে জীবন্ত এবং বিদ্যাকে কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী করাও বাঞ্ছনীয়। তজ্জন্য শিক্ষা যাহাতে বর্ত্তমানের সহিত বিশেষ ভাবে যুক্ত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে জগতে কি রকম ব্যাপার চলিতেছে, দেশ, জাতি ও সমাজ বর্ত্তমানে কি ভাবে ভাবিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়াই ছাত্রকে কর্ম্মক্ষেত্রে কিরূপ শক্তি ও অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে, এগুলিও তাহার ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ বিদ্যালয়ের প্রাচীরের মধ্যে তাহার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকিয়া কেবলমাত্র কালিদাস বা সেকস্পিয়র, কপিল বা প্লেটোনিয়া ব্যাপৃত

থাকিলে জীবন সংগ্রামে সে নিজেকে নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ করিবে। কর্ম্মজীবনে সফলতা লাভ করিবার উপযোগী উপকরণও ছাত্রজীবনে সংগ্রহ করা আবশ্যক এবং তাহা মনুষ্যত্ববিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। তদুদ্দেশ্যে সমসাময়িক সাহিত্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অধ্যাত্মিক ও আর্থিক সমস্যা বিষয়ক মতামতের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ের ব্যবস্থা, সেইসব আন্দোলনে শিশিক্ষুভাবে যোগদানের ব্যবস্থা এবং দেশের বর্ত্তমান মণীষীদের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

এতদ্ব্যতীত আরও একটী অবশ্য বিবেচ্য বিষয় এই যে মনুষ্যজীবন গঠনের উদ্দেশ্যে এমন কতকগুলি সংস্কার ও বৃত্তির উদ্বোধন ও অনুশীলন প্রয়োজন হয়, যাহা কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ, উপদেশ গ্রহণ, সাহিত্যদর্শন-বিজ্ঞানাদির সহিত পরিচয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না। তজ্জন্য শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গীভূত কতকগুলি অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়। বুদ্ধির সাহায্যে আমরা সকলেই বুঝিতে পারি দরিদ্রের সেবা করা উচিত, স্বদেশের সেবায় স্বার্থত্যাগ ও কষ্টস্বীকার মনুষ্যত্বের লক্ষণ, সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জন করা বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি। ছাত্রজীবনে এই সব বিষয়ের উপদেশ লাভ করিয়া তদনুরূপ বৃত্তিসমূহও জাগ্রত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু আত্মবিকাশের কোন সুবিধা না পাইয়া তাহারা আবার নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে কার্য্যকরী হয় না। যৌবনের প্রারম্ভে এই সব সদ্বৃত্তির অনুশীলন হইলে তাহারা সুন্দররূপে স্ফুরিত হইয়া প্রবল হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অঙ্গস্বরূপ দরিদ্র সেবা ভাণ্ডার, দরিদ্র সেবা সমিতি, রোগী সেবা সমিতি, সমাজ সেবক সমিতি, শ্রমজীবি শিক্ষা সমিতি প্রভৃতি কতকগুলি সদনুষ্ঠান এবং দেশভ্রমণ, দেশবাসীদের অবস্থা স্বচক্ষে সন্দর্শন প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহাতে শিক্ষা জীবন্ত হয়, শুভইচ্ছা প্রবল হয়, শুভকার্য্যে আনন্দ পাওয়া যায়, চিত্তবৃত্তি পরিশোধিত হয় এবং মনুষ্যত্বের সম্যক্ বিকাশ হয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোস্লেম কর্ত্তব্য।

আজ ভারত নবচেতনায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই শুভ যুগেও যদি আমরা কর্ত্তব্যকে অবহেলা করি তবে মানব সমাজে আমরা কোথাও স্থান করিয়া লইতে পারিব না। ধর্ম্মজীবনই মানুষকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ করে, ধর্ম্মহীনতা মানুষকে পশুর পর্য্যায়ে অবনত করে। সুতরাং এই সময় আমাদিগের সকলেরই নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য এবং তদ্বারা জীবনকে সমুন্নত ও দায়িত্বপূর্ণ করিয়া তাহা দেশ, সমাজ ও আত্মার উন্নতির জন্য নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। আমি আজ আমার স্বজাতীয় নিরক্ষর মোস্লেম ভ্রাতাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়াই কয়েকটী কথার অবতারণা করিলাম। আশা করি, এই প্রকার আলোচনায় আমাদের সমাজের উপকার ব্যতীত কোন অপকার হইবে না। যাহারা শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে ধর্ম্মজীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন, জগতের এই ঘোর পরিবর্ত্তন ও উত্থান পতনের দিনে আশা করি—এবং জাতির মঙ্গলের দোহাই দিয়া অনুরোধ করি, তাহারাও আমার এই মামুলি কথাগুলির মূল্য ভাবিয়া দেখিবেন। কর্ম্ম এবং তৎ সঞ্জাত অর্থই জগতে সকলের চেয়ে বড় নহে, তাহা অনুভব করিবার সময় আসিয়াছে। ভোগ বিলাস পরতন্ত্র ইয়ুরোপ আজ তাহা চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া জগৎকে দেখাইয়া দিয়াছে।

পৃথিবীতে ধর্ম্ম নানারূপ এবং মানবও নানাজাতিতে বিভক্ত। প্রত্যেক জাতিই এক একটী ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আছে। কিন্তু সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য এক, পন্থা ভিন্ন ভিন্ন। ইস্লাম একটী ধর্ম্ম; মুসলমানগণ সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আছেন। এই ইস্লাম ধর্ম্ম আমাদের আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) হইতে চলিয়া আসিয়াছিল; পরে আমাদের আখেরী পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মস্তোফার (দং) সময়ে ইস্লাম ধর্ম্ম পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হয় এবং সেই সঙ্গে ইস্লাম বিষয়ক মুসলমানগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, আইন, কানুন, সরা, সরীয়ত প্রভৃতিও আগেকার পয়গম্বরগণের জীবনী লিখিত কোরাণসরীফ প্রব-

স্তিত হয়। সেই মহাগ্রন্থ কোরান সরীফে এবং হাদিসে উল্লেখ আছে—নামাজ, রোজা, কলিমা, হজ্জ, জাকাৎ এই পাঁচটীকেই মুসলমান ধর্ম্মের অঙ্গ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইমান (বিশ্বাস) ব্যতীত কোনপ্রকার সৎ কর্ম্মেই পুণ্যলাভ হইবে না। ইমানই সকলের মূল। সাত বস্তুকে মনে সত্য জানা ও মুখে প্রচার করার নাম ইমান (বিশ্বাস)। যথা—আমান্তো বিল্লাহে মালায়েকাতি কতুবিহি রসুলিহি ওলিয়াও মেল আখেরে অল কাদ্‌রে খায় রেহি অস্বারেহি মিনাল্লাহে তাআ্লা অল বাছে বাদেল মউত।

ইহার বঙ্গার্থ।—যিনি এই সংসার সৃজন করিয়াছেন তাঁহার নাম আল্লা। দ্বিতীয় তাঁহার ফেরেশতাগণ (দূতগণ), তৃতীয় তওরাত, জর্ব্বুর, ইঞ্জিল, ফোরকান প্রভৃতি গ্রন্থসকল তাঁহার মুখজাত। চতুর্থ পয়গম্বরগণ (বার্ত্তাবহগণ), পঞ্চম কেয়ামত (লয়), ষষ্ঠ তিনি সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম উভয়েরই সৃজনকর্ত্তা, কিন্তু প্রভেদ এইযে সৎকর্ম্মে তিনি সন্তুষ্ট ও অসৎকর্ম্মে অসন্তুষ্ট। সপ্তম মরণের পরে পুনর্ব্বার জীবিত করিবেন। এই সকল সত্য জানা ও প্রচার করারই নাম ইমাম বা বিশ্বাস।

নামাজ। নামাজ একপ্রকার আরাধনার নাম। নামাজ পড়িতে হইলে ওজু করিতে হইবে; অবগাহনের আবশ্যক থাকিলে তাহা পূর্ব্বেই বিশুদ্ধ জল দ্বারা করিতে হইবে।

হস্ত পদাদি ধৌত করাকে ওজু বলে কিন্তু ওজুতে ফরজ, সোন্নত, মস্তাহাব ইত্যাদি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ওজুতে যে যে স্থান ধৌত করা আবশ্যক তাহার যেন কোন স্থান শুষ্ক না থাকে ইহা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

নামাজ পড়িবার সময়ে সাংসারিক কাজ, কর্ম্ম, দয়া, মমতা ইত্যাদি হইতে মনকে উঠাইয়া একাগ্রচিত্তে এই চিন্তা করিতে হইবে—"যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি আমার সম্মুখে, আমি যদিচ তাঁহাকে দেখিতে পাই না কিন্তু তিনি অনায়াসে আমাকে দেখিতেছেন"। এইরূপ ধ্যানকরতঃ "কাবা"র দিক হইয়া দাঁড়াইবে এবং দুটী পা চারি অঙ্গুলি ব্যবধানে রাখিবে, দুটী হস্ত স্বাভাবিকভাবে ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইবে। তৎপর নামাজে যাহা যাহা আবশ্যক তাহা শুদ্ধরূপে বলিয়া সমাধা করিবে।

রোজা—প্রভাত অবধি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত রোজার সময় অর্থাৎ নিয়তের সহিত আহারাদি কিম্বা সঙ্গমাদি না করাকে শরাতে রোজা বলে। সাধারণতঃ যাহাকে উপবাস বলা হইয়া থাকে। মনে রাখা উচিত যে বিনা নিয়তে কখনই রোজা সিদ্ধ হইবে না। রোজা তিন প্রকার ফরজ, ওয়াজেব ও নফল। রমজান সরীফের মাস ভরিয়া রোজা রাখা ফরজ। কোনও মানস করিয়া রোজা রাখা ওয়াজেব। এ ছাড়া সকলই নফল।

এইসব রোজা দুই ভাগে বিভক্ত। শারীরিক ও মানসিক। মানসিক রোজা—একাদশ ইন্দ্রিয়, ষড়্ রিপু, ইহাদিগকে স্ববশে আনিয়া আত্মসংযমের সহিত রোজা করার নাম মানসিক রোজা। আত্মসংযম না থাকিলে রোজা হইবে না। কেবল উপবাস করা হইবে মাত্র।

চারিটী কলিমা, মুসলমান মাত্রেই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহা এই :—

১। লাএ লাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রসুলোল্লাহ।

২। আস্‌হাদুয়ান্ লাএলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহ দাহো লাশারিকা লাহো ওয়াস হাদুয়াল্লা মোহাম্মাদান আবদুহো রাসুলোহ।

৩। লাএ লাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহেদোল্লা সানিয়া লাকা মোহাম্মাদুর রাসুলোল্লা ইমামুল নোত্তা ফিন রাসুলু রাব্বেল আলামিন।

৪। লাএ লাহা ইল্লা আনতা নোরাণ ইয়াহ্‌দিয়াল্লাহো লেনুরেহিমাইয়া সাউ মোহাম্মাদার রাসু লোল্লাহে ইমামুল মুরছালিন খাতে মাল্লবী দিন রাসুলো রাব্বেল আলামিন।

হজ্জ্ :— হজ্জ্ করা ধনী লোকেরই কর্ত্তব্য। যাহারা ধনবান তাঁহারা মক্কা সরীফে যাইয়া "কাবার" ঘরে হজ্জের সময় হজ্জ্ করিবেন।

জাকাৎ—নিজ ধন হইতে $\frac{১}{৪০}$ ভাগ ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে দীন, দুঃখীকে দান করা। যাহার ঘরে বাজে খরচ বাদে ৪৮৷৹ টাকার রৌপ্য ও ৭ তোলা ১১ মাসা ২ রতির কিঞ্চিতাধিক স্বর্ণ এক বৎসর বাস জমা থাকিবে তাহার উপরোক্ত নিয়মে জাকাৎ দিতে হইবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের এই

পরিমাণ অলঙ্কার থাকিলে তাহার ও জাকাৎ দিতে হইবে। যিনি জাকাৎ দিবেন তিনি বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী, স্বাধীন এবং জাকাৎ দেওয়া যে খোদা তালার আদেশ, তাহা প্রাণের সহিত অনুভব করেন এরূপ লোক হওয়া চাই।

মুসলমান মাত্রেই বাল্য বয়সে বালকের "খত্‌না" করাণ উচিৎ। সেই "খত্‌না" সাফ খত্‌না হওয়া চাই। তদভাবে তাহার কোন এবাদত (উপাসনা ইত্যাদি) কবুল (গ্রাহ্য) হইবেনা, আজীবন তাঁহার শরীর নাপাক (অশুচি) থাকিবে।

প্রত্যেক পাপ কার্য্য হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকিয়া ঈশ্বরারাধনা করিবে। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যাইয়া ভুলেও কোন পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেনা। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে পাপ, পুণ্য, কিরূপে জানিতে পারিব? মুসলমানী শাস্ত্রে যাহা নিষেধ, তাহা পাপ, আর যাহার বিধি আছে, তাহা পুণ্য। এতদ্ব্যতীত পাপ পুণ্যের বিচার করিবার আর একটী সহজ উপায় আছে। যে কাজ করিলে মনে অনুতাপ আসে তাহাই পাপ। আর যাহাতে মনে শান্তি জন্মে তাহাই পুণ্য।

এসংসারে যত প্রকার পাপ আছে তাহা সকলই ঈশ্বরের নিকট তৌবা (ক্ষমাপ্রার্থনা) করিলে মাপ হয়। কিন্তু এমন একটী পাপ আছে যাহা ঈশ্বরও ক্ষমা করিতে পারেন না। সে পাপ অন্যের দাবী। কোন রূপ কথা, কি কোনরূপ কার্য্য দ্বারা, কাহারও মনে কোন কষ্ট দিলে, অথবা কোন বস্তু মালীকের নিকট না বলিয়া আত্মসাৎ করিলে, যে পর্য্যন্ত দাবীদার দাবী পরিত্যাগ না করে সে পর্য্যন্ত আর মুক্তিনাই। অতএব ভুলেও যেন এমন কাজ করা না হয়।

কন্যা বিবাহের সময় যেন পণ লওয়া না হয়। ইহা মুসলমানী শাস্ত্রে মহাপাপ। মেয়ে বিবাহের সময় দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেরই মনের ধারণা—যিনি যত উর্দ্ধ সংখ্যক টাকার দেনমোহর ধার্য্য করেন তিনিই তত বড় লোক। বাস্তবিক ইহাদ্বারা বড় ছোটর পরিমাণ করা যায় না। কিন্তু একটী অতীব অন্যায় কার্য্য করা হয়। কারণ দেনমোহর যদি আদায় না হয় তবে তাহাও স্বামীর নিকট স্ত্রীর একটী বড় দাবী থাকিয়া যায়। ইহাতেও উপর্য্যুক্ত পাপ বর্ত্তে।

আমাদের মুসলমান জাতিতে আর একটী কুপ্রথা দৃষ্ট হয়। অনেকেই প্রথম একটী বিবাহ করিয়া, পরে আর একটী বিবাহ করেন এবং দ্বিতীয় স্ত্রীকে সরার (বাঁদি) স্ত্রী বলিয়া অনেক সময় বেপরদায় চালাইয়া থাকেন। ইহা বড়ই অন্যায়। স্বামী স্ত্রীকে সাধ্যমত পর্দ্দায় রাখিয়া অতীব সম্মান ও যত্নের সহিত তাহাকে প্রতিপালন করিবে এবং রীতি মত খোরাক পোষাক দিবে।

দাস দাসীর প্রতি মমতা প্রকাশ করিবে। আত্মীয়, স্বজন, পাড়া, পড়শীর প্রতি সৌজন্য দেখাইবে। দীন, দুঃখীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। কাহারও প্রতি হিংসা, দ্বেষ প্রকাশ করিবেনা। ছোট, বড় সকলের প্রতিই সমবেদনা প্রকাশ করিবে।

এতিমের (পিতৃ মাতৃহীন) প্রতি দয়া করিবে। ভুলেও এতিমের কোন বস্তু গ্রহণ করিবেনা।

টাকার সুদ খাইবেনা। সুদ খাওয়ার বিষয় খোদা তালা কোরাণ সরীফে সত্তুর জায়গায় নিষেধ করিয়া ছেন।

আত্মার উন্নতি করিতে না পারিলে কেবল মুখের বক্তৃতায় দেশের ও সমাজের কোন উন্নতি হইবে না; পরন্তু তাহাতে দেশে ও সমাজে অনাচার ও পাপই বৃদ্ধি হইবে। ব্যষ্টির উন্নতিতেই যে সমষ্টির কল্যান নির্ভর করে ইহাই এই উত্থান পতনের সময় সকলের চিন্তার বিষয় হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীআবদুররহিম খান পাঠান।

পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষা।

(প্রথম স্তবক)

চারি ভিতে শুধু জল;
জল-কল্লোলে সঙ্গীত বাজে,
অচেতন আজি চেতনের সাজে
মরমের মাঝে আকুলি বিকুলি
কথা কয় কল কল।

মাঠে ঘাটে ভরা জল ;
কে বলে তাহার নাই মুখে ভাষা,
নাই হাসি-রাশি প্রীতি ভালবাসা ?
দেখেছে কে কভু কচি শিশু মুখে
এত হাসি খল খল ?

কোথা হ'তে এত জল ;
পাহাড়ের বুক এত রসে ভরা—
স্নেহ নীরে ক্ষীরে ভাসাইবে ধরা ?
অজীব আজি কি লভিল জীবন
জীয়াতে পৃথিবী-তল ?

অদ্ভুত হুতবল ;
বক্ষা বহে কি রসের সায়রে,
মহনে কিগো অমিয়া উপরে,
নাই বুঝি সেথা সুধা ছাড়া কভু
কালকূট হলাহল।

উল্লাসে নাচে জল,
ছোট ছোট ঢেউ ক'টির রসনা,
তুলিছে মধুর রণনা ঝণনা,
রূপের লহরী রূপসী-অঙ্গে
যৌবন চলমল।

নাই ঘটে শতদল ;
রাঙা রবির তরুণ কিরণে
ঘুমু্ম খেলে হিরণ-বরণে,
ষোড়শী নারীর অঙ্গে যেনগো
মুকুতা ঝলমল।

মন প্রাণ বিহ্বল ;
আকুল বাতাস ছুটিয়া ছুটিয়া,
সলিল-অঙ্গে লুটিয়া লুটিয়া,
স্বচ্ছ অধর চুম্বিয়া চালেগো
বনফুল-পরিমল।

বিরহিণী গণে পল ;
গুরু গুরু গুরু ঘন-গরজনে,
প্রলয়ের ঘোর অশনি-স্বননে,
বাতায়ন-পথে চাওয়া অনিমেখ
আঁখি দুটি ছল ছল।

তাই কিগো ধরা টলমল ;
সে আঁখির জলে ভাসে কি ধরণী,
বরষার ভয়ে শিথিল অবনী,
এত জল কিগো বন্দ ভরিয়া
বিরহিণী-আঁখিজল ?

(দ্বিতীয় স্তবক)

পদ্মার বুকে অযুত তরণী
পালে পালে পোড়ে যেন বিহগিনী
আকাশের পাখী উড়ে বুঝি জলে
শোঁ শোঁ শোঁ শব্দ শন।

শিশুর হৃদয়ে খেলিছে পুলক,
বালিকার নাকে দুলিছে নোলক,
"পান খেয়ে যাও অঃ পানের নাও"
করিছে আমন্ত্রণ।

গঙ্গা-মেঘনা-যমুনা-ঢিলাই
ব্রহ্মপুত্র, তিতাস, করাই,
ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গা
গাহিছে কাহিনী কত।

নদীতে নদীতে জাহাজের খেলা
বন্দরে বন্দরে 'লঞ্চের' মেলা
বংশী-নিনাদে কাণ ঝালাপালা
পাটের গুদামে রত।

মাঠ ভরা জলে ধান নালিতা
মা'র কোলে যেন শিশুরা পালিতা,
ঢেউ খেলে যায় ধানের তগায়
দুলাইয়া উঠে হেলে।

খালে বিলে জেলে-ডিঙ্গীর লহর,
দিকে দিকে শুধু নায়ের বহর,
গহেনায় মাঝি বদর বদর
সারি সারি দাঁড় ফেলে।

ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস জলের উপরে
ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ সলিল-উদরে
দলে দলে শিশু ডোবে ও সাঁতারে
নাই কারু মনে ভয়।

পূরব বঙ্গে নবীন বরষা
প্রবীণ নবীন কবির হরষা
মাস চারি জুড়ি' দেখায় কতনা
নাটকের অভিনয় !

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

স্রোতের ফুল।

২২

পরেশ যাহাকে লইয়া বৈঠকখানা সাজাইয়া পৃথক সংসার পাতিয়াছিল তাহার নাম মাণিক্য।

শ্রীমতী মাণিক্য বয়সে ছিল পরেশ অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের বড়। পরেশ যখন মাতুল রমানাথ বসুর বাসায় থাকিয়া পড়িত তখন সঙ্গদোষে তাহার চরিত্র নষ্ট হইয়া যায়। অন্ন দাতা বসুমহাশয় হৃষ্টচিত্তে লোককে অন্নদান করিতেন কিন্তু তাঁহার বাসায় তাঁহার পরম আত্মীয় লোক গুলাও যে কোথায় রাত্রি যাপন করিত বা কোথায় দিন কর্ত্তন করিত, তাহার কোনই তত্ত্ব লইতেন না। এ বিষয় সেকালের সহরবাসী অন্নদাতা অভিভাবকগণ প্রায় সকলই ছিলেন একরূপ। ফলে সেকালে সহরবাসীদের নৈতিক অবস্থা ছিল অধিকাংশেরই অত্যন্ত জঘন্য। অভিভাবকদিগের দৃষ্টির অভাবে এবং সঙ্গদোষে সেকালে অনেক লোক সহজে বিপথগামী হইয়া যাইত।

এইরূপ অবস্থায় এক কুসঙ্গীর সংসর্গে পরেশের চরিত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মাতুলের সুপারিসে পরেশ চাকরী পাইয়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করে। এই সময় ঢাকা সহরের রোজগারে বাবুদের—যাহার একখানা বৈঠকখানা ও একটী রাড় না ছিল, সে মনুষ্য সমাজেই গণ্য ছিল না। পরেশ স্বাধীন মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবার জন্য শ্রীমতী মাণিক্যকে লইয়া এই বৈঠকখানা সাজাইয়া বসিয়াছিল।

পরেশের চরিত্রে এই গুরুতর দোষটী কালধর্ম্মে ঘটিয়া উঠিলেও তাহার ভিতর কতকগুলি গুণ ছিল। সে তাহার মাতুলের ন্যায় মহাপ্রাণ ছিল। বেশ্যাসক্ত হইলেও সে পরস্ত্রীকে যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে দেখিতে জানিত। দীনের দুঃখ অল্প কথায় বুঝিত, এবং সৎ কার্য্যে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

পরেশ মদ খাইত। সেকালে পান দোষ খুব নিন্দনীয় ছিল না। প্রফুল্লকে পরেশ সুশীলের ভগিনী বলিয়া বুঝিয়াছিল। পরেশের এই ধারণা যে ভুল, তাহা বুঝাইয়া দিতে সুশীল কোন চেষ্টা করে নাই; করা প্রয়োজনও মনে করে নাই; বরং তাহাতে সায় দিয়াই চলিয়াছে।

প্রফুল্ল নীচের কোঠায় আসিয়াছে অবধি পরেশ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নীচে যাইত; যাহাতে সতীর্থ সুশীলের ভগিনীর লজ্জাশীলতায় কোনরূপ আঘাত না পড়ে, তাহার যাতায়াতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ না হয়—যথাসম্ভব তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরেশ চলিত। সুতরাং পরেশের সতর্ক ও সম্ভ্রমদৃষ্টি সর্ব্বদাই প্রফুল্লকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।

পরেশ প্রফুল্লর মুখ এ পর্য্যন্ত না দেখিলেও প্রফুল্ল নারী জনসুলভ ঔৎসুক্যের তাড়নায় তাহার পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে চুলের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত—সমস্ত দেখিয়া লইয়াছিল। ছিদ্রপথে পুরুষ দেখিবার—পুরুষ কেন বিশ্ব-সংসার দেখিবার এ অভ্যাস আমাদের মেয়েদের বোধ হয় সনাতন প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরেশ যেমন প্রফুল্লকে সুশীলের বোন বলিয়া বুঝিয়া ভুল করিয়াছিল প্রফুল্লও তেমনি মাণিক্যকে পরেশ বাবুর স্ত্রী বলিয়া বুঝিয়া ভুল করিয়াছিল।

সুশীলের পরেশ-মাণিক্য সংবাদ জানা থাকিলেও সে প্রফুল্লকে তেমন একটা অবিশুদ্ধ কথা জানান সঙ্গত মনে করে নাই।

দ্বিপ্রহরে প্রফুল্ল নীচের কোঠায় বসিয়া একটা বড় ধামার চারিদিকের বাঁশের চাক বেত দিয়া বাঁধিতেছিল, এমন সময় শ্রীমতী মাণিক্য আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

প্রফুল্ল অপেক্ষা মাণিক্যের বয়স ১০।১২ বৎসর অধিক হইবে। সে মাণিক্যকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া আসিয়া মাটিতে মাথা পাতিয়া প্রণাম করিল, তারপর অনুসন্ধিৎসু নেত্রে ঘরের ভিতরের চারিদিক চাহিয়া একখানা বুনট পাখাই আনিয়া মাটিতে রাখিয়া বিনীতভাবে বলিল—"কি দিব বসিতে,—আমার ঘরে যে কিছুই নাই। আপনি এইটাতেই বসুন।"

মাণিক্য দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল—"তোমার নামই প্রফুল্ল? আমাদের বাবুর সঙ্গে কত দিনের ভাব গো?"

প্রফুল্ল একটু আশ্চর্য্য হইয়া মাথার ঘোমটার উপর হাত রাখিয়া বলিল—"আমার সঙ্গেতো তাঁর কোন পরিচয় নাই। আমি পূর্ব্বে আর কখনও তাঁহাকে দেখি নাই—"

মাণিক্য প্রফুল্লর আসন রূপে দেওয়া অর্দ্ধসমাপ্ত

পাখাটা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল—"তুমিই দিয়াছ বুঝি বাবুকে একটা পাখা, সেই রকমই তো দেখা যায়, না ?"

প্রফুল্ল এখানে আসিয়া অবধি সুশীলকে দাদা ডাকিত সে বলিল—"দাদা একটা পাখা ও একটা ঝাড়ুনী নিয়া বাবুকে দিয়াছেন—

মাণিক্য বলিল—"সে একই কথা। বাবু কি পুরস্কার করিলেন ?"

প্রফুল্ল—"সেতো আমি জানি না।"

মাণিক্য—"জান না কি ? সবই জান।"

প্রফুল্ল দুঃখিত হইয়া বলিল—'আমি কিছুই জানি না, দাদাই জানেন—বাবু কিছু দিয়াছেন কিনা। দাদা বেত কিনিয়া আনিয়াছেন, সে পয়সা—

মাণিক্য বাধা দিয়া বলিল—এই প্রথম বার—সাবধান করিয়া দিতেছি—তলে তলে ভাব-কুটুম্বিতা চলিবে না—ঘোমটার নীচে খেমটার নাচ। "

প্রফুল্লর চক্ষে জল দেখা দিল। সে সেই ছল ছল জলবিন্দু চক্ষে লইয়া নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

মাণিক্য সেই আবাধা অর্দ্ধসমাপ্ত পাখাটী হাতে লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—"এর মধ্যেই আবার ন্যেকামিরভরং।"

মাণিক্য চলিয়া গেলে প্রফুল্ল চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া লইয়া পুনরায় কাজ করিতে লাগিল।

প্রফুল্ল ভাবিয়া দেখিল—দাদাকে একথা বলিলে আর কি হইবে? জীবনেরই যাহার কোন মূল্য নাই, তাহার আবার মান অপমান কি ? ভগবানই যাহার জন্য নাই মানুষ তাহাকে সম্মান করিবে কেন? অনর্থক দাদাকে একথা জানাইয়া তাহার চিন্তার ভার বৃদ্ধি করিয়া দেই কেন ?

(২৩)

পরেশ আফিস হইতে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া বলিল "আমার নূতন পাখাটা কোথায় ?"

মাণিক্য বলিল—"চুলায় দিয়াছি।"

পরেশ রাগ করিয়া বলিল—"কেন ?"

মাণিক্য সুর উপরে চড়াইয়া বলিল—"আমার খুসী।"

পরেশ রাগের সহিত বলিল—"অকর্ম্মার কুকর্ম্মই এইরূপ, প্রস্তুত কর দেখি একখানি ঐরূপ—তবে বুঝি।"

মাণিক্য ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"যে করিতে জানে তাহাকে লইয়া ঘর করিলেই হয়—আমার পায়ে কেন ?

কথাটার প্রকৃতি বিশ্রী হইয়া যাইতেছে দেখিয়া পরেশ থামিয়া গেল। পরেশের এই পৃষ্ঠভঙ্গ দেখিয়া মাণিক্য তাহার কল্পিত ধারণা সত্য বলিয়া বুঝিয়া তেমনি ভাবে সুর সমান পর্দ্দায় রাখিয়া বলিল—"আমি বুঝি আর বুঝিতে পারি নাই; চালাকী! যাওনা, তার পায়ে পড়িয়া মর না গিয়া—এখনও এখানে কেন ?"

পরেশ রাগ দেখাইয়া বলিল—"দেখ মাণিক তোমার সময় অসময় নাই কি ? আর সেই ভদ্রলোকের মেয়ে—শুনিলে কি মনে করিবে ? সুশীলই বা কি মনে করিবে ?"

মাণিক্য বলিল—"চোরের ভয় নাই, সাধুর চীৎকার! তুমি দিনরাত নাম জপ করিয়া মরিতে পার, আর কথা বলিলেই দোষ পরের ? তলে তলে কেরামতি—আমি কি বুঝি না ?"

পরেশ রাগের সহিত বলিল—'তুমি কি বুঝিলে ?' হ্যাঁ, কি বুঝিলে ?"

মাণিক্যও প্রতিধ্বনির সহিত বলিল—'তুমি কি বুঝিলে ?"

পরেশ নরম হইয়া বলিল—"তোমার ঐ দোষ, সত্য মিথ্যা কোন খবর না লইয়াই মনের ভিতর আগুন জ্বালাইয়া বস। ঐ পাখাটা না দাও, আর একটা দাও, আর পয়সাগুলি গণিয়া বুঝিয়া লও! বড় গরম! ইঃ!

মাণিক্য শান্তমূর্ত্তি ধরিল, তারপর আসিয়া পরেশের কোমরের গাঁট হইতে স্তরে স্তরে রক্ষিত—আজকার দিন মানের রোজগার—সিকি, পিয়সা, দুয়ানি টাকা—খুলিতে লাগিল।

পরেশ হাসিয়া বলিল—"কত হইল দেখ দেখি! আগে একটা পাখা দাও!"

মাণিক্য পাখা প্রদানের দিকে মনোযোগ না দিয়াই পয়সা-সিকি গণিতে লাগিল। পরেশ নিজ শরীরে গামছা দ্বারা বাতাস দিতে দিতে খাটের নীচ হইতে একটা ভাঙ্গা পাখা কুড়াইয়া লইল, তারপর তাহাদ্বারা জোড়ে নিজ শরীরে বাতাস করিতে লাগিল।

মাণিক্য ততক্ষণ পয়সা-সিকি-দুয়ানিগুলি গণনা করিয়া বলিল—"চারি টাকা তের আনা—না?"

পরেশ বলিল—"হইতে পারে?"

মাণিক্য সেগুলি নিজের বস্ত্রাঞ্চলে তুলিয়া লইতেছিল, দেখিয়া পরেশ বলিল—"রাখ তোমার নিকট, এ টাকা মূলধনে খাটাইয়া সুশীলের বোন যে পাখা, ঝাড়ু ও আর আর কি সব বুনিতেছে—তার ব্যবসা করিব।"

পরেশের কথা শেষ হইতে না হইতেই মাণিক্য অঞ্চল খাড়িয়া পয়সা সিকি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া বলিল—পাইয়াছে পেত্নিতে—যাও তারি পায়ে পড়িয়া গিয়া মর, আমি বুঝি খুকীটি, কিছুই বুঝি না—কিছুই দেখি না—না!"

পরেশ হাসিয়া বলিল—"ছিঃ এত তরল বুদ্ধি তোমার এ যে তোমারই মূলধন, না হয় তুমিই নিজ হাতে দিও সুশীলকে, নিজে গুণিয়া জিনিষ লইও। জিনিসগুলি এমন সুন্দর যে এ আমরা না নিলেও তাহা ঘরে থাকিবে না—আর তুমি না নিতে চাও, বস্, না লইব আমরা, তাহার জন্ত আবার আত্ম বিরোধ কেন?"

পরেশ মাণিক্যের চিবুক ধরিয়া সোহাগ দেখাইতে চেষ্টা করিল। মাণিক্য পরেশের স্পর্শ অগ্রাহ্য করিয়া মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল—'দিন ভরিয়া প্রফুল্ল—প্রফুল্ল—যেন প্রফুল্লই জপ-মালা—

পরেশ হাসিয়া বলিল—"এইজন্ত সন্দেহ! পাগলী, সে কথা খুলিয়া বলিলেইতো হইতো। আমি যে প্রফুল্ল প্রফুল্ল জপিয়াছি তাহার সহিত সুশীলের বোনের কোন সংস্রবই নাই। এ নামটী এর পূর্ব্বেও তুমি আমার মুখে বোধ হয় বহুবার শুনিয়াছ।" দেয়ালে বুলান একখানা ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পরেশ বলিল—'ঐ ছবি খানার কথায়ও সে কথা বলিয়াছি। আজ সুশীলের বোনের পাখায় তাহার বোনের নামটী লেখা দেখিয়া সেই প্রাচীন ঘটনাটীই বারংবার স্মরণ হইতেছিল; তুমি পড়িতে জান না—তাই বুঝিতে পার নাই।"

কথাগুলি বলিয়া পরেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

পরেশের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া মাণিক্যও রাগ সামলাইয়া লইল এবং ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত তাম্রমুদ্রা ও রজত খণ্ডগুলির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল।

(২৪)

পূর্ব্বদিনের ন্যায় ঠিক সেই সময়ে আজও মাণিক্য আসিয়া প্রফুল্লর দ্বারে দাঁড়াইল। দেখিয়াই প্রফুল্লর মুখ কাল হইয়া গেল, বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। সে তাহার কিরূপ সম্ভাষণ করিবে এবং সেই সম্ভাষণেরই বা ফল আজ কিরূপ হইবে, প্রফুল্ল ভাবিয়া পাইতেছিল না।

মাণিক্য বলিল—"আমার প্রতি কাল তুমি রাগ করিয়াছ; না? ওসকল কি বাবুদেরে দিতে হয়, ওরা এর কি বুঝিবেন—আমার তাই রাগ হইয়াছিল। রাগের মাথায় আমি নিজকে সামলাইতে পারি না, ঐ আমার দোষ, তা কিছু মনে করিও না।"

প্রফুল্ল আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"আমি অত্যন্ত গরীব ও নিরাশ্রয় আমার লোকের কথায় রাগ হইলে চলিবে কেন?

মাণিক্য বলিল—"তোমার ঐ এক এক খানা পাখার দাম কত?"

প্রফুল্ল বলিল—ইহার আমি কিছুই জানি না বেত আর বাঁশ—এইতো—ইহার আর কতই দাম হইবে। দাদা সব জানেন—

মাণিক্য নিজ অঞ্চলের অন্তরাল হইতে হাত বাহির করিয়া হাত হইতে দশটী টাকা প্রফুল্লর সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"আমিই তোমার সমস্ত জিনিস লইব—এই তাহার অগ্রিম বায়না লও, এখন দশ টাকাই দিলাম—বাকী কথা তোমার দাদার সঙ্গেই হইবে।"

প্রফুল্ল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আপনি টাকাটা রাখুন এখন; এত টাকা লইয়া আমি কি করিব? দাদা আসিয়া কোন্ জিনিসের কি দাম আপনাদের নিকট যাইয়াই স্থির করিবেন। আমরা যখন আপনাদের আশ্রয়ে আছি তখন, যে দাম ধরিবেন তাহাই হইবে। টাকাটা আপনি এখন দিবেন না।...

মাণিক্য টাকা দশটী মাটি হইতে তুলিয়া লইয়া প্রফুল্লর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—"তা হইবে পরে, এ টাকা আমি এখন তোমাকে দিলাম।"

প্রফুল্ল অগত্যা টাকা দশটী বস্ত্রাঞ্চলে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া সেই পূর্ব্বদিনের মতই বলিল—আপনাকে

বসিতে দিব কি?—বলিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া নিজের শুইবার পাটীটাই আনিয়া বারান্দায় পাতিয়া দিয়া বলিল—"বসুন আপনি।"

মাণিক্য বসিল। প্রফুল্ল একটা খুচনীর চারিদিকের চাকা বাধিতে আরম্ভ করিল।

মাণিক্য জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের বাড়ী কোথায় গো?"

প্রফুল্ল লম্বা বেতটার মধ্যভাগ মুখে কামর দিয়া ধরিয়া সমলাইয়া লইতেছিল, ততক্ষণে উত্তরটা ভাবিয়া লইয়া বলিল—"মালকা।"

মাণিক্য বলিল—"সে কোথায়?

প্রফুল্ল—"তা ঠিক জানিনা, এখান হইতে দুইদিন আড়াই দিনের পথ—নৌকায়।"

"সে কি ফরিদপুরে না বরিশালে? না ঢাকাতেই?"

প্রফুল্ল বলিল—"না, সে ময়মনসিংহ জেলায়।"

"স্বামী কি করেন?"

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"স্বামীর রোজগার খাইবার মত যদি অদৃষ্ট হইত, তবে কি আর পরের গলায় ঝুলিয়া আছি?"

প্রফুল্ল হাটুর উপর মুখ কাত করিয়া রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল; তাহার হাত দুখানা নিশ্চল হইয়া রহিল।

মাণিক্য বলিল—"সোয়ামী বুঝি রাড় লইয়া থাকে?"

প্রফুল্লর চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে কোন উত্তর দিতে পারিল না।

মাণিক্য বলিল—"কাঁদিওনা, কাঁদিলে কি হইবে, তোমার যে বয়স, যে চেহারা, তাতে তোমার কিসের অভাব? থাক এই খানে, তোমার টাকা পয়সার অভাব হইবে না। আমি তোমার ঠাঁই করিব ছিঃ! অনর্থক চক্ষের জল ফেলিতে নাই।"

প্রফুল্ল বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিয়া পুনরায় বেত গাছা টানিয়া লইল।

মাণিক্য বলিল—সোয়ামীর স্বভাব দোষটা বিয়ার পূর্ব্ব হইতেই ছিল বুঝি—না হইলে তোমায় এই রূপ দেখিয়াও।

প্রফুল্ল বলিল—"এ সকল কথা বলিলে আমি বড় কষ্ট পাই—"

মাণিক্য—"না, আর তুলিব না; তুমিও আর তার কথা ভাবিও না।"

মাণিক্য চুপ করিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের বাড়ী কোন স্থানে—?"

মাণিক্য—"আমাদের বাড়ী এখন ঢাকাতেই।"

প্রফুল্ল—"বরাবরই কি ঢাকাতে ছিল?"

মাণিক্য—"না, আগে বাবুর বাড়ীছিল. সে বাড়ী সমুদ্রে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, এখন এখানেই আছেন।"

প্রফুল্ল মাথা উঠাইয়া মাণিক্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া; জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুর বাড়ী কোথায় ছিল?"

মাণিক্য বলিল—"সমুদ্রের পারে হরিলা।"

হরিলা গ্রামের নাম শুনিয়া প্রফুল্লর বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হরিলা কোথায়? হরিলার বাড়ী তাঁহার কি হইল? এখন কেন নাই? কবে কি প্রকারে তাহা সমুদ্রে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—এরূপ কত প্রশ্নই প্রফুল্লর মনে আসিয়াছিল; কিন্তু তাহার কোনটীই আর মুখে ফুটিল না। প্রফুল্লর চক্ষে জল উপচাইয়া আসিতেছিল, সে আর তাহা কোনমতেই আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না; তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইয়া সবলে বুক চাপিয়া ধরিয়া কান্না থামাইল।

মাণিক্যও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেল।

মাণিক্য চলিয়া গেলে প্রফুল্ল ঘরের মেঝে পাটিটা টানিয়া আনিয়া তাহার উপর উপুর হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিলেই যেন মনের সকল দুঃখ বেদনা বাহির করিয়া দিয়া মনকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারিত। তাহা সে পারিল না। নীরবে কাঁদিয়া পাটি মাটি ভাসাইয়া দিল।
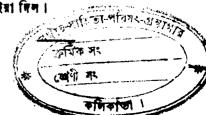
ইউরোপে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের পুনরুদ্বোধন।

ভাস্করাচার্য্যের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা মন্দিভূত হইয়া আসিয়াছিল। এই সময়ে মধ্য এসিয়ার সমরখণ্ড নগরে এই বিদ্যার যথেষ্ট চর্চ্চা হইতেছিল। সমরখন্দের অধিপতি উলুবেগ··· একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর এশিয়া খণ্ডে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। অতঃপর ইউরোপীয় মনীষিগণের আলোচনায় ইউরোপ খণ্ডে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি দৃষ্ট হয়। কিরূপে এই বিদ্যার চর্চ্চা তথায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং কোন্ কোন দেশে এই বিদ্যার অল্প বিস্তর আলোচনা চলিয়াছিল নিম্নে আমরা তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (Frederic II, ১১৯১—১২৫০) জর্ম্মাণীর সম্রাট ফ্রেডারিক বহুকাল ধর্ম্ম সম্রাট পোপ গণের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত থাকিয়াও জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের পৃষ্ঠ পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। ইনি নেপলস নগরে (Naples) একটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলী ও টলেমীর আলমাজেস্ত লেটিন ভষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

এলফোন সো—(Alphonso) প্রায় এই সময়েই (Castile) কেষ্টাইলের রাজা দশম এলফোনসো ও এই বিজ্ঞানের উৎসাহ দাতা রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার সময়ে তাহার মত উন্নত লোক অতি অল্পই ছিল। রাজধানী টলেডোতে ইনি একটী জ্যোতির্বিজ্ঞানের কলেজ স্থাপন করিয়া খৃষ্টান, য়িহুদী বা মুর, যে জাতীয় জ্যোতির্ব্বিদকে তিনি যে খানে পাইলেন, তাহাকেই তথায় আহ্বান করিয়া প্রাচীন খণ্ডা সমূহের ভ্রম সংশোধন করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সংশোধিত খণ্ডা সমূহ তখন কার দিনের অন্যান্য খণ্ডা হইতে শুদ্ধতর ছিল। এই কার্য্যে ৪০ চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা (ডিউকেট) ব্যয়িত হইয়াছিল। ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে ইহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। এই শতাব্দীতেই জ্যোতিষানুরাগী আরও কয়েক জন লোকের জন্ম হইয়াছিল। ইহারা পাটীগণিত, জ্যামিতি দৃষ্টি বিজ্ঞান (Optics) ও জ্যোতিষ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সাধু রোজার বেকনের নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

রোজার বেকন (Roger Bacon) ১২১৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই মনস্বী পণ্ডিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রসায়ণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু এই পণ্ডিত্যই তাঁহার শত্রু হইয়া দাড়াইল। সকলেরই সন্দেহ হইল যে তিনি একজন যাদুকর। শয়তানের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ আছে। সুতরাং তাঁহাকে করাগারের অন্ধ কোঠরিতে নিক্ষেপ করা হইল। রাজপ্রতিনিধি ও ধর্ম্মপ্রাজক পোপ তাহার বিচার করিলেন। শয়তানের সঙ্গে আইন বিরুদ্ধে কোন কথা বার্ত্তা না বলায় তিনি নির্দ্দোষ প্রমানিত হইলে পর তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। তিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রের অবস্থান এবং ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি লিখিয়াছিলেন এবং পাঞ্জিকা সংশোধনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পার্ব্বাক—(George Purbach) খৃষ্টিয় ১৪২৩ অব্দে অষ্ট্রিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিয়েনাতে অবস্থান কালে কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়েই তিনি বুদ্ধিমান বালক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে অধ্যাপনার কর্য্যে ও ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেণ। একবার তিনি ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় কার্ডিনেল ডিকুজ তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তথা হইতে অষ্ট্রিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া আল্মাজেস্ত নামক টলেমী কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থ তর্জ্জমা করিতে আরম্ভ করেন। গ্রীক ও আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকা সত্বেও তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাদক গণের অনবধানতা প্রযুক্ত যে যে ভুল হইয়াছিল, তাহা স্বীয় প্রতিভা বলে সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রেজিওমণ্টেনাস্—(Regiomontaneous) অকাল মৃত্যুতে পার্ব্বাক যে সকল কাজ আরম্ভ করিয়াও অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই শিষ্য সু-সম্পন্ন করেন।

ইহার আর এক নাম ছিল কনিংস্‌বার্গের জন্ মুল্লার (John muller of Koningsberg). পার্ব্বাকের সুনামে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার নিকট দশ বৎসর জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপর গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া আলমাজেস্ত অধ্যয়ণ করিবার মানসে তিনি রোম নগরে চলিয়া যান। তথায় তিনি উক্ত গ্রন্থ ও এক খানা কনিক্‌স্ (Conics) বা উচ্চ অঙ্গের জ্যামিতি অনুবাদ করেন। ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউরেম্বার্গে গমণ করিয়া একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীর সাহায্যে তথায় একটী মানমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ঐ মানমন্দিরে বিভিন্ন যন্ত্রাদি স্থাপন পূর্ব্বক তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদগণের সারণীর ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিয়াছিলেন। ঐ মানমন্দিরেই তিনি ত্রিংশ বর্ষ কাল গবেষণা করেন। অতপর ষষ্ঠ পোপ পঞ্জিকা সংস্কারের মানসে তাঁহাকে রোম নগরে আহ্বান করিয়াছিলেন। ২।৩ মাস তথায় অবস্থানের পর হঠাৎ তাহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বিষ প্রয়োগে এবং কেহ ২ বলিয়া থাকেন যে মহামারীতে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই বিজ্ঞবরের অকাল মৃত্যুতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কোন একটী সারণীতে ভুল বাহির করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত সারণীর অধিকারী তাহাকে বিষ প্রয়োগ করেন, এরূপ অনেকের অনুমান। জন্ম ১৪৩৬ খৃঃ মৃত্যু ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে।

বার্ণার্ড ওয়াল্‌থার—মুল্লারের মৃত্যুর পর ওয়াল্‌থার পুনরায় গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনিই সর্ব্বপ্রথম শুক্র গ্রহের সাহায্যে নক্ষত্রগণের দেশান্তর নির্ণয় করিতেন। ইনি ১৪৩০খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া, ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

জন ওয়ার্ণার—(John Warner) নামক অন্য এক ব্যক্তি ও নিউরেম্বার্গে—জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রে দেশান্তর নির্ণয় করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হইয়াছিল।

তৎপর জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। টলেমী ভৌমকেন্দ্রিক মত সমর্থন করিতেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আরিষ্টার্কাস্ সৌর কেন্দ্রিক মতের পক্ষপাতি ছিলেন। যখন দেখিতে পাওয়াগেল যে ভৌম-কেন্দ্রিক মতে জ্যোতিষিক গণনা করিলে সব সময় সন্তোষ জনক ফল পাওয়া যায় না, তখন জ্যোতির্ব্বিদ গণের দৃষ্টি ধীরে ধীরে সৌরকেন্দ্রিক মতের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

কপারনিকাস্—(Nicolas Copernicus) কপারনিকাস্‌ই আধুনিক সৌর কেন্দ্রিক জ্যোতিষের প্রবর্ত্তক। ১৪৭৩ খৃঃ ১৯ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিম প্রুশিয়ার থরন নামক স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহা তখন পোলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার জননী একজন জর্ম্মাণ রমণী; পিতা জাতিতে স্লাবনিক হইলেও আচার ব্যবহারে একজন খাটি জার্ম্মাণ ছিলেন। পোলণ্ড ও জার্ম্মণী এই দুই প্রদেশই কপারনিকাসের গৌরব করিয়া থাকেন। ১৪৯১ খৃঃ হইতে ইনি গণিত ও আলোক বিজ্ঞান এবং চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৫০০ খৃঃ তিনি রোম নগরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। এই সময় তিনি জ্যোতিষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। ঐ সনের ৬ই নবেম্বর তারিখে একটী চন্দ্র গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। পেডুয়াতে তিনি ১৫০১ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ণ করিতেছিলেন। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি ইটালি পরিত্যাগ করিয়া প্রুশিয়াতে চলিয়া যান। ১৫২২ খৃঃ পর হইতে উচ্চপদস্থ ভিন্ন ২ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াও অবসর কালে আকাশ পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি প্রতিপাদন করেন যে সূর্য্যই আমাদের জগতের কেন্দ্র।

১৫৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি অপস্মার রোগে আক্রান্ত হন। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে, মৃত্যুশয্যায় অবস্থান কালে তাহার কৃত গ্রন্থাবলীর প্রথম মুদ্রিত পুস্তক তাহার হাতে প্রদত্ত হয়। ইতি এক খানা ত্রিকোণমিতি এবং অন্যান্য ২।৪ খানা পুস্তকও মুদ্রিত করিয়াছিলেন। খগোলক সিদ্ধান্তে তিনি প্রাচীন মত খণ্ডণ করিয়া ভৌমকেন্দ্রিক মতের পরিবর্ত্তে সৌর কেন্দ্রিক মত প্রচার

করেন। তাহার মতে আকাশের তারকা সমূহ গগনের দূরতম সীমায় অবস্থিত। তৎপর যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, পৃথিবী, শুক্র ও বুধ গ্রহ অবস্থিত! ইহারা উত্তরোত্তর সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী। সূর্য্য ইহাদের কক্ষাপথের কেন্দ্র বা অধিশ্রয় স্থলে নিশ্চলভাবে অবস্থিত হইয়া মহাকর্ষণের বলে এই গ্রহ গণকে কক্ষচ্যুত হইতে দিতেছেন না। এই সিদ্ধান্তমতে গ্রহগণের শীঘ্র ও বক্রগতি গণিত শাস্ত্রের সঙ্গে মিল রাখিয়া সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। এই প্রকারে তিনি দিবা, রাত্র, ষড় ঋতু, জ্যোতিষ্কগণের উদয়াস্ত, ও অয়ন-চলন ইত্যাদির অতি সুন্দর ও পরিস্ফুট ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন। সৌর জগৎ সম্বন্ধে তিনি যে ধারণা করিতেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধতম।

অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের বশবর্ত্তি হইয়া সাধারণ লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে এই ভাবিয়া, তিনি তাঁহার মত প্রচার ও মুদ্রিত করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশেষে তাহার বন্ধুগণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তিনি ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার সমাধিমন্দিরে কতকগুলি বর্ত্তুল অঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছে। কপার্নিকাসের মত জার্ম্মণীতে নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইয়াছিল বটে। কিন্তু ১৭শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহা লোকের মনে ততদূর আস্থা উৎপাদন্ করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৭শ শতাব্দীতেই ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল।

টায়কো ব্রাহি— (Tycho Brahe) কপার নিকাসের পরেই টায়কো-ব্রাহির স্থান। সময়ের ফলে তিনি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি অপরাপর জ্যোতির্ব্বিদ অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। স্বকীয় উৎকৃষ্ট প্রতিভা বলে তিনি ঐ সকল যন্ত্রাদির সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম আলোক বিবর্ত্তনের নিয়ম সমূহ বিধিবদ্ধ করেন, এবং বিভিন্ন উচ্চতায় আলোক বিবর্ত্তনের পরিমাণ কত হয় তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। কিন্তু চন্দ্রের গতি নির্ণায়ক খণ্ডাতেই তিনি সমধিক মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। ৭৭৭টী নক্ষত্রের মানচিত্র নির্ম্মাণ করিয়া তিনি ঐ মান-চিত্রে ইহাদের পরস্পর দূরত্ব ও নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। হিপার্কাস ও উলুবেগের মানচিত্র হইতে তাঁহার মানচিত্র বিশুদ্ধতর। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে ডেনমার্কের অন্তর্গত ক্নুড্ ষ্টর্প (Knud storp) নামক স্থানে এক পুরাতণ সম্ভ্রান্ত বংশে ইহার জন্ম হইয়াছিল। দিনেমার দেশীয় এই জ্যোতির্ব্বিদ ফলিত জোতিষেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

বিশিষ্ট ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, এই ভাবিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে লেটিন ভাষা শিক্ষা করাইতে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতুল অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে লিপ্‌সিক্ (Leipsic) বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়িবার জন্য ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে একটী সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার কৌতুহল উদ্দীপিত হইয়াছিল। তখন হইতেই তাঁহার মন গণিত ও জ্যোতিষ শিক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পিতা মাতার ইহাতে আদৌ ইচ্ছা ছিলনা। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে ইচ্ছামত পড়াশুনা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তখন হইতে ই তিনি জ্যোতিষ ও রসায়ন শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ শিক্ষায় তাঁহার এতদূর আগ্রহাতিশয্য দেখাগিয়াছিল যে একজন জ্যোতির্ব্বিদের অন্বেষণে তিনি জার্ম্মণীর ভিন্ন ২ নগরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণী হইতে ডেন্মার্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক হইতে সুণ্ডপ্রণালী স্থিত হিউএন দ্বীপের (Huen) অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট প্রদত্ত একটী বৃত্তির সাহায্যে ও নিজের ১০০০০০ মুদ্রা (Crown) ব্যয়ে তিনি তথায় ইউরেনিবার্গ (Uraniburg) মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপর উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ মানমন্দির সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। এই নির্জ্জন স্থানে তিনি পঁচিশ বৎসর কাল গগনপর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা করিয়া ইউরোপের বিদ্বন্মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর তিনি গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অনেক

অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল ; তাহার বৃত্তি রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মানমন্দির পরিত্যাগ করিয়া তিনি হাম্বার্গের সন্নিকট ওয়ান্দেস্বার্গে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথা হইতে বোহিমিয়াতে, এবং বোহিমিয়া হইতে প্রেগ (Pregue) নামক স্থানে সম্রাট দ্বিতীয় রোডলফের (Rodolph II) আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইস্থানে তিনি কেপ্‌লার ও লঙ্গমণ্টেনাস্ (Longomontaneous) কে নিয়া আবার গগন পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন। কি জন্য যে তিনি রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন, তাহা রহস্যপূর্ণ। তিনি নিজেও ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া যান নাই। যে কারণেই হউক তাহার পলায়নে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতিই হইয়াছে। কেননা তাহার কাগজ পত্রাদি কেপ্‌লারের হাতে পতিত না হইলে বোধ করি কেপ্‌লার তাহার গবেষণা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন না। তিনি ফলিত জ্যোতিষ ও স্পর্শমণির অন্বেষণে অনেক সময় ব্যয় করিতেন। কিন্তু তিনি কপার-নিকাসের মত মানিতেন না। সম্ভবতঃ কপারনিকাস্ ও টলেমীর বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য করিবার জন্য তিনি অন্য একটী নূতন মত পোষণ করিতেন। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর তারিখে তিনি ইহধাম হইতে অনন্ত ধামে চলিয়া যান।

লঙ্গমণ্টে নাস্—(Longo montaneous)—হিউয়েনে আট বৎসর কাল ইনি টাইকোর সহকারী ছিলেন। তৎপর অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইয়া কোপেনহেগেনে চলিয়া যান। তিনি এক খানা সুবৃহৎ জ্যোতিষ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

কেপলার—(Kepler)—টাইকো যে সকল গবেষণা করিয়াছিলেন তাহার সমুদয় কাগজ পত্রই তাঁহার শিষ্য কেপ্‌লারের হস্তে পতিত হয়। ঐ সকল পুরাতন কাগজ পত্র ও গবেষণা হইতেই কেপ্‌লার আধুনিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। এগুলি নিয়া তিনি ২০ বৎসর গবেষণা করিয়াছিলেন। অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিতেন যে গ্রহগণ বৃত্তাকারে ভ্রমণ করে। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে কার্য্যতঃ তাহা নহে। তৎপর মঙ্গলগ্রহ নিয়া তিনি অনেক বার গবেষণা ও পরীক্ষা করেন। এইসকল পরীক্ষার ফলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বৃত্তাভাব চক্র (ellipse) ব্যতীত অন্য পথে ইহাদের গতি নির্দেশ করিতে পারা যায় না। এই চক্রের একটী অধিশ্রয়ে (Focus) সূর্য্য অবস্থিত। গ্রহগণ সমান সমান সময়ে, বৃত্তাকারে ভ্রমণ করিয়া, সমান সমান পথ অতিক্রম করেন, এ পর্য্যন্ত এই ধারণা ছিল। তিনি দেখিলেন যে এরূপ নিয়মাবদ্ধ গতি প্রকৃতিতে নাই। তিনি আরও দেখিলেন যে সূর্য্য ও কোন গ্রহের সংযোজনী রেখা সমান সমান সময়ে যে যে ক্ষেত্রফল অঙ্কিত করে তাহা পরস্পর সমান (Areas described in equal times are equal). কেপলারের হাতে জ্যোতিষ শাস্ত্র এই প্রকারে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ধূমকেতুর গতি সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল অন্য প্রকার। তাঁহার মতে সৌর কর নক্ষত্রে প্রবেশ করিতে যাইয়া ধূমকেতুর সৃষ্টি করে। আর এই প্রকারে প্রবেশ করিতেং উক্ত নক্ষত্রের সকল অংশই নষ্ট হইয়া যায় সুতরাং তিনি ধূমকেতুর বিষয় চর্চ্চা করা নিস্ফল মনে করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার জন্য তিনি গ্রহণের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। তিনি লগারিথম (Logarithm) নামক গণনা প্রণালী জ্যোতিষিক গণনায়—প্রয়োগ করিয়া পরিশ্রমের লাঘবতা সম্পাদন করিতেন।

তিনি শুধু গণনা ও পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণই করিতেন এ মত নহে; কারণও অনুসন্ধান করিতেন। মাধ্যা কর্ষণের জ্ঞানও তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহার ধারণা ছিল যে দূরত্বের অনুপাত অনুসারে মাধ্যাকর্ষণ ও মহা-কর্ষণের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গ্রহগণের দূরত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিবার কালে তিনি দেখিতে পাইলেন যে সূর্য্য হইতে ইহাদের দূরত্বের ঘন ফল এবং ইহাদের সূর্য্য প্রদক্ষিণের কাল পরস্পর আনুপাতিক। উপগ্রহ সম্বন্ধেও একই নিয়ম। এই আবিষ্কারই কেপ্‌লারের তৃতীয়—নিয়ম (Third Law) বলিয়া পরিচিত। জ্যোতিষিক গণনায় কিরূপ ভাবে গ্রহণ সমূহের সাহায্য নিতে হয়—তাহা কেপ্‌লারই দেখাইয়াছিলেন। আর লগারিথম নামক গণনা প্রণালীও

তিনিই সর্ব্বপ্রথম জ্যোতিষিক গণনায় ব্যবহার করিতেন। জোয়ার ভাঁটার সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিয়াছিল। এ বিষয়ে তদতিরিক্ত বেশী কিছু কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কিন্তু তিনি যথাযথরূপে ইহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। মহাত্মা নিউটন যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন তাহা কেপ্‌লারের গবেষণা হইতেই পাইয়াছিলেন।

কেপলার দরিদ্রের ছেলে। সামান্য প্রবন্ধাদি ও পুস্তকাদি লিখিয়া তাঁহার যে আয় হইত তদ্বারাই তিনি বড় একটা পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। এতদ্ব্যতীত গণিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ রাজসরকার হইতে যে বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন তাহার অংশবিশেষ কেপ্‌লারও ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু সময়ের বিপাকে তাহাও যথাযথরূপে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রদত্ত হইত না। এই জন্য তাঁহাকে অনেক সময় বহুদূরস্থিত রাজসরকারে যাইয়া তাগাদা করিতে হইত। রেটিস্‌বন্ (Ratisbon) নামক স্থানে তিনি একদা টাকার তাগাদায় গিয়াছিলেন। তথায়ই ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। এল্‌বার্গের রাজকুমার চারলস্ মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারায় তাঁহার একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন; তাহাতে মঙ্গলগ্রহের কক্ষা (বৃত্তাভাষ চক্রে) অঙ্কিত করা হইয়াছে। উরটেম্বার্গ (Wurtemberg) রাজ্যের অন্তর্গত উইল নামক স্থানে, ১৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নবেম্বর তারিখে এই বিশ্ববিখ্যাতব্যক্তির জন্ম হইয়াছিল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কবির বিপদ।

(১)

"এ তোমার লেখা ?"

"হুঁ।"

"বেশ্ কবিতাটি হয়েছে কিন্তু।" এই বলিয়া নৃত্যগোপাল বাবু কবিতা লেখা পত্রিকা খানা গাঢ়অভিনিবেশ সহকারে আবারও পাঠ করিতে লাগিলেন। খানিকপরে ভ্রূকুটি করিয়া কতকটা বিস্ময়ের সহিত পীযুষ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তুমি আবার কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে কবে থেকে হে ?"

"এইত ভায়া, মাঝে মাঝে একটু ফুরসুৎ পেলেই দু, চার লাইন লিখে থাকি। আমাদের ত আর অবসর পাওয়ার জোটি নেই; শুধুই কাজ! কাজ! কাজ!"

"তাইত ভাবছি। এত কাজের মাঝেও তুমি কবিতায় সিদ্ধহস্ত হ'য়ে উঠেছ। এখন একদিন হাঠাৎ উদীয়মান কবি বলে নাম বেরিয়ে পড়্‌বে।, তোমার নামটা দাওনি কেন কবিতায় ?"

"নামটা আগেই জাহির করতে চাইনে ভায়া। কাগজে যখন ছাপা হয়েছে, অবশ্যই তার একটা সমালোচনা ও বেরুতে পারে। তা মন্দ হউক বা ভাল হউক, কিছুই যায় আসে না। এই ভাবে কয়েকটি কবিতা "বিনামা" ছাপা হ'য়ে গেলেই বাজারে তখন একটা উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠ্‌বে; তার পরেই ব্যস; কস্ করে কবিতার নীচে নাম জুড়ে দেব এবং আগেকার কবিতা গুলি যে আমিই লিখেছি বৎসর শেষের সূচীতেও তার পরিচয় দিয়ে দেব। সাহিত্যিকদের মহলে খুবই একটা চি চি রব পড়ে যাবে তখন, নয় কি ?"

"তা তুমি মনে করতে পার বটে, কিন্তু কথা হচ্ছে এই, নব্য কবিদের এ সমস্ত বাজে কল্পনা খাটি সাহিত্যিকদের নিকট কিন্তু আসলেই আসে না। তবু যা হক, তোমার ষ্টাইলটা একেবারে মন্দ নয়, অথচ ছন্দের ঝঙ্কার. তাতে একটু আছে, শব্দ গুলিও বেশ মোলায়েম হয়েছে। আমি বল্‌ছি কি, আসছে মাস থেকে বরং নামটা জুড়ে দিতে পার। তাতে উৎসাহ বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে কলমও চলতি থাকে।"

"যাক্ কয়েকটা মাস, দু, চারটা ছাপিয়ে সাহস হোক আগে।"

"তাই ভাল। তবু যা হক, আজ থেকে আমরা এক-জন—কবি বন্ধু পেলাম। মাঝে মাঝে রগড় হবে, আমোদ চলবে।" এই বলিয়া নৃত্যগোপাল বাবু পীযুষ বাবুর নিকট হইতে বিদায় নিলেন। পীযুষবাবু দ্বিগুণ উৎসাহে সিগারেট টানিতে টানিতে কি একটা ভাবনায় নিমগ্ন হইলেন।

(২)

ভবানীপুরের ১৩নং বাড়ীতে একটী যুবক নিজ পাঠ গৃহে বসিয়া বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, এমন সময় পিওন আসিয়া চিঠি, পত্র, খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি বিলি করিয়া গেল। যুবক প্রথমেই অতি আগ্রহের সহিত মাসিক পত্রিকা খানা খুলিলেন। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একটী কবিতার দিকে তাকাইতেই তাহার চক্ষু স্থির। খুবই মনোযোগের সহিত কবিতার আগা গোড়া একবার পাঠ করিয়া মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন "দেখেছ রামনাথ বাবু কাণ্ডটা? কবিতা লিখলুম আমি, আর ছাপিয়ে দিলেন কিনা কোথাকার এক জোচ্চোর! ব্যাটা আবার চালাকী ক'রে নাম দেয়নি। রসো জোচ্চোর, তোমার জুচ্চুরী না ভেঙ্গে ছাড়ছিনে। এখুনি সম্পাদকের কাছে যাচ্ছি।"

রামনাথ—"ব্যাপারটা কিহে রমেশ? বড় ক্ষেপলে যে, এই কবিতা কি তোমার লেখা?"

রমেশ—"আমার লেখা না তো কার? কত পরিশ্রম করেই কবিতা গুলো লিখেছিলুম। কত আশা, কত উৎসাহ ছিল; তার মাঝে কিনা আমার লেখা কবিতা অপরে ছাপিয়ে দিলে! দেখবে তুমি আমার রাফ্ খাতা?—এই দ্যাখ। পড়, পড়। সবটা মিলিয়ে পড়। হিজিবিজি লেখা, পড়তে পারবেনা তুমি। দাও আমার কাছে। এই ভাখ সব লাইন হুবহু মিলে যাচ্ছে।"

রমানাথ—আশ্চর্য্য বটে! কি করে সে পেলে? লোক টাকে ধরবে কি করে? নাম যে দেওয়া নেই।

রমেশ—তার একটা উপায় ঠাওরাতে হবে। বেটা আবার চালাকী ক'রে নিজের নাম গোপন করেছে।—আমার "ফেয়ার" করা কবিতার খাতা আজ ক'মাস যাবত পাচ্ছিনে; নিশ্চয় এই জুচ্চোর বেমালুম আত্মসাৎ করেছে রসো পাজি, তোমার ফন্দী আমি সব বের করে দিচ্ছি।

(৩)

পরের মাসের "বীণাপাণিতে"ও লেখকের নামবিহীন একটী কবিতা বাহির হইল। কবিতা পড়িয়াই রমেশচন্দ্র অগ্নি শর্ম্মা। ভ্রূকুটি কাটিয়া দন্তে দন্ত নিপীড়ন করিয়া রমেশ উদ্দেশে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল "চোর ব্যাটা, ছুচো ব্যাটা, খাতা চুরি করেছিস্ত করেছিস্! তার উপর ও আবার জুচ্চুরি! পরের কবিতা নিয়ে পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়া! এত বড় বদমায়েশ সাবাশী ক'রে আবার নাম গোপন করা হ'চ্ছে।"

"কি হে রমেশ! হাতে এ কি? এ মাসেও কি তোমারই কবিতা উঠেছে নাকি?" এইবলিয়া রমানাথ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। রমেশের মনে শান্তি নাই। সে একটু বিষাদের সহিত উত্তর করিল—

"কে বল্লে আমার কবিতা? নাম নেই গন্ধনেই ছ'মাস যাবৎ কবিতা ছাপান হচ্ছে। কবিতা লিখলুম আমি—আর সম্পাদকের নিকট বাহার নিচ্ছেন কোথাকার এক জুচ্চোর।"

"একটা প্রতিকার করবে বলেছিলে; কি করেছ তার?"

"কি আর করব রমানাথ! গেল মাসে পত্রিকা আফিসে যেতে পারিনি। বিশেষ—একটু জরুরী কাজে আমাকে সেই দিনই ঢাকা চলে যেতে হয়েছিল। এই রবিবার এসে পৌচেছি।"

"সে খবর আমি আগেই নিয়েছি। কিন্তু এখন কি করবে মনে করেছ? এর একটা কিনারা না করলে ও চলবেনা। যে রকমেই হউক রহস্যের ভেদ করা চাইই?"

"এই আমি আজই যাচ্ছি "বীণাপাণি" অফিসে—বিকেল—বেলায়।" এই বলিয়া রমেশ বাবু রমানাথের মুখের দিকে তাকাইয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নানা কথা বার্ত্তার পর "সন্ধ্যায় আবার আস্ব এখন" এই বলিয়া রমানাথ বাবু চলিয়া গেলেন।

বেলা ৫টার সময় রমেশচন্দ্র বীণাপাণি অফিসে আসিয়া সম্পাদক কে ধরিলেন। সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া শেষবলিলেন—এর একটা প্রতিকার না করিলেই নয়।"

সম্পাদক—কি করা যায় বলুন। ভদ্রলোক, দেখতেও শিক্ষিত বলেই মনে হয়। নিজে এসে কবিতা দিয়ে যান। কবিতা গুলিও পড়্তে বেশ—মোলায়েম ভাষা, শুনতে ও মিষ্টি শোনায়। একটু দার্শনিকত্বও তার ভিতর জড়ানো থাকে।"

রমেশ—আস্‌ছে মাসে ফের যদি আসে, বল্‌বেন, "কবিতা গুলি মাসে মাসে যাচ্ছে মসাই; কিন্তু নাম দেননা কেন তাতে? নিজে পরিশ্রম ক'রে কবিতা লিখলেন, অথচ কেউ আপনাকে জানলেনা। আপনার নাম ঠিকানা আমাদিগকে দিন—আস্‌ছে মাস থেকে আপনার নাম শুদ্ধ কবিতা ছাপিয়ে দোব।' আপনাদের নিয়ম ও বোধ হয় তাই?

সম্পাদক—তা বটে! তবে জানেন কি—ছোট্ট ছোট্ট কবিতা কিনা, ওসব আমাদের কিছু নজরেই আসেনা। নীচে খালি জায়গা পড়ে থাকলেই ছাপিয়ে দিই। তা আপনি যা বল্লেন, নিশ্চয়ই আমাকে সেই উপায় দেখ্‌তে হবে। সত্যের অনুসন্ধান হওয়া ভাল! মিছি মিছি একটা বাজে লোক বাহাদুরী নিবে আর আপনি প্রতারিত হবেন, এ কোনো কাজের কথা নয়!

(৪)

পীযুষবাবু গৃহে বসিয়া আছেন—এমন সময় নৃত্য গোপাল বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে পীযুষ ভায়া! বড় হাসছ যে! কি খবর?"

পীযূষ—"খবর্‌ তেমন কিছুই নয়। আমার কবিতা প'ড়ে ও বাড়ীর মাখন বাবু খুবই প্রশংসা করলেন। মাখন বাবুর সঙ্গে তোমার জানা শোনা নাই বুঝি নৃত্য গোপাল, ইনি সম্প্রতি বঙ্গ সাহিত্যের একজন "উদীয়মান" লেখক। মাসিক কাগজ গুলিতে প্রায়ই দুটী একটী তার কবিতা থাকেই। বল যদি তোমার সঙ্গে এর পরিচয় করে দি উনি আগে জান্‌তেন না যে আমি কবিতা লিখতে জানি।

নৃত্য—এবারের কবিতা কিন্তু অতি সুন্দর হ'য়েছে পীযূত ভায়া। বাস্তবিকই তাতে পীযূষ ঝ'রে পড়ছে—কি—না—কি নামটী—দিয়েছে—কবিতার? —হ্যা হ্যা—"বসন্তের হাওয়া।" খাসা নাম-খাসা লেখা।

পীযুষ—সে দিন আরও কয়েকটা কবিতা এক সঙ্গেই পত্রিকা অফিসে দিয়ে এসেছি। সম্পাদক ভারী খুসী হেসে হেসে আমার কবিতার খুব প্রশংসা করলেন, নীচে নাম দিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ঠিকানা ও রেখে দিলেন। বেশ ভদ্র বলেই মনে হয়। আমার কয়েকটা আশার কথাও ইনি শুনিয়ে দিলেন। এবার থেকে আমাকে গদ্য প্রবন্ধ লিখতেও খুব উৎসাহ দিলেন। গদ্য লিখে হাত পাকা না হলে নাকি পাকা লেখকই হওয়া যায়না।—"বীণাপাণি' ঠিক সময়ে পাওত নৃত্য গোপাল?"

নানা প্রকার আলাপের পর দুই বন্ধুতে বেড়াইতে বাহির হইলেন।

(৫)

বিকাল বেলা। নৃত্যগোপাল তাহার এক বন্ধুকেসহ পীযুষবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত। পীযূষবাবু ব্যস্তসমস্তভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া হাল্‌ক্যাসনে অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত আগন্তকদ্বয়ের অভ্যর্থনা করিলেন। সম্ভ্রমটা নবীন আগন্তককে উপলক্ষ্য করিয়াই মাত্রায় কিছু বেশী হইল। নৃত্যগোপাল বলিল "ইনি আমার একজন বন্ধু, এই আষাঢ় মাসের ৫ তারিখ ওঁর এক ভাগ্নের বিয়ে। একটী "প্রীতিউপহার" লেখাবার জন্যে কাকে ধরা যায়, কার কাছে যাওয়া যায়—এই ভাবনায় ইনি ভারি বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন। আমার কাছে তোমার পরিচয় শুনে একেবারে যেন সাঁতারে ঠাঁই পেয়েছেন। সরাসরি তোমার কাছে এগুতে সাহস পাননি কিনা, তাই আমাকে ধরে পড়েছেন। বিয়ের একটা উপহার এঁকে লিখে দিতেই হ'বে ভাই, তুমি হচ্ছো কবি!"

পীযুষ—সর্ব্বনাশ! দিনরাত খেটে মরবার পর্য্যন্ত ফুরসুৎ পাইনে, আর তুমি বল্‌ছ কিনা প্রীতিউপহার লিখে দিতে হবে। (আগন্তকের প্রতি) মাপ্‌ করবেন মশাই। এই আজকে ১৩ই নবেম্বর, ২৯শে কার্ত্তিক। এই সাতদিন আমার মোটেই অবসর নেই। এই দেখুন না "বীণাপাণি" অফিস্‌ থেকে একটা "স্বাগত"—কবিতা লিখ্‌বার জন্যে অনুরোধ পত্র এসেছে। এক সপ্তাহের ভিতরই পূর্ণিমা সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন। তাকি আর হ'য়ে উঠ্‌বে? সময় কোথায়? অথচ পরশু দিনই আমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে চুঁচুড়ায়। তা আপনি দয়া ক'রে এসেছেন, আপ্যায়িত হলুম। বসুন! ওরে ভগ্‌লু তামাক নিয়ে আয়।"

আগন্তক—আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে নিজকে সৌভাগ্যবান্‌ মনে করছি। আপনারা পাকা লেখক আপনাদের মত পাকা হাতের একটা প্রীতিউপহার হ'লে

কেউ আর নিন্দে করতে পারতো না। দেখ্‌তেই পাচ্ছেন আজকালকার দিনে একটা প্রীতিউপহার ছাপানো না হ'লে বিয়েতে আর বর কনের মেলন হবারই জোটী নেই। রামা শ্যামা ধামা সকলেই উপহার লিখ্‌ছে। ছাই, ছাই, ওগুলিকি আর কেউ পড়ে, না দেখে? আমি তেমন দু'একখানা লিখিয়ে আনিয়েছি বটে, কিন্তু ওতে আমার মন উঠ্‌ছে না। তা, আপনার সময় নেই বল্‌ছেন, দয়া ক'রে যদি এই দু'খানা প্রীতিউপহার কারেক্ট (correct) ক'রেও দেন, তবেও হ'তে পারে।

পীযূষ—কোথায় কবিতা, দেখি?

আগন্তুক তাহার সঙ্গে-আনা কবিতার খাতা খানা পীযূষবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখুন—খাতার একেবারে শেষভাগ দিয়ে "প্রীতিউপহার" দু'টী লেখা রয়েছে। ভদ্রলোক আর আলাদা কাগজে নকল ক'রে তুলে দেননি, একেবারে নিজের কবিতার খাতা খানাই আমাকে দিয়ে বল্লেন কবিতা দুটী নকল ক'রে প্রেসে দিতে। খাতাখানা কাল কি পরশু ফিরিয়ে দিলেই চল্‌বে।"

পীযূষবাবু অতি আগ্রহের সহিত খাতার পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখিয়া যাইতেছিলেন। পরে বলিলেন "আপনি এত পরিশ্রম করে আমার নিকট এসেছেন, মূঢ়ের মত আপনাকে বিদেয় করে দিই কেমন করে, অথচ সময়ও একেবারে নেই, যাক্‌ আমি ও কবিতা দুটাই যথাসাধ্য কারেক্ট ক'রে দেবো। খাতাখানা রেখে যেতে পারেন।"

আগন্তুক—তা থাক। কাল কি পশু ফেরৎ পেলেই হবে।

পীযূষ—তা বেশ, পর্শু'র আর দরকার হবে না, কালই আমি ফিরিয়ে দেব আপনার খাতা, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এলেই হবে।

(৬)

৫ই অগ্রহায়ণ রবিবার। বেলা তিনটা হইতেই বীণাপাণি আফিস প্রাঙ্গনে জন-সমাগম বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিস্তৃত একটী প্যাণ্ডাল বা চন্দ্রাতপের নীচে সারি সারি চেয়ার টেবিল শ্রেণীবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত। অদূরে ভদ্রমহিলাদের নিমিত্ত চিক-ঘেরা পৃথক্‌ স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। স্থানীয় ও বিদেশীয় সাহিত্যিক-প্রতিনিধিদের জন্য মার্কামারা অসংখ্য চেয়ার। অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের জন্য ও ভিন্ন ভিন্ন আসন সজ্জীকৃত রহিয়াছে। সভামঞ্চের উপর সভাপতির জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনখানা এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে অপরাপর খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও রাজা মহারাজদের চেয়ারগুলি নামাঙ্কিত অবস্থায় স্ব স্ব প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া নিজেদের ব্যস্ত-সমস্ততার পরিচয় জানাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে ঘড়ীতে সাড়ে তিনটা বাজিয়া গেল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ একে একে যার যার সুবিধা অনুসারে আসন দখল করিতে লাগিলেন। সহরের উকীল, ভকীল, মোক্তার, ডাক্তার, পণ্ডিত, সম্পাদক, কবিরাজ, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, ডেপুটি, মুন্সেফ, মাষ্টার, প্রফেসর, সকলেই সেই সভায় নিমন্ত্রিত। দূরে সংখ্যাতীত টুল টেবিলের উপর ছাত্রমণ্ডলী ও অপরাপর ভদ্রবৃন্দ স্থান নিয়াছেন। চারিটা বাজিবার আর মিনিট দুই তিন বাকী। সকলেই সভাপতির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া উৎকণ্ঠায় এদিক্‌ ওদিক্‌ উকি ঝুকি মারিতেছেন। ঠিক এমনই সময় শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয়ের আগম হইল। সমবেত জনসঙ্ঘের করতালিতে তাঁহার সম্মান সূচিত হইল। জনৈক সাহিত্যসেবীর প্রস্তাবে এবং অপরের অনুমোদনে সভাপতিমহাশয় স্বকীয় আসন গ্রহণ করিলেন। সভার কার্য্য-সূচী সভাপতির সম্মুখে স্থাপিত হইলে পর হারমোনিয়ম ও এস্‌রাজের সাহায্যে বাণী-বন্দনা গীত হইল। তৎপর সভাপতিমহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "স্বাগত কবিতা—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু পাঠ করুন।" আদেশ পাইয়া রমেশচন্দ্র বসু গম্ভীর উদাত্তছন্দে তাঁহার লিখিত স্বাগত সম্ভাষণ কবিতা পাঠ করিলেন। কবিতা শুনিয়া পীযূষবাবুর শরীর থরথরি কাঁপিতে লাগিল, তালু শুকাইয়া গেল। উচ্চ করতালি ধ্বনির মধ্যে রমেশচন্দ্র আসন পরিগ্রহ করিলে সভাপতি মহাশয় ডাকিলেন "২য় নং স্বাগত কবিতা—বাবু পীযূষ চন্দ্র ধর।" কিন্তু হায়! এ কি এ! পীযূষবাবু যে ইহার পূর্ব্বেই অচৈতন্য হইয়া চেয়ারে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, হাত পা অবসন্ন, চক্ষু মুদ্রিত। তাড়াতাড়ি রমানাথ ও নিত্যগোপালবাবু আসিয়া পীযূষবাবুকে ধরিলেন

ভলান্টিয়ারগণ কেহ জল আনিতে ছুটিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল, সভাময় একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। পীযুষের হস্তভ্রষ্ট কবিতাটী তুলিয়া বীণাপাণি সম্পাদক মনে মনে পাঠ করিয়া দেখেন রমেশবাবু ক্ষণপূর্ব্বে যে কবিতা পাঠ করিয়াছেন, ইহাও ঠিক সেই কবিতা অথচ নীচে নাম লেখা রহিয়াছে—পীযুষকান্তি ধর। তখন সভাপতি মহাশয়ের কাণে কাণে বীণাপাণি সম্পাদক সকল কথা সংক্ষেপে খুলিয়া বলিলেন। পীযুষের তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া সকলেরই দয়া হইল। রমেশ সম্পাদক মহাশয়ের কাছে যাইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়ে গেছে—আর না। এখন কিন্তু বাস্তবিকই আমার বড় দুঃখ হ'তেছে ওর জন্য।"

সভার কার্য্যে অযথা বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া কয়েক জন লোক বিপন্ন পীযুষ বাবুকে ধরাধরি করিয়া প্যাণ্ডেলের বাহিরে লইয়া গেল। রমেশ, রমানাথ ও নৃত্যগোপাল পীযুষের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। নিত্যগোপাল পাখা করিতে করিতে ত্যক্ত হইয়া বলিল—"এ বিপদের ষড়যন্ত্রকারী একমাত্র রমানাথ। তুমি যদি সে দিন রমেশের লেখা নূতন কবিতার খাতাখানা ওর কাছে দিয়ে না আস্‌তে, তবে বেচারা নিশ্চয়ই আজ সাক্ষী দেবার জন্যে চুচুড়ায় চলে যেত। খাতার ভিতরে স্বাগত অভিভাষণের কবিতাটী দেখে বেচারা আর লোভ সামলাতে পারেনি। এ ব্যাপারে রমানাথই দণ্ড পাবার যোগ্য। কিন্তু ভোগে মরেছি এখন আমরা।"

রমানাথ বলিল—তুমি আমার সাহায্যকারী বলে দণ্ডনীয়। তোমাকে না পেলে বিষয়টা এমন সঙ্গীন ও নির্দ্দয় হয়ে উঠ্‌ত না।"

রমেশ বাবু বলিলেন "চোরের দশ রাত, সাধুর এক দিন; কিন্তু আশ্চর্য্য! পীযূষ বাবুর রুচির!

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ-সংগ্রহ।

জলবিন্দুতে অনুর প্রমাণ।

এক ফোটা জলে অনুমান ১৭০০০০০০০০০০০০০০ অনু বর্ত্তমান আছে। পরমাণু যে কত তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) বলিতেন যদি জলবিন্দুকে আমরা পৃথিবীর মত কল্পনা করিয়া লই তাহা হইলে উহার অনুসকল এক একটা ক্রিকেট বলের মত দৃষ্ট হইবে। যদি আমরা এই অনু সেকেণ্ডে ৫টি করিয়া গণনা করিতে পারি তাহা হইলে এক ফোটা জলের সমস্ত অনু গণনা করিতে প্রায় ১২০০০০০০০০০ বৎসর লাগিবে।

বিবাহের হিসাব।

১৯১৯ সনের বিবাহ রেজেষ্টরী দৃষ্টে দেখা যায় স্কটলণ্ডে উক্ত বৎসর ১৫ বৎসরের দুটি কন্যার বিবাহ হইয়াছে। ১৬ বৎসরের বর ৫টি এবং কন্যা ৪৭টি। ১৭ বৎসরের বর ১১১টি এবং কন্যা ৩০৪টি। ২০ বৎসরের নিম্নে কন্যার সংখ্যা ৩২৩৭ এবং বরের সংখ্যা ১১০৬ টি। এই বরদের ২১ জন বিধবা বিবাহ করিয়াছেন। ৭০ হইতে ৮০ বৎসরের বর ৪২ টি। ৫টী বরের বয়স ৮০ বৎসরের উপরে। একটি ৭৫ বৎসরের কুমার ৭২ বৎসরের এক কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন একজনের ৪টী জমজ সন্তান জন্মিয়া জীবিত আছে। ১৮৫৫ সনে বিবাহ রেজেষ্টরী হওয়ার পরে এইরূপ জমজ প্রসব পঞ্চম বার হইল।

বিচিত্র ভ্রমণ।

টনি পাইজো (Tony Pizzo) নামে এক ব্যক্তি হাতকড়া পরিধান করিয়া সাইকেলে নিউইউর্ক হইতে এনজেলস্‌ পর্য্যন্ত প্রায় ১০০০ মাইল যাতায়াত করিয়া ১ হাজার পাউণ্ড বাজি জিতিয়াছেন। হাতকড়া তাহার বাইসাইকলের হ্যাণ্ডেল শিকল দ্বারা আবদ্ধ থাকিত।

কিছুদিন হয় সামকোল (Samcole) নামে এক ব্যক্তি ১০ সেণ্ট মাত্র পকেটে নিয়া নিউইয়র্ক হইতে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হয়। সে এরূপ সৌভাগ্যবান যে ভ্রমণের সময়ে লণ্ডন হইতে এক অর্থশালিনী কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া আনিয়াছে।

কতিপয় বৎসর হয় লণ্ডনে এরূপ এক অদ্ভুত ভ্রমণকারী দেখা গিয়াছিল—সে এক লৌহনির্ম্মিত মুখস লাগাইয়া একখানা ঠেলাগাড়ীর মধ্যে নানারূপ ফটোগ্রাফ ও ক্ষুদ্র পুস্তক রাখিয়া রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করিতে

করিতে যাইত। তাহার ভ্রমণে আর কয়েকটী সর্ত্ত ছিল—সে বিনা সম্বলে ভ্রমণে বাহির হইবে, সর্ব্বদা আত্মগোপন রাখিবে এবং এই ভ্রমণ সময় মধ্যে বিবাহ করিবে, তবেই সে ২ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পাইবে।

সুইজারলণ্ডের একজন ভ্রমণকারী অদ্ভুত সর্ত্তে বাজি রাখিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সে বিনা সম্বলে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইবে। দিবাভাগে তাহার হাতে হাতকড়া থাকিবে, কেবলমাত্র দুই ঘণ্টার জন্য জীবিকা অর্জ্জন করিতে হাতকড়ি খুলিতে পারিবে।

বেলজিয়ামে স্কুভার নামক এক ব্যক্তি পেছনের দিকে হাটিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে বলিয়া বাজি রাখিয়াছিল।

এমিল এলেকজেণ্ডার নামক এক ব্যক্তি ৪ জন সহচর সহ ৪০ হাজার পাউণ্ড বাজি রাখিয়া ভূ প্রদক্ষিণে বাহির হন। তাহাদের মধ্যে সাহারা মরুভূমিতে দুইজন আরবদের হস্তে নিহত হন। একজন স্পেনিস দস্যুদের হস্তে চিরতরে আবদ্ধ হন।

রোমের ভৌগলিক সমিতীর (Geographical Society) সহিত ১০ হাজার পাউণ্ড বাজি রাখিয়া ৭ জন যুবক ভ্রমণে বাহির হন। তাহাদের ৪০ হাজার মাইল ভ্রমণ করিবার কথা। চুক্তি ছিল যে ভ্রমণকারীগণ পথে তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইবে। ৪ বৎসর পরে ঐ দলের ৩ জন লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহারা প্রকাশ করেন যে এলবেনিয়াতে ডাকাতের গুলিতে এক জন নিহত হন। ব্রঙ্কাইটিস রোগে একজনের মৃত্যু হয়, পাহাড়ের গহ্বরে পড়িয়া একজন মারা যান। চতুর্থ পথিমধ্যে নদীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া পথেই রহিয়া যান।

মিঃ শিলিং নামে একব্যক্তি ভ্রমণকালে একসময়ে অদ্ভুত উপায়ে নিজের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়াতে এক সময়ে তিনি টেলিগ্রাফের লাইন ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপ চলিবার সময়ে তাহাকে ৪০ মাইল অন্তর অন্তর গবর্ণমেণ্টের পুকুর হইতে জল সংগ্রহ করিতে হইত। এক সময়ে তিনি ৪০ মাইল যাওয়ার পর দেখিলেন তথাকার পুকুর শুকাইয়া গিয়াছে। জলের অভাবে প্রাণ যাইবে জানিয়া তিনি এক আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিলেন। উহার ফলে তার মেরামত করিবার জন্য একদল লোক আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই শিলিং এর জীবন রক্ষা হয়।

হেসলীন নামে একজন অষ্ট্রেলিয়ান ২ হাজার ডলারের জন্য ২৫০ দিনে ৭ হাজার মাইল পায়ে হাটিয়া গিয়াছিলেন।

সাঙ্কেতিক সংবাদ।

আমাদের সভ্য দেশে যে কেবল শব্দ না করিয়া টেলিগ্রাম ইত্যাদির মত সঙ্কেতের দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে তাহা নহে। আমেরিকার টেরাডেল ফিউগো দ্বীপবাসীরা একস্থান হইতে অপর স্থানে সংবাদ পাঠাইতে হইলে পাহাড়ের উপর হইতে আলোক দ্বারা একরূপ সঙ্কেত করিয়া থাকে।

বেসটস (Basatas) নামে এক জাতির মধ্যে একরূপ বৃহৎ ঢাকের শব্দ করিয়া সংবাদ প্রেরণ করা হয় এই ঢক্কা নাদ প্রায় ৮ মাইল দূর হইতে শুনা যায়। মালাবারের আদাম নিবাসীদের মধ্যে আলোক দ্বারা সংবাদ পাঠাইবার রীতি আছে।

রাজার বকশিস্।

যখন আমরা কোন বন্ধুর বাড়ীতে অতিথি হই তখন আসিবার সময়ে তাহার চাকরবাকরদিগকে আমাদের সাধ্যানুসারে কিছু বকশিস্ দিয়া থাকি। ইংলণ্ডের রাজা যখন তাহার কোন প্রজার বাড়ীতে অতিথি হন তখন আসিবার সময়ে তাহার ভৃত্যদিগকে ১০০ শত পাউণ্ড অর্থাৎ নূন্যপক্ষে ১৫০০ হাজার টাকা বকশিস্ দিতে হয়। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এবিষয়ে বরাবরই মুক্তহস্ত ছিলেন তিনি সর্ব্বদাই ২।৪টি সভারিণ (স্বর্ণ মুদ্রা) সঙ্গে নিয়া বাহির হইতেন। কখন কেহ তাঁহার কিছু কাজ করিলে তাহাদিগকে ২।১টি দিতেন।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ একদা লণ্ডনের রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন একটি লোক দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন লাগাইতেছে। তিনি একখানা বিজ্ঞাপন চাহিলে ঐ লোক তাহার হস্তে

একখানা বিজ্ঞাপন দিল, তিনি উহার প্রতিদানে তাহার হাতে একখানা কাগজ দিলেন। ঐলোকটি যখন দেখিল যে ঐ ক্ষুদ্র কাগজখানা একখানা ৫০৲ টাকার নোট তখন তাহার প্রায় মূর্চ্ছা হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল।

যখন অপর লোকে বকশিস্ দেওয়ার জন্য অর্থ দিয়া থাকে তখন রাজা কিম্বা যুবরাজগণ অনেক সময়ে মণি মুক্তা কিম্বা স্বর্ণ নির্ম্মিত বস্তু উপহার দিয়া থাকেন। ষ্টেসন মাষ্টারদের অনেকেই এইরূপ উপহার গর্ব্বের সহিত পরিধান করিয়া থাকেন; বিলাতে সর্ব্বত্র ইহার নিদর্শন দেখা যায়।

খৃষ্টানদের দীক্ষিত হওয়ার সময়ে এক জনকে ধর্ম্মমাতা মাতা হইতে হয়। যখন কোন রাজকুমারী এরূপ ধর্ম্মমাতা হইয়া থাকেন তখন তিনি শিশুর ধাত্রীকে ৫০৲ টাকা বক্শিস দিয়া থাকেন।

কয়েদি বারিষ্টার।

মিঃ ই জে ডুগান (Mr E. J. Duggan) একজন পর্লিয়ামেণ্টের বারিষ্টার ও মেম্বার। তিনি সিনফিন, এজন্য পার্লামেণ্টের কার্য্য করিবার পূর্ব্বে যে শপথ গ্রহণ করিবার নিয়ম আছে তাহা তিনি করেন নাই। কিছুদিন হয় তাহাকে গেপ্তার করিয়া ডাবলিনের এক কারাগারে পাঠান হইয়াছিল। তাহার এক মক্কেলের বিচার পার্লিয়ামেণ্টে লর্ড সভায় হওয়ার কথা হয়। মিঃ হিলি (M. T· Hilly) যিনি ঐ মক্কেলের পক্ষে উপস্থিত হন তিনি ঐ মকেদ্দমা সম্বন্ধে তাহাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য মক্কেলের ভূতপূর্ব্ব বারিষ্টার মিঃ ডাগানকে লণ্ডনে আনিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হইলে বারিষ্টার হিলী তাহার সহিত পরামর্শ করিবার সময়ে হয় পার্লেমেণ্ট গৃহে কিম্বা ব্রিমটন (Brimton) কারা গৃহে যাইয়া করিতেন। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে মিঃ ডাগানকে কারা গৃহ হইতে পাহারা দিয়া পার্লামেণ্টে আনিতে হইত। দ্বিতীয় দিন হইতে তিনি পার্লামেণ্টের মেম্বর হিসাবে উক্ত মহা সভা গৃহে মেম্বরদের সহিত আহার করিবার অনুমতি পাইলেন। একদা তিনি তাহার একজন অতিথিকেও তথায় আহার করান।

অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের প্রবীন অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। তারাপদ বাবু কেবল অধ্যাপনায় সুদক্ষ ছিলেন এমন নহে, তিনি সুপণ্ডিত ও একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী ছিলেন। যে সকল কৃতী লেখক সৌরভে প্রথম বাণী-সাধনা আরম্ভ করিয়া পরিশেষে স্বীয় প্রতিভায় সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তারাপদ বাবু অন্যতম ছিলেন। তিনি সৌরভে প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমশঃ তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলি দ্বারা তিনি সমগ্র শিক্ষিত সমাজের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠেন। কতিপয় বৎসর যাবৎ তিনি বেদের আলোচনায় তৎপর ছিলেন; তাঁহার সেই গভীর আলোচনার ফল 'সৌরভ' ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রগুলিতে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইতেছিল। বেদ-সম্বন্ধে তিনি একখানা গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। সেই গ্রন্থের প্রথম ভাগের অর্দ্ধাংশ মুদ্রিত হইতে না হইতেই তিনি ইহধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আশাকরি তারাপদ বাবুর সুযোগ্য পুত্রগণ তাঁহার এই বহু তপঃসিদ্ধ অসমাপ্ত গ্রন্থখানার মুদ্রন কার্য্য সত্বরে শেষ করিতে পারিবেন।

এত বড় পাণ্ডিত্যের আধার হইয়াও তারাপদ বাবু বিনয়ের অবতার ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিল। আজ তারাপদ বাবুর ন্যায় সুলেখক ও হিতৈষী বন্ধু হারাইয়া আমরা অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছি। শ্রীঅঃ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

জর্ম্মনির বর্ত্তমান রাষ্ট্র নীতির-অভিব্যক্তি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা ৫৫ অপার চিৎপুর রোড্—আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

পুস্তকখানা মিঃ গুষ লিখিত ও সুপ্রসিদ্ধ Contemporary Review পত্রিকায় প্রকাশিত Evolution of German Statecraft নামক প্রবন্ধের অনুবাদ। ক্ষুদ্র জার্ম্মেনী কি প্রকারে বৃহৎ রাষ্ট্রে ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়া জগতের ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এই পুস্তকায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির পক্ষে তাহা লক্ষ্য ও অবগতির বিষয় সন্দেহ নাই। মূল প্রবন্ধটী যেমন হৃদয়গ্রাহী অনুবাদের ভাষাও তেমন সুন্দর ও সরল হইয়াছে।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, Dacca.

সৌরভ

নবম বর্ষ। মৈমনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩২৮। দশম সংখ্যা।

সাংখ্যদর্শন।

(১)

ভারতীয় ষড়দর্শনের অন্যতম, প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কোনপ্রকার নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করা সম্ভব পর কিনা তাহা এতদ্বিষয়ে লব্ধপ্রবেশ সুধীব্যক্তিদিগের নিকটই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। নতুবা শুধু "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্"; কেবলই কৃতশ্রমের অনুতাপ। হইতে পারে এ সকল তত্ত্ব কাহারও নিকট পুরাতন তথ্য, কাহারও বা নিকট নূতন পথ্য। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে কোন বিষয়েরই উপসংহারে পৌছান যায় না, অথচ সেই বিষয়ে নীরব থাকিয়া নিশ্চিন্তভাবে কাল যাপন করাও সমীচীন নহে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই অদ্য এই যৎকিঞ্চিৎ সন্দর্ভ সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি।

সাংখ্যদর্শনের অন্বর্থ ও অভিব্যক্তি।

নিরীশ্বর ও সেশ্বরভেদে সাংখ্যদর্শন দুই প্রকার। মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর এবং মহর্ষি পতঞ্জলি কৃত যোগদর্শন সেশ্বর। কাহারও মতে যোগশাস্ত্রের আদিবক্তা হিরণ্যগর্ভ; পতঞ্জলিমুনি তাঁহার অনুশাসকমাত্র। এই উভয়দর্শনই সাংখ্যনামে অভিহিত। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারে সাংখ্য বলিতে একমাত্র কপিলকৃত দর্শনকেই বুঝায়। ভারতীয় ছয় দর্শনের গণনাকালে পাতঞ্জল দর্শনকে স্বতন্ত্রভাবেই ধরা হয়। যথা (১) সাংখ্য (২) পাতঞ্জল, (৩) মীমাংসা, (৪) বেদান্ত, (৫) ন্যায় ও (৬) বৈশেষিক।

শব্দও বর্ণগত সাদৃশ্যদ্বারা সাংখ্য ও সংখ্যা এই দুইটী শব্দ অতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। সংখ্যাশব্দে সম্যক গণনা বা সম্যক কথন অর্থ বুঝায়। কেহ কেহ বলেন 'সংখ্যা' হইতেই "সাংখ্য' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যথা "সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।

তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

অর্থাৎ এই সাংখ্যদর্শন, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ এবং তদতিরিক্ত পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা বা গণনা করে। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা শব্দের অর্থ "সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে অনেন" ইতি সাংখ্যঃ অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান। যাহাদ্বারা সম্যক্ জ্ঞানের উপদেশ লাভ করা যায় তাহাই কপিল কৃত সাংখ্য। 'সম্যক্ জ্ঞান' এই পদের উল্লেখ আমরা ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত ৬৭ কারিকার প্রথম ভাগে দেখিতে পাই। যথা "সম্যক্ জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণতাপ্রাপ্তৌ ইত্যাদি।" "সম্যগ্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্।" ৭১। এই সম্যক্ জ্ঞান পদের সঙ্গে সাংখ্য শব্দের অর্থ-সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এমনও হইতে পারে যে সাংখ্য শব্দে সংখ্যা বুঝায় বা সম্যক্ জ্ঞান বুঝায়—এইযে যুক্তি, ইহা আমাদেরই স্বকপোলকল্পিত বা নিজের গড়া। এতদ্ভিন্ন অপর কোনও নিঃসন্দিগ্ধ বা নিশ্চয়াত্মক যুক্তি আর কি থাকিতে পারে যাহাদ্বারা আমরা এই শাস্ত্রকে সাংখ্য শব্দের সমন্বয়ী বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি।

উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও অপর কতিপয় প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থে জানা যায়—একসময়ে নানাবিধ ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মব্যাখ্যা একত্র একই সম্প্রদায়ে এলোমেলোভাবে প্রচারিত হইতে থাকে এবং কালক্রমে সেইগুলি সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; অথচ উহাদের মধ্যে ভূরি ভূরি মতপার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। সাংখ্য ও বেদান্ত উহাদেরই অন্তর্গত ধর্ম্মব্যাখ্যা বিশেষ।

সাংখ্য দর্শনের কতিপয় প্রচলিত গ্রন্থ।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের মূলগ্রন্থ এবং টীকা ও ভাষ্যাদির মধ্যে বর্ত্তমান সময় যে কয়খানি বিশেষ প্রচলিত তন্মধ্যে ঃ—

(১) কপিল কৃত—তত্ত্বসমাস বা দ্বাবিংশসূত্র
(২) যতি কৃত—তত্ত্বসমাস-ব্যাখ্যা
(৩) কপিল কৃত— ষড়ধ্যায়ী সূত্র বা সাংখ্য প্রবচন
(৪) ঐ গ্রন্থের বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত প্রবচন ভাষ্য
(৫) ঐ অনিরুদ্ধ ভট্ট কৃত বৃত্তি
(৬) ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত সাংখ্যসপ্ততি বা 'সাংখ্যকারিকা
(৭) ঐ গ্রন্থের বাচস্পতি মিশ্র কৃত তত্ত্বকৌমুদী
(৮) ঐ শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কৃত পূর্ণিমা
(৯) ঐ গৌড়পাদ ভাষ্য
(১০) বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত সাংখ্যসার
(১১) ঐ গ্রন্থের শ্রীরমেশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ প্রণীত সাংখ্যসারবিবেকপ্রদীপঃ
(১২) পতঞ্জলি প্রণীত (অথবা অনুশাসিত) যোগসূত্র বা পাতঞ্জলদর্শন
(১৩) ঐ গ্রন্থের ভোজরাজ কৃত বৃত্তি
(১৪) ঐ বেদব্যাস রচিত ব্যাসভাষ্য।
(১৫) ঐ বাচস্পতিমিশ্র কৃত তত্ত্ববৈশারদী (টীকা)
(১৬) ঐ বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত যোগবার্ত্তিক।

উল্লিখিত গ্রন্থ সমুদয়ের মধ্যে ১, ৩, ৬, ১০, ১২ এই কয়খানই মূল গ্রন্থ অপরগুলি ভাষ্য, টীকা ও টীকার টীকা।

ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যসূত্র কপিলের রচিত কিনা ?

তৃতীয় সংখ্যায় উক্ত, ষড়ধ্যায়ী সূত্র বা সাংখ্যপ্রবচন গ্রন্থখানা আদৌ কপিলের রচিত কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন ঐ পুস্তকের কিয়দংশ নহে সমগ্র ভাগই কৃত্রিম; অর্থাৎ মহর্ষি কপিল প্রণীত নহে। সেই অনুমানের প্রতি হেতু এই যে শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র বা তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও প্রামাণিক গ্রন্থকার ষড়ধ্যায়ী সূত্রের মতবাদ কুত্রাপি উল্লেখিত বা উদ্ধৃত করিয়া যান নাই। পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র ভারতীয় ছয়টী দর্শনেরই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহাকে ষড়দর্শনের টীকাকার বলা হয়। পরন্তু তিনি নিজেও তত্ত্ব কৌমুদীর সমাপ্তিসময়ে আপনাকে "ষড়্‌দর্শন টীকাকৃৎ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তদ্‌যথা—"ইতি ষড়্‌দর্শনটীকাকৃদ্বাচস্পতি-মিশ্র বিরচিতা সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী সমাপ্তা।" ইনি ঈশ্বর কৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যসপ্ততিকেই সাংখ্যদর্শন রূপে ধরিয়াছেন এবং ইহারই টীকা করিয়াছেন; সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় অপর কোনও পুস্তকের টীকা বা ভাষ্য রচনা করেন নাই। অতএব প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সাংখ্যসপ্ততি বা সাংখ্যকারিকাই প্রকৃত সাংখ্যদর্শন। ষড়ধ্যায়ী সূত্র কৃত্রিম, প্রামাণিক নহে; অতএব কপিল কৃতও নহে। আমাদের বক্তব্য এই যে ষড়ধ্যায়ী সূত্রের সমুদয় অংশকেই কৃত্রিম বলিয়া অবহেলা করা যায়না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টান্ত ও হেতু প্রভৃতির প্রদর্শনে প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ীকৃত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণের প্রামাণ্য মাত্র নহে। বাচস্পতি মিশ্র বা অপর কোনও প্রামাণিক গ্রন্থকার কুত্রাপি ষড়ধ্যায়ী সূত্রের উল্লেখ করেন নাই, এই হেতুতে ষড়ধ্যায়ীসূত্র কপিল কৃত নহে, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে গেলে তত্ত্বসমাস গ্রন্থে অব্যাপ্তি দোষ আপতিত হয় অর্থাৎ তত্ত্বসমাসও তাহা হইলে কপিলের রচিত নহে এমন কথা বলা যায়। যেহেতু "যতি" ভিন্ন শঙ্করাচার্য্য বা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অপর কোনও প্রামাণিক গ্রন্থকার উহার কোনরূপ টীকা বা ভাষ্য রচনা করেন নাই। এইস্থানে আরও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই যে প্রামাণিক গ্রন্থকারের সংজ্ঞা কি? কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে কেমন ব্যক্তি প্রামাণিক গ্রন্থকার আখ্যা ধারণ করিতে পারেন? একের ধারণায় যিনি প্রামাণিক, অপরের ধারণায় হয়ত তিনিই অপ্রামাণিক। সুতরাং এই সমস্ত স্থলে কোনও "সংজ্ঞার" না পৌঁছিলে কে প্রামাণিক কে অপ্রামাণিক তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের ত মনে হয় শঙ্করাচার্য্য ও বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় বিজ্ঞান ভিক্ষুরও যথেষ্ট প্রামাণিকতা আছে। অতএব যেহেতু স্বয়ং বিজ্ঞানভিক্ষু ষড়ধ্যায়ী সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন সেইহেতু ইহা প্রামাণিক এবং কপিলের রচিত। সম্পূর্ণ গ্রন্থ কপিলের রচিত না হইলেও কিয়দংশ যে কপিলের রচিত তাহাতে কোনও ভুল নাই।

প্রবচন ভাষ্যের প্রারম্ভে বিজ্ঞান ভিক্ষু একটী শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥"

অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্র কাল কবলিত প্রায়, অতএব আমি নিজের রচনা দ্বারা সেই বিনষ্টপ্রায় সাংখ্যকে পূর্ণ করিব।

অনেকানেক সমালোচক শুধু ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াই মোটা গলায় বলিতে চান যে ষড়ধ্যায়ী সূত্রের সকলই কৃত্রিম। তাঁহারা এতদতিরিক্ত কোনরূপ অনুসন্ধানদ্বারা পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রয়াসী নহেন। আমরা এইস্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব ষড়ধ্যায়ী সূত্রের সকল অংশই কৃত্রিম নহে; কতক অংশ কপিলের রচিত বা কপিলের স্বীয়মতের অভিব্যক্তি, কতক অপরের রচিত বা প্রক্ষিপ্ত এবং অধিকাংশই বিজ্ঞান ভিক্ষুর রচিত।

প্রাচীনকালে তেমন মহানুভব লোকের অসদ্ভাব ছিলনা, যাঁহারা নিজের নামটাকে বাহিরে গর্ব্বের সহিত জাহির করিতে বিশেষ সঙ্কোচ মনে করিতেন। তাদৃশ মহাত্মগণ নিজের রচনাপ্রণালী ও অনেক সময় "বে-নামী" প্রকাশ করিতেন। অহংজ্ঞানের পরিচায়ক 'অহন্তা' বা 'মম-তা' তাঁহাদের ছিলনা। ষড়ধ্যায়ী সূত্রের মধ্যেও যে তেমন কয়েক জন পণ্ডিতের রচনা প্রক্ষিপ্ত নাই, সে কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

ষড়ধ্যায়ি সাংখ্যসূত্রে প্রক্ষিপ্ত রচনা এবং পুনরুক্তি।

এই গ্রন্থের সর্ব্ব প্রথম সূত্র "অথ ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত-পুরুষার্থঃ।" গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে "অথ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া সেই অথ শব্দ কোন অর্থে প্রযুক্ত হইল সেই কৈফিয়ৎ নিজেই আবার অপরস্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছেন:—"মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি। ৫।১" এমন-ধারা কৈফিয়ৎ অন্যত্র কোথাও বড় দেখা যায়না। বিশেষতঃ অথ শব্দের প্রয়োগ করিলেন প্রথমাধ্যায়ে আর তার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—পঞ্চমাধ্যায়ে, অতএব একটু সন্দেহ আসেনা কি? সূত্রকার কোন্ অর্থে কোন্ সূত্র রচনা করিলেন তাহার ভাষ্য বা টীকা করেন অপর ব্যক্তি। অথবা তিনি নিজেই যদি সেই সূত্রের বা সূত্রান্তর্গত শব্দবিশেষের ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা একই অধিকরণে সন্নিবেশিত করেন; কখনও চারি পাঁচ অধ্যায় পরে নহে। আরও দেখুন—প্রথমাধ্যায়ের ২৫ সূত্রে "ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ" এই সূত্র বলিয়া পুনরায় পঞ্চমাধ্যায়ে সূত্র করিলেন—"ন ষট্পদার্থনিয়মস্তদ্বোধান্মুক্তি" ৮৫। এই একই প্রকারের সূত্র রচনায় কোনও গূঢ় অভিপ্রায় দেখা যায় না। হয় ইহাকে পুনরুক্তি, না হয় প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে।

প্রথমাধ্যায়ে "নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ।২০। বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ ২১। বিজাতীয় দ্বৈতাপত্তিশ্চ।২২। বিরুদ্ধো ভয়রূপা চেৎ। ২৩। ন তাদৃক্ পদার্থাপ্রতীতেঃ। ২৪।" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা অবিদ্যার বন্ধকারণত্ব নিরাকৃত করিয়া পুনরায় পঞ্চমাধ্যায়ে "নাবিদ্যাশক্তিযোগে নিঃসঙ্গস্য। ১৩। তদ্‌যোগে তৎ সিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্। ১৪।" ইত্যাদি—একপ্রকারের সূত্র রচনা পরিদৃষ্ট হয়। এক বিষয়ের বিচার একই অধিকরণে সমাপ্ত না করিয়া উপইষ্ট ব্যতিরেকে ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে আলোচনা করিলে সন্নাক্ষর মসন্দিগ্ধং সারবৎ গূঢ়নির্ণয়ম্" ইত্যাদি সূত্রের লক্ষণ ইহাতে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। "নাবিদ্যাশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য—এই সূত্রের তাৎপর্য্য-কালে বিজ্ঞান ভিক্ষু লিখিয়াছেন "নাবিদ্যাতো বন্ধ ইতি যৎ সিদ্ধান্তিতম্ প্রথমপাদে তত্র পরমতং বিস্তরতঃ প্রঘট্টকেন দূষয়তি।"

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই প্রঘট্টক কাহার রচিত? বিজ্ঞানভিক্ষু যে গ্রন্থের আদিতে লিখিয়া গিয়াছেন "ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ।" আমাদের বিশ্বাস, এই সমস্ত স্থানেই তাঁহার স্বকৃত পূরণ অর্থাৎ নিজের রচনা। অপরাপর স্থলে হয়ত অন্যের রচনাও থাকিতে পারে, ইনি শুধু তার টীকা করিয়াছেন মাত্র। মোট কথা পঞ্চমাধ্যায়ের অধিকাংশ সূত্রই মূল গ্রন্থকার ভিন্ন অপরাপর গ্রন্থকারের রচনা। বাহুল্য-বিধায় পঞ্চমাধ্যায়ের অপরাপর পুনরুক্তিগুলি উল্লেখিত হইল না। এখন হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুসন্ধানে তৎপর হওয়া যাউক।

ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রারম্ভে বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভনিতাটুকু পাঠ করিলেই স্পষ্ট ধারণা হয় যে এই অধ্যায়টী নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত অথবা পুনরুক্ততাদোষে দুষ্ট। তথাহি (তাই দেখুন) "অধ্যায়চতুষ্কেণ সমস্তশাস্ত্রার্থং প্রতিজ্ঞায় পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষ নিরাকরণেন প্রসাধ্য ইদানীং তস্যৈব সারভূতং শাস্ত্রার্থং ষষ্ঠাধ্যায়েন সঙ্কলয্য়ূপ সংহরতি। উক্তার্থানাংহি পুনস্তন্ত্রাখ্যে বিস্তারে কৃতে শিষ্যাণা মসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তো দৃঢ়তরো বোধ উৎপদ্যতে, ইত্যতঃ স্থূণানিখনন ন্যায়াদত্রক্ত যুক্ত্যাদ্যুপন্যাসাচ্চ নাত্র পৌনরুক্ত্যং দোষায়।" অর্থাৎ প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নিরূপণ করিয়া পঞ্চমধ্যায়ে বিপক্ষদলকে দলন করিয়া সম্প্রতি সেই সেই বিষয়ের সারভূত অর্থ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সঙ্কলন পূর্ব্বক গ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন। কথিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিলে (অর্থাৎ বলাকথা আবারও ছোট খাট করিয়া ফিরাইয়া বলিলে) ছাত্রদের সন্দেহভঞ্জন হয়, মিথ্যাজ্ঞান দুর হয় অথচ প্রতিপাদ্য বিষয়ে দৃঢ়তর ধারণা জন্মে। এইহেতু পুনরুক্তি দোষ গুলি দোষস্বরূপ হইতে পারেনা।

ইংরেজীতে এতাদৃশ অজুহাত্‌কে "লেম্ এক্সকিউজ" (Lame excuse) বা ব্যর্থ ওজর বলা হয়। "কষ্টকুরান্ন ইতি প্রশ্নস্যোত্তরণং যথ। ময়া ন ভুক্তা রম্ভেতি—"। "ঠাকুর ঘরে কেহে?" এই প্রশ্নের উত্তরে যেমন "আজ্ঞে আমি কলা খাইনা" এইরূপ উত্তর প্রবাদবাক্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে,—এইস্থলেও প্রায় তদ্রূপ। ষষ্ঠ অধ্যায়টী যে পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট ইহা বিজ্ঞানভিক্ষুর অবিদিত নহে; তথাপি তিনি গোড়াতেই সামলাইয়া নিতেছেন—"নাত্র পৌনরুক্ত্যং দোষায়।" বিশেষ বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন। স্বকীয় উক্তি সমর্থনের নিমিত্ত পুনরুক্তির স্থলগুলি উদ্ধৃত করিয়া না দেখাইলে আমাকে হয়ত অনুযোগভাগী হইতে হইবে অতএব আমি এই স্থলে বস্তসংক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া অতি অল্পই কয়েকটী মোটামোটা পুনরুক্তির উল্লেখ করিতেছি।

"জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্" ১ম অঃ, ১৪৯ সূত্র।

"পুরুষ বহুত্বং ব্যবস্থাতঃ" ৬ষ্ঠ অঃ, ৪৫ সূত্র।

গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ। ১। ৫১

গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপি উপাধিযোগাদ্‌-
-ভোগদেশকাললাভো ব্যোমবৎ। ৬। ৫৯

অধিকারি প্রভেদান্ন নিয়মঃ। ৩। ৭৬

অধিকারি ত্রৈবিধ্যান্ন নিয়ম। ৬। ২২

স্থিরসুখ মাসনম্। ৩। ৩৪।

স্থিরসুখ মাসনম্ ইতি ন নিয়মঃ। ৬। ২৪।

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ ৩। ৫৮

অন্ধুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্য উষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ ৬। ৪০

এই প্রকার আরও ভুরি ভুরি সূত্র উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহা প্রায় একার্থক বা সমার্থক। অতএব সন্দেহ হয়—উহা বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিতও হইতে পারে, কপিলের রচিতও হইতে পারে এবং অপরাপর বিভিন্ন লেখকের রচিতও হইতে পারে। এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ষড়ধ্যায়ীর সমুদয় সূত্র একই লেখকের লেখনী সম্ভূত নহে। কপিলের সূত্র যে ইহার মধ্যে একেবারেই নাই, তাহাও শপথ করিয়া বলা যায়না; যে হেতু কপিল কৃত তত্ত্বসমাসের তাৎপর্য্য অনুসারে এই গ্রন্থে উহারই বিবৃতি পরিলক্ষিত হয়। এইস্থানে তত্ত্বসমাসের সূত্রগুলি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম। মূল তত্ত্বসমাস দ্রষ্টব্য; উহাতে মোটেই বাবিংশতি সূত্র। আমাদেরতো মনে হয় এই তত্ত্বসমাস (সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপ, অতএব তত্ত্বসমাস অর্থে তত্ত্বসংক্ষেপ) অবলম্বনেই ঈশ্বর কৃষ্ণ তদীয় সাংখ্যকারিকায় সংক্ষেপের বিস্তার করিয়াছেন (১) এবং বিজ্ঞান ভিক্ষু তত্ত্বসমাস অবলম্বনে গ্রথিত কপিলের বিস্তৃত গ্রন্থাবয়কে ষড়ধ্যায়ী সূত্রনামে সংজ্ঞিত করিয়া স্বয়ং শাখাপল্লবিত করিয়াছেন (২)। অথচ সংশয় হয়—অপরাপর দার্শনিকের প্রক্ষিপ্ত সূত্রও উহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সাংখ্য কারিকায় অধ্যাহর্ত্তব্যস্থল।

এইক্ষণ সাংখ্য কারিকা বা সাংখ্যসপ্ততি বিষয়ক দুই একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। এই গ্রন্থের পঞ্চম কারিকায় ব্যক্ত হইয়াছে প্রমাণ তিন প্রকার। প্রত্যক্ষ,

(১) তথাপি আখ্যায়িকা-ভাগ এবং পরমত খণ্ডন বাদদিয়া তিনিও সংক্ষেপেই ইহা বিবৃত করিয়াছেন।

(২) ষড়ধ্যায়ীসূত্রে আখ্যায়িকা এবং পরমত খণ্ডন উভয়ই আছে।

অনুমান ও শব্দ। অনুমান পুনরায় ত্রিবিধ। কিন্তু এই ত্রিবিধ অনুমানের যে স্বরূপ কি তাহা না বলিয়াই ইনি ষষ্ঠ কারিকায় বলিলেন "সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে "সামান্যতো দৃষ্ট" একপ্রকার অনুমান। তথাপি অপর দুইপ্রকার অনুমানের বিবরণ উহ্যই রহিয়াগেল। টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু মূলপাঠে এই অধ্যাহর্ত্তব্য বিষয়ের উদ্ধার হইতে পারেনা।

৫০ কারিকায় বলা হইয়াছে আধ্যাত্মিকী তুষ্টি চারি প্রকার। প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য নামধেয়। বাহ্যা তুষ্টি পাঁচপ্রকার। অতএব সমুদায়ে নয়প্রকার তুষ্টি। আধ্যাত্মিকী তুষ্টি চারিপ্রকার উল্লেখ করিয়া উহাদের নাম করিলেন, কিন্তু বাহ্যা তুষ্টি পাঁচপ্রকার বলিয়া উহাদের নাম উল্লেখ করিলেননা। টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে মূল গ্রন্থে আমরা ঐ সকলের নাম প্রাপ্ত হইনা। নয়প্রকার তুষ্টি বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমরা টীকার সাহায্যে অতি সরল ভাষায় যাহা বুঝিয়াছি নিম্নে তাহা চিত্রাঙ্কনে (in table form) প্রদর্শিত হইল—

আধ্যাত্মিকী তুষ্টি	(১) প্রকৃতি	=	অম্ভঃ
	(২) উপাদান	=	সলিলম্
	(৩) কাল	=	মেঘঃ (অথবা ওঘঃ)
	(৪) ভাগ্য	=	বৃষ্টিঃ
বাহ্যা তুষ্টি	(১) অর্জ্জন	=	পার
	(২) রক্ষণ	=	সুপার
	(৩) ক্ষয়	=	পারপার
	(৪) ভোগ	=	রমাক
	(৫) হিংসাদি দোষ নিমিত্তক	=	সদা মুদিত

৪৬ কারিকায় "এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তি তুষ্টি সিদ্ধাখ্যঃ।" এবং ৪৭ কারিকায় "পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।" ইত্যাদিতে বিপর্য্যয় শব্দের উল্লেখ আছে এবং বিপর্য্যয়েরভেদ যে পাঁচপ্রকার তাহাও উক্ত হইয়াছে; কিন্তু সেই পাঁচপ্রকার যে কি কি তাহা কষ্টকল্পনা ব্যতিরেকে অধ্যাহার করা যায় না। বিপর্য্যয়ের মূল সংজ্ঞা না করিয়াই গ্রন্থকার বিপর্য্যয়ের অবান্তরভেদ বলিতেছেন "ভেদস্তমসোঽষ্টবিধঃ—" ইত্যাদি। খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা এই সমস্ত অবান্তর ভেদের মধ্যে বিপর্য্যয়ের অনুসন্ধান পাই। যথা—(১) তমঃ (২) মোহ (৩) মহামোহ (৪) তামিস্র (৫) অন্ধতামিস্র। ইহারাই অন্যত্র যথাক্রমে (১) অবিদ্যা (২) অস্মিতা (৩) রাগ (৪) দ্বেষ ও (৫) অভিনিবেশ নামে সংজ্ঞিত।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ।

কোকিলের কান্না।

(১)

ভাবলো কোকিল—মস্ত বড় একটি প্রবীণ বটের ছায়ায়,
জীবনটা তার সুখেই যাবে কেটে!
বুঝতে পেলো হঠাৎ একদিন একটা ভীষণ ঝড় বন্যায়,
গাছটি যেদিন পড়লো মাটি কেটে!
থাকতে আয়ু এমনি করে উপড়ে গেল শিকড় ছিঁড়ে,
ভাবতে গেলে চক্ষু আসে ভ'রে!
বাসার যত পক্ষিগুলির বক্ষ ভিজে চক্ষু জলে,
কোকিল এখন গাইবে কেমন ক'রে!
জম্বীরের ফুল গন্ধ ছড়ায়,
গাছে নূতন পাতা গজায়,
দখিন হাওয়া লাগছে মনোরম;
হৃদয় তবু দ্যায় না সাড়া,
সকল কাজেই ছাড়া ছাড়া,
এক নিমেষে টুটলো মনের ভ্রম!

(২)

কোকিল ছিল স্বাধীন বিহঙ্গম!
স্নেহের জালে পড়লো ধরা,
গায়না তো গান আকুল-করা,
এখন গানের সময় বড়ই কম!
নাই সে হৃদয় নাই সে জীবন, গভীর দুখের নাই অনুভব,
নাইরে তাহার একটু অবসর!
ঠোঁটের কাছে যা পাওয়া যা'য় তাহাই শুধু খুঁটে খুঁটে,
কষ্টে বাঁচায় কয়টি আপন-পর!
টিয়াগুলার খাঁচা দেখে কোকিলের খুব দুঃখ জাগে,
কারণ তাহার নাইরে তেমন খাঁচা!
ট্যা-ট্যা-করা টিয়ার চেয়ে কোকিল মোটেই তুচ্ছ নহে,
বাঁচতে চাহে বাঁচার মত বাঁচা!

(৩)

'রাধা কেষ্ট' মিষ্টি বুলি শিখাও যদি খেয়াল বশে,
শিখবে সুখে হাম-বড়া সব টিয়া;
স্বাধীন পাখী শেখা বুলি শিখতে মোটেই রাজী নহে,
থাকবে কোকিল নিজের 'কুহু' দিয়া।

বসন্তের সব অগ্রদূতের সর্ব্বযুগেই আদর বেশী,
একটু সুখে থাকার দাবী করে ;
দেখ্‌তে তারা নয় কদাকার, কুঁচ্‌-রঙা চোখ চমৎকার,
গানে তাদের কর্ণে সুধা ঝরে।
তাদের গানে বসন্তকাল,
সব ঋতুতেই থাকে বহাল,
সবার প্রাণে আনে সুখের স্মৃতি ;
দুর্দ্দিনে আজ করলে ঘৃণা,
বুঝবে শেষে কোকিল বিনা,
মিথ্যা স্নেহ মিথ্যা ধরার প্রীতি !

(৪)

কোকিল যাতে সুখেই থাকে নিতি—
একটু বিহিত হোকনা তাহার !
শুনবে তবে এই পাখিটার,
প্রাণ-মাতানো প্রাণের মধুর গীতি।
আমের বোলের আঘ্রাণে আজ হৃদয় কাঁদে উচ্চরবে,
আস্বাদ—সে পায়না মোটেই তার ;
ছিন্নকণ্ঠ এই কোকিলের তুচ্ছ অভাব কে পূরাবে ;
কে জুড়াবে প্রাণের হাহাকার !
থাক্‌তে চাহে টিয়ার চেয়ে মনের সুখে ভালখাঁচায়,
অসঙ্গত নয়তো তাহার দাবী !
কোকিল গুলার কাছে আছে নিখিল মনের রং মহালের,
চির-গোপন রহস্যের সেই চাবি !

(৫)

ক্রন্দনে যার ভাঙ্‌লো গলা সেই কোকিলই একলা আবার,
সুদিন পেলে সুখে দুদিন বাদে—
প্রাসাদ কুটীর আকাশ বাতাস সঙ্গীতে সে মুখর করি',
হাসির আবাদ করবে নির্ব্বিবাদে।
কোকিল শুধু কোকিল নহে, ঋতুরাজের মস্ত নকীব',
শুষ্কপ্রাণে রসের জোয়ার আনে ;
কান্না হতে হাসির পাশে, দুঃখ হতে সুখের দিকে,
মৃত্যু হতে বাঁচার পথে টানে।
বটের পাতার আব্‌ডালে সে,
গান গেয়েছে হেসে হেসে,
তাহার কিন্তু আদরছিল তবে;
আজ্‌কে নেহাৎ দাগা দিলে,
হা-হুতাশে এই নিখিলে,
হাজার কোকিল কাঁদবে 'কুহু'রবে !

(৬)

তাহার অভাব কে পুরাবে কবে !
চায়নি তো সে তেমন কিছু,
(ঘুরছে তবু আশার পিছু)
চাচ্ছে একটু বৃহৎ খাঁচা তবে !
সোনার খাঁচা চায়নাতো সে, সোনাকে সে তুচ্ছ ভাবে,
অসঙ্গত করবেনা সে দাবী !
যেজায় ছোট খাঁচার ভিতর হাওয়া আলোর অভাবে সে,
দিন যামিনী খাচ্ছে বিষম 'খাবি' !
এই দুনিয়ায় সুখ-সুবিধা তাদের বেশী হয়ে থাকে,
পিটায় যারা নিজের ডঙ্কা নিজে ;
তাদের ভাগ্যে দুঃখ শুধু, মরবে তারা পোকার মত,
চোখের জলে বক্ষ যাদের ভিজে !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি।

যথার্থ প্রাণপ্রদ যাহা, মানব দেহের পুষ্টির পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় যাহা তাহা যতই পুরাতন হউক না কেন, তাহার সংগ্রহ ও সংরক্ষণে আমরা কোনদিনই শিথিল-প্রযত্ন বা উদাসীন হইতে পারি না। আমাদের ভিতরকার যে স্বাভাবিক অভাববোধ তাহাই আমাদিগকে সেই নিত্যপ্রয়োজনীয় পুরাতন বস্তু'গুলির সংগ্রহের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। দন্তোদ্গম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে আমরা প্রথম অন্নগ্রাস মুখে তুলিয়াছিলাম, দিন ক্ষণ স্মরণ নাই—জীবনের কোন্ উদয়-উষায় তৃষ্ণার্ত্ত শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সেই যে প্রথম সলিল-বিন্দু পান করিলাম, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরমুহূর্ত্ত হইতেই নাসিকারন্ধ্রে সেই যে প্রথম চিরপ্রাণদ বায়ুরাশি গ্রহণ করিলাম, তদবধি জীবনের আজ কত কালইত কাটিয়া গেল—অন্ন জল ও বায়ু এসকল যতই পুরাতন হউকনা কেন, আমরা কোন দিনই বলিলাম না—না এসকলে আমাদের অরুচি বা অতৃপ্তি হইয়া গিয়াছে, এসকল দ্বারা আর আমাদের কি হইবে, আইস এ সকল পরিত্যাগ করিয়া নূতন যদি কিছু থাকে তাহাই অন্বেষণ করি। দেহের পক্ষে এই সকল চির পুরাতন বস্তুই যেমন নিত নূতনভাবে লভনীয়, মহতী কীর্ত্তি শ্রবণ ও স্মরণ সেইরূপ নিত্য প্রয়োজনীয়।

সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গিয়া প্রতিদিন আমরা কত প্রকার কলুষ-কালিমায় মলিন হইতেছি, কতপ্রকার হীন ও কদর্য্য বিষয় আমাদের চিত্তকে জীবনেরপক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ, যাহা প্রকৃত কল্যাণকর তাহা হইতে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে, আমাদের অন্তরদৃষ্টি আমরা হারাইয়া ফেলিতেছি, জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া বিনাশপাথারে ডুবিতেছি, এরূপ অবস্থা আত্মাকে সুস্থ-অবস্থা প্রদান করিতে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও সাধুসঙ্গের মত দ্বিতীয় আর কিছু নাই। মনুষ্যসমাজ যে একেবারে অধঃপাতিত হইতেছে না, তাহার কারণ উক্ত দুইটী অমোঘবস্তু তাহাদের অসামান্য প্রভাবে পাপের যে মহাবিনাশকারী-শক্তি তাহাকে সহজে মস্তক উত্তোলন করিতে দিতেছে না। এই সাধুসঙ্গের অসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করিয়াই আমাদের দেশের মহাজ্ঞানী শঙ্কর বলিয়াছিলেন—এই অকূল ভব-সমুদ্র যদি উত্তীর্ণ হইতে চাও, আর কিছু নয়, ক্ষণমাত্র সাধু-সঙ্গ কর। বঙ্গের অধুনাতন এক ভক্ত-কবিও গাহিয়াছেন "সাধু-সঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম, শ্রান্ত হলে তথায় লভিবে বিশ্রাম, পথ-ভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ সে পান্থ নিবাসীগণে।" মানুষ তাহার বিশ্রাম-সময় অনেক বৃথা আমোদে যাপন করিয়া আরও অধিকতর পরিশ্রান্ত ও ক্লিষ্ট হয়, পরন্ত সে যদি সে সময়টুকু সাধু-সঙ্গরূপ পান্থধামে আসিয়া কাটাইতে পারে তাহাতে তাহার কি অসীম কল্যাণ ও মহোপকারই না সাধিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও বহুদিন হইল পরলোকস্থ হইয়াছেন তাঁহাকে আমরা একেবারে হারাই নাই। স্থানের ও কালের ব্যবধানে তিনি আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে বলিয়া মনে হইতে পারে; বস্তুতঃ দেহে বর্ত্তমান থাকিতে দূরস্থ লোকদের পক্ষে তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করা যত কঠিন ছিল, আজ বিদেহী হওয়ায় তাঁহার বিরাট আত্মা সমস্ত দেশকালে ব্যাপ্ত হওয়াতে তিনি আমাদের অতি নিকটস্থ হইয়াছেন। বিদ্যাসাগরের অমর-আত্মা আমাদের এই সভা-ক্ষেত্রেই বিদ্যমান, আমরা যদি বিশ্বাস-নেত্রে তাঁহাকে এইখানে একবার দেখিতে চাই, ভক্তি-যোগে আমরা তাঁহার মধুময়স্মৃতি আলোচনা করি, দেখিব, তিনি আমাদের প্রতিজনের মনের মন্দিরে আমাদের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত।

কি সুমহান্ সমুন্নত চরিত্র তাঁহার! একদিকে করুণায় তাঁহার হৃদয় কিরূপ আর্দ্র, অপরদিকে সৎসঙ্কল্পসাধনে কি দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা ও অসীম অকুতোভয়তা। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" কবির এই যে মনোহারী উপমা তা তাহাতেই সুন্দররূপে প্রযুজ্য। দেহমনের সকলশক্তি কিভাবে বঙ্গজননীর সেবায় নিঃশেষ করিলেন, অজ্ঞান ও অধঃপতিত, নানাপ্রকার কুসংস্কার-জালে জড়িত এই বঙ্গীয়সমাজকে উদ্ধার করিবার জন্য কি পরিমাণ পরিশ্রম করিলেন, কি ছিলাম আর তাঁহার কল্যাণে আমরা কতদূর অগ্রসর হইলাম—নীরবে একসকল কথা যখন স্মরণ করি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চরণোদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইচ্ছা হয় কোটি রসনায় তাঁহার মহৎ গুণাবলী কীর্ত্তন করি। এই যে অমূল্য বিদ্যাসাগর জীবন—সর্ব্বজনের, বালবৃদ্ধযুবা,সংসারী ও সন্ন্যাসী, জ্ঞান-কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিপথাবলম্বীরই অনুকরণীয় জীবন। আমরা বাঙ্গালী, দারিদ্রের করালমূর্ত্তি আমরা আমাদের প্রতিগৃহেই দেখিতে পাই, এই দারিদ্র্যই আমাদের মাথার মুকুট—এই দারিদ্র্যই আমাদের পরম শিক্ষাদাতা, ইহার নিকট ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা সন্তোষ ও পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি কত সৎগুণ শিক্ষা করি। অভিশাপরূপে নয়, দেবতার প্রসাদরূপে নিত্য ইহা আমাদের গৃহে বিরাজিত থাকুক। এই দারিদ্র্য যে আমাদের উন্নতি পথের পরিপন্থী নয়, যে প্রকৃত উন্নতি-প্রয়াসী, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে সে যে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্নকে হেলায় অতিক্রম করিতে পারে বীরসিংহ গ্রামনিবাসী পরম দরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এই বিদ্যাসাগরই তাহার অত্যুজ্জল নিদর্শন। দাসত্ব-শৃঙ্খলে আমাদের হস্তপদ যখন বড়ই আবদ্ধ ছিল, অতি অকিঞ্চিৎকর ও অপদার্থ বলিয়া রাজপুরুষদিগের দ্বারা যখন আমরা বিবেচিত হইতাম, পরামুখাপেক্ষীতাই যে স্বরাজ ও স্বরাষ্ট্রলাভের একমাত্র উপায় নয় এই স্বাধীন-চেতা ব্যক্তিই তাহা প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "দশজনে পারে যাহা আমিও পারিব তাহা, আমাওতো জোর আছে গায়ে" আপনাতে এই আস্থা তাঁহাতেই

প্রথম মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকটিত হইয়াছিল। তাই তিনি মতের অনৈক্য হওয়ামাত্র এক নিমিষে পাঁচ শত টাকার সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসক-সম্প্রদায়ের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া আমাদের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই—ইহাই যখন সাধারণে বিশ্বাস ছিল, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বাঙ্গালী হৃদয়েও যে কি পরিমাণ তেজ ও শক্তি নিহিত আছে মেট্রপলিটন নামক বেসরকারী কলেজ স্থাপন করিয়া তিনিই তাহা প্রথম প্রতিপন্ন করিলেন। আজ তাঁহারই সেই অসম-সাহসিকতার ফলে, বঙ্গের জেলায় জেলায় স্বদেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত কত উচ্চ বিদ্যালয় আমরা দেখিতে পাইতেছি।

বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আমাদের জন্য যে সুরসাল অমৃতফল রাখিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা মিলে না। তাঁহার ভাষার মধ্যে কি সহজ সচ্ছন্দ গতি, কি অপূর্ব্ব রচনা ভঙ্গিমা, কি সুন্দর স্বচ্ছ বিশুদ্ধ ভাব! তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদি পাঠে ভাব ভাষা ও রুচি সকলি সুসংস্কৃত ও সুমার্জ্জিত হয়, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূরীকৃত হয়—আত্মা প্রাচীন জড়তা হইতে মুক্ত হইয়া সতেজ ও সমুন্নত হয়।

ভক্তিতে প্রেমেতে এমন কোমল ও সরস হৃদয় আর তো খুঁজিয়া পাই না। এই ভক্তি ও প্রেমই তাঁহার সকল উৎসাহ ও উদ্যমের প্রস্রবণস্বরূপ ছিল। এই দুইটি তাঁহাকে নানাপ্রকার কল্যানকর কার্য্যে নিয়োজিত রাখিয়াছিল। প্রেমেতে হৃদয় যাঁহার যত বিশাল, ভক্তিতে যাঁহার জীবন যত পবিত্র তিনিই মানব হিতে আপনাকে তত বিলাইয়া দিতে পারেন,—সকল সাধুজনের জীবনই এই শিক্ষা দেয়। বিদ্যাসাগরও তাহার সমুজ্জ্বল সাক্ষী। এমন পিতৃভক্ত এমন মাতৃগত প্রাণ সন্তান বুঝি দ্বিতীয় আর এ বঙ্গভূমে জন্মে নাই। যদিও তিনি নিরীশ্বর ছিলেন না, তিনি তাঁহার পিতামাতাকেই সাক্ষাত প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে পুজা করিতেন। একবার কোন ব্যক্তি গৃহের বিগ্রহ দেবতাকে দেখাইতে বলিলে বিদ্যাসাগর যাইয়া জীবন্ত প্রতিমা স্বরূপিনী অসীম স্নেহের আধার পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

তাঁহার প্রেম শতধা বিস্তৃত হইয়া কত অনাথ বালকের কত অনাথিনী রমণীর, নানাপ্রকার বিপদ ও অভাবে মুহ্যমান কত ব্যক্তির যে কত সহায়তা করিয়াছে, উচ্চ নীচ সাধু নরাধম নির্ব্বিশেষে কতজন তাঁহার কত যে করুণা লাভ করিয়াছে, পথপার্শ্বে পতিত মলমূত্রে অপরিচ্ছন্ন মুমূর্ষ কত পুরুষ ও রমণী যে তাঁহার সেবায় প্রাণ পাইয়াছে—মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরের সে সকল পুণ্য-কাহিনী কাহার না বিদিত আছে? নরকুলে এমন সব মানুষ কচিৎই জন্মগ্রহণ করেন, তাই না ইঁহাদিগকে বলে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

শ্রোতৃবর্গের অপ্রীতিকর হইলেও তাঁহার অনেক স্মৃতি সভায় তাঁহার যে কার্য্যটীর কোনই উল্লেখ হয় না, অথচ যাহাকে তিনি নিজে জীবনের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। যাহার জন্য তিনি তাঁহার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করিয়া শুধু যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ছিলেন তা নয় বহু ঋণ জালে পর্য্যন্ত আপনাকে জড়িত করিয়া ছিলেন, যে কার্য্যের জন্য দেশবাসীর নিকট সুযশও সুখ্যাতি পাওয়া দূরের কথা নানা প্রকার লাঞ্ছনা নির্য্যাতন বিদ্রুপ ও উপহাস ছাড়া প্রতিদানে আর কিছু পান নাই, অধিক কি যে কার্য্যের জন্য দেশাচারের দাস—তাঁহার আকৃতজ্ঞ স্বদেশ বাসী তাঁহার প্রাণ নাশেরও আয়োজন করিয়াছিল সেই কার্য্যটীর উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। সকলেই বুঝিতেছেন এটি তাঁর বাল বিধবাদের দুঃখ বিমোচন প্রচেষ্টা। পুরুষ ভোগ স্পৃহার বসবর্ত্তী হইয়া যখন বহুনারীর পাণিগ্রহণ করিয়া নারীকে সামান্য ক্রিড়নক রূপে ব্যবহার করিতেছিল, নারী যেখানে নিগৃহীত হয় নরক সেখানে অবতরণ করে, মনুর এ মহাবাক্য যখন সমাজ বিস্মৃত হইয়াছিল, অপর দিকে দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বালিকা কন্যা বিবাহ দিয়া বিবাহের পর দু'দিন যাইতে না যাইতে বিধবা হইলে জোর করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে বাধ্য করিতেছিল, এই নিদারুণ বৈষম্য ও অবলার প্রতি এই অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া বিদ্যাসাগরের কোমল প্রাণ তখন কাঁদিয়া উঠিল; তিনি আর স্থির থকিতে পারিলেন না, কি করিয়া সমাজের এই মহা-পাপ ক্ষালন করিতে পরা যায় তাহার জন্য আহার নিদ্রা

পরিত্যাগ করিলেন। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত; শুধু প্রমাণ করিয়া নয়, নিজ পুত্রকে বিধবার সহিত বিবাহ দিয়া দেখাইলেন, সুলভে সমাজ সংস্কারক নাম ক্রয় করা যায় না—বাক্যের সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার সাহস থাকা চাই।

অনেকে বিজ্ঞতার ভান করিয়া বলিয়া থাকেন, কালের প্রতীক্ষা কর, বৃথা লাঞ্ছনা গঞ্জনার পথে যাইয়া কি কাজ; এক দিন দেখিবে, কালের অপ্রতিহত প্রভাবে সমাজে সকল দুর্গতি নিরাকৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সমাজের খাঁটি হিতৈষী যাঁহারা, সমাজের ব্যাধি দেখিয়া যাঁহাদের প্রাণ যথার্থই কাঁদে, কালের প্রতীক্ষায় তাঁহারা বসিয়া থাকিতে পারেন না; বিপ্লবের পথ অবলম্বন করাই যুক্তি যুক্ত না ক্রম বিবর্ত্তনের মার্গই অনুসরণীয় এই বিচারের তাঁহাদের অবকাশ থাকে না। যাঁহারা সমাজের অকৃত্রিম সুহৃৎ তাঁহারা সময় সময় সমাজের কল্যানের জন্য বিপ্লবের পথই অবলম্বন করেন। সে জন্য তাঁহাদিগকে দেশ বৈরী বলিয়া মনে করা উচিত নহে। চির প্রচলিত প্রথা সমূহের দাস বঙ্গবাসী বিদ্যাসাগরের অন্তরের যে প্রকৃত ব্যথা তাহা অনুভব করিতে পারে নাই, তাই তাঁহারা তাঁহার এই কার্য্যের এত হতাদর করিয়াছিল। রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করিতে কালের প্রতীক্ষা করেন নাই, মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাঙ্গলায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে স্বীয় কন্যাদ্বয়কে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া সমাজ ও জাতির ভয় করেন নাই, বিদ্যাসাগরও হিন্দুবাল বিধবার বিবাহাশ্রু বিমোচনে কালের প্রতীক্ষা না করিয়া আপনার সকল সুখ সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বিধবা বিবাহ আন্দোলন রূপ কার্য্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের কষ্টিপাথর। এই ব্যাপারেই তাঁহার চরিত্রের মহত্ব অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। পুষ্পাকীর্ণ পথে, সম্মান, ও সহানুভূতির স্নিগ্ধ মারুত হিল্লোলে কার্য্য করিতে সকলেই সক্ষম, কিন্তু যাঁহারা অপমান লাঞ্ছনার বোঝা মাথায় বহিয়া নরহিতব্রতে আপনার যথা সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিতে পারেন, নরলোকে মনুষ্য দেহ ধারী হইলেও তাঁহারাই দেবতা, তাঁহারাই মনুজগণের যথার্থ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরাও তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকি।

বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত।

স্রোতের ফুল।

(২৫)

সন্ধ্যার পর সুশীল আসিলে প্রফুল্ল মাণিক্যের দেওয়া টাকা দশটী তাহার হাতে দিয়া বলিল—"বাবুর স্ত্রী আজ এই দশটী টাকা দিয়া আমাদের প্রস্তুত সকল জিনিষই তাঁহাদিগকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন।"

সুশীল বলিল—"টাকা রাখিলে কেন?"

প্রফুল্ল—"আমি রাঁখিতে চাই নাই, তিনি জোর করিয়া দিয়া গিয়াছেন, আপত্তি করিলে বলিলেন—অমনি দিয়া গেলাম।"

সুশীল—"রাখিয়া দাও।"

প্রফুল্ল বলিল—"বাবু কি জাত দাদা, ব্রাহ্মণ কি?

সুশীল—"না, ওরা কায়স্থ—ঘোষ বংশীয় কায়স্থ।"

প্রফুল্লর আগ্রহ বাড়িয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল "বাড়ী কোথায় তাঁদের?"

সুশীল বলিল—"ফরিদপুর।"

প্রফুল্লর আশার সূত্রটী মুহুর্ত্তের মধ্যে একটী কথার আঘাতে ছিন্ন হইয়া গেল। সে খানিক এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি কি কাজ করেন?"

সুশীল—"কাজ বেশী বড় কিছু করে না, তবে টাকা রোজগার করে বেশ; রোজ তিন, চার টাকা এমন কি সময় সময় তার চেয়ে বেশীও পায়। বরাত! সব বরাত! আমরা একত্র পড়তাম, এক সঙ্গে এক বাসায় থাকিতাম, সুতরাং পরেশ ঘোষের বিদ্যা বুদ্ধি সবই জানি। তবে, লোকটার অন্তঃকরণ খুব উচ্চ—প্রায় তার মাতুলের মতই।"

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল—"তাঁর মাতুল কি করেন?"

সুশীল বলিল "আমরা যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি, সেই মহাত্মাই পরেশের মাতুল। তিনি এখানে ওকালতি করেন।"

"তবে বাবু পৃথক বাসা করিয়া থাকেন কেন?"

সুশীল বলিল—"ক্ষমতা থাকিলে কে পর প্রত্যাশী হয়?

"এতদিন বুঝি তিনি মাতুলের বাসায়ই থাকিতেন?"

"আমি পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ ঢাকা আসিয়াছি, আমি আসিয়া পরেশকে তার মাতুলের বাসায়ই পাইয়াছি।

"তখন তিনি কি করিতেন ?"

"স্কুলে পড়িত।"

"আপনি ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে কোথায় পড়িতেন ?"

"গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়িতাম।"

পরেশের সম্বন্ধে প্রফুল্লর আরো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা সে করিতে সাহস পাইল না; ভয়, কি গ্লানি পাছে কোন্ কথার উত্তরে কোন কথা আসিয়া তাহার মনের কোন্ আশার পরদা অকস্মাৎ ছিন্ন করিয়া সকল কল্পনা উন্মূলিত করিয়া দেয়।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া প্রফুল্ল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি বুঝি তাঁর মামার বাসায় থাকিয়াই পড়িতেন ?"

"হাঁ।"

"বিবাহ নিজ বাড়ীতে গিয়া করিয়াছিলেন ?"

সুশীল এ প্রশ্নর উত্তর চিন্তা করিতে করিতে বলিল—"তুমি এইগুলি প্রস্তুত করিতে কোথায় শিখিয়াছিলে ?"

প্রফুল্ল বলিল—"মালঞ্চা খুব বাঁশ ও বেত হয়, সেখানেই শিখিয়াছিলাম।"

সুশীল হাসিয়া বলিল—"তোমাদের দেশেরতো কোন পরিচয়ই এ পর্য্যন্ত আমাকে দিলে না; সে কি মালঞ্চা না, আর কোথাও ?"

প্রফুল্ল মাথা নত করিয়া বলিল—"মালঞ্চায় আমিও সই এগুলি কত প্রস্তুত করিয়াছি!" প্রফুল্ল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সুশীল আজ ছাড়িল না, সে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার স্বামীর বাড়ী কোথায় প্রফুল্ল! বল তো তোমাকে তথায় রাখিয়া আসি; স্বামীর বাড়ী থাকিলে মালঞ্চা যাইবে কেন ?

প্রফুল্ল মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া চক্ষু মুছিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া সুশীল বলিল—"বলিলে সকল ব্যাপারেরই প্রতিকার হয়; একজনের দ্বারা না হয়, দশ জনের দ্বারা হয়। তুমি বল..."

প্রফুল্ল কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর বলিল—"দাদা আমার অদৃষ্টের প্রতিকার নাই—

প্রফুল্ল আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইয়া ফুঁকাইয়া কান্না আসিল—তারপর অস্ফুট কণ্ঠে সে কান্না জুড়িয়া দিল।

সুশীলের নিকট প্রফুল্ল তাহাদের গ্রামের বিবাহ সভার গোলমালের পর হইতেই একটী প্রহেলিকার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রফুল্লর নাম সুশীল প্রথম শুনিয়াছিল মন্মথের নিকট। মন্মথ প্রফুল্লকে সুশীলের নিকট বিবাহ দিবে বলিয়া সুশীলকে নিমন্ত্রণ করিয়া যমুনার বিবাহে লইয়া যায় এবং প্রকাশ্যভাবে প্রফুল্লকে তাহার সম্মুখে আনিয়া দেখাইয়া দেয়।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে যেমন কোন ছেলেই নিজের ভবিষ্যৎ কে ছোট দেখে না, সুশীলও তেমনি তাহার ভবিষ্যৎ কে খাট দেখিত না। পিতার মৃত্যুর পর সে তাহার বিধবা মাতার সাধ পূর্ণ করিবার জন্য একটী সুন্দরী সংসার কর্ম্মে নিপুনা পুত্রবধূ সংগ্রহ করিবার কল্পনা করিয়াছিল; সেই সময় সতীর্থ মন্মথ প্রফুল্লর রূপ ও গুণের কথা তাহার নিকট বিবৃত করিয়া বিনা পণে তাহার হস্তে প্রফুল্লকে তুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, তখন, সমাজে অকুলীন, জাতি-ভেদ-জ্ঞান-শূন্য ব্রাহ্ম স্বভাবী সুশীল ইহাকে বেশ লাভ জনক সম্বন্ধ বলিয়াই মনে করিয়াছিল এবং সেই জন্য সে ঢাকা হইতে দল বদ্ধ হইয়া মালঞ্চা যাইয়া প্রফুল্লকে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়াছিল। সে সময়ও রূপ-মুগ্ধ-যুবক সুশীল প্রফুল্লর কুলের পরিচয় সংগ্রহ করিতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, করা প্রয়োজনও মনে করে নাই।

ইহার পর অল্প দিনের মধ্যেই সুশীল তাহার নিজের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারে; তখন তাহার মন হইতে সকল কল্পনা দূর হইয়া যায়; স্কুলের পড়া চালাইবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া যখন সুশীল তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছিল, তখন ভট্টাচার্য্য বাড়ীর বিবাহের গোলমালে তাহার সহিত প্রফুল্লর দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ। এইবার প্রফুল্লর নিজ মুখ হইতে সুশীল শুনিল প্রফুল্লর বিবাহ হইয়াছে, তাহার স্বামী বর্ত্তমান।"

এই ঘটনার পরদিন সুশীল প্রফুল্লর মুখে তাহার সমস্ত কথা শুনিয়াছিল। কিন্তু শুনিতে পায়নাই—তাহার

স্বামীর নাম ও শ্বশুর বাড়ীর কোন কথা। সুশীল তাহার ভগিনী পূর্ণকে দিয়াও প্রফুল্লকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করাইয়াছে। তাহাতেও কোন কথা প্রকাশ পায় নাই।

পূর্ণর মুখে সুশীলের মা প্রফুল্লের কাহিনী শুনিয়াই তিনি তাহাকে আর গৃহে স্থান দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। সুশীলও প্রফুল্লর সহিতই যে তাহার বিবাহের আলাপ হইয়াছিল, তাহা আর এরূপ স্থলে প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করে নাই।

পূর্ণ ও তাহার মাতা প্রফুল্ল সম্বন্ধে যাহাই মনে করুণ না; এবং যেরূপ ভাবই পোষণ করুণ না কেন, সুশীলের মনে তাহা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

এইস্থলে সুশীলের সম্বন্ধে, একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। এই সময় ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের খুব উন্নত অবস্থা। সহরের একদিকে এক দল যেমনি উচ্ছৃঙ্খলভাবে পথ ভ্রষ্ট হইয়া চলিয়া ছিল, অপর দিকে অন্য দল ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে চরিত্রবান থাকিয়া অশেষ প্রলোভনের ভিতর দিয়া চলিয়াও নিজকে সৎপথে রক্ষা করিতেছিল। তাহারা মিথ্যা কথা বলিতনা, সৎকার্য্যে সাহসিকতা দেখাইত, আশ্রয় হীনা কে আশ্রয় দিয়া উন্নত জীবন যাপন করাইতে চেষ্টা করিত। সুশীল ছিল এই শ্রেণীর যুবক।

সুশীল পূর্ণ ও তাহার মাতার কথা ও মন্তব্যের উত্তরে বলিয়াছিল, আপনারা যাহাই বলুন, আমি ইহাকে এখনও কোন রকমের দোষনীয় ব্যাপারে লিপ্ত—বলিয়া মনে করিতে পার নাই; তবে ইহার অদৃষ্ট নিতান্ত খারাপ। যাহা হউক আমি উহাকে উদ্ধার করা ও আশ্রয় দেওয়া যখন কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তখন তোমরা ঘৃণাই কর, আর তাড়াইয়াই দেও, আমি তাহার আশ্রয় দিবই—তাহাকে মালদা পাঠইবার ব্যবস্থা করিবই; কিন্তু তাহাতে তো সময়ের দরকার।"

সুশীলের চরিত্র যেমন উচ্চ আদর্শের ছিল—ঠিক সেইরূপ উচ্চভাবেই সে প্রফুল্লকেও নিরীক্ষণ করিয়া ছিল। তাহার মা ও ভগিনী তাহার মনে নানা ভাব প্রবেশ করাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেও সুশীলের মন তাহাতে টলাইতে পারে নাই। সে প্রফুল্লকে কুচরিত্রা বলিয়া ক্ষণ কালের জন্যও মনে করে নাই। তাই সে তাহাকে তাহার ছোট ভগিনীর মত অত্যন্ত স্নেহ করিত এবং বড় ভগিনীর ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত।

সুশীল নৌকায়ও চেষ্টা করিয়াছে, বাসায়ও দুই এক দিন নানা কথা উপলক্ষ্যে প্রফুল্লর স্বামী সম্পর্কীত বিষয়ের তত্ত্ব লইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হইতে পারে নাই।

আজ সুশীলের প্রশ্নের উত্তরে প্রফুল্ল যখন কাঁদিয়া তাহার অন্তর্নিহিত গোপন ব্যথা প্রকাশ করিয়া দিল। তখন সুশীল মনে করিল—এইবার নিশ্চয় সকল কথা জানা যাইবে। এবং যেরূপেই হউক ইহার ব্যথা দূর করিতে হইবে। মানুষ সমাজের দাস, এমন পাষণ্ড কে আছে যে দশের অনুরোধ—ন্যায় সঙ্গত অনুরোধ—অগ্রাহ্য করিতে পারে?

সুশীলের মনে তখনই পরেশের চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আহা! পরেশের কেমন চরিত্র একটা গুরুতর দোষ-স্পর্শে কিরূপ কলুষিত হইয়া আছে—সমাজ তাহার কি করিতেছে—দশজনের আদেশ-অনুরোধ, ঘৃণা-নিন্দা তাহার কি করিতেছে? এমন পাষণ্ডতো সমাজের বক্ষে সগর্ব্বে উচ্চ শিরে দাঁড়াইয়া আছে।

সুশীল প্রফুল্লর অবস্থাও ঠিক এমনটাই অনুমান করিল; তারপর অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত বলিল— "দিদি চিরজীবন অল্পে অল্পে না কাঁদিয়া একদিন খুব কাঁদিয়া লও, তারপর সকল কথা আমার নিকট খুলিয়া বল—দেখি তোমার দুঃখ ঘুচাইতে পারি কি না?"

প্রফুল্ল চক্ষু জল মুছিয়া বলিল—"দাদা একদিন সবই বলিব—তোমার নিকটই বলিব। আমার আর এ সংসারে কেউ নাই—স্বামীও...„

প্রফুল্ল আর বলিতে পারিল না—তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। সে পুনরায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর তাহার নিকট লুকাইবার কিছু নাই—গোপন করিবার কিছু নাই, লজ্জাকরিবারও কিছু নাই। পাটির উপর গড়াইয়া পড়িয়া প্রফুল্ল সাধ মিটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরেশ বাহিরে গিয়াছিল। আঙ্গিনায় পা দিতেই প্রফুল্লর অস্ফুট রোদন ধ্বনি তাহার কাণে গেল। সে

খানিক দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল—তবে কি মাণিক্য তাহার প্রতি কোনরূপ রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে? পরেশ ডাকিল—"সুশীল ঘরে আছ কি?"

পরেশের ডাকে সুশীল বাহির হইয়া আসিল পরেশ জিজ্ঞাসুনেত্রে সুশীলের দিকে চাহিলে সুশীল বলিল—"ভাই, এ যাহারতাহার দুঃখের কান্না, মর্ম্মের বেদনা প্রকাশ' বোনটী বড়ই দুঃখী— সধবা হইয়া স্বামী সুখে বঞ্চিতা।'

সুশীলের স্বরও বেদনা প্লুত।

পরেশ উৰ্দ্ধদিকে চাহিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তার পর বলিল—"সে তো দুঃখেরই কথা—এমন গুণবতী মেয়েরও অদৃষ্টে এমন?"

সুশীল ভয় পাইতেছিল—কোন কথার উপর পরেশ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে নিরুত্তর করিয়া দেয়। সে বলিল—"তুমি যাও, ওকে আমি বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিতেছি। আজ আবার দশটী টাকা পাঠাইয়া দিলে কেন?"

পরেশ বলিল—"তাতে কি? চল কাল প্রাতে বাবুর বাজারে একটা ভাল ঘর দেখিয়া জিনিসগুলি অল্পে অল্পে নিয়া রাখা যাক, দেখা যাউক—কেমন চাহিদা। তুমি হইবে কিন্তু দোকানদার। আমার মনে হইতেছে—এ জন্মের লেজাই কাটাতে হইবে।"

সুশীল পরেশকে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া আসিল।

সুশীল স্থির করিয়াছিল, আজই প্রফুল্লর মুখ হইতে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে; তারপর তার প্রতিকার চেষ্টা। নিতান্তই প্রতিকারের যদি কোন উপায়ই না থাকে—তাহাকে ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে দিয়া তাহার জীবনকে উন্নতভাবে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা যাইবে।"

সুশীল জিজ্ঞাসা করিল "তোমার পিত্রালয় কোথায় প্রফুল্ল?"

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হরিণা।"

সুশীল—"সে কোন জেলায়।"

"সুধারাম। এখন সেই গ্রাম নাই, দৌলতখাঁর জল প্লাবনে ৬। ৭ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ভাসিয়া গিয়াছে।"

"তোমার পিতামাতা নাই?"

'বলিতে পারি না!' বলিয়া প্রফুল্ল পুনরায় কাঁদিবার সূচনা করিল।

সুশীল বলিল—"আগে উত্তর দাও। তোমার পিতার নাম কি?"

"গৌরমোহন চৌধুরী।"

"কি করিতেন তিনি?"

"কিছুই করিতেন না।"

"বাড়ীতেই থাকিতেন কি?"

"হাঁ, বাবা বাড়ীতেই থাকিতেন।"

সুশীল এ সকল কথা পূর্ব্বেই পূর্ণের নিকট হইতে শুনিয়াছিল, তথাপি পুনরায় নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইল। এইবার সুশীল নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিল—"বিবাহ হইয়াছিল বুঝি মালঙ্কায় আসিয়াই।"

প্রফুল্ল রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—'না; বিবাহের রাত্রেই আমাদের এই বিপদ ঘটে, বিবাহের রাত্রিই আমার কাল রাত্রি হইয়া আসিয়াছিল। রাত্রিতে যখন সমুদ্রের জল আসিয়া বাড়ী ঘর ভাসাইয়া লইল—তখন আর বাবাকে, মাকে কি স্বামীকে—কাহাকেও—

প্রফুল্ল আর কথা বলিতে পারিল না। গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুশীল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হায় বাল্য বিবাহ!"

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া সুশীল জিজ্ঞাসা করিল—"তবে মন্মথ আমাকে কেমন করিয়া বলিয়াছিল—তোমার বিবাহ হয় নাই?"

প্রফুল্ল নাক মুখ অঞ্চলে মুছিয়া বলিল—"বোধ হয় তিনি সে সকল কথা জানিতেন না; আমি কাহাকেও এ সকল কথা বলি নাই।"

সুশীল বলিল—"সময়ে বল নাই—"

প্রফুল্ল বলিল—পিতামাতার কথা বলিয়াছি, মালঙ্কা হইতে অনুসন্ধানও হইয়াছে; বাবাজীরাও দেশে দেশে অনুসন্ধান করিয়াছেন। বিবাহের কথা তখন বুঝিতে পারি নাই, যখন বুঝিয়াছি, তখন একমাত্র সইকে বলিয়াছি, আর আজ—বলিলাম—"

প্রফুল্ল পুনরায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সুশীল জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার স্বামীর নাম কি?"

প্রফুল্ল কাঁদিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না।

সুশীল বুঝিল, স্বামীর নাম স্ত্রীর লইতে নাই, তাই প্রফুল্ল বলিতেছে না। যাহা হউক, সময়ে তাহা জানা যাইবে।

সুশীল আহার করিতে চলিয়া গেল। সে আহার করিয়া সেখান হইতে থালায় করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন আনিলে প্রফুল্ল আহার করিবে।

(২৮)

অনেক রাত হইয়া যাওয়ায় সুশীল সেদিন আর তাহার শুইবার স্থানে যাইতে পারে নাই; পরেশের বৈঠকখানার ফরাসেই ঘুমাইয়াছিল।

ছাদের উপরে দুটী কোঠা, এক কোঠায় পরেশ ও মাণিক্য ঘুমাইত, আর এক কোঠার মেজে বিস্তৃত ফরাস—তাহাই বৈঠকখানা।

পরেশ প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিত। সে নিয়মিত সময়ে উঠিয়া আসিয়া সুশীলকে ডাকিয়া বলিল—"চল দেখি আজ কয়েকটা ঝাড়ুনী ও ডালি লইয়া দোকানদারদের নিকট যাচাই করিয়া দেখিয়া আসি।"

সুশীল বিছানা হইতে না উঠিয়াই বলিল—"ঘরে এস, এখনও দোকানপাট খুলিবার ঢের দেরী।

পরেশ আসিলে সুশীল বলিল—"বস, একটা কথা আছে।"

পরেশ সুশীলের নিকট বসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা?"

সুশীল—"প্রফুল্লকে তুমি আমার বোন বলিয়া মনে করিয়াছ, আমিও তাহাকে সেইভাবেই তোমার নিকট পরিচিত করিয়াছি; বাস্তবিক কিন্তু ভাই সে আমার মার পেটের বোন নহে। কিন্তু তার স্বভাবে আমি তাহাকে আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অপেক্ষাও অধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকি। তাহার ইতিহাস বড় করুণ—বড় মর্ম্মান্তিক!"

পরেশ খুব আগ্রহের সহিত বলিল—"তাই নাকি! সে কেমন, বল দেখি?"

সুশীল বলিল—"প্রফুল্ল স্রোতের তৃণ! স্রোতে ভাসা তৃণ খণ্ডের মত সে এ কুল হইতে সে কুলে, সে কুল হইতে এ কুলে ভাসিয়া চলিয়াছে; তাহার কেহ নাই—গৃহ নাই, পিতা নাই, মাতা নাই, স্বামী নাই—নাই বলিতে—আত্মীয় বলবার মত কেহই নাই; কেহ আছে কি না, তেমন কাহারও কথাও সে জানে না।"

পরেশ সুশীলের দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া পূর্ণ সহানুভূতির সহিত বলিল—"অচ্ছা—বাড়ী কোথায় ছিল তার, তা কি সে জানে? আর তুমিই বা তাহাকে পাইলে কেমন করিয়া?"

সুশীল—"এর পিত্রালয় ছিল নোয়াখালী জেলায় হরিণা গ্রামে; সে গ্রাম দৌলতখাঁর সেই ভীষণ জল প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে—মেয়েটা কোন মতে রক্ষা পাইয়াছিল—তার..."

পরেশ অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"পিতার নাম জানা আছে কি?"

সুশীল বলিল—"তার বাবার নাম গৌরমোহন চৌধুরী।"

পরেশের মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। সে উঠিয়া গিয়া জানালাটা খুলিয়া দিয়া আসিয়া বসিয়া বেশ স্বাভাবিক স্বরে বলিল—"যাক্, একটা ঠিকানা যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন এর কিনারা অবশ্যই হইবে।"

পরেশের ঘটনা শুনিবার যেন আর বিশেষ কৌতূহল নাই দেখিয়া সুশীল নিজ হইতেই বলিল—"আসল কথাই তোমাকে বলি নাই ভাই, প্রফুল্লর বিবাহের রাত্রিতেই সেই প্লাবন হইয়াছিল, তারপর হইতেই মেয়েটা ভাসিয়াছে—কিন্তু ভাই, মেয়ের স্বভাব কি...?"

পরেশ কোন কথাই বলিল না বটে—কিন্তু তাহার সমস্ত প্রাণের পিপাসা যেন মূক হইয়া থাকিয়া সুশীলের নিকট হইতে প্রফুল্লর সমস্ত কাহিনী শুনিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। পরেশের আগ্রহ নাই দেখিয়া সুশীল থামিয়া গিয়াছিল। অথচ পরেশের মনের ভিতর অনন্ত প্রশ্ন। সে প্রশ্ন সে কিছুতেই সুশীলের নিকট আগ্রহ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফরাসের উপর পায়চারি করিতে করিতে মনে মনে যেন তাহার সে সকল মানসিক প্রশ্নের সমাধান করিয়া লইল।

সুশীল শয্যা ছাড়িয়া উঠিলে পরেশ বলিল—আমি কি এ সম্বন্ধে প্রফুল্লকে দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারি ?"

সুশীল কাপড় পরিতে পরিতে বলিল—"নিশ্চয় পার ; সে আমারও যেমন, তোমারও তেমন—"

পরেশ—"সে কিন্তু তোমার অসাক্ষাতে করিব।"

সুশীল—"আমার অসাক্ষাতে সে তোমার সহিত হয়তো শব্দই করিবে না, সে এমন মেয়েই নয় !"

পরেশ—"তাতে আমার মোটেই অসম্মান বা অপমানের ভয় নাই।"

সুশীল—"তবে জিজ্ঞাসা করিও।"

হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া সুশীল বলিল—"চল তবে সিদ্ধিদাতার নাম লইয়া ব্যবসায় পত্তনের জন্য যাত্রাকরা যাউক।"

পরেশ বলিল—"চল।"

মাণিক্যের তখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। পরেশ জুতা কাপড় লইয়া বাহির হইয়া আসিল সুশীল রাস্তা হইতে কুলী ডাকিয়া লইয়া—ডালা, সের, কাঠা, ঝাড়ু, পাখা প্রভৃতি কতকগুলি তাহার মাথায় চাপাইয়া দুইজনেই বাহির হইয়া পড়িল।

সুশীল ও পরেশকে বাবুর বাজার পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। পথেই জিনিষগুলি বিক্রয় হইয়া গেল।

তাহারা উভয়েই দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় বাঁশ ও বেত ক্রয় করিয়া সেই কুলীরই মাথায় চাপাইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিল।

বাসায় আসিতে আসিতে পরেশ বলিল—"প্রফুল্লর কাহিনী অতি শোচনীয়, স্বামীর খোজ পাওয়া গেলেও সে যদি এখন তাহাকে গ্রহণ না করে ?"

সুশীল গম্ভীরভাবে বলিল—"কি বল তুমি ? এমন মেয়ে সংসারে হয় না ভাই, তার স্বভাব-চরিত্র দেখিলে তুমি বুঝিতে পারিবে—যেন অগ্নির সংস্পর্শে বাস করিতেছ। পিতা মাতা স্বামী হারা হইয়াও সে তাহার চরিত্রের আদর্শ এমন উচ্চভাবে স্থির রাখিয়াছে যে জানিতে পারিলে অতি বড় পাপীর মাথাও তাহার নিকট সম্ভ্রমে নত হইয়া যাইবে।"

পরেশ বলিল—"তবু বলিতেছি, যদি তার স্বামীকে না পাওয়া যায়, অথবা পাওয়া গেলেও স্বামী তার তারে গ্রহণ না করেন—সকলেরই বিচার বুদ্ধিতো সমান নহে—কি ব্যবস্থা করিবে তখন ? চিরজীবন তুমি এই মেয়েটাকে আগুলিয়া লইয়া বসিয়া থাকিবে কি ?"

"সে চিন্তাও আমি করিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে দিয়া তাহার সাধুজীবন যাপনেরই সহায়তা করিব মনে করিয়াছি।" বলিয়া সুশীল পরেশের মুখের দিকে চাহিল।

পরেশ—"সে সম্বন্ধে প্রফুল্লর মত জানিয়াছ কি ?"

"আমার এ সকল চিন্তা তাহাকে কিছুই জানাই নাই; কালই সবে মাত্র তাহার সম্বন্ধে ঠিক তত্ত্ব আমি জানিতে পারিয়াছি।"

পরেশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—"মোটেকাল।"

বিবি খোদেজা (রাঃ)।

বিবি খোদেজা (রাঃ) খোবেলাদের ঔরসে কোরেসী বংশে মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খোবেলাদ বহু ধন সম্পত্তি এবং একমাত্র দুহিতা বিবি খোদেজাকে (রাঃ) রাখিয়া পরলোক গমণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর বিবি খোদেজা (রাঃ) অতুল ধন সম্পত্তির অধিকারিণী হন। বিবি খোদেজা (রাঃ) যেমন ধনবতী ছিলেন, তেমনই রূপবতী ছিলেন। আবুহালা তামিমি নামক এক ব্যক্তি বিবি খোদেজাকে (রাঃ) বিবাহ করেন। আবুহালা তমিমি, আরবের একজন বড় ধনী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত ধনই বিবাহের সময় বিবি খোদেজাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। আবুহালা তমিমির' ঔরসে বিবি খোদেজার (রাঃ) গর্ভে হালা ও হেন্দা নামক দুইটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। কিছুকাল পরেই আবুহাল তমিমি ও তাঁহার পুত্রদ্বয় পরলোক গমন করেন। তৎপর আর একজন ধনবান, আবেদের পুত্র অমুক নামক,এক ব্যক্তি বিবি খোদেজাকে (রাঃ) দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁহার ঔরসে' মাত্র একটী কন্যা সন্তান জন্মে। কিছুকাল পর অমুক ও তাঁহার কন্যার মৃত্যু হয়।

ইহার পর হইতেই বিবি খোদেজা (রাঃ) অতুল ধনাধিকারিণী হইয়া বৈধব্য ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। বৈধব্য ব্রত-কাল অতীত হইলে, তিনি দেশ দেশান্তরে বানিজ্য ব্যবসা আরম্ভ করাইলেন ; আরবেরও বহু ব্যবসায়ী লোক তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইয়া বানিজ্য ব্যবসা করিতে লাগিলেন। এছাড়া তাঁহার অনেক মেষ পালও ছিল। বিবি খোদেজা (রাঃ) সদা সর্ব্বদা তৌরাত (তর্কশাস্ত্র) কেতাব পাঠ করিতেন, যাহা হজরত মুশা কলিমুল্লার (আঃ) উপর প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বোধ হয় বিবি খোদেজা (রাঃ) হজরত মুসার (আঃ) ধর্ম্মে দীক্ষিতা ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই বিবি খোদেজার (রাঃ) ধনৈশ্বর্য্যের এবং সাধ্বি তার সংবাদ আরব ময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। অনেক বাদসাহ ও বড়লোক তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্ম উকিল (ঘটক) পাঠাইতে লাগিলেন কিন্তু তিনি কাহারও প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন না। এক দিবস রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে আকাশ হইতে চন্দ্র আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে এবং সেই চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়াই তিনি বাকি রাত্রি ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাটাইলেন। প্রাতে নজ্জুম (গণক) ডাকাইয়া স্বপ্ন বিবরণ বিবৃত করিয়া তাহার ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। নজ্জুমগণ বলিলেন যে মক্কা নগরীতে কোরেশ বংশে শেষ পয়গম্বর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই আপনার দেহ তরীর কর্ণধার হইবেন। তাঁহা দ্বারাই আপনার পর কালে মুক্তি হইবে। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীতেই প্রচারিত হইবে। মানব এবং জিন সকলেই সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। খোদেজা বিবি (রাঃ) এই সংবাদ শুনিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার আগমনের আশায় বুক বাঁধিয়া রহিলেন।

একদা হজরত মহম্মদের (দঃ) পিতৃষসা আতকা বিবি তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেবের সহিত পরামর্শ করিয়া হজরত মহম্মদকে (দঃ) বিবি খোদেজার (রাঃ) নিকট চাকর নিযুক্ত করিবার জন্ম খোদেজা বিবির (রাঃ) বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। খোদেজা (রাঃ) তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আদর অভ্যর্থনা করিয়া ভোজন করাইলেন এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় আতকা বিবি বলিতে লাগিলেন—মাতৃ পিতৃ হীন আমার এক গরীব ভ্রাতুষ্পুত্র আছে ; তাঁহার নাম মহম্মদ (দঃ) তাঁহাকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া কোন একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করুণ। ইহা শুনিয়া বিবি খোদেজার (রাঃ) স্বপ্ন বিবরণ মনে হইল এবং আগ্রহের সহিত আতকা বিবিকে বলিলেন, আমি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে স্বচক্ষে দেখিয়া, যে কার্য্যের উপযুক্ত মনে করিব ; সেই কার্য্যেই নিযুক্ত করিব।

আতকা বিবি বাড়ীত ফিরিয়া আসিয়া আবু তালেবকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া হজরত মহম্মদকে (দঃ) সঙ্গে লইয়া বিবি খোদেজার (রাঃ) বাড়ীতে গেলেন, তখন খাদেজা বিবি (রাঃ) বালা খানায় থাকিয়া দেখিতে পাইলেন যেন হজরত মহম্মদের (দঃ) মাথার উপর মেঘ সকল ছায়া বিস্তার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে এবং দুই পার্শ্বের, বৃক্ষ সকল শাখানত করিয়া তাহাকে প্রণাম করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে জ্ঞান করিলেন যে ইনিই শেষ পয়গম্বর হইবেন। তৌরাত কিতাবে শেষ পয়গম্বরের যে যে লক্ষণ পড়িয়াছিলেন ; তাহা ও তাঁহাতে দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়াই তিনি সম্মানের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গিনীগণ, হজরত মহম্মদকে (দঃ) এরূপে সম্মান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। খোদেজা বিবি (রা) বলিলেন, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই কে যেন আমার হাত ধরিয়া আমাকে দাঁড়া করাইয়াছে। ইহা বলিয়াই বিবি খোদেজা (রা) মনে করিলেন যে তিনি হজরতের পায়ে ধরিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিবেন কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে সে পথ হইতে ফিরাইল। তখন বিবি খোদেজা (রা) ভক্তি ভরে বিনয়, নম্র বচনে হজরতকে বলিলেন, আমি আপনাকে মেষ পালক নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনি এই কার্য্যে বিশেষ রূপ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন তাহাহইলে আপনাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিব। হজরত মেষ পালকের কার্য্য গ্রহণ করিতেই স্বীকার করিলেন। এই কার্য্যে তিনি এরূপ উন্নতি দেখাইলেন যে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার রক্ষিত

মেষ সকল হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠিল এবং সংখ্যায় প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধিপাইল এবং আশাতিরিক্ত দুগ্ধও দান করিতে লাগিল।

কিছু কাল পরে বিবি খোদেজা (রাঃ) দ্বিগুণ বেতনে হজরত মহম্মদ (দঃ) কে বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত করিলেন। নির্জ্জন কান্তার পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য-কোলাহলে যাইতে মহম্মদের (দঃ) অভিপ্রায় ছিলনা কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেবের অনুরোধে ও খোদেজার (রাঃ) আকিঞ্চনে তিনি বণিক বৃত্তি অবলম্ব করিলেন। বাণিজ্য ব্যাপারেও তাঁহার প্রতিভা প্রকাশিত হইল। বসোরা, আলেপ্পো, দামাস্কস প্রভৃতি নগরে খোদেজার (রাঃ) আয় তিনি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তুলিলেন।

মহম্মদ (দঃ) সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বাগ্রে বিবি খোদেজাকে (রাঃ) লাভের সংবাদ দিতে গমন করিলেন। খোদেজা (রা) ইহার পূর্ব্বে কখনও মহম্মদ কে (দঃ) এরূপ নিকটে ও স্পষ্টভাবে আর দেখেন নাই। তাঁহার সাধুতার কথা মক্কার আবাল, বৃদ্ধ বানিতা অবগত ছিল, তাঁহার সাধুতার জন্য খোদেজা (রাঃ) পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, এখন তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার ভ্রমর কৃষ্ণ কেশ গুচ্ছ, প্রশান্ত ললাট, সুদীর্ঘ ও সূক্ষ্ম ভ্রূযুগল, নম্রতা ও মধুরভাবব্যঞ্জক নয়ন দ্বয় সুউচ্চ নাসিকা, নাতি দীর্ঘ উজ্জ্বল বপু ও সুকুমল গঠন দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য খোদেজার (রাঃ) হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহম্মদ (দঃ) বাণিজ্যের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, খোদেজা (রা) অনিমেষ লোচনে তাঁহার রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন।

খোদেজা (রাঃ) মহম্মদকে (দঃ) বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করিয়া পুনরায় তাঁহাকে দক্ষিণ দেশে বাণিজ্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। এ বারও মহম্মদের (দঃ) কার্য্যকুশলতায় বাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভ দাঁড়াইল। মহম্মদ (দঃ) ক্রমগত তিন বৎসর কাল খোদেজার (রাঃ) কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। খোদেজা (রাঃ) তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। তিনি মহম্মদের (দঃ) মনের ভাব অবগত হইবার জন্য পরি চারিকা মৈশারাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

মৈশারা মহম্মদকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিল "আপনার বিবাহের উপযুক্ত বয়স' হইয়াছে ; আপনি কি বিবাহ করিতে চান না?"

মহম্মদ (দঃ) বলিলেন "স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করার' যাহার ক্ষমতা নাই, তাহার কি বিবাহ করা উচিত?"

মৈশারা বলিল 'যদি কোন সৎকুল সম্ভূত ধনবতী রমণী আপনার অনুরাগিণী হন, তবে কি আপনার বিবাহ করিতে আপত্তি আছে?" মহম্মদ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন "সে রমণী কে?" মৈশারা বলিল "খোদেজা (রা)।" মহম্মদ (দঃ) একথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন ইহা কি সম্ভব? মৈশারা এই বিবাহ সংঘটন করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বিদায় লইলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে খোদেজার (রাঃ) সহিত মহম্মদের (দঃ) সাক্ষাৎ হইল। এখন আর সে প্রভু ভৃত্যের ভাব নাই। প্রেমিক যুগল চঞ্চল নেত্রে উভয়ের পানে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া দেখিলেন, কথায় তাঁহাদের প্রেম প্রকাশ করিতে হইল না।

খোদেজার (রাঃ) চল্লিশ বৎসর পার হইয়াছে ; যৌবনের সে উত্তেজনা নাই, তথাপি যৌবন সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় নাই। লজ্জা আসিয়া তাঁহার গণ্ডদেশ রক্তাভ করিয়া তুলিল। তিনি মহম্মদকে (দঃ) মনের কথা বলি বেন কি, চক্ষু তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিতেও পারিলেন না। মহম্মদ (দঃ) ও কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিলেন, বাক্যাতীত ভাষায় উভয়ে বহুক্ষণ প্রেমালাপ করিয়া উভয়ে উভয়ের মনের ভাব অবগত হইয়া চলিয়াগেলেন। খোদেজা (রাঃ) এই বিবাহে আপনার ও মহম্মদের (দঃ) আত্মীয় স্বজনের সম্মতি গ্রহণ করিবার জন্য এক ভোজে সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তথায় আবু তালেব ও খোদেজার (রা) আত্মীয় বরকা বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। যথা সময়ে শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

মহম্মদ (দঃ) ও খোদেজার (রাঃ) বিবাহ মণি-কাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল। খোদেজা (রাঃ) প্রখর বুদ্ধি সম্পন্না, উদার হৃদয়া, সরল প্রাণা, ও গুণ গ্রাহিণী রমণী

ছিলেন। মহম্মদের (দঃ) গম্ভীর ও চিন্তাশীল চরিত্র তাঁহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। স্বামী ও স্ত্রী উভয় উভয়ে লীন হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রেম পবিত্রতা, বিনয় ও শান্তি তাঁহাদের সংসারে বিরাজ করিতে লাগিল।

মহম্মদ (দঃ) গরীব, খোদেজা (রাঃ) অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারীণী। সমৃদ্ধি শালিনী রমণীর গরীব স্বামী এসংসারে অহরহ লাঞ্ছিত ও অপমানিতই হইয়া থাকেন; কিন্তু খোদেজা (রাঃ) স্বামী প্রেম আত্ম-হারা হইয়া সম্পত্তি কোন ছার, জীবন মন অর্পণ করিয়া তাহাতে মিশিয়া গেলেন। ক্রমে খোদেজার (রাঃ) গর্ভে, মহম্মদের (দঃ) দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। জেষ্ঠ পুত্র কাশিম দুইবর্ষ বয়সে এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র আবদাল্লা শৈশবেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। জয়নাব, রোকেয়া, ওম্মে কুলসুম ও জগত জননী ফাতেমা জহুরা (রাঃ) নামক কন্যা চতুষ্টয়া পিতা, মাতার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল।

মৃত্যু কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। কাল পূর্ণহইলে সকলেরই কালের করাল কবলে পতিত হইতে হইবে। খোদেজা (রাঃ) আমাদের পরকালের ভরসা হজরত মহম্মদের (দঃ) দগ্ধ হৃদয়ের অবলেপ, দুঃখের শান্তি বারি, সন্দেহ-বিষ জর্জ্জরিত প্রাণের আরাম ছিলেন; সমস্ত মক্কানগরী যখন তাঁহাকে পাগল, ভূতগ্রস্ত, মৃগী রোগা-ক্রান্ত বলিয়া উপহাস করিত, সেই দুঃসময়ে তিনি এক-মাত্র তাঁহার স্বর্গীয় ভাব বুঝিতে সমর্থা হইরাছিলেন। মক্কাবাসীর অত্যাচার, উৎপীড়ন, রক্ত পাতের মধ্যে মহম্মদ (দঃ) যে খোদেজার (রাঃ) ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া দগ্ধ প্রাণ শীতল করিতেন এবং হাস্য মুখের আশার বাণী শ্রবণ করিয়া, লোক গঞ্জনা অগ্রাহ্য করিয়া, একমাত্র ঈশ্বর নাম প্রচার করিতেন, সেই খোদেজাবিবি (রাঃ) পঞ্চবিংশতি বর্ষ কাল মহম্মদের (দঃ) সহবাসে পরম সুখে যাপন করিয়া, পঞ্চষট্টি বৎসর বয়সে প্রাণের আরাম, দুজাহানের রক্ষা কর্ত্তা মহম্মদকে (দঃ) অকুল সাগরে ভাসাইয়া, ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া, অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন।

শ্রীআবদুররহিম খান পাঠান।

বাদ্‌লা দিনে।

আজ প্রভাতে বাদল ধোওয়া
বনের ধারে ধারে,
হৃদয় আমার উধাও হয়ে
ঘুর্‌ছে বারে বারে!
উঠছে কেঁপে গহন লতা,
ফুটচে কতই ব্যাকুলতা,
কইচে যে কোন্ গোপন-কথা
দাঁড়িয়ে সারে সারে!
পরাণে সেই নীরব-বাণী
এই যে বিহরে;
হৃদয় আমার অধীর হয়ে
তাই ত শিহরে!
কত সুখের সুপ্ত স্মৃতি
কত দিনের লুপ্ত প্রীতি
রহি রহি আস্‌চে বহি
হৃদয় দুয়ারে।

শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী।

মিলন মাধুরী

নায়িকার কথা।

প্রলয়ের ঝঞ্ঝা তখনও সম্পূর্ণ থামিয়া যায় নাই। মাঝে মাঝে বাতাস ক্রোদ্ধ অজগরের মত গর্জ্জন করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। পদতলে বুড়িগঙ্গার কর্দ্দমাক্ত জলে পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গগুলি পরস্পরে আঘাত করিয়া যেন শতধা চূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। নিজের প্রকৃত অবস্থা তখন ও সম্পূর্ণ হৃদয়-ঙ্গম করিতে পারি নাই। মাত্র কয়েক মুহুর্ত্ত পূর্ব্বে জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছে। সমস্ত দেহে অসহ্য বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। অতি কষ্টে মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখি, চারিদিকেই কালবৈশাখীর উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য; দুগ্ধ ফেন-নিভ সুকুমল শয্যার পরিবর্ত্তে বুড়িগঙ্গার বালুকা সৈকতে শয়ন করিয়া রহিয়াছি। প্রথমত স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইল কিন্তু কয়েক মিনিট চিন্তার পর যখন পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনাই মানস পটে প্রত্যক্ষ করিলাম, তখন আর

নজের অবস্থাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিবার মত অবসর নাই। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক এ কঠোর চিন্তার গুরুভার [illegible] করিতে পারিল না, আবার জ্ঞান হারাইলাম।

পুনরায় যখন জ্ঞান সঞ্চার হইল তখন আকাশ অনেকটা পরিস্কার হইয়াছে, বাতাস থামিয়া গিয়াছে, বুড়িগঙ্গার আর সে তাণ্ডব নৃত্য নাই। চারিদিকেই একটা বিরাট নিস্তব্ধতা বিরাজিত। অতি কষ্টে হাতে ভরদিয়া অর্দ্ধ উপবিষ্ট অবস্থায় উঠিলাম। চাহিয়া দেখি, কোথাও জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। অদূরে কি একটা স্তূপের মত পড়িয়া রহিয়াছে, আর চতুর্দ্দিকে বহুদুর ব্যপী একটা গভীর শূন্যতা খাঁ খাঁ করিতেছে। আমার বড় ভয় হইতে লাগিল কিন্তু চীৎকার করিবার শক্তি ছিলনা। তখন একে একে সমস্ত কথা মনে পড়িতে লাগিল—পূজা উপলক্ষে নৌকা যোগে কত আকাশ কুসুম রচনা করিতে করিতে বাড়ী চলিয়াছি। নৌকায় আমরা দুইটী প্রাণী পরস্পরের প্রতি চাহিয়া চাহিয়াও যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছিলাম না। এক কথাকে দশবার জিজ্ঞাসা করিয়াও যেন তাঁহার আকাঙ্খা মিটিতেছিলনা। কথার স্রোত অনবরত চলিয়াছে—বিরাম নাই, অতৃপ্তিও নাই ই। শারদ প্রকৃতির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার অবসর কোথায়? শুক শারীর মত আত্মহারা হইয়া কেবল পান করিতেছিলাম, একে অন্যের রূপ সুধা; ভুলিয়াগিয়াছিলাম, জগতে আমরা দুইটী প্রাণী ভিন্ন আর তৃতীয় কাহারও অস্তিত্ব আছে কিনা? ক্রমে নদীর অপর পারের বাঁশ বনের পশ্চাতে সূর্য্যদেব ডুবিয়া গেলেন। তৎসঙ্গে নৌকার গতিও থামিল।

শেষ রাত্রে মাঝিদের চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বুঝিতে পারিলাম, ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গাঘাতে নৌকা এত আন্দোলিত হইতে লাগিল যে ভিতরে বসিয়া থাকা দুরূহ হইয়া উঠিল। ঝড়ের সঙ্গে ভয়ানক বৃষ্টি। দুর্য্যোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, আর বুঝি রক্ষা নাই। ভয়ে প্রাণপণে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈস্বরে বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনের নাম ডাকিতে লাগিলাম। উভয়ে তাড়াতাড়ি নৌকার বহির্ভাগে আসিয়া পড়িলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের প্রবল তাড়নায় নৌকা ডুবিয়া গেল; আমরা অকূলে ভাসিলাম।

মনে পড়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাঁহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম; কিন্তু ভীষণ তরঙ্গাঘাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলাম, হস্তের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছিল, তারপর এক তরঙ্গাঘাত পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সূচীভেদ্য অন্ধকারে আর কেহ কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য হারাইলাম।

চৈতন্য লাভ করিয়া যখন নিজের অবস্থা বুঝিলাম, তখন আতঙ্কে সিহরিয়া উঠিতে লাগিলাম। হায় অদৃষ্টের কি পরিহাস! মনে করিলাম, এই দুর্ব্বল শরীরে এখন একটীবার নদীতে ঝাপাইয়া পড়িলেই ত সকল যন্ত্রনা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব। কিন্তু ভিতর হইতে কে একজন আশ্বাস দিয়া বলিয়া উঠিল—তিনি বাঁচিয়া আছেন, তোমার মরা হইবেনা। এই আশ্বাস বাণীতে যেন হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল। মরিবার অবসর অনেক মিলিবে, তাহার পূর্ব্বে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে বৈ কি। যদি তিনি প্রকৃতই বাঁচিয়া থাকেন তবে কি আমাকে হারাইয়া তিনি সুখী হইতে পারিবেন? তিনি আমাকে কতই না ভালবাসেন! এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যাহা স্তূপ বলিয়া ভ্রম করিতেছিলাম, এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম সেটী কোন জল নিমজ্জিত ব্যক্তির মৃত দেহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া আতঙ্কে ও শোকে মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। এক হত ভাগিনী তাহার স্নেহের ধন বংশের দুলালকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া চির নিদ্রায় মগ্ন! উভয়েই নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে, হায়, সে ঘুম যে আর ভাঙ্গিবেনা। বুঝি আমারি মত নৌকা ডুবিতে মাতা পুত্রের একত্র মহাসমাধি হইয়াছে! মাতা পুত্রের স্নেহের দৃঢ় বন্ধন মৃত্যুও ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই।

এক বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এমনি একটী স্বর্গের অর্দ্ধ বিকসিত কুসুম তাহার মধুর স্পর্শে আমার পিপাসিত মাতৃ হৃদয়কে স্বর্গীয় আনন্দ দান করিয়াছিল, আমি আত্মহারা হইয়া চুম্বনের পর চুম্বনে তাহার রক্তিম গণ্ডদেশ আরও রাঙ্গা করিয়া তুলিতাম, তবুও তৃপ্তি

মিটিত না। শিশুর আধ আধ "মা, মা" ডাক শুনিয়া পুলকে দিশাহারা হইতাম, একটা ঝঙ্কার যেন সমস্ত বাড়ীময় বহিয়া যাইত। সে আনন্দের ইয়ত্বা ছিলনা, তুলনা ছিলনা, কেবল আত্মহারা স্বামী স্ত্রী সে অতুল আনন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকিতাম। হঠাৎ তিন দিনের কাঠ ফাটা জ্বরে স্বর্গের সেই সুষমা, নন্দনের স্ফোটনোন্মুখ পারিজাত কুসুমটি অকালে এমনি করিয়া আমার বক্ষের উপর শুকাইয়া ঝড়িয়া পড়িয়াছিল। সেদিনও আমি এমন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। মূর্চ্ছাভঙ্গে চাহিয়া দেখি আমার বক্ষদেশ শূন্য। মৃত্যু চির দিনের জন্য মাতাপুত্রের মধ্য পথে একটা অচ্ছেদ্য কঠোর ব্যবধান সৃজন করিয়া দিয়াছে।

চক্ষুর সম্মুখে এ দৃশ্য দেখিয়া আমার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। শোকের নিদারুণ কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া এই মাতা পুত্রের জন্য এক করুণ দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিলাম।

নদীর ধারে ধারে ছুটিয়া চলিয়াছি, পাগলিনীর মত কেবলই চলিয়াছি, ক্ষুধার অসহ্য তাড়নায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবু বিরাম নাই। তরঙ্গাঘাতে কত মৃত দেহ তীরে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, প্রত্যেকটীরই নিকট গিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তীরের অতি নিকট দিয়া সে সমস্ত শব দেহ ভাসিয়া চলিয়াছে জলে নামিয়া প্রত্যেকটীরই মুখ দেখিয়া তবে ছাড়িয়াছি, কিন্তু তাঁহার সন্ধান পাইলাম না। শেষ নিরাশ হইয়া অবসন্ন দেহে নদীর তীরে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই নদীর ধারে লোক সমাগম হইতে লাগিল। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" 'মা' সম্বোধনে আমার তৃষিত মাতৃহৃদয় আবার বেদনার ভারে টন্ টন্ করিয়া উঠিল। অসঙ্কোচে সমস্ত কথা আমার ঐ প্রৌঢ় সন্তানের নিকট নিবেদন করিলাম। সহানুভূতিতে তাঁহার কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি নিজে আমার স্বামীকে খোঁজিয়া দেখিবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এবং আমাকে তাঁহার নিজ আলয়ে লইয়া গেলেন।

সে বাটীতে আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত শয্যাগত কাতর ছিলাম। ভীষণ জ্বর তৎসঙ্গে গায়ে অসহ্য বেদনা। সময় সময় চৈতন্য হারাইতাম। প্রত্যহ দুই বেলা ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিয়া যাইতেন। কাতর অবস্থায় একদিন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—আমার ইহ-পরকাল সর্ব্বস্ব স্বামীদেবতাকে যেন আমি আবার ফিরিয়া পাইয়াছি। আশ্চর্য্য! চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি, সত্যই তিনি আমার মস্তক ক্রোড়ে নিয়া একদৃষ্টে আমার মুখ পানে চাহিয়া আছেন। এ কি বিশ্বাসের যোগ্য? স্বপ্ন কি সত্য পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলাম। তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন প্রভা! তোমাকে কি আবার ফিরিয়া পাইলাম? আমি আনন্দে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম; গণ্ড বাহিয়া দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে কি সুখ! কত প্রাণা-রাম সে মিলন!

নায়কের কথা।

"মানুষ ভাবে এক হয় আর।" কে জানিত শরতের, জল হারা, ধব্ ধবে সাদা মেঘের আড়ালে এমন সর্ব্ববি-ধ্বংশিকাল "ক্ষীরের ভিতর বিষের ছুরীর" মত আমাদের সুখ স্বপ্নের আড়ালে কুটীল হাসি হাসিতে ছিল। কোথায় প্রিয়ার মুখ চন্দ্রমা দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া চলিয়াছি স্বর্গাদপি গরীয়সি জন্মভূমিতে জগজ্জননী দশ ভূজার মন্দিরের দ্বারে প্রাণের সমস্ত বাসনা কামনা নিবেদন করিতে, জ্বালা জুড়াইতে, আর কোথা হইতে দেবতার অভিশাপ রূপে সর্ব্ব গ্রাসী নরকের মত নিষ্ঠুর প্রলয় ঝটিকা আমাদের সুখ স্বপ্ন ও জল্পনা কল্পনা গুলিকে পদ দলিত করিয়া চলিয়া গেল! সে নিষ্ঠুর আঘাতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ জীবন আহুতি দিল, মাতা পুত্র হারাইল, বঙ্গের বুভুক্ষু কঙ্কালসার কৃষক কুল মাথা রাখিবার সম্বল শত ছিদ্র কুটীর খানি হরাইয়া পথে বসিল! শত বৎসরের বৃক্ষাদিও চূর্ণ হইল এবং কত গৃহ পালিত পশুর জীবন লীলার অবসান হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কথায় সমস্ত পূর্ব্ব বঙ্গকে মরুভূমি এবং হাহাকারে পরিণত করিয়া গিয়াছে যাহা, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কল্পনা করিবার সাধ্য নাই।

নৌকায় শুইয়া স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম—দেবতার প্রসাদে প্রভার ও আমার পক্ষীর মত পাখা হইয়াছে। উভয়ে পাখা পাশি হইয়া উড়িয়া চলিয়াছি শূন্য হইতে মহা শূন্যের দিকে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের ভিতর দিয়া। সে কি আনন্দ! হঠাৎ যেন এক খণ্ড কালমেঘ কোথা হইতে আসিয়া আমাদের মাঝখানা দিয়া চলিয়া গেল, তাহার মধ্যহইতে একটা বড় ঝড় উঠিয়া প্রভাকে উড়াইয়া লইয়া গেল। প্রভা ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল, আমি প্রাণ পণ চেষ্টায়ও যেন তাহার নিকটস্থ হইতে পরিতেছি না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রভার ব্যকুল আহ্বান এবং মাঝিদের চীৎকারে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। কিন্তু প্রভাকে স শরীরে সম্মুখে উপবিষ্টা দেখিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিলাম। প্রভার আকর্ষণে হতভম্বের মত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই একটা প্রবল তরঙ্গের আঘাতে নৌকা এক ধারে হেলিয়া পড়িল এবং তৎসঙ্গে আমরা সকলেই জলে পড়িয়া গেলাম।

আমি সসব্যস্তে প্রভাকে চাপিয়া ধরিলাম! এ দুর্য্যোগে আর কতক্ষণ এরূপে ধরিয়া রাখা যায়। এক প্রকাণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে আমরা একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। পর মূহুর্ত্তেই একটা অস্ফ ক্ষীণ করুণ চীৎকার আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। তারপর আর কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। নিরুপায় দেখিয়া স্রোতের জলে গা ভাসাইয়াদিলাম।

জলের টানে অনেক দুর মরার মত চলিয়া গিয়াছি হঠাৎ মনে হইল যেন কোন কঠিন পদার্থে আটকাইয়া গিয়াছি; একটু চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঝড়ের বেগে সমূলে উৎপাটিত হইয়া নদীগর্ভে পড়িয়াগিয়াছে এবং নদীর জলে অনেক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। প্রাণের ভিতর আশার একটা ক্ষীণ রশ্মি ফুটিয়া উঠিল, প্রাণ পণ শক্তিতে তাহার একটা শাখা জড়াইয়া ধরিয়া সময়ের প্রতীক্ষায় পড়িয়া রহিলাম।

বৃক্ষের আশ্রয়ে দুর্য্যোগের পূর্ণ আক্রমণ হইতে অনেকটা রক্ষা পাইলাম। পরদিন যে পর্য্যন্ত না বিপদের মাত্রা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে সে পর্য্যন্ত বৃক্ষের আশ্রয় পরিত্যাগ করি নাই। প্রকৃতি তাহার ভীষণতা পরিহার করিয়া যখন আবার আপনার স্বাভাবিক শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতে যত্ন পর হইলেন তখন মনুষ্য কলরবে নদীতীর মুখরিত হইয়া উঠিল। আমার তখন স্বাভাবিক জ্ঞান লুপ্ত প্রায়; বাঁচিবার আগ্রহও নাই, মৃত্যুর জন্য ভয়ও নাই, সে যেন কেমন এক অবস্থা! সেই অবস্থাতেই কে একজন আমাকে জল হইতে উঠাইয়া আনিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে আমার জ্ঞানের ক্ষীণ রেখা টুকুও বিলুপ্ত হইল।

যখন চক্ষুরোন্মিলন করিলাম দেখি দুইটী আগ্রহভরা করুণ অথচ ব্যাকুল আঁখি আমার উপর ন্যস্ত, অথচ তাহা সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির! আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি কোথায়? "কোন ভয় নাই, কথা কহিবেন না" বলিয়া তিনি ত্রস্তে উঠিয়া নিকটস্থ শিশি হইতে কি একটা তরল পদার্থ আমার মুখে ঢালিয়া দিলেন। দ্রব্যগুণ কি চমৎকার! সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার দেহে যেন নব বলের সঞ্চার হইতে লাগিল।

ক্রমে জানিতে পারিলাম, সেই দয়ালু ব্যক্তি নিজেই একজন ডাক্তার। বড়লোক। বাড়ীতে বসিয়াই দরিদ্র দেশবাসীদিগকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিয়া থাকেন। সেই নিস্বার্থ পরোপকারী দয়ার অবতার দেবতুল্য মহাপুরুষের অনুগ্রহ এবং অক্লান্ত চেষ্টাতেই মৃত্যুর গ্রাস হইতে এবার রক্ষা পাইয়াছি।

বাঁচিলাম বটে! কিন্তু প্রাণাধিকা প্রভার চিন্তা আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে দাবানল জ্বালিয়া দিল। কি সে অসহ্য জ্বালা! আমিও কেন মরিলাম না! আমি কি নিষ্ঠুর! কি স্বার্থপর! কেন বাঁচিলাম? ডাক্তার বাবু আমার ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাপর শুনিয়া আমাকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিলেন কিন্তু মন কি তাহা মানিতে চাহে? কত কষ্টেই না জানি বুড়িগঙ্গার অতল জলে তাহার শেষ নিশ্বাসটুকু বাহির হইয়াছে। এ কথাগুলি ভাবিতেই দর্ দর্ করিয়া অশ্রু গণ্ড বাহিয়া ঝড়িয়া পড়িত।

নিয়তির কি অচিন্তনীয় খেলা! মানুষের সাধ্য কি সে খেলার তিলমাত্র উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়! ক্ষুদ্র মানবকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া সেই সর্ব্বশক্তিমান মহাপুরুষ কখন কি খেলা খেলিয়া যান তাহা কল্পনায়ও মানুষ আনিতে অক্ষম। আমার জীবন রক্ষাকারী বন্ধু, ডাক্তার বাবুর সাহায্যেই প্রভাকে আবার ফিরিয়া পাইয়াছি। আবার তাহাকে বক্ষে টানিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতে পারিয়াছি। কি অচিন্তনীয় ব্যাপার মরা মানুষকে আবার ফিরিয়া পাওয়া!

ডাক্তারের কথা।

পিতার অগাধ সম্পত্তি ছিল। তাহার কিয়দংশের বদলে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একটা উপাধি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। তাহাতেই আমি সর্ব্বসাধারণের নিকট "ডাক্তার বাবু" বলিয়া পরিচিত। পাশ করিয়া কলিকাতায় উপরই 'ডিস্পেন্সারী' খুলিয়া বসিয়াছিলাম, প্রেক্টিসও চলিতেছিল বেশ। যেরূপেই হউক কথাটা আমার কান পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছিল— আমার নাকি বেশ হাত যশ আছে। তবু বাধ্য হইয়া আমার কলিকাতার দোকান তুলিতে হইল। একদিন টেলিগ্রাম পাইলাম বাবার শরীর খুব কাতর, অবিলম্বে বাড়ী যাওয়ার দরকার। কতকগুলি ঔষধপত্র গোছাইয়া লইয়া বাড়ী রওয়ানা হইয়া গেলাম। এত ত্রস্তে আসিয়াও পিতাকে দেখিতে পাই নাই। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে মাত্র আমি পিতৃহীন হইয়াছি। শুনিলাম চিকিৎসাদি তেমন কিছুই হয় নাই, কারণ নিজ গ্রামে অথবা নিকটস্থ গ্রামে কোন ডাক্তার নাই। তাঁহার অতুল সম্পত্তি এবং মেডিকেল কলেজের উপাধীধারী পুত্র মৃত্যুর সময় কোন কাজেই আসিল না! আমার নিজের উপর একটা ধিক্কার আসিল। আমি নিজে ডাক্তার আর আমার পিতা মারা গেলেন বিনা চিকিৎসায়! কলিকাতায় আমার মত শত শত ডাক্তার আছেন, দুই চারি জনের অভাবে সে স্থানের বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমাদের অবজ্ঞায় "পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহর বাসের ইচ্ছা" রূপ প্রবল মহাব্যাধির তাড়নায় আজ শান্তি নিকেতন বঙ্গের পল্লীগুলি সর্ব্বনাশের পথে চলিয়াছে। সুচিকিৎসকের অভাবে দেশ ব্যাধির আকরে পরিণত হইতেছে। মনে হইল, আমার মত ক্ষুদ্র একটা প্রাণী দ্বারাও হয়ত দেশের এ দুঃখ এবং অভাব কিয়ৎ পরিমাণেও নিবারিত হইতে পারে। আজ আমি গ্রামে থাকিলে হয়ত পিতার আমার এমনভাবে অকাল মৃত্যু ঘটিত না। তারপর দুই একটী প্রাণীরও কিঞ্চিত উপকার সাধিত হইত। এই চিন্তা আমাকে এত আঘাত দিয়াছিল যে সেই আঘাতের তাড়নায় আমি কলিকাতা ছাড়িয়া বাড়ীতেই বসিয়াছি।

বাল্যকালে আমি একটু নাস্তিক প্রকৃতির লোক ছিলাম। পাঠ্যাবস্থায় বন্ধুমহলে "সায়ান্টিফিক ম্যান" বলিয়া আমার বেশ খ্যাতি ছিল। কিন্তু কতকগুলি অলৌকিক আশ্চর্য্য ঘটনায় আমার সে বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, মনের আর তেমন দৃঢ়তা নাই। বর্ত্তমানে এমন এক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যাহাতে আমার জন্ম জন্মান্তরের ভুল ভাঙ্গিয়াছে, এই ঘটনার ভিতর দিয়া ভগবানকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

পূজার পূর্ব্বে যে প্রবল ঝটিকা সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গকে বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, যাহার দুঃখময় ফল পুরুষানুক্রমে আরও এক শতাব্দী পর্য্যন্ত আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে সেই সময়ের একটী ঘটনা আজ আপনাদিগকে বলিব।

ঝড় যখন অনেকটা থামিয়া গিয়াছে, চারিদিকের অবস্থা দেখিবার জন্য বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। গ্রামের কোথাও আর বাড়ী ঘর বৃক্ষ পত্রের চিহ্নমাত্র নাই। স্থানে স্থানে মাত্র দুই একটা গাছ বা ঘর প্রলয়ের সাক্ষী স্বরূপ ভগ্নদশায় দণ্ডায়মান। দেশময় হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকেই মৃতের বিভৎস দৃশ্য, আর বিলাপ রোদন। উচ্চ, নীচ, শত্রু, মিত্র, স্ত্রীপুরুষ আজ একই শূন্য আকাশের তলে মাঠে আশ্রয় নিয়াছে। সে কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য!

দেখিতে দেখিতে নদী তীরের দিকে ছুটিলাম, না জানি কত প্রাণ ঐ বুড়িগঙ্গার জলে চিরতরে লুকাইয়াছে। গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। কত মৃতদেহ যে ভাসিয়া চলিয়াছে, কত যে তীরে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। হঠাৎ আমার দৃষ্টি একটী জিনিষে আকৃষ্ট হইল। একজন লোক যেন নদীগর্ভে পতিত একটী বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়া ঢেউয়ের সহিত ক্রমে উঠিতেছে এবং পড়িতেছে। জীবিত কি মৃত—দূর হইতে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি বৃক্ষ বাহিয়া লোকটীর নিকটে নামিয়া পড়িলাম। বুঝিতে পারিলাম, তখন পর্য্যন্ত লোকটীর প্রাণ বিয়োগ হয় নাই।

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অপার কৃপাবলে আমার শরীরে যেন অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হইল। কি কৌশলে

যে লোকটীকে তীরে উঠাইয়া আনিলাম, তাহা আমি এখন পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তীরে উঠাইয়া আনিতেই লোকটী সংজ্ঞা হারাইল। নিকটস্থ অন্য দুই একজন লোকের সাহায্যে তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া এবং গরম সেকের পর সে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। নিয়মিত ঔষধ সেবনে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। তাহার মুখে শুনিতে পাইলাম তাহার স্ত্রী নাকি ঐ দুর্য্যোগে প্রাণ হারাইয়াছে। তাহার দুঃখ দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়। বোধ হয় স্ত্রীকে সে আত্মহারা হইয়া ভালবাসিত।

আমার হাতে অনেক রোগী ছিল। তাহাদের অধিকাংশই সেদিনের ঝড়ে আহত। পাশ্ববর্ত্তী গ্রামের কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে এক রোগিণী ছিল, শুনিলাম সে নাকি জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, সৌভাগ্য ক্রমে প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। ভয়ানক জ্বর তার। নিয়মিত ঔষধে এবং শুশ্রূষায় ক্রমে ক্রমে আরোগ্যের পথে চলিয়াছে এখন।

একদিন সেই রোগিণীকে দেখিতে গিয়াছি। গৃহস্বামী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা, প্রভা, ডাক্তার বাবুকে একবার হাতটা দেখাও!" প্রভা—নাম শুনিয়া আমি একটু চমকিয়া উঠিলাম; ঠিক এই নামইত আমার বাড়ীর সেই যুবক রোগীটীর মুখে শুনিয়াছি। স্বপ্নের মধ্যেও সে মধ্যে মধ্যে এই নাম লইয়া কাঁদিয়া উঠিত। তবে কি—? ভগবান, তাহাই হউক!!

আমি যথারীতি তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে বহির্ব্বাটিতে চলিয়া আসিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মেয়েটী ভদ্রলোকের আপনার কেহ নহে, নদীতীর হইতে তিনি অর্দ্ধমৃতাবস্থায় তুলিয়া আনিয়াছেন। আমি কোন কথা প্রকাশ না করিয়া চিন্তিত অন্তরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ভ্রমণের ছলে পরদিন যুবককে লইয়া সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম রোগিণী তখন ঘুমাইতেছে। এই উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া ভদ্রলোককে বলিলাম, আমি একটু ব্যস্ত আছি, একবার মাত্র নাড়ী পরীক্ষা করিয়াই চলিয়া যাইব। নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যুবক অথবা ভদ্রলোককে আমার গোপন অভিসন্ধির কথা প্রকাশ করিনাই, শেষে যদি সত্য না হয়! যুবককে বলিলাম, চলনা আমার সঙ্গে রোগী দেখিয়া আসিবে, সেও তোমার ন্যায় এক অবস্থারই। যুবক প্রথমতঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু আমি হাতে ধরিতেই উঠিয়া আসিল। আমরা ভদ্রলোকের পশ্চাতে রোগিণীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে তখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিল। রোগিণীর সম্মুখে গিয়াই যুবক অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি, তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম; চীৎকার করিতে নিষেধ করিয়া হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া আসিলাম।

ভদ্রলোক ত বিস্ময়ে অবাক্! আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে তিনি আনন্দে একেবারে হাত তুলিয়া বালকের মত নাচিয়া ফেলিলেন। এও কি সম্ভব?

তাহাদের মিলন হইল। সেই মিলনের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সেই মিলন-মাধুরীতে ভগবানের করুণাময় ছবি প্রত্যক্ষ করিলাম—যাহা মূর্ত্তি ধরিয়া আমার নয়নের সম্মুখে আজীবন বিরাজ করিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর সরকার।

মায়া।

নদীর বুকের জল আকাশের গায়
দুদিনের তরে শুধু ভাসিয়া বেড়ায়,
একদিন বিজুলীটি মুখ খুলে হাসে,
যেথায় আছিল জল সেথা ফিরে আসে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ।

যুবকদের প্রতি।

অমৃতের সন্তান যে, সে সর্ব্বত্রই দেখ্‌বে, অমৃত স্বরূপের বরাভয় প্রদান প্রসারী পাণি সর্ব্বদাই তাকে আবাহন করে ডেকে নিচ্ছে, সুতরাং সংসারে কোথাও তার কোনো কুণ্ঠা থাক্‌তে পারেনা; জগতের পথে চল্‌তে সারাক্ষণ ছুঁতিনাতি বিচার করে পাঁজি পুঁথি বিচার করে চল্‌বার তার দরকার হয় না।

যে ভীরু—পথে বেরুতে পদে পদে সঙ্কুচিত হয়, কাঁটার ঘায়ে ক্লিষ্টহয়, ক্ষণিক স্খলনে নিরাশ হতাশ্বাস হয়ে পড়ে সে চায় এমন রাস্তা, যাতে নেই—কোনো কাঁকর কাঁটা, কোনো পিছল, নেই কোনো দুঃখের আঘাৎ বা প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব। সে জন্য সে মানুষকে বলে পারত চলে যাও অরণ্যে, যেখানে লোক নেই, জন নেই, শত্রু মিত্র নেই—সেখানে বসে বসে চক্ষু মুদ্রিত করে অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করো; নৈলে সংসারে যদি নেহাৎ থাক্‌তে হয়, তবে যত্তপার আচার নিয়মের বর্ম্মে এঁটে সেঁটে শক্ত হয়ে থাক—খবর্দ্দার হঠকারিতা বা সাহসিকতার সহিত কখনো চল্‌তে যেয়ো না—শীতলা-মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর পশ্চাতে পশ্চাতে অতি গোপনে টিক্‌টিকি প্রভৃতি বাহনে চরে আচার, মন্ত্র বা তিথির দ্বারা আপনাকে অষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে জড়িয়ে কোনমতে নির্ব্বিবাদে ভবধাম পেরিয়ে যেতে পার্‌লেই একেবারে কৈবল্যলোক হাতে হাতে পেয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান! মনটা যদি কোনো প্রকার দুরন্তপনা করে, তবে তার কানমলে শাসিয়ে ঠিক্ করে তাকে রাখ্‌বে—নৈলে সমূহ বিপদ্!

সম্প্রতি এই সব প্রবীণ পরমপক্ব পণ্ডিতগণ একটা ধুয়ো তুলেছেন্ যে য়ুরোপের যে কর্ম্মমূলক ও ভোগমূলক সভ্যতার বীজ চারদিকে এবং অনিবার্য্যরূপে এদিকেও ছড়িয়ে পড়্‌ছে, তার সঙ্গে এ জাতির একটা সমূহ ধ্বংসের আয়োজন, একটা প্রচণ্ড মহামারীরূপে দেশ উচ্ছন্ন করে দিবে—অতএব যদি কল্যান চাও, তবে ঐ সভ্যতার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদন করে একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করে সেই প্রাচীরের এপারে আত্মরক্ষা কর।

তাঁরা বল্‌তে চান, যে য়ুরোপ কর্ম্মসংসারে এসে ধরার মাটিকে যে জোরের সহিত আঁক্‌ড়ে ধরেছে—এতে তার আসক্তিরই পরিচয়—এর মধ্যে কোথাও মুক্তির রেখাও ফুটে উঠ্‌তে পারে না। মাটির এই আকর্ষণ মাত্রেই পাপ—অতএব ওটাকে একেবারে সজোরে অতিক্রম করে যেতে পার্লেই উর্দ্ধগতি, নৈলে নরকের নিম্ন কোঠায়—অধঃপতনের চরমে গিয়ে ঠেক্‌তে হবে।

আবার আশ্চর্য্য এই যে নবীনেরাও আপনা ভুলে বুড়োর দলে ভিড়ে বুড়োর বচনে বেশ মাথা ঝেঁকে সায় দিতে সুরু করেছেন; এ দেখ্‌লে একদিকে যেমন হাসি পায়, তেমি অন্তরের নাড়ীগুলো চরম দুঃখে ছিড়ে যেতে চায়।

এই যুবকেরা যখন সব-প্রথম এই সৌন্দর্য্যখচিত ঐশ্বর্য্যভূষিত পৃথিবীতে নয়ন মেলে নীল আকাশের নতুন আলোর পেয়ালা ভরে ভরে পান করে করেও তৃপ্তি পায়নি—যখন এই সুবৃহৎ জগতের রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ শব্দ সবই তাদের প্রথম-জাগরণ-সুন্দর হৃদয়কে আকর্ষণ করে নিচ্ছিল, পৃথিবীকে "আমার" বল্‌তে তারা কখনো কুণ্ঠিত হয় নি। ভগবান্ তাদের শুধু মায়ামোহে ভোলান নি—সমস্ত মোহের ইন্দ্রজালের মধ্যে তিনিই তখন তাদের টান্‌ছিলেন—কিন্তু ভগবানের বাঁশীর টান তারা ভুলে গেল। জটীলা-কুটিলার কুমন্ত্রণে—তারা সতর্ক হয়ে পড়্‌ল। ভাব্‌ল জগৎ মিথ্যা; সুখ—পাপ মরীচিকামাত্র। এই ভেবে তারা হ'ল ব্রতী—তাই আজ দেখি যৌবনে হয়েচে সকলে যোগী উনিশে তাদের পেয়েছে উনপঞ্চাশী। তাদের নবোদ্গত বুদ্ধি, নব-বিকশিত তরুণ মন, তাদের নতুন ফোটা রূপও ইন্দ্রিয় নিয়ে তারা বসে গেচে কৈবল্য-মার্গ-সাধনে। এর চাইতে ক্ষোভের কথা আর কি আছে? দেহ ও মন আজ তাদের চির-একাদশীর উপবাসে মৃত! তারা কর্ম্ম কর্‌বে না—খেল্‌বে না—গান গাইবে না—স্ফূর্ত্তি কর্‌বে না—কেবল কৌপীন পরে আলোচাল—কাঁচকলা—খাওয়া সন্ন্যাসের অতল ব্যর্থতার মধ্যে চির-নিহিত থাক্‌বে—একি কম দুর্গতি! তারা বল্‌ছে, যে সমুদ্র-পার হলে সে পারের হাওয়ায় বোধিকে এলোমেলো করে দেবে, বল্‌ছে, যে বিদেশীর অন্ন খেয়ে তাদের চঞ্চল বিদ্যুৎ-শক্তি স্থির প্রজ্ঞা ঘুলিয়ে দেবে।

অর্থাৎ তারা হয়েছে "কামিনীকাঞ্চনত্যাগী," সে কেলে তামসিক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীদের মানস পুত্র—হয়নি; সহজ-আনন্দের চিরবৈরাগী, যৌবন-পথের চির-পথিক, তাই হয়ে গেচে অকাল-পক্ক বা ইচড়ে-পাকা!

পরমার্থের দিক দিয়ে ভোগের ঈষণা চেপে রাখতে গিয়ে প্রবীনেরাও কথনো কৃতকার্য্যহননি, বরঞ্চ তা সুযোগের মুখে এমন আস্কারা পাওয়া উশৃঙ্খলতা ও কদর্য্যতার পরিচয় দেখিয়েচে যে তার কলঙ্কের অনলে এ সব পাকা মরালিষ্টদের অধিকাংশই মুখ-পোড়া।

আমরা বলিনা যে তোমরা সন্ন্যাসী হও। আমরা চাই তোমাদের সব কর্ম্ম ও সুখ নির্ম্মূল না হয়ে নির্ম্মল হয়ে উঠুক। পবিত্র সমতা নিয়ে সংসার কর, সকল বিষয়েই পরমানন্দ পাবে, তার জন্যে অধ্যাসের প্রয়োজন হবে না। জীবনটা আগাগোড়া চালিয়ে নিয়ে যাও, কোনো অঙ্গকেই খাটো কারো না। মানুষের নীচেকার অতি কদর্য্য প্রবৃত্তি গুলোও বিশুদ্ধ করে, ধৌত করে, আবর্জ্জনা বিহীন করে সে সত্ত্ও ভাবনাকে ফুটিয়ে যাতে তোলে—আমরা তাই চাই। শঙ্করাচার্য্য, টলষ্টয় প্রভৃতিরা মহাপুরুষ কিন্তু জীবনের দিক্ দিয়ে তাঁরা ক্ষুদ্র দৃষ্টি—একথা বল্লে কিছু অত্যুক্তি হবে না।

একটা প্রশ্ন অনেকে করেন—কর্ম্ম ও ভোগ যদি মৃত্যুর পথই না হবে, তবে য়ুরোপের এ দেশা কেন? আমরা বলি, একদেশদর্শী দেখবে যে য়ুরোপের সভ্যতা আগাগোড়া মৃত্যুর মুখেই চলেচে কিন্তু বস্তুতঃ এ মৃত্যু একটা সামায়িক বিপর্য্যয় মাত্র। য়ুরোপ ভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে এক এক সময় দিশা হারানো উশৃঙ্খলতার পশুভাব প্রকাশ করে সত্য, কিন্তু এ তার প্রকৃত স্বরূপ নয়।

য়ুরোপ ভোগ কর্ত্তে জানে। বিশ্বের সব পাত্র দিয়ে রূপ রসের সুধা পান করে তারা অমর। সুরলোকে এ সব অসুরের উৎপাৎ ক্ষণিক। তাদের এ অমৃত অসুরের হাতে পড়ে চিরদিন গড়াগড়ি ছড়াছড়ি যাবে একথা নিতান্তই খেলো। য়ুরোপ মধ্যে যে একটা পশুর উন্মত্ততা নিয়ে মাৎলামী কর্ত্তে লেগেছিল আজ তা য়ুরোপ বুঝছে, আজ আবার য়ুরোপে সত্যের আলোক স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আখরে ফুঠে উঠছে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মনীষীদের লেখা ও জীবন আলোচনা কল্লে বোঝা যায়—একথা তাঁরা বুঝেছেন যে ভোগ ও ত্যাগের সম্মিলনেই মানুষের জাগা-শক্তি।

ভরেতে একসময় এদুটোর একটা অত্যাশ্চর্য্য সমন্বয় ছিল বলেই তার আকাশছাওয়া সভ্যতার ছায়ায় এসে সব দেশ আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু কয়েক শতাব্দী হ'ল সে ত্যাগের দিকে এতই ঝুঁকে পড়েছে, যে তার অন্ন, প্রাণ ও চিৎএর কিছুরই স্ফূর্ত্তিনেই; তাই সে জীবন হারিয়ে ফেলেছে। বীর না হলে কি দেব্ তা হওয়া যায়? আজ কি এমন দিন আসেনি, যেদিন এই তামসিক পশ্বাচারী জাতিকে বীরাচারী পশ্চিমের আঁধার-বুক্-চেরা চোখ-ধাঁধানো আলোয় ভালো করে চেয়ে জীবনকে ও কর্ম্মকে বুঝ্ তে হবে?

তাই বল্‌ছি—যারা যুবক আছ, এখনো যাদের দেহে কিছুমাত্রও প্রাণস্পন্দন থেমে আসার মুখেও ধুক্ ধুক্ কর্‌ছে, যাদের বুকে আশার এতটুকু স্ফুলিঙ্গ, নিবে-আসা প্রদীপের শেষ রশ্মির মত এতটুকু উজ্জ্বল্যের সহিত দীপ্তি বিস্তার কর্‌ছে—তাদের এখনো আশা আছে। এখনো তোমরা কাঁচাহতে পার তরুণ হতে পার।

যৌবনের পরে আমার বিশ্বাস আছে, আমি জানি প্রাণ মর্ তে মর্ তেও আবার হবে জয়ী, মৃত্যু আপনিই মরে ঝরে শুকিয়ে যাবে; চিরদিন যা টিঁকবে—তা হচ্ছে, যৌবন, তা হচ্ছে—অমৃত বিগ্রহের নিত্য আনন্দ হতে ঝরে পড়া অমর-যৌবন!

প্রকৃত মানুষ।

তৈলাক্ত মস্তকে তেল পরম আগ্রহে
অনেকেই দিয়ে থাকে অনেক সময়;
দেখিলেই অবিস্ময়ে বুঝিতে হইবে—
স্বার্থ এতে সংগোপনে (?) রয়েছে নিশ্চয়।

রুক্ষ কেশে যে মানব হাসিতে হাসিতে
আপন সঞ্চিত তৈল মাথায় যতনে
প্রকৃত মানুষ সেই—নিঃস্বার্থ নির্ম্মোত
নাহিক তুলনা তার বিশাল ভুবনে।

শ্রীবসন্তকুমার খাসনবিশ।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, DACCA
and Published by Kedar Nath Mojumdar Research House, Mymensinghz.
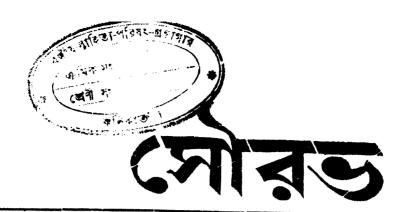
নবম বর্ষ। ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩২৮। একাদশ সংখ্যা।

সাংখ্য দর্শন

(২)

বিজ্ঞান ভিক্ষু ও বাচস্পতি মিশ্রের মতদ্বৈধ।

(ক) বাচস্পতি মিশ্রের টীকা ও বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য এই দুইটী সম্যক আলোচনা করিলে এতদুভয়ের মধ্যে বহু স্থলেই মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয়। শুধু যে সাংখ্য দর্শনেই এই দুই গ্রন্থকারের মতপার্থক্য তাহা নহে, পাতঞ্জল দর্শনের বহু বহু স্থানেও তাহাদের মধ্যে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। অপ্রাসঙ্গিক বিধায় যোগদর্শনের ঐক্য অনৈক্য বর্জ্জন করিয়া আমরা এই স্থানে সংক্ষেপতঃ সাংখ্যদর্শনের কতিপয় বিরোধী স্থলের উল্লেখ করিতেছি। বুদ্ধিধর্ম্ম বা প্রত্যয়-সর্গ চারি প্রকার (১) বিপর্য্যয় (২) অশক্তি (৩) তুষ্টি (৪) সিদ্ধি। এই সিদ্ধি আবার অষ্টবিধ। তদ্ যথা "উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখ বিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎ প্রাপ্তিঃ।

দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ', সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশ স্ত্রিবিধঃ॥৫১।" রেখাঙ্কিত পদের ব্যাখ্যা এই যে পূর্ব্বোক্ত তিনটী, সিদ্ধির অঙ্কুশস্বরূপ অর্থাৎ নিবারক। পূর্ব্বোক্ত তিনটী যে কোন্ তিনটী এবং অঙ্কুশশব্দেরই বা অর্থ কি ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বাচস্পতিমিশ্র ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতপার্থক্য দেখা যায়। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন 'পূর্ব্বোল্লেখিত উহ, শব্দ ও অধ্যয়ন এই তিনটী, সিদ্ধির অঙ্কুশ (অর্থাৎ আকর্ষক = আকড়া), বাচস্পতি মিশ্র বলেন, না—তাহা নহে; সিদ্ধি লাভের প্রতি বিপর্য্যয় অশক্তি ও তুষ্টি এই তিনটী অঙ্কুশ (অর্থাৎ বিঘাতক = নিবারক) আমাদেরও মনে হয় এই স্থানে—বাচস্পতি মিশ্রের অভিমতই সমীচীন।

(খ) প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর সান্নিধ্যবশতঃ সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের বিবেক বা ভেদজ্ঞানে আত্মার মোক্ষ ইহাই সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রকৃতি অচেতনা জড়া, পরিণামশালিনী, সত্ব রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণধারিণী। প্রকৃতির সংজ্ঞান্তর প্রধান। প্রধানের পর্য্যায় শব্দ যথা অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, রসগন্ধবর্জ্জিত, অব্যয়, নিত্য, অনাদি, ধ্রুব সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ, অনাদিনিধন, প্রসবধর্ম্মি, নিরবয়ব, এক, ইত্যাদি। পুরুষ; চেতন, অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, নির্গুণ, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রবিৎ, অপ্রসবধর্ম্মা। ইহার পর্য্যায় শব্দ যথা—পুরুষ, আত্মা, পুমান্ জন্তু, জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, কবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণী, দেহী, ইত্যাদি।

আপত্তি হইতে পারে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই যখন অপ্রসবধর্ম্মা, তখন অপর কোনও তৃতীয় কারণান্তরের প্রয়োজনব্যতীত বা ঈশ্বরপ্রেরণাব্যতীত অচেতনা প্রকৃতির সৃষ্টিবিষয়ে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। এই সংশয় নিরাকরণোদ্দেশ্যে সাংখ্যাচার্য্য বলিতেছেন "বৎস বিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য" ইত্যাদি ৫৭। বৎস বিবৃদ্ধির নিমিত্ত (অর্থাৎ বাছুরের পরিপুষ্টির জন্য) অচেতন দুগ্ধ যেমন আপনা হইতেই ক্ষরিত হয় তদ্রূপ পুরুষের মোচনের নিমিত্ত অচেতনা প্রকৃতি স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বেদান্তদর্শনেও "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।" ২।১।২৪সূত্রে কারণান্তর নিরপেক্ষ-ক্ষীরের ন্যায় কারণকূটবিহীন অদ্বয় ব্রহ্মের জগৎস্রষ্টৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৎপর "পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি।" ২।২।৩ সূত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে সমুদয় কার্য্যই

ঈশ্বরসাপেক্ষ। সাংখ্যাচার্য্য, ঈশ্বরসাপেক্ষ বলিতে চান্না; যে হেতু কর্ম্মসাপেক্ষ বলিলেই সমস্ত সংগত হয়। কর্ম্মের অনাদিত্ব সকল দর্শনেই অবিসংবাদিত। "কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্।"

সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রতিপন্ন করেন, পুরুষ নির্ম্মল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ এবং প্রকৃতি জপাপুষ্পের ন্যায় লোহিত-গুণাত্মিকা। উভয়ের সান্নিধ্যবশতঃ অচেতন জপাপুষ্পের প্রতিবিম্ব নির্ম্মল স্ফটিকে নিপতিত হয় এবং তজ্জন্য পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এতদ্রূপ অভিমান-সম্পন্ন হন। তাদৃশ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ববুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষের ছায়া আবার সেই অচেতনা প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয়, তখন প্রকৃতি অচেতনা হইলেও চেতন পুরুষের সাহচর্য্যে নিজকেও চেতায়মানা মনে করেন। এই প্রকার পরস্পর বিম্বপ্রতিবিম্বপাতবশতঃ প্রকৃতি ও পুরুষের অভাবনীয় সংযোগ ঘটে এবং অবশেষে ক্ষুভ্যমাণা প্রকৃতি হইতে অনুলোমক্রমে মহদাদি ত্রয়োবিংশ তত্ত্ব কার্য্যরূপে পরিণত হয়। বাচস্পতিমিশ্র সৃষ্টির এবম্বিধ প্রক্রিয়ার অন্যোন্য প্রতিবিম্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে পুরুষের চেতন্যই প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয় কিন্তু প্রকৃতির ছায়া পুরুষে নিপতিত হয় না। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন যে তাহা নহে, উভয়ের উপরেই উভয়ের কতক কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সেই কর্ত্তব্যটী অন্যোন্য প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। অন্যোন্য প্রতিবিম্ব ব্যতিরেকে পূর্ব্ববর্ণিত বহু বিশেষণে বিশেষিত পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনই হইতে পারে না। এইস্থলে বিজ্ঞানভিক্ষুর যুক্তিই আমাদের নিকট সমাদৃত। সাংখ্য সপ্ততির ২০ ও ২১ কারিকা প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই পরস্পর সাহচর্য্য প্রতিপন্ন করিতেছে। বলা বাহুল্য যে বাচস্পতিমিশ্র এতদুভয় কারিকার তত্ত্বকৌমুদী তত্ত্ব বিবৃত করেন নাই; অথচ প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ ও বর্ণন করেন নাই।

"সাংখ্য সার।"

মহর্ষি কপিল—প্রোক্ত সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বসমূহ বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত ক্ষুদ্র "সাংখ্য সার" নামক—পুস্তিকা পাঠেই বিশেষ অবগত হওয়া যায়। এই সাংখ্য সার গদ্য ও পদ্য দুই ভাগে বিভক্ত। গদ্যভাগ পরিচ্ছেদ ত্রয়ে সঙ্কলিত, এবং পদ্য ভাগে সাতটী পরিচ্ছেদ। গদ্য ভাগে প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞানে মোক্ষ হয় ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ঐ বিবেক জ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকৃত্যাদি জড়-বর্গের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পদ্যভাগে প্রকৃতির ব্যাখ্যা, অচেতনা-প্রকৃতি ও চেতন-পুরুষের পার্থক্য; মনের ইন্দ্রিয়াগ্রণীত্ব, এবং বিদেহলয় প্রকৃতি লয় প্রভৃতি। সাংখ্যসারের বক্তব্য বিষয় গ্রন্থের আদি ভাগে কয়েকটী পঙ্‌ক্তিতেই অতি সংক্ষেপে—বিবৃত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট গ্রন্থ ঐ কয়েক পঙ্‌ক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। এই স্থলে সেই কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইতেছে।

"আত্মানাত্মবিবেক-সাক্ষাৎকারাৎ কর্তৃত্বাদ্যখিলাভিমান-নিবৃত্ত্যা তৎকার্য্যরাগদ্বেষধর্ম্মাধর্ম্মাদ্যনুৎপাদাৎ, পূর্ব্বোৎপন্নকর্ম্মণাং চা বিদ্যা রাগাদিসহকার্য্যোচ্ছেদরূপদাহেন বিপাকানারম্ভকত্বাৎ প্রারব্ধসমাপ্ত্যনন্তরং পুনর্জ্জন্মাভাবেন ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপো মোক্ষো ভবতীতি শ্রুতিস্মৃতি ডিণ্ডিমঃ।"

"সাংখ্যসার" পুস্তক প্রণয়ন করিবার হেতু কি তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত গ্রন্থকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন; ঈশ্বর কৃষ্ণপ্রোক্ত সাংখ্যকারিকা বা সাংখ্যসপ্ততি পুস্তক বালকদের সুখবোধের নিমিত্ত; উহাতে অতি সংক্ষেপে আত্মতত্ত্ব বিবেচিত হইয়াছে। অতএব এই সাংখ্যসার পুস্তকে সেই সমস্তবিষয়েরই প্রপঞ্চ বা বিস্তার বলা হইতেছে। (১) ইহাদ্বারা এমন মনে করিলে চলিবেনা যে "সাংখ্যকারিকা" পুস্তকে সাংখ্য দর্শনের মূল বিষয়েরই অভাব আছে। তেমন মনে করা ভ্রম। সাংখ্যকারিকাতে সাংখ্যদর্শনের যাহা যাহা অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া তৎসমস্তই প্রায় সঙ্কলিত হইয়াছে। পরপক্ষখণ্ডন, স্বপক্ষমণ্ডন এবং আখ্যায়িকাভাগ সাংখ্যসপ্ততিতেও ধৃত হয় নাই, সাংখ্যসারেও বর্ণিত হয়নাই। এতদংশে উভয়েরই সারত্ব বা সংক্ষেপত্ব (sum and substance) অতিক্রম করিবার উপায় নাই।

---

(১) সাংখ্যকারিকয়া লেশাদাত্মতত্ত্বং বিবেচিতম্।
সাংখ্যসারবিবেকোঽতঃ বিস্তারেণ প্রপঞ্চ্যতে॥
প্রায়ঃ সঙ্কলিতা সাংখ্য-প্রক্রিয়া কারিকাগণে।
সাহঙ্কারোঽত্র বর্ণ্যতে লেশাৎ তদনুক্তাংশমাত্রতঃ॥

(কপিল কে ?)

মহর্ষি কপিলই যে সাংখ্যদর্শনের আদিবক্তা সেই-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। (১) কিন্তু কে এই কপিল ? কোথায় তাঁহার নিবাস ? সে সমস্ত পরিচয় অদ্যাপি কালের গহ্বরে সংশয়তিমিরে সমাচ্ছাদিত। অষ্টাদশ পুরাণ প্রণেতা মহর্ষি ব্যাসের ন্যায় সাংখ্যদর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিলের ও বহু বহু জন্ম ও বহু বহু নামের কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রুতিতে উল্লেখিত একটী ঋক পাঠে জানা যায় কপিল, ব্রহ্মার মানস পুত্র, যথা "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।" কেহ বলেন ইনি বিষ্ণুর মূর্ত্তি রূপে নারায়ণের অবতার। অপর একটী বৃত্তান্তে জানা যায় কর্দ্দম ঋষির ঔরসে দেব হুতির গর্ভে কপিলের জন্ম। অথচ—অন্য স্থলে উল্লেখ আছে ইনি ধর্ম্মের ঔরসে হিংসার গর্ভে জাত সন্তান। পুনশ্চ—ইনি অগ্নির অবতার রূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অপর ও একজন কপিল ছিলেন,—গোতম বংশীয়। ইনি তত প্রাচীন নহেন অত এব সাংখ্য বক্তা হইতেই পারেন না। বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায় এই কপিলের নামেই নাকি কপিলাবস্তু নগরের নামাকরণ হইয়াছে। যে সমস্ত স্থানে কপিলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় আমরা এইস্থলে উহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি—

> ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি
> জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ। শ্রুতি।
> আদৌ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়েদৃষিম্।
> প্রসূতং বিভৃয়াজ্ জ্ঞানৈ স্তং পশ্যেৎ পরমেশ্বরম্॥ স্মৃতি।
> কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহু র্যতয়ঃ সদা।
> অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ॥ মহাভারত
> এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ।
> প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্ম দর্শনম্॥ ভাগবত
> ইহ ভগবান্ ব্রহ্মসুতঃ কপিলো নাম ; তদ্ যথা—
> "সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ;
> কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
> ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ॥"
> গৌড়পাদ স্বামী
> (প্রাচীনতম সাংখ্য দার্শনিক)

শেষোক্ত শ্লোকের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটী অপরস্থলে নিম্ন-লিখিত ভাবে পরিবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়—

> "সপ্তৈতে মানসাঃ পুত্রাঃ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥

সাংখ্যকারিকার টীকা তত্ত্বকৌমুদীর প্রারম্ভে মঙ্গলাচার-প্রকরণে বাচস্পতিমিশ্র লিখিতেছেন—

> কপিলায় মহামুনয়ে মুনয়ে শিষ্যায় তস্য চাসুরয়ে।
> পঞ্চশিখায় তথেশ্বর কৃষ্ণায়ৈতে নমস্তামঃ।

সাংখ্যসপ্ততি-গ্রন্থকার স্বয়ং ঈশ্বরকৃষ্ণ ৬৯ ও ৭০ কারিকায় কপিলের উল্লেখ করিতেছেন—

> পুরুষার্থজ্ঞান মিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।
> স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্॥
> এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনি * রাসুরয়ে ঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
> আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্॥

তত্ত্বসমাস বা দ্বাবিংশসূত্রকে আদি-সাংখ্য বলা হয়। এই আদিসাংখ্যের সর্ব্বোপকারিণী নাম্নী টীকায় যাহা যাহা লিখিত আছে তাহারই প্রয়োজনীয় অংশগুলি বাছিয়া বাছিয়া উদ্ধৃত করিতেছি—

> অথাত্রানাদিক্লেশ-কর্ম্মবাসনা-সমুদ্র-পতিতান্ অনাথান্ উদ্দিধীর্ষুঃ পরমকৃপালুঃ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানো মহর্ষির্ভগবান্ কপিলো ব্রহ্মসুতো দ্বাবিংশ সূত্রাণি (তত্ত্বসমাসস্তু) উপাদিক্ষৎ। ……… …… সূত্রষড়ধ্যায়ীতু বৈশ্বানরাবতার-ভগবৎকপিল-প্রণীতা। তত্ত্বা অপি বীজভূতা ব্রহ্মসুতমহর্ষিভগবৎ কপিল প্রণীতেতি স্মৃতা বদন্তি। অত্র নারায়ণাবতার ভগবৎ প্রণীতেতি কেচিৎ ! তত্র মননীয়ম্"

আমরা ত বলিতে চাই শ্রুতিতে বর্ণিত সেই প্রাচীনতম কপিলই কল্পভেদে বিভিন্ন শরীর পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মার পুত্র, কর্দ্দমের পুত্র, নারায়ণের অবতার, অগ্নি অবতার-রূপে জন্মধারণ করিয়াছিলেন এবং যোগবলে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইয়া একই কপিল নামে যুগে যুগে সাংখ্যদর্শনের প্রসার ও ক্রমোন্নতি করিয়া গিয়াছেন। ইনিই একদিন যোগবলে বলীয়ান্ হইয়া ব্রহ্মতেজে ষষ্টি সহস্র ক্ষাত্র-শক্তিকে পরাভূত করিয়া ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যে জগৎকে স্তব্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিলেন অথচ ইনিই এককালে জন্মান্তরীণ অনাদিবাসনাবশতঃ সাধারণ মানবের ন্যায় যোনি-ভ্রমণচ্ছলে দেবহূতির উদরে জন্মক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন

(১) গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি॥

* মুনিঃ—কপিলঃ

অথচ ইঁহারই সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বদর্শিতায় ভীতভীত হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও অতি সন্তর্পণে বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের প্রথম সূত্রের ভাষ্যতে পক্ষাপক্ষ প্রদর্শনপূর্ব্বক সুষ্ঠু অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। মোট কথা, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে বিশ্ববিশ্রুত এই ঋষি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহমেঘ চিত্তাকাশ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। কপিল সম্বন্ধে আমরা যথার্থতঃ (খাটী সত্যরূপে) কিছুই জানি না বা বলিতে পারি না। যে যাহাই বলুন না কেন, সকলই অনুমানাত্মক, অথচ বিবিধ বিসদৃশ কাহিনীতে বিজড়িত বিধায় নিতান্তই অমূলক। তথাপি একথা বিশ্বাস করিতেই হইবে, অথচ উহাতে দ্বিধা করিবারও কোন কারণ নাই যে মহর্ষি কপিল উপকথা বা রূপকথায় বর্ণিত সাধারণ মানব হইতে অবশ্যই একজন অতিমানুষ ছিলেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যসন্তান আমরা, তাদৃশ মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মকার্য্যের ভিতরে ও উল্লিখিত মহাত্মা এবং অপরাপর কতিপয় মহাত্মার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তাহাদের সমাধির উপর কোনরূপ দুগ্ধধবল শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের সুরম্য মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই, বহুসহস্রপৃষ্ঠাব্যাপী সত্যমিথ্যাঘটনায় পরিপূর্ণ তাহাদের কোন জীবনচরিতও কেহ রচনা করিয়া রাখিয়া যান নাই, অথবা আধুনিক রীতি অনুসারে তাহাদের কোনরূপ ছায়াচিত্র (বা তৈলচিত্র) তুলিয়া রাখা হয় নাই কিংবা উহাদের স্মারকদিবস (memorial day) উপলক্ষ্য করিয়া বৎসরের মধ্যে একটা বা দুইটা দিন কোনরূপ উৎসবের ও সূচনা নাই, তথাপি আমরা প্রত্যহ ভোরের বেলায় উঠিয়া শুদ্ধচিত্তে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কয়েক গণ্ডূষ জল অর্পণ করিয়া থাকি। প্রাতঃস্মরণীয় আর কাহাকে বলে? ধর্ম্মের সঙ্গে সংবদ্ধ থাকিয়া যাঁহারা আমাদের প্রাত্যহিক ধর্ম্মকার্য্যের ভিতর দিয়া কর্ম্মকার্য্যে ও মর্ম্মরাজ্যে আধিপত্য ও অনুরাগ লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁহারাই চিরস্মরণীয়।

দর্শন ও দার্শনিকদের সঙ্গে আর্য্যধর্ম্মের সম্বন্ধ।

আমাদের সেই শ্রদ্ধা-গণ্ডূষের মন্ত্রটী এই—

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ,
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ় ও পঞ্চশিখ এই সমস্ত দার্শনিকগণ মৎপ্রদত্ত জল দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুণ। এই জল-প্রদানের ব্যবস্থার মধ্যে বৈজ্ঞানিকের আস্থা বা বৈজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নিহিত রহিয়াছে কিনা তাহা অবৈজ্ঞানিক আমরা—কেমন করিয়া বলিব? আমাদের শিক্ষা নাই, বিজ্ঞান নাই, জ্ঞান নাই মান নাই আছে শুধু শ্রদ্ধা ভক্তি ও ধর্ম্মের ভান। অথচ—এই গুলিকেই আমরা মহাদান বলিয়া মনে করি। জড় বিজ্ঞানের প্রতি তত ঝোক নাই। আন্তরিক শ্রদ্ধা হইতেই আমরা পরলোকগত পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য এই মনে করিয়া শ্রাদ্ধাদি করি; তাঁহারা মরিয়াও আমাদের প্রদত্ত তিল—জল গ্রহণ করিবেন কি করিবেন না সেই বিচার করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। হইতে পারে তাহারা মৃত্যুর পরক্ষণেই স্থূল ও সূক্ষ্ম—উভয়দেহশূন্য হইয়া ভোগাতীত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, হইতে পারে তাহারা স্বকীয় উত্তম কর্ম্মের ফলে নশ্বরত্ব পরিত্যাগ করিয়া পুনর্জন্মবিহীন মোক্ষ পদ লাভ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে তাহা নাও হইতে পারে। সেই সংবাদ জানিবার যখন আমাদের শক্তি নাই, এতদবস্থায় আমরা আমাদের স্ব স্বকর্ত্তব্য কেন করিবনা? তাঁহারা যদি আকাশস্থ নিরালম্ব—বায়ুভূত ও নিরাশ্রয় হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ তাঁহাদেরই বংশধরগণ হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্যের প্রার্থী থাকেন তবে আমরা কেন "এই জল নিন" "এই দুধ নিন" বলিয়া উহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত দুধ জল নিবেদন করিয়া দিবনা? মৃত্যুর পরও যখন তাঁহারা কতক কাল পর্য্যন্ত আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের পানে তাকাইয়া থাকতে পারেন তখন আমরা কেন তাহাদের প্রীত্যর্থে এক গণ্ডূষ জল বা দুধ এবং কয়েকটী স্নেহ ময় পদার্থ—তিল দান করিতে পারিবনা? কতকাল পর্য্যন্ত যে আকাশ মার্গে তাঁহাদের তাদৃশ গতি বিধি থাকিবে বা থাকিতে পারে
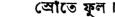
সেই সংবাদে আমাদের প্রয়োজন কি? আমরা জানি ভক্তি, আমরা জানি শ্রদ্ধা। এবং উহাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কেহ কেহ আপত্তি করেন, কৈ সেইজল—বা তিল যেমন ভাবে দেওয়া হয় ঠিক তেমনি ভাবেইত পড়িয়া থাকে, উহা খায় কে এবং কি প্রকারেই বা দেহশূন্য সেই সুক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর ভূতলের তিল জল খাইবে? উহাদেরত এখন হাত পা নাই, মুখ নাই, উদর নাই, ক্ষুধা নাই? আমরাও বলি, না—আছে। স্থূল দেহ নাই বটে কিন্তু একাদশ ইন্দ্রিয় আছে, পঞ্চতন্মাত্রা আছে সূক্ষ্ম শরীরে ত্রিবিধ অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) বর্ত্তমান রহিয়াছে। * অতএব অন্তঃকরণ থাকিলেই অনুভূতি থাকিবে, অথচ—অনুভূতি থাকিলে কামনা, বাসনা, ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিবে। সূক্ষ্ম সূর্য্য রশ্মি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমাদের প্রদত্ত নীর ও ক্ষীর তাহাদের সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত অন্তঃকরণকে তৃপ্ত করে। যাবৎ না পর-দেহ-প্রাপ্তি ঘটে তাবৎ তাহারা আমাদেরই পানে সতৃষ্ণ নয়নে—চাহিয়া থাকেন। কবে যে পরদেহ প্রাপ্তি ঘটিবে তাহাও আমরা জানিনা। পরদেহ প্রাপ্তি ঘটিবে কি না, পুনর্জন্ম নাশ হইবে কি না; ব্রহ্মলোকে গতি হইবে অথবা চন্দ্রলোকে গতি হইবে তাহাও আমরা সঠিক অবগত নহি অতএব আমাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়াই বিধেয়, নতুবা আমাদের কর্ত্তব্যচ্যুতি হয়, পিতৃপুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন হয়, পক্ষান্তরে হয়ত তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীরও তৃষিত চাতকের ন্যায় "জল জল" বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। অতএব দাও বৎস! পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে এক গণ্ডূষ জল দাও। কোনও ব্যয়বাহুল্য নাই। কোনও আড়ম্বর নাই। শুধু এক গণ্ডূষ জল ও একাগ্রচিত্তের শ্রদ্ধা; ইহাই আমাদের আর্য্যগণের জ্ঞান বিজ্ঞান রসায়ন, ইহাই আমাদের জাতিতত্ব, সমাজতত্ব ও ধর্ম্মতত্ব। বিপক্ষে, যে যাহা বলে বলুক।

শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ।

---

* পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্ম পর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥

স্রোতের ফুল।

২৭

পরেশ বাসায় আসিয়া দেখিল মানিকার ঘুম তখনও ভাঙ্গে নাই। সে চারিদিগের জানালা ও দরজাগুলি খুলিয়া দিয়া মানিক্যকে ডাকিয়া সজাগ করিল।

মানিক্য পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শরীরের উপর ভাল করিয়া কাপড় টানিয়া দিয়া বলিল "আমি মারিলাম গো, আমি মারিলাম; আজ আর আমি উঠিতে পারিবনা; তোমাদের খাওয়া করা তোমরা করিয়া লও।"

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁথা খুলিয়া দিব কি?" মানিক্য কম্পিত স্বরে বলিল—"দাও গো, দাও!" পরেশ কাষ্ঠের সিন্দুক হইতে কাপড়ের গাঁঠুরী বাহির করিয়া তাহা হইতে একটা কাঁথা খুলিয়া মানিক্যের আপাদ মস্তক জুড়িয়া মেলিয়া দিল। তখন মানিক্য সমস্ত শরীরে কম্প তুলিয়া কাঁথা টানিয়া লইল।

পরেশ ফরাসে বসিয়া নিজের কাজ করিয়া, আবার স্নানের সময় আসিয়া পুনরায় মানিক্যকে ডাকিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এবেলা খাবে কি?

মানিক্য তেমনি কম্পিত কণ্ঠে বলিল "আমি কিছুই খাইব না; তোমার চিন্তা তুমি কর।"

মানিক্য বলিল—"আমি মামার বাসায়ই খাইব, তোমার জন্য সাবুদানা আনিয়া রাখিয়া যাইব, যখন ক্ষুধা হয় খাইও।"

পরেশ স্নান আহার শেষ করিয়া আসিয়া পুনরায় মানিক্যকে ডাকিয়া বলিল "এই তোমার জন্য সাবু-মিশ্রী রাখিলাম; আফিসের সময় হইয়াছে, সুশীলের বোনকে বলিয়া যাই, তোমার জন্য আসিয়া সাবু জাল দিয়া দিবে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না।"

পরেশ প্রফুল্লকে ভাল করিয়া দেখে নাই। একটী ঘোমটা দেওয়া মেয়ে নীচের কোঠায় থাকে—তাহার চলা ফিরার আভাসে সে টের পাইয়াছে মাত্র। পরেশের চরিত্র যতই খারাপ হউক পরস্ত্রীকে চেষ্টা করিয়া দেখিবার মত তাহার স্বভাব ছিলনা। বিশেষ সুশীলের বোন সম্বন্ধে সে বিশেষ সতর্কতা নিয়াই যাতায়াত করিত;

কারণ সুশীলের নিকট তাহার নিজের দোষ অগোচর ছিল না।

পরেশ আজ প্রফুল্লকে ডাকিয়া সম্মুখে আনিয়া কথা বলিবে ও উপরে আসিয়া মাণিক্যের সাবু রাঁধিয়া দিতে বলিবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া নীচে নামিল।

সে নীচে নামিয়াই দেখিল সুশীল প্রফুল্লর জন্য ভাতের থালা গামছায় লুকাইয়া লইয়া আসিয়া সদর দরজা পার হইয়াছে।

পরেশ হাসিমুখে বলিল "ভাই আমার অবস্থাতো বলিয়াছিই, আমি আফিসে যাইতেছি ; ওকে যদি খাবার পর, একটু উপরে যাইতে বল, ভাল হয়। আমি সাবু টাবু প্রস্তুত করিতে আর সময় পাইলাম না......"

সুশীল সাগ্রহে বলিল—"আমি সাবু রাঁধাইয়া পাঠাইয়া দিয়া যাইব, তারপর আসিয়া সে খাইবে।"

পরেশ বলিল—"না, না, আগে যেন রাঁধেনা; খাইবে কি না এবং কখন খাইবে জানিয়াই যেন রাঁধে। খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া যেন যায়। একা একা বসিয়া দুঃখের চিন্তা অপেক্ষা কথার প্রসঙ্গে থাকা ভাল..."

সুশীল হাসিয়া বলিল— বাঁশ-বেত আনিয়াছি, আর কি তার চিন্তার সময় আছে, সে তেমন মেয়েই নয়, তুমি জাননা!..."

পরেশের সে সময় আর প্রফুল্লকে সম্ভাষণ করা হইল না। সে আফিসে চলিয়া গেল।

প্রফুল্ল আহার শেষ করিয়া অতি ভয়ে ভয়ে উপরে আসিল। দুতলা দালানে সে আর কখনও উঠে নাই। তাহার প্রতি পদক্ষেপ ভাবের ও চেষ্টার।

সিড়ির মুখেই বৈঠক খানা। বৈঠক খানার দরজা তখন বন্ধ ছিল। প্রফুল্ল বৈটক খান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। চারিদিকে দেয়ালের গায়ে কালী, দুর্গা ও রাধা কৃষ্ণের পট। সুশীল তাহাকে বলিয়াছিল—পরেশ সৌখিন শিল্পী। বাস্তবিক পরেশ যে সৌখিন শিল্পী প্রফুল্ল তাহার বৈঠকখানার সাজ সজ্জা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল। বৈঠক খানার ছাদে লাল, নীল, সবুজ বর্ণের কাঁচের ফানুষ ঝুলিতেছিল ; মাঝখানে একটী স্ফটিকের বেল।

প্রফুল্ল এরূপ বেল-ফানুষ-ঝালরার বাড়ীতেও দেখিয়াছে ; নিজের বাড়ীতে দেখিয়াছে কি না স্পষ্ট মনে হইতে ছিল না।

প্রফুল্ল বৈঠক খানা ঘরের চারিদিক জানালাদিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া পরের কোঠায় গেল।

পালঙ্কের উপর মাণিক্য শয়ান ছিল। প্রফুল্লকে দেখিয়া সে তাহাকে ডাকিল। প্রফুল্ল নীচের চৌকির পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাকে কি এখন সাবু করিয়া দিব—খাইবেন ?"

মাণিক্য নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণা ব্যঞ্জক স্বরে বলিল—"নাঃ। সাও খাইব না।"

প্রফুল্ল—"তবে কি খাইবেন ?"

মাণিক্য বলিল—ভাতই খাইব, তোমার কিছু করিতে হইবে না, আমি খাই যদি তো রাঁধিয়াই খাইব।

প্রফুল্ল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেয়ালের গায়ে আটা ছবি-চিত্র গুলি দেখিতে লাগিল।

মাণিক্য বলিল—"এ আমাদের বাবুর নিজ হাতের আঁকা ছবি; সে কোঠাতেও তাহার হাতের ছবি আছে।"

প্রফুল্ল আগ্রহের সহিত ছবি গুলির নিকটে যাইয়া যাইয়া দেখিতে লাগিল।

মাণিক্যের শিয়রে ঝুলান আয়নার ফ্রেমেআটা একখানা ছবির প্রতি প্রফুল্লের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রফুল্ল ছবিখানার নিকটে যাইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সেই ছবিখানা দেখিতে লাগিল।

প্রফুল্ল বলিল—"ছবিখানা নামাই দিদি।"

মাণিক্য বলিল—সাবধানে নামাও, ঠিক করিয়া রাখিয়া দিও।

অতি ধীরে সন্তর্পণে প্রফুল্ল আয়নাখানা নামাইয়া আনিয়া তাহার নীচে লিখিত—ছবির নামটী পড়িল—স্রোতের ফুল।

প্রবল জল প্লাবনে বাড়ীঘর ভাসিয়া যাইতেছে ; তারমধ্যে একটী যুবক একটী বালিকাকে একটা ভাসমান কাঠের উপর শুয়াইয়া দিয়া স্থির দৃষ্টিতে সেই বালিকার স্পন্দন শূন্য মুখ খানা যেন নিরীক্ষণ করিতেছে—প্রফুল্ল অনেকক্ষণ একদৃষ্টে ছবির দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার

মুখে কথা ফুটিতেছিল না; কিন্তু এক এক বার কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল—পারিতেছিল না।

অনেকক্ষণ এইরূপ থাকিয়া মনের আবেগ ও সংকোচ দূর করিয়া ধীরে ধীরে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল—"একিসের ছবি? একেবারে যে জলময় সব দেখাযায় বাড়ীঘর ডুবিয়া যাইতেছে, একটী লোক জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া…"

প্রফুল্ল আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠস্বরে জড়তা বাঁধিয়া গেল।

মাণিক্য বলিল—"এ বাবুর দেশের বাড়ীর ছবি। যে বান ডাকিয়া তাহাদের বাড়ীঘর নষ্ট হইয়াছিল—এ তাহারই ছবি…"

প্রফুল্ল বলিল—"একটী মরা মেয়ের ছবি নাকি?

"বাবুর নিজের আর তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছবি। এ ছবি আন্দাজি আঁকা—অনেক দিনপরে আঁকিয়াছেন, ভাল হয় নাই।" বলিয়া মাণিক্য মুখ ভঙ্গি করিয়া চিত্র শিল্পির প্রতি তাচ্ছল্য ভাব দেখাইল।

প্রফুল্ল হৃদয়ে বল বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ছবিখানা যথাস্থানে ঝুলাইয়া রাখিয়া বলিল—তবে এখন যাই দিদি; যদি দরকার হয়, ডাকিবেন; উপর হইতে ডাকিলেই শুনিতে পাইব। বাঁশের বেত তুলিতে হইবে, বাঁশগুলি শুখাইয়া গেলে শক্ত হইয়া যাইবে।"

প্রফুল্ল ধীরে ধীরে বাহির আসিয়া পুনরায় বৈঠকখানাটা চুপিদিয়া দেখিল, তারপর নীচে নামিয়গিয়া নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

২৮

পরেশ অন্যান্য দিন হইতে শীঘ্র বাসায় আসিতে চেষ্টা করিয়াও সেদিন শীঘ্র আসিতে পারিল না। বাসায় শীঘ্র আসিতে যে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, সে ত্যাগের সহিত মাণিক্যের অবস্থার তুলনা করিয়া একটু বিলম্ব করার দিকেই তাহার মনের কাটা নামিয়া গিয়াছিল বেশী। সেজন্য যাই যাই করিয়াও সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিছুতেই গৃহে ফিরিতে পারিল না। এদিকে দুটা আড়াইটার সময়ই মানিক্য চারিটা বেগুন ভাতে রাঁধিয়া খাইয়া সটান ঘুমাইয়া উঠিল।

ঘুম ভাঙ্গিয়াও যখন দেখিল পরেশের কোন খবরই নাই, তখন মানিক্যের মনে রাগ জন্মিয়া গেল। সে সিন্ধুক খুলিয়া তাহার নিজ তহবিলটী একবার গুণিল, নিত্যকার বাজার খরচের তহবিলটা দেখিল। তারপর তাহা বন্ধ করিয়া রাখিয়া পুনরায় শুইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় পরেশ গৃহে আসিল মানিক্য সেই সন্ধ্যায়ও পরেশের গায়ের সালটীর চাদ্দরখানা পায়ে মাথায় জড়াইয়া যেন অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল।

পরেশ কাপড় ছাড়িয়া ধীরে ধীরে মাণিক্যের কাছে আসিয়া সস্নেহে তাহার পিঠ ঠেলিয়া বলিল—মাণিক্য, এই সন্ধ্যাবেলায়ও কি উঠিতে নাই, এমন সময় যে পশু পক্ষিতেও একটু নড়িয়া চড়িয়া বসে। শরীর এখন কেমন তোমার?"

পরেশ মাণিক্যের শরীরে হাত দিতে চেষ্টা করিলে মানিক্য তাহার হাত ঠেলিয়া দিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল—"আর কাজ নাই পীরিতির—শরীর কেমন? আমার শরীর কেমন, তা দিয়া তোমার কি হইবে? তুমি যাও না সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাছারী কর গিয়া!"

পরেশ হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল বকলটা বড় মস্ত ছিল কিছুতেই বেলা থাকিতে শেষ করিতে পারিলাম না। এদিকে আজ না দিলে পাঁচটা টাকা যায়। তোমার সাবু করিয়া দিয়া গিয়াছিল তো? কেমন শরীর এখন?

মাণিক্য ভ্রূকটী করিয়া বলিল "আমি এ 'নেকটী ভেকটী' শুনতে চাই না। "পাঠায়বলে 'প্রাণে মরিলাম, গৃহস্থ বলে আলবনী খাইলাম'। আমি মরী আর তার পাঁচটী টেহা।"

এই নাও পাঁচটী টাকা" বলিয়া পরেশ মাণিক্যর সম্মুখে টাকা পাঁচটী কোমর হইতে খুলিয়া রাখিয়া দিল, পরেশ বলিতে লাগিল—"তোমার শরীর এখন প্রায়ই কাতর থাকে। ভাল চাকরানীও পাওয়া যায় না—বলতো সুশীলের বোনকে রাখিয়া দেওয়া যাউক। সে……

মাণিক্য গর্জ্জিয়া উঠিয়া তাহার মুখের কথা চাপিয়া লইয়া বলিল—সে—আসিবে কি করিতে, কাজ করিয়া খাওয়াইতে; না … আমি এই কিছু পীড়িতি চাই না, মরিতে হয় তুমি নিজেই নীচে গিয়া মর—যাও!"

পরেশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—তবে তোমাকে এখন চালা ইবে কে? আমারওতো কেবল পাথার বাতাস খাই-য়াই পেট ভরিবে না। চাকর চাকরাণী রাখিলে দুদিনের বেশী টিকিতে চায় না; আমি কি সারাদিনের আফিসের খাটনির পর ঘরে আসিয়া তোমার জন্ম আর খাটিতে পারি? শরীরে কত সহ্য হয়?"

মাণিক্য তেমনি উচ্চ গলায় বলিল—চাকর চাকরানী টিকে না আমার জ্বালায়— না?"

পরেশ বলিল—"যাহা মনে লয়' কর, আমি আর তোমার খাটুনি খাটিতে পারিব না।"

মাণিক্য বলিল—"তা আর পারিবে কেন? বেত বাঁশ মাথায় করিয়া আনিতে সামান যায় না; ঘরে আসিয়া নিজের ভাতটা রাঁধিয়া খাইতেই যত খাটুনী!

পরেশ বলিল—"তা আমি পারিব না, আমি সুশীলের বোনকেই রাত্রিতে রাঁধিতে বলিব, এত দূরে গিয়া রাত খাইতে পারিব না।"

মাণিক্য চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল — "সাবধান, ওই আজাত কুজাত যদি আমার ঘরে আনতো আজ তোমার এক দিন আর তার এক দিন।"

পরেশ হতাশ হইয়া বলিল—"তবে আজ আর বুঝি অদৃষ্টে খাওয়া নাই। সেই কখন চারটা ভাত খাইয়া আফিসে দৌড়াইয়াছি—এত বড় দিন। তুমিই বা খাইবে কি? সেই কোন বেলা একটু সাবু......"

মাণিক্য কোন উত্তর দিল না। পরেশও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নিজ শরীরে পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া পরেশ প্রদীপ জ্বালিল। তারপর মাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করিল "রাত তুমি খাইবে কি?"

মাণিক্য কোন উত্তর করিল না।

উত্তর না পাইয়া পরেশ কাপড় জুতা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রফুল্লর প্রতি পরেশের সহানুভূতির আভাস পাইয়াও মাণিক্যর তত ভয় হইয়াছিল না, যত ভয় প্রফুল্লকে টানিয়া নিজ সংসারে আনিয়া প্রবেশ করাইবার প্রস্তাবে হইয়াছিল। এই প্রস্তাব শুনিয়া মাণিক্য প্রমাদ গণিল। সে বুঝিতে পারিল প্রফুল্লর সৌন্দর্য্য পরেশের মাথা কত খানি ঘুলাইয়া দিয়াছে। তাই পরেশের সেই প্রস্তাবের মুহূর্ত্ত হইতেই মাণিক্যর মনে প্রফুল্লর প্রতি একটা কঠোর বিদ্বেষ ভাব প্রবল হইয়া উঠিল। পরেশের প্রতিও তার সন্দেহের মাত্রা চরমে উঠিল।

পরেশ বাহির হইয়া যাইতেই মাণিক্যর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া জানালা খুলিয়া চাহিয়া রহিল। সে দেখিবে আজ পরেশ কোন দিকে যায়।

পরেশ নামিয়াই প্রফুল্লর ঘরের দিকে যাইয়া ডাকিল —"সুশীল ঘরে আছ কি?"

সুশীল ঘরে ছিল না। প্রফুল্ল দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া বাঁশের বেত তুলিতেছিল। পরেশ খুব উচ্চ গলায় ডাকিতেছিল না, তাই তার সে ক্ষীণ আহ্বান প্রফুল্লর কর্ণে প্রবেশ করে নাই।

পরেশ প্রফুল্লকে একবার দেখিয়া কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার এই ইচ্ছা সে প্রাতঃকালে সুশীলকে জানাইয়াছিল; সুশীলও সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছিল। যদি সম্ভব হয় পরেশ এখনই প্রফুল্লকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে অথবা অন্ততঃ তাহাকে একবার দেখিতে পারে—এই ভাব মনে লইয়া সুশীলকে ডাকিতে ডাকিতে পরেশ যাইয়া যখন প্রফুল্লর ঘরের দরজায় পঁহুছিল, তখন মাণিক্য উপর হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল—"যাও—মর গিয়া—মর গিয়া—মর গিয়া—"

পরেশ উপরের দিকে চাহিয়া প্রমাদ গণিল। সে লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া তাড়াতাড়ি আঙ্গিনা পার হইয়া গেল।

(২৯)

মাণিক্য নীচে নামিয়া আসিয়া প্রফুল্লর দরজায় সজোরে পদাঘাত করিল। প্রফুল্ল প্রথমে বাহিরের বিপদ আশঙ্কা করিয়া ভয় পাইয়াছিল। মাণিক্যর চীৎকার শুনিয়া তাহার সে ভয় দূর হইল, সে দরজা খুলিয়া দিল।

মাণিক্য চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—

এই তোমাকে দোহরা বার বলিতেছি—এর পর আর মুখে বলিব না, ঝাঁটা মারিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিব। ভাতারের ঘরে নাই ঠাঁই, পরের ঘরে আঠারো ভাই।

প্রফুল্ল কিছুই জানে না। সুতরাং মাণিক্যের সম্ভাষণে সে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে বলিল—

"আপনি কাহাকে কি বলিতেছেন? আমি তো কিছুই জানি না ..."

মাণিক্য চেঁচাইয়া বলিল—ঘোমটার নীচে খেমটার নাচ্ যারা নাচে, তারা মুখে কিছুই জানে না।"

প্রফুল্ল মাণিক্যর পা ধরিয়া বলিল—সত্যি দিদি আমি কিছুই জানি না; আপনারও বোধ হয় সে দিনের মতই ভুল হইয়াছে ... ..."

মাণিক্য জোরে পা টানিয়া লইয়া বলিল—কিছুই জানি না—ভাতার কুড়ানী মাগী—এখ্খনি ঝাঁটা মারিয়া বাহির করিয়া দিব ... ...

প্রফুল্ল যেমন করিয়া মাণিক্যর পায়ে ধরিয়া বসিয়াছিল ঠিক তেমন করিয়াই সে অধোবদনে বসিয়া রহিল, তাহার মুখ হইতে আর একটি কথাও বাহির হইল না। মাণিক্য যে শ্রেণীর লোক তাহার মুখ হইতে ঠিক সেই রূপ ইতর ভাষা বাহির হইতে লাগিল; সে কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা লেখনি কলঙ্কিত করিব না।

প্রফুল্ল মাণিক্যের এইরূপ শাসনের কোন কারণ খুজিয়া পাইল না। সে নীরবে বিধি লিপি মানিয়া চক্ষু জলে সে বিধি লিপির তর্পন করিলমাত্র।

সুশীল আসিলে সে এ সব কথা কিছুই বলিল না; কেবল বলিল—"দাদা তুমি আমার সম্পর্কে আর কাহাকেও কোন কথা বলিও না, আমিএ গুলি প্রকাশ করিতে মনে বড় কষ্ট পাই; যে বিষয়ের প্রতিকার নাই, অসম্ভব বা তাহার আলোচনায় লাভ নাই, তাহার জানাজানি একেবারে না হওয়াই ভাল। আমি মনকে স্থির করিয়াছি, আর কাঁদিব না, কোন বিষয় ভাবিব না। আমার ভাবনার শেষ হইয়াছে।',

সুশীল বলিল—"তেমন উচ্চ ভাব মনে থাকাতো ভালই। তবে আমি তোমাকে আমার ভগ্নি বলিয়া পরিচয় দিয়া এরূপে কত দিন রাখিব? তোমার বয়স হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় তোমার নিকট আমার যাতায়াত লোকের চক্ষে এবং নিজের পক্ষেও শোভা পায়না এবং সঙ্গত নহে।'

প্রফুল্ল বলিল যাহার এরূপ একটী হতভাগিনী বোন আছে, সে কি লোকের ভয়ে তাহাকে ফেলিয়া দেয়?"

সুশীল—যাহারা বোন বলিয়া মনে করিবে তাহারা অবশ্য কিছু বলিবে না কিন্তু দেশের লোকে জানিলে বা এখানকার লোকে টের পাইলে—তাহারা যা' তা বলিতে ইতঃস্তত করিবে না। তখন আমার তোমার উভয়ের অবস্থাই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রফুল্ল বলিল—"তবে আপনি কি করিতে চান?"

সুশীল—তুমি ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলে আমি সে ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। তাহাই আমি তোমার পক্ষে মঙ্গল জনক ও বলিয়া মনে করি, চির জীবন এরূপ থাকিয়া ......

সুশীল যাহা বলিতে চাহিয়াছিল প্রকাশ করিয়া তাহা বলিতে পারিল না। প্রফুল্ল সুশীলের মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—"দাদা" আমি তোমার আশ্রয়ে বেশ নিরাপদে আছি! আমি তোমার বোন্; মা'র পেটের বোন্ ছাড়া কি মানুষের অন্য রকমের বোন থাকিতে পারে না? ..."

সুশীল প্রফুল্লর কথায় লজ্জিত হইয়া বলিল—

খু্ব পারে দিদি, তুমি যে আমার স্নেহের বোন, শ্রদ্ধার দিদি, এ আমি দিনে দিনে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। কিন্তু লোকে কি তা বুঝিবে?

প্রফুল্ল "দাদা তুমি আর আমি বুঝিলেই হইবে। আর কারো কথা আমি গ্রাহ্য করি না।"

সুশীল—মনে কর, তোমার স্বামীকে যদি এখন পাওয়া যায়, তবে তিনি কি ... ..."

প্রফুল্ল বাধা দিয়া বলিল—"অসম্ভব কথা তুলিওনা দাদা; স্বামী আমার ভগবানের আশীর্ব্বাদে সুখে থাকুন, আমি মনেমনে তাহাকে আরতি করিয়াই সুখে থাকিব?"

সুশীল প্রফুল্লর মনের দৃঢ়তা অনুভব করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িল।

৩০

মাণিক্য নিশ্চিত বুঝিয়াছিল, প্রফুল্লর টুকটুকে মুখ খানা পরেশের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। সে রাত ভরিয়া নানা উপায় ও প্রতিকার চিন্তা করিয়া অস্থির হইয়া গেল। পরেশের সহিত সে রাত্রিতে ও পর দিন আফিসে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার একটী কথাও হইল না। পরেশ ও নীরবে সময় কাটাইল। এরূপটী তাহাদের মধ্যে প্রায়ই হয়—আজও হইল। বিশেষত্ব ইহার মধ্যে কিছুই ছিল না।

আজ মানিক্য নানা অসুখের ভাণ করিয়াও রান্না করিয়া পরেশ কে খাওয়াইয়াছিল। পরেশ আহার করিয়া আফিসে চলিয়া গেলে পর মানিক্য বেশ সাজ সজ্জা করিয়া আসিয়া প্রফুল্লকে বলিল—"ওগো কাপড় নেও দেখি বাবু, এই টাকা দিয়া গিয়াছেন আর বলিয়া গিয়াছেন—ঢাকেশ্বরীর বাড়ী যাইতে—তোমাকেও লইয়া যাইতে—যদি যাইতে আপত্তি না থাকে, শিগ্গির চল—সকালেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। বাবু ও আফিস হইতে সে খানে যাইবেন।'

প্রফুল্ল মাণিক্যকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। এখন তাহার কথা গুলি শুনিয়া আবস্ত হইল; সে এ বিষয়ের কি উত্তর দিবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতে ছিল না। ঢাকেশ্বরী দর্শনের সাধ ঢাকায় আসিয়া কাহার না হয়? অথচ এমন সুযোগ সকল সময় মিলে না। তার পর আশ্রয় দাতা বাবু নিজে আদর করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। অপর দিকে দাদা কে না জানাইয়াই বা কি প্রকারে যাই? প্রফুল্ল মাণিক্যের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া এই রূপ সাত পাচ ভাবিতে ছিল। কোন উত্তর দিতে পারিতে ছিল না।

মাণিক্য বলিল—তবে তুমি যাইবে না? বাবু জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব? তিনি যখন জিজ্ঞাসা করিবেন যে সুশীলের বোন আসিল না কেন? তখন কি বলিব?"

প্রফুল্ল বলিল—"সে কতদূর? যাইবেন কিসে?"

মাণিক্য বলিল—সে দিল্লী নয়, এই ঢাকাতেইত; ঘোড়ার গাড়ীতে যাইব সেই গাড়ীতেই ফিরিব। তিনটার মধ্যেই ফিরিতে হইবে; অসুখ শরীর লইয়া কতক্ষণ থাকিব? এই ধর—ঢাকেশ্বরীর বাড়ী, রমনার কালীবাড়ি, দেলখোস বাগ, হোসেনী দালান, বিবি পন্নী এই কয়টা দেখিয়াই চলিয়া আসিব। বাবুও সঙ্গে থাকিবেন।

যদিও তামাসা দেখিবার মত সখ বা খেয়াল প্রফুল্লর মোটেই ছিল না, তথাপি বাবু সঙ্গে থাকিয়া এগুলি দেখাইবে—এরূপ দেখার প্রলোভন সে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিলনা। সে একটু অনুযোগের সুরে বলিল—"দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম না, বাবু তো বোধ হয় আফিসে যাইবার পূর্ব্বেই বলিয়াগিয়াছিলেন, আমাকে তখন জানাইলেই তো হইত, আমি দাদাকে বলিয়া রাখিতাম।"

মাণিক্য মুখ ভঙ্গি করিয়া বলিল—"তিনি আদর করিয়া বলিয়াছেন, এর পরও যে ঘাটে ঘাটে অনুমতির দরকার হবে, তা তো জানা ছিল না; তা তুমি না যাও, না যাইবে, আমি একাই যাইতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে বলিব সুশীল বাবুকে না বলিয়া সে অন্তের কথায় নড়িতে পারে না।" ত্রস্তভাবে মাণিক্য গমনোদ্যত হইল।

প্রফুল্ল বলিল—না দিদি, বাবু বলিলেও যে আমি যাইতে না পারি তা নয়, তবে তিনি আমাকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন জানিলে আমি দাদাকেও বলিয়া রাখিতাম।

মাণিক্য বিরক্ত হইয়া বলিল—"অত কথার পেচের কাজ কি—আসল কথা তুমি যাইবে না।"

প্রফুল্ল তখন নানা দিক ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা আমি যাইব।

মাণিক্য বলিল—"তবে কাপড় লও, আমি গাড়ী ডাকি।"

মাণিক্য ও প্রফুল্লকে লইয়া গাড়ী চলিল। প্রফুল্ল জানালা তুলিয়া—ঢাকার অলিগলি দালান কোঠা দেখিতে লাগিল। বড় রাস্তার পর ছোট রাস্তা, ছোট রাস্তার পর বড় রাস্তা—অতিক্রম করিয়া গাড়ী চলিতে চলিতে হটাৎ আসিয়া এক জায়গায় থামিল।

গাড়ী থামিলে মাণিক্য প্রফুল্লকে বলিল—"তুমি গাড়ীতে থাক, আমি এই আসিতেছি—"

প্রফুল্লর মুখে কথা বাহির হইবার অবসর না দিয়াই মাণিক্য নামিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই আবার গাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

গাড়ী পুনরায় চলিল।

ঢাকেশ্বরীর বাড়ীর দরজায় আসিয়া গাড়ী থামিলে মাণিক্য বলিল—"নামিয়া আইস,এই ঢাকেশ্বরীর বাড়ী।"

প্রফুল্ল ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে ঢাকেশ্বরীর দরজায় পড়িয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতে যাইয়া সে প্রাণের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল।

মাণিক্য বলিল—ছিঃ! চক্ষের জল ফেলিতে নাই! তোমার যে রূপ-যৌবন—এ রূপ-যৌবন লইয়া কোন মেয়েই চক্ষের জল ফেলে না—বহু পুরুষেরই চক্ষের জল ফেলাইতে থাকে..."

এরূপ অযথা রসিকতায় প্রফুল্লর রাগ হইয়াছিল, সে সেদিকে মনোযোগ না দিয়া বলিল—বাবুকে তো দেখি না দিদি?"

মাণিক্য ঠাট্টা করিয়া বলিল—"বাবুকে দেখিলেই কি প্রাণটা ঠাণ্ডা হইবে, আমরা কি কিছুই না? জলে পড়িয়া গেছ বুঝি!"

প্রফুল্ল রাগে মুখ কাল করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মাণিক্য প্রফুল্লর মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—"তিনি বোধ হয় আসিতে পারেন নাই, আর একটু অপেক্ষা করিয়া দেখি, তারপরও না আসিলে—চল আমরা চলিয়া যাই! তাহাই হইল। কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল—তিনি যখন আজ আর আসিতে পারিলেন না—তখন আর অন্ত স্থানে যাওয়া হইল না—চল আমরা চলিয়া যাই!

গাড়ী পুনরায় পূর্ব্ব পথে চলিল।

মাণিক্যের ইঙ্গিতে পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া গাড়ী থামিল।

মাণিক্য প্রফুল্লকে বলিল—"নাম এখানে কালীবাড়ী দর্শন করিয়া যাই।"

প্রফুল্ল নামিয়া মাণিক্যের অনুসরণ করিল।

গলির মধ্যে যাইয়া মাণিক্য বলিল—"এই কালীবাড়ী, চল প্রণাম করিয়া আসি।"

গেটের কপাট ঠেলিয়া মাণিক্য প্রফুল্লকে লইয়া একটা পাকা বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া প্রফুল্ল ও মাণিক্যকে বসিবার জন্ত একখানা বেঞ্চ দেখাইয়া দিল।

মাণিক্য প্রফুল্লকে বলিল—"একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, মন্দিরের দরজা খোলা হয় নাই; আমি দরজা খুলিবার বন্দোবস্ত করি, তুমি একটু বস এই খানে।"

মাণিক্য ত্রস্ত পদে আঙ্গিনা পার হইয়া গেল। বৃদ্ধা আসিয়া গেটের কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

অনেক ক্ষণ চলিয়া গেল, তথাপি মাণিক্য আসিল না দেখিয়া প্রফুল্লর সন্দেহ হইল ভয়ও হইল।

প্রফুল্ল ভয়ে ভয়ে সেই বৃদ্ধার নিকট জিজ্ঞাসা করিল—তিনি গেলেন কোথায় মা?"

বৃদ্ধা বলিল—"ডর কি মা, তুমি ঘরে গিয়া বও, হে মেয়ে অখনি আইবে।"

প্রফুল্ল ঘরে গেল না দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধাও নড়িল না।

আরও কিছুকাল চলিয়া গেল, তবু মাণিক্য আসিল না।

প্রফুল্ল বলিল—তবে আমি গাড়ীতেই গিয়া বসি মা...

প্রফুল্ল যাইতে উদ্যত হইলে বৃদ্ধা স্নেহের সুরে বলিল—"তুমি কোথায় যাইবার চাও। মাণিক্য আইলে আমার নিকট দাবি করিলে, আমি তারে কি বৈলা জবাব দিমু।

বলিয়া বৃদ্ধা প্রফুল্লকে হাতে ধরিয়া সস্নেহে টানিয়া উপরের ঘরে লইয়া গেল।"

প্রফুল্ল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃদ্ধার মুষ্টি ছাড়াইয়া নিতে পারিল না। বৃদ্ধা মাণিক্যকে জানে চিনে দেখিয়া অধিক জোড় করা সঙ্গতও মনে করিল না।

বৃদ্ধা প্রফুল্লকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, দেখিয়া প্রফুল্লর ভয় হইল।

প্রফুল্ল ভয় পাইয়া আতঙ্কের সহিত বলিল—"আমাকে কোথায় আনিলে? কেন দরজা বন্ধ কর?

বুদ্ধা বলিল--"সুখে থাকিবে মা, সুখে থাকিবে এ ঘর তোমারই—এ রূপ যৌবন বিথায় যাইবে কেন মা?"

প্রফুল্ল এতক্ষণে তাহার বিপদ বুঝিল। সে বুঝিল মাণিক্য নিশ্চয় তাহাকে ছল করিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছে এবং এই বুদ্ধার কবলে নির্ব্বাসিত করিয়া গিয়াছে।

বৈঠক খানার জাঁক জমক-সাজ সজ্জা দেখিয়া প্রফুল্ল বুঝিল ইহা নিশ্চয় কোন বড় লোকের বাড়ী।

বহু বিপদে পড়িয়া পড়িয়া প্রফুল্লর ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা বিলক্ষণ জন্মিয়াছিল। সে বুদ্ধাকে বলিল "আমাকে যাইতে দেও আমি এখানে থাকিব না; যাইতে না দিলে আমি চীৎকার করিয়া লোক জমাইব।"

বুদ্ধা বলিল "পাগলি মাঞা পাগলামি করিচ না মানিক্য আইলে তার সঙ্গে যাইও একেলা একেলা কৈ যাইবে?"

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল-"মানিক্যকে কি তোমরা জান?"

বুদ্ধা হাসিয়া বলিল -"হেতো আমাগোই ঘরের মাইয়া জানিবনা কেন? হেঁক কোন অজানা ঠাঁইত তোমাকে রাইখ্যা গেছে?"

প্রফুল্ল—"এ বাড়ী কার?"

"আজ থেকা তোমারই এই বাড়ী।" বলিয়া বুদ্ধা প্রফুল্ল চিবুক ধরিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিল।

বুদ্ধার হাত ঠেলিয়া দিয়া প্রফুল্ল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "আমাকে ছুইওনা তুমি।"

তবে থাক্। তর কেমন আকল--"বলিয়া বুদ্ধা গড় গড় করিতে করিতে বাহির হইয়া গিয়া দড়জার সিকল আটিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

খেওড়া নুণের খনি ও কটাক্ষরাজ।

সামুদ্রিক লবণ কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, ভারতবর্ষ প্রায় তিন দিকেই সমুদ্র বেষ্টিত বলিয়া ভারতবাসীরা কিছু না কিছু সে বিষয় খবর রাখে। ইহা ব্যতীত দেশীয় লবণ আর কয়েক প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, খেওড়া নুণের খনি তাহার অন্যতম। আজ তাহারই কথা বিবৃত করিব। কটাক্ষরাজ ইহার নিকটবর্ত্তী একটী মহাপীঠ সুতরাং সে বিষয়েও দুই এক কথা বলা এক্ষেত্রে অসঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

খেওড়া পঞ্জাবের পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। আমরা সৈন্ধপ লবণ খেওড়া হইতেই পাইয়া থাকি। সম্বর হ্রদ, পচভদ্রা, বগ্‌গ, সকরওয়াল, ধারওয়াল, মেক্‌লিয়ড প্রভৃতি খনিতেও আমরা দেশীয় পবিত্র লবণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। খেওড়ার কথাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। পঞ্জাবের আসল রেল (main line) রাস্তায় লাল'মুসা ষ্টেসন, এখান হইতেই খেওড়া নামক শাখা লাইনে নুণের খনিতে যাইতে হয়। ক্ষুদ্র লাইন, মাঝে দু একটী মাত্র ষ্টেশন, উহা কেবল লবনের কারখানার যাতায়াতের উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে। এই লবণের খনিকে মেওমাইন্‌স ও কহিয়া থাকে, লর্ডমেয়ো ইহা গবর্ণমেণ্টের হস্তগত করেন। এই খনি পিণ্ডিদাদন খাঁ তহশীলে পিনাম জেলার অন্তর্গত।

সে অনেক দিনের কথা আমার মাথায় তখন ভ্রমণের উনপঞ্চাশ বায়ু ঘুরিতেছিল। আমি তখন পঞ্জাবে। লাহোরের কোন বাঙ্গালী বন্ধুর মুখে খেওড়ার পবিত্র সৈন্ধপলবণ প্রস্তুত বিবরণ ও কটাক্ষরাজ তীর্থ কাহিনী অবগত হইয়া উহা দেখিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। তারপর একদিন সত্যসত্যই খেওড়া যাত্রা করিলাম। লাহোরের বন্ধুদিগের নিকট হইতে খেওড়াও অন্যান্য স্থানের পত্র সংগ্রহ করিয়া নিয়াছিলাম। পথে নানা সহর ও দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়া একদিন লালামুসা ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া দেখি, একজন সে দেশীয় রেলের ভদ্রলোক কর্ম্মচারী আমার পরিচয় প্রার্থী হইলেন। আমার পরিচয় পাইয়া তিনি আমার লটবহর কুলীর মাথায় চাপাইয়া তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। এতটা খাতিরের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, নুণের খনির বাবুরা আমাকে পাইলেই গ্রেপ্তার করিয়া হেপাজাতে রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিলাম এইটুক আমার লাহোরস্থ বন্ধুর পত্রের দৌলতে হইয়াছে। আমি নিরাপত্যে পুলিশের মুখে হাজতী আসামীর ন্যায় আস্তে আস্তে বিদেশী বন্ধুর অনুসরণ করিলাম। অনেকেই

বলেন, পঞ্জাবীরা বড় লম্বা, যেন সুপারী গাছের আগায় তাদের মাথা। ইহারও ব্যভিচার এখানেই পাইলাম। নব পরিচিত বন্ধু পঞ্জাবী কিন্তু বেঁটে পুরুষ, স-শিখ ব্রাহ্মণ তাঁহার ঘরে গেলে, তাঁহার মেয়ে এক শিশি সুগন্ধি তৈল রাখিয়া চলিয়া গেল। বুঝিলাম আমাকে এখানে অনেক রকম কাজ করিতে হইবে।

আবগারী বিভাগের যৎসামান্য একটা শাখার সঙ্গে আমার পরিচয়। সেই তাম্রকূট বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় অগত্যা নূতন বন্ধু বন্ধুবরকে তা স্মরণ করাইয়া দিলাম। বন্ধুর বেশী বেগ পাইতে হইল না, আমার সঙ্গে সবই আছে, ভৃত্য আসিয়া সাজিয়া ঢালিতে ও চালিয়া সাজিতে লাগিল, বাড়ীওয়ালা তামাক খান না। বেলা তখন প্রায় দশটা, শীতকাল, মালগাড়ীতে চাপিয়া তখনই যাইতে পারিতাম, পূর্ব্বে খবর থাকিলে রেলের বাবুরাই এ সুবিধাটুকু ভ্রমণকারীদের জন্য করিয়া দেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে বিশ্রামার্থ বসিলে অপর কয়েকটী রেলের বাবু আসিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহারা আমার ভ্রমণ বিষয়ের কোন কোন কথা বিশেষতঃ বাঙ্গলা ও কলিকাতা সম্বন্ধে নানা বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ভ্রমণকারীরা প্রায় সকলেই চা পায়ী, আমিও তদবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তখন বন্ধুর আপ্যায়নে আবদ্ধ হইলেও তখন চায়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রচুর আয়োজন যথাসম্ভব সময়ে আহারাদি করিলাম। বিকালে একখানা গাড়ী আসিল শব্দ পাইয়াই বিদেশী বন্ধু বলিলেন এইবার গাড়ী আসিয়াছে বেশী বিলম্ব নাই ইহার পরই ঘোড়ার গাড়ী। এখানে বড় বেশী হাঙ্গাম, হুজ্জত নাই, লালামুসা হইতে একখানি গাড়ী খেওড়া যাতায়াত করে। কেবল কাছারীর লোক লইয়াই যেন ইহার কারবার। অল্পক্ষণেই বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে যতটা আপ্যায়িত ভাব হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইয়াছিল। লাহোর হইতে আমার বাঙ্গালী বন্ধু খেওয়ার নুণের আফিসের বাবুদের কাছে আমার বার্ত্তা জানাইলে তাঁহারাই এই বিদেশী বন্ধুকে পথে তালাপী, তদ্বির করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রেল ছাড়িয়া দিল, আমরা স্বল্প পরিচিত বন্ধুদ্বয় উভয়ে চাওয়া চাওয়ি করিয়া যতদূর পারা যায় উভয়কে পরস্পর দেখিতে লাগিলাম। তারপর একটা পাহাড় আমাদের দৃষ্টির গতিরোধ করিয়া ফেলিল। পাহাড়ের এই আকস্মিক নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য আমরা উভয়েই দুঃখিত হইলাম। পঞ্জাব শকতময় প্রদেশ, শীতকাল, কিছু বেলা থাকতেই শীতবস্ত্রের কিছু পরিমাণ গায় না জড়াইয়া আর পারিলাম না। যে দুই একটা ষ্টেসন পাইলাম উহা পাহাড়ের গায় লাগা। সন্ধ্যার সময় গিয়া খেওড়া অবতরণ করিলাম।

গাড়ী হইতে নামিতেই কয়েকটী বাঙ্গালী বাবু আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিলেন যেন আমি তীর্থযাত্রী আর তারা পাণ্ডা! সকলেরই সহাস্য বদন, হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন, যেন আমি তাহাদের কত পরিচিত। লালামুসা নামিতেই; সেই বাবুটী এখানে তারযোগে আমার আগমন বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন তাই আমার এখানে আগমনটা নিতান্ত প্রাইবেট হইল না। আমরা হাসিতে হাসিতে পথের সুখ দুঃখের কথা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিলাম। এখানে ইংরাজের শুভাগমনের পর হইতে এখানকার রাস্তাঘাটগুলি সুন্দর ও বৃক্ষ সারি কর্ত্তৃক শোভাময় হইয়াছে। আমরা সেই বৃক্ষ শ্রেণীর ভিতর দিয়া বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইলাম।

গৃহপালিত বিরাট কায় সারমেয় আসিয়া স্বীয় বিকট শব্দে সম্ভবতঃ আমাকে নূতন লোক দেখিয়া তাড়াইতে চাহিয়াছিল। আমার অবস্থা তদ্রূপ নহে দেখিয়া সারমেয় বীর আমার অলেষ্টার ধরিয়া ধরিয়া লাফাইয়াও তাহার কৃতাপরাধের জন্য আমার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল।

হাত মুখ ধুইয়া সায়াহ্নিক করিয়া ভৃত্য সালগ্রামের আনিত চা ও জলযোগ পাইয়া আপ্যায়িত হইলাম। বাঙ্গালী বন্ধুগণ আমাকে একটা স্বদেশী জীব পাইয়া ভারি আনন্দিত হইলেন। অনেক কথাবার্ত্তাই চলিল তন্মধ্যে একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন আমি গান বাজনা জানি কিনা? আমার উত্তর শুনিয়া আমার মূর্খতায় তাহারা নিরাশ হইলেন। অগত্যা তাহারাই সে দিনকার মত

সঙ্গীতালোচনায় ব্রতী হইলেন। কেহ বাদক, কেহ গায়ক, আমি শ্রোতা। বুঝিলাম আমার এখানকার গণিত দিনগুলি কাটিবে ভাল।

রাত্রি দশটা বাজিতেই আড্ডা ভঙ্গ হইল। আমি পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছি বিশ্রাম করিতে হইবে বলিয়া তাহারা যে যার মত চলিয়া গেলেন। আমি এদেশে আসিয়া অবধি রাত্রে রুটী বা লুচি খাই। তাঁহারা সেই আয়োজনই করিলেন। তাঁহাদের নিজেরও সেইরূপ ব্যবস্থা। আহারান্তে নিদ্রা গেলাম, গৃহস্বামী বলিয়া গেলেন, গৃহ হইতে রাত্রি বাহির হইতে হইলে শব্দ না করিলে হয়ত কুকুরটা কামড়াইয়া ধরিবে। কুকুর দিনমানে বাঁধা থাকে, রাত্রে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই কুকুরই সারারাত সসংগ্রামে পাহারা দিয়া থাকে। আমি যে গৃহে ছিলাম সেখানে গৃহস্বামীর এক পুত্র ও তাহার এক ভৃত্য অবস্থান করিয়া আমার আশঙ্কা দূর করিয়াছিল।

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি প্রায় সব কয়টী কুটিরের বাঙ্গালী দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারা প্রাতর্ভ্রমণে আমাকে লইয়া বাহির হইবেন। আমি তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া তাহাদের সঙ্গী হইয়া পড়িলাম। চলিতে চলিতে অনেক গুলি দ্রষ্টব্য স্থান মাড়াইয়া আসিলাম। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত মাঝখানে বৃহৎ সরোবর, তাহাতে অসংখ্য পদ্ম ফুটিয়া তাহার শোভা শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। মাঝে মাঝে শ্বেতপদ্ম গুলি তাহার শোভা আরো চমৎকার করিয়া দিয়াছিল। এখানে একটী মিশনারীদের আড্ডা আছে তথায় একটী মাইনার স্কুল ও হোমিওপ্যাথিক দাওয়াইখানা আছে। স্কুলে প্রায় একশত ছাত্র, ইংরাজি পড়ান, ইউরোপীয় খৃষ্টান মিশনারীরা উহাদের স্ত্রীলোকেরা বাড়ী বাড়ী গিয়া উলের ও সূচের কাজ শিক্ষা দিয়া আসেন।

এখানকার নুণের খনির মালিক পাতিয়ালার মহারাজা তাঁহার নিকট হইতে ইংরেজেরা বহু বৎসরের জন্য ইজারা লইয়া নুণের ব্যবসা করিতেছেন। খনিতে প্রচুর লাভ হইতেছে, এতটা লাভ মহারাজের হয়নাই। ইংরেজেরা খনি পর্য্যন্ত রেল নিয়াছেন; ফলে তাহাদের শুভাগমনে খেওড়া একটী সুন্দর ও ছোট সহর হইয়াছে। এখানে পাহাড় কাটিয়া নুণ বাহির করা হয়। তারপর রেল বোঝাই করিয়া চালান দেওয়া হয়। আবার একটা বৃহৎ সুরঙ্গ করা হইয়াছে তাহার ভিতর স্থান ঘন অন্ধকার। গ্যাস লাইট দিয়া তাহার ভিতরে উজ্জ্বল আলো করা হইয়াছে। সুরঙ্গের ভিতর দিয়া আলোর সাহায্যে রেলগাড়ী যাতায়াত করে। নুণের খাস আফিস সুড়ঙ্গের ভিতর। সেখানে অন্যান্য আফিস ঘর, কুলী থাকিবার ঘর ইত্যাদি আছে। দিনমানে লোকজন রেলে ও পদব্রজে ইহার ভিতর যাতায়াত করে। এখানে কয়টী কূপ আছে তাহার কোন কোনটী নুণা, কোন কোনটী বেশ পরিষ্কার, পরিষ্কার কূপগুলিকে মিঠা কূয়া আর নুণাগুলিকে খাট্টা কূয়া কহে। রাত্রিমানে গ্যাসলাইট থাকে না সুতরাং সুড়ঙ্গে কেহ যাইতে পারে না।

এই যে নুনের পাহাড়ের কথা কহিলাম তাহাতে ডিনামাইট দিয়া পাহাড় ধ্বসিয়া দেওয়া হয় পরে কুলীরা কুড়ালী ইত্যাদি দিয়া তাহা কাটিয়া লইলেই নুণ হইল। সেই নুণগুলিই স্তূপাকারে সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। ও পরে গাড়ী বোঝাই করিয়া ষ্টেশনে আনিয়া মহাজনদের সাহায্যে যত্র তত্র চালান দেওয়া হয়। আমরা দিনমানে গুড়ুম গুড়ুম শব্দ শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি যে ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে এক স্থানে চারি পাঁচ বৎসর নুণ তুলিলেই তাহা প্রায় শেষ হইয়া যায়। পুনরায় নূতন স্থানে যাইতে হয়। পরে কয় বৎসর পর আসিয়া আবার সেই স্থান হইতে নুণ তুলিতে পারা যায়। এইরূপে এদিক ওদিক করিয়া সারা বৎসরই নুণ তোলা যায়। বেশ সুন্দর এক কারখানা। কর্ম্মোপলক্ষে কয়টী বাঙ্গালী ব্যতীত অপর বাঙ্গালী এখানে নাই। নুণের ব্যবসায় মাড়োয়ারীরাই বেশী করে। বাঙ্গালী এমন লাভ চায় না। নুণের ব্যবসায় একজন মাড়োয়ারীর প্রচুর বিত্তশালী হইয়াছেন বাঙ্গালীরা নথরিটাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করে। এখানের নুণ কেহ চুরি করিলে ইংরেজেরাই তাহাদিগকে সাজা দিতে পারেন, মহারাজা তাঁহাদিগকে

তদ্রূপ ক্ষমতা দিয়াছেন। নুণের আফিসে দুই তিনটী মাত্র ইংরেজ বাকী সব সে দেশীয় ও বাঙ্গালী। এখানে ইংরেজদের একটী ডাক্তার ও একটী দাওয়াইখানা আছে। ডাক্তারটী পাঞ্জাবী তিনি এখানে থাকিয়া আফিসের লোক ও কুলীদের চিকিৎসা করেন। বাহিরের লোক ডাকিলেও গিয়া থাকেন। এখানকার অতি কম লোকেই ডাক্তার ডাকিয়া থাকে। বাহিরে গেলে তিনি ভিজিটের ও ঔষধের টাকা পান।

এখানকার সব দেখিবার শেষ হইলেই আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিব মনস্থ করিলে বাঙ্গালী বন্ধুরা কটাক্ষরাজ তীর্থ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও সঙ্গী হইবেন বলিয়া আমি রবিবারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। রবিবার ব্যতীত তাঁহাদের যাইবার উপায় নাই, সে দিন তাহাদের আফিস বন্ধ। রবিবার প্রাতে একা সাহায্যে কটাক্ষরাজ যাত্রা করিলাম। গো গাড়ী ও এই প্রকার অশ্ব শকট ব্যতীত অন্য যানে যাইবার উপায় নাই। হাটাপথে, পথ কিছু কম হইলেও বড় দুর্গম। এখান হইতে কটাক্ষরাজ প্রায় ৮ মাইল।

রবিবার অতি প্রত্যুষে উঠিয়া যাত্রা করিলাম, পথে যাইতে যাইতে কটাক্ষরাজ যাত্রী অশ্বারোহী দুই একজন পাইলাম। অশ্বারোহীগণ আমাদের আগেই চলিয়া গেল। আমাদিগকে কখন কখন উচু নীচু স্থান বুঝিয়া গাড়ী ছাড়িয়া হাটিয়াও যাইতে হইয়াছে। এরূপ স্থানে হাটীয়া যাওয়াই সঙ্গত, নতুবা গাড়ী উল্টাইয়া যাইবার সম্ভাবনাও আছে। বেলা নয়টার সময় বা কিছু পূর্ব্বেই কটাক্ষরাজ তীর্থে পঁহুছিলে আমার সঙ্গীরা চা ও জল যোগের আয়োজন করিলেন। আমি তীর্থ কার্য্য না করিয়া তাহা গ্রহণ করিলাম না। এখানে কয়েকটী প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আছে। মন্দির গুলি বড় দৃঢ় নির্ম্মিত। এইরূপ প্রবল শীতেও এখানকার সেবাইতেরা স্নান করিয়া তিলক কাটিয়াছে। শীতকালে এখানে বরফ পড়ে। পাণ্ডাদের কোন উপদ্রব আছে বলিয়া মনে হইলনা। খেওড়ার বাঙ্গালী বাবুদের যিনি পাণ্ডা আমার পাণ্ডাও তিনিই হইলেন। সাধারণতঃ এখানে বাঙ্গালী তীর্থ যাত্রী বড় হয় না। তবে মাঝে মাঝে বাঙ্গালী সাধু সন্ন্যাসী ও আমার মত ভব ঘুরে দেখিতে পাওয়া যায়। স্নান করিয়া তীর্থপ্রাপ্তি শ্রাদ্ধ করিয়া দেবী দর্শন করিলাম। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য—পর্ব্বত হইতে জলের এক ঝরণা আসিয়া একটা বৃহৎ পুকুরে নামিতেছে। জলটা পুকুরে নামিয়া দুগ্ধের মত সাদা হইতেছে আর উহা যে দিক দিয়া পুকুর হইতে বাহির হইতেছে সে দিকেও স্বচ্ছ সলিল ব্যতীত আর কিছু নহে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া ঘটীতে করিয়া জল তুলিয়া দেখি উহা আর দুগ্ধের বর্ণ নাই—পরিষ্কার জল। একজন সাধুপুরুষ কতকদিন পূর্ব্বে ইহার ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছিলেন। ফলে তাহার অতি রঞ্জিত কথায় আমি তাহাকে অবিশ্বাস না করিয়া পারিলামনা। এইরূপ অতিরঞ্জিত গল্প করিয়া যাহারা মনে করেন যে তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বাড়াইলেন ফলে তাহাদের এই উক্তি যখন মিথ্যা সাব্যস্ত হয় তখন তাহাদের প্রতি ঘৃণা হয় ও তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধেও যাত্রীরা একটু আস্থাহীন যে না হয় এমন নহে।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে বেড়াইতে বাহির হইলাম, পর্ব্বতোপরি সরোবর সমূহে পদ্মবন দেখিয়া প্রীতি হইলাম। এখানে অধিকাংশই শ্বেত পদ্ম ও অনেক রক্ত পদ্মও আছে। পদ্ম রং বিশিষ্ট পদ্মের সংখ্যাও কম নহে। দুই একটী নীল পদ্মও দেখিলাম নীল পদ্ম আর কোথাও দেখি নাই। দুই এক বৎসর পর ভ্রমণোপলক্ষে বরোদা রাজ্যে এক সরোবরে নীল পদ্ম দেখিতে পাইয়াছিলাম। নীল পদ্ম অতিশয় দুর্লভ। ইহার এক একটী গাছ কলিকাতার নার্সারী ওয়ালারা ২০৲ হইতে ৪০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহার ফুল না দেখিয়া কাহারো ক্রয় করা উচিত নহে। রক্ত পদ্মও দুর্লভ জিনিষ, কিন্তু ইহা বাঙ্গলা দেশেও পাওয়া যায়। আমি কোন বড়লোক বন্ধুর বাগান হইতে উহা আনিয়া আমি রোপণ করিয়াছি। বাগানে খুব বড় চাড়ীতে বা পুকুরে রোপণ করা চলে।

আমরা পাণ্ডাদের অনুরোধে সে দিন কটাক্ষরাজ রহিয়া গেলাম। পাণ্ডারা আমাদিগকে যথেষ্ট যত্ন ও আপ্যায়িত করিয়াছিল। পাণ্ডাদের কোন উৎপাত

আছে বলিয়া মনে হইলনা। তবে একাকী কেহ গেলে কি করে তাহা জানা নাই। পরদিন অর্থাৎ সোমবারে প্রাতে তথা হইতে যাত্রা করিয়া যথা সময়ে খেওড়া বন্ধুগণ সহ পঁহুছিলাম। নুণের আফিসের বাঙ্গালী বন্ধুগণ খেওড়া ত্যাগের সময় আমাকে কতকগুলি নুণের পাথরে প্রস্তুত থালাবাটী ও খেলনা দিয়াছিলেন। ইহারা কেবল শোভার্থ রাখা হয়, অপর কোন ব্যবহারে আসে না। অতি অল্প কয়দিন খেওড়াছিলাম; কিন্তু তথাকার বাঙ্গালীবন্ধুদের সাদর ব্যবহার মনে করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বিশেষ কষ্টানুভব করিয়াছিলাম। বিদেশে বাঙ্গালী হীন বা স্বল্প বাঙ্গালী ময় স্থানে বাঙ্গালীরা কদাচিৎ বাঙ্গালী পাইলে এমন করিয়াই আপ্যায়িত করেন।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

নবীন রুচি।

সে তখন গান গাইতেছিল। গানের সুর বাতাসে মিশিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া আকাশে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। মুক্তার মত ছোট্ট ছোট্ট সাদা দাঁত গুলি তার ওষ্ঠের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল। দূরে আমগাছের ঘন পল্লবের ভিতর হইতে একটা কষায়কণ্ঠ কোকিল প্রাণের আবেগে ডাকিয়া উঠিল "কুহু";— কক্ষান্তর হইতে রমণী-কণ্ঠে ডাক আসিল "সুখু!"

"এই যাই" বলিয়া সুখদা সুন্দরী হারমোনিয়মটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া উঠিল। গানের শেষ পদটা আর ভাল করিয়া গাওয়া হইলনা। মা বলিলেন "সুখু তোকে বার বার তিন বার ডাকলাম তবু তুই গান ছেড়ে আসতে পারবিনি? যা এখন, সন্ধ্যা পার হয়েছে, কর্ত্তার জল খাবার সময় চলে যায়।"

"যাই" বলিয়া সুখদা অপর একটী কোঠায় প্রবেশ করিল; সুখদার মাতা ধূপের ধূয়ায় ঘর বাড়ী আমোদিত করিয়া এ-কোঠায় সে-কোঠায় বেড়াইতে লাগিলেন। তুলসি তলার টবের নীচে "সন্ধ্যা" দেখাইয়া গলায় কাপড়ে আঁচল জড়াইয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিলেন। গৃহ কর্ত্তার মুখে চোখে ভক্তির রক্তিমরেখা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।

বাহিরের আঙ্গিনায় ডাক্তার রামনারায়ণ একখানা ইজি চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। কোলে একটী দুই বৎসরের কন্যা। আধ আধ কথায় সে পিতার চিন্তাজড়িত মুখে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণ প্রভার মত ঈষৎ হাস্যের রেখা ফুটাইয়া তুলিতেছিল। ডাক্তার বাবু মনে মনে কি ভাবছেন আর মাঝে মাঝে হুকার নলটীকে গাঢ় ও সুদীর্ঘ চুম্বন হইতে অব্যাহতি দিয়া ধূমের কুয়াসা উদ্গিরণ করছেন। পুঞ্জীকৃত ধূম রাশি দ্বারা কক্ষের ভিতর একটা কল্পলোকের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে, তবু কিন্তু তাঁর চিন্তার বিরাম নাই।

"বাবা জল খাবে এস" বলিয়া সুখদা যখন সম্মুখে উপস্থিত, তখন তাঁহার চমক ভাঙিল। হুকার নলটী যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া খুকীকে সুখুর কোলে সমর্পণ করিয়া তিনি বাহির হইলেন।

চৈত্রমাস। খুব গরম পড়িয়াছে। গৃহিণী এক খানা পাখা হাতে নিয়া জল খাবারের রেকাবীর নিকট বসিয়া আছেন। কর্ত্তা আসিয়া আসন-পরিগ্রহ করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'আজ যে বড় সকাল সকাল ফিরলে?'

"হুঁ, সকাল বই কি। সব গুলো কেসে (case) আজ আর যাওয়া হয়নি; ও বাড়ীর ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গে দেখা হল, তিনি একটা সম্বন্ধের প্রস্তাব করলেন, ছেলেটী নাকি মাষ্টারী করছে।"

"তা বেশতো, ভাল কথা; ছেলের পক্ষে ওরা কি চায় কিছু জানতে পারলে?—ওরা ক' ভাই, বাপ কি করেন, কেমন ঘর তা তিনি কিছু বলেছেন?"

"হাঁ সব বলেছেন; বলেছেন বলেইত আজ অন্য কোথাও না যেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে চলে এলুম। ওরা নাকি বৈশাখমাসের মধ্যেই যে খানে হয় সম্বন্ধ ঠিক করবেন; তাই তাদের তাড়া বেশী, কালই মেয়ে দেখতে চান। তোমার এতে কি মত?"

"আমার আবার মতামত কি? যা ভাল বুঝ তুমিই তা করবে। আমার কিন্তু সেই কথা; ছেলেটীর স্বভাব চরিত্র ভাল হওয়া চাই; আর দুটো খাবার পরবারও যেন ঘরে থাকে।

"ছেলের খবর আমরা নিব এখন, দেখ আগে তোমাদের সকলের পছন্দ হয় কিনা?"

"ও মা, মরণ আর কি! সকলের আবার পছন্দ অপছন্দ হবে কি গো? আমার ও তোমার পছন্দ হলে আর অপছন্দ হবে কার?—ওঃ—ওবার অমন একটা হয়েছিল বলে কি বরাবরই তেমন কিছু হতে যাবে?—আলোতো শুধু আমাদের নিতান্ত ছেলে মানুষ! এই সবে মাত্র পনেরো পার হয়ে ষোলয় পা দিয়েছে। ছেলে-বুদ্ধি বৈত নয়! তাই সেবারে গোলমাল করেছিল। তা বলে কি চিরকালই ও রকম করবে? আর—সেই ছেলেটাও দেখ্‌তে তত সুন্দর ছিল না, গায়ের রংও কালো ছিল।"

"কে বল্লে গায়ের রং কালো ছিল?—আর গায়ের রং কালো হলেই বুঝি সে ছেলের বিয়ে হ'বে না?—বেটা ছেলে তার আবার সুন্দর কুৎসিৎ কি? লেখা পড়া শিখেছে, দিব্যি দু'পয়সা উপায় করছে, বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ ঘর; সেই সম্বন্ধটা কিনা ইচ্ছা করে' ছেড়ে দিলে? মেয়ে হ'য়ে বাপ্ মার বিরুদ্ধে কথা কইতে সাহস করলে? এ কার দোষ—মার না মেয়ের?"

"এ দোষ মার নয়, মেয়ের ও নয়; এদোষ তোমার নিজের, এদোষ তোমার সমাজের। মেয়ের বয়স বাড়্‌ছে, এতদিন কেন তোমরা তার বিয়ের জন্য চেষ্টা দেখনি? শত হলেও ভাল মন্দ বুঝবার একটা ক্ষমতা তার ভিতর নিশ্চয়ই এসে পড়েছে; দু'চার খানা বইও সে পড়েছে। —তা—সেই সম্বন্ধটা হয়নি বলে কি তুমি আমি চুপ্ করে থাক্‌বো?—ঐ ডাবের জলটুকু খাও—পাথরের বাটিতে।"

ডাক্তার বাবু ডাবের জলটুকু নিঃশেষ করিয়া এবং দুটী পান মুখে দিয়া বহির্ব্বাটিতে আসিলেন।

(২)

পরের দিন ডাক্তার বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন এমন সময় দুইটি ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া অভ্যার্থনা করিলেন—"এইযে আসুন আসুন; বসুন।"

"আমরা বস্‌ছি, আপনি বসুন" এই বলিয়া আগন্তুক দ্বয় ফরাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। অদূরে চেয়ারগুলি নিরাপদেই তাকাইয়া আছে।

"ওরে মঙ্গলা, তামাক দিয়ে যা।—উঃ কি ভয়ানক রোদ! তবু যা হ'ক আপনারা সকাল সকাল এসেছেন, ভালই হল। আমার আবার সন্ধ্যার আগেই বিনোদ বাবুর বাসায় যেতে হবে। তার ছেলেটীর বড় অসুখ, তিন দিন প্রায় অজ্ঞান হ'য়ে রয়েছিল। আপনিতো বিনোদ দাদাকে জানেন ক্ষিতীশ বাবু?"

"হাঁ জানি বৈকি, কি অসুখ ছেলেটীর?"

"উঃ, শক্ত জর, হাই টেম্পারেচার, তার উপর আবার ডবল নিমোনিয়া হ'য়েছিল। আজ একটু দম ধরেছে।"

"বাবু তামাক" বলিয়া মঙ্গলাভৃত্য হুকার নলটী ফরাসের উপর রাখিয়া চলিয়াগেল। ক্ষিতীশবাবু নলটী মুখে গুঁজিয়া সঙ্গীয় ভদ্রলোকটীকে দেখাইয়া বলিলেন "এর নাম বাবু রমণী মোহন মিত্র, ইনি ছেলের মাতুল। বংশ এদের খুব উচ্চ, বারাসতের মিত্রগোষ্ঠী। কাজেই ছেলের মাতামহ বংশ, সম্বন্ধেও কারুর কিছু বল্‌বার নেই। এখন মেয়ে দেখে পছন্দ হ'লেই বাকী কথা পরে হবে। কি বলেন রমণী বাবু?" রমণী বাবু উত্তর করিলেন—

"হাঁ তাই ভাল।" তারপর রমণী বাবুর সঙ্গে কিছু কাল কথাবার্ত্তার পর "বসুন আপনারা, ভিতর বাড়ীতে সংবাদ দিয়ে আসি।" বলিয়া রামনারায়ণ বাবু বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

বরপক্ষের লোক মেয়ে দেখিতে আসিয়াছে এই সংবাদ পূর্ব্বেই অন্দরমহলে পৌঁছিয়াছিল; ডাক্তার বাবু ভিতরে প্রবেশ করিয়া গৃহিনীর মুখখানা বড়ই বিষণ্ণ দেখিলেন এবং শুনিতে পাইলেন, সুখদার নাকি হঠাৎ কি ভারি অসুখ হইয়া পড়িয়াছে; সে এখন নড়িতে চড়িতেই অক্ষম। আর কোন উক্তি প্রত্যুক্তি না করিয়া ডাক্তার বাবু তীব্রগতিতে বৈঠকখানায় চলিয়া আসিলেন এবং অতি কষ্টে মনের রুদ্ধ আবেগ সংবরণ করিয়া—আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বিনীতভাবে বলিলেন—'মাপ কর্‌বেন ক্ষিতীশ বাবু, মাপ করবেন রমণী বাবু; হঠাৎ মেয়েটীর ভয়ানক অসুখ করেছে, আজ আর কিছু হ'লনা। অনুগ্রহ ক'রে একটু মিষ্টিমুখ—"

"মাফ্ করুন, মাফ্ করুন "বলিয়া ক্ষিতীশ বাবু ও রমণী বাবু উভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতাকি করিয়া ভ্রূকুটি-কুটিলনেত্রে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। সে দিন আর কিছু হইল না। আগন্তুকেরা প্রস্থান করিলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে রামনারায়ণ বাবু কাঁপিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি আবার ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সুখু কোথায়?"

"ঐ ঘরে।"

"কি হয়েছে তার?'

"গিরিবালাকে জিজ্ঞেস্ কর, সেও ঐ ঘরেই আছে।"

"গিরি, ও গিরি।"

গিরিবালা আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত।

"কি অসুখ হয়েছে সুখুর? তুই তাকে নিয়ে বাসনি কেন? তারা যে দেখ্তে এসে ফিরে গেল।"

"কি করবো মামা, সে যে আসতে চাইলে না, গোঁ ধরে ফিরে রইলে।"

"কেন, হয়েছে কি তার?"

"হয়নি কিছু, অসুখ হওয়ার কথাটা আমাদেরই চালাকী। কি করব বলুন, ভদ্রলোক বাড়ীতে এসেছেন মেয়ে দেখ্তে, তাদেরই একটা কিছু ব'লে বুঝ দেওয়া চাই। তাই মামীমা বলেছেন যে সুখুর অসুখ।......"

কি বলুলে সে বেয়াদব মেয়ে? অবিশ্যি তোর কাছে কিছু বলেছে।"

"হাঁ বলেছে বৈকি; বলুলে I. A. পাশ করেছে মাষ্টারী করে খায়, সহরে একটা বাড়ী টাড়ী নেই, তার সঙ্গে আবার বিয়ে?" এই রকমেরই কয়েকটা কথা সে বলেছে। আমরা কিন্তু মামা কত ক'রে তাকে বুঝিয়েছি সে কিছুতেই তা শোনবে না।"

"যাক্ অধঃপাতে। বড় আদর করেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলুম, স্নেহের চক্ষে দেখ্তে দেখ্তে এতখানি ডাগর করে তুলেছি,—কোনো দিন কোনো কথা বলিনি, — এই বুঝি তার পুরস্কার? সে যারের ছেলে কালো, এযারের ছেলে মাষ্টার—এইতো দোষ? যা ইচ্ছে তাই হউক।"

(৩)

"চিন্তা করবেন না বিনোদ দাদা। দু' চার দিন পেটে দানা গেলেই দুর্ব্বলতা কমে আসবে।" ডাক্তার রাম নারায়ণ বাবু রোগীর পিতা বিনোদ বাবুকে বলিতেছেন। বিনোদ বাবু উত্তর করিলেন "তা ভাই তুমি যা বল। তোমারই চেষ্টায়, তোমারই চিকিৎসায় মহীন আমার মরার মুখ দেখে ফিরে এসেছে। এখন ভগবানের আশীর্ব্বাদ। এই কয় দিনের রোগ যাতনায় মহীন আমার কেমন হ'য়ে গেছে! কত কিছু না সে খেতে চায়। কাল তোমার বৌদি বল্লেন মহীন নাকি তার খুড়ীমাকে দেখ্তে চেয়েছে। তোমাকে বলে দিচ্ছি ভাই তুমি অবিশ্যি আজ হ'ক্ কাল হ'ক—বাড়ীর সকলকে নিয়ে আস্বে। এ যাত্রা তাদিগকে কয়েকদিন থাক্তে হবে কিন্তু রামনারায়ণ! অনেকদিন তারা আমাদের বাড়ীতে আসেন নি। এতে তোমার কোন অসুবিধা হবেনা ত ভাই? মহীনের জন্ত তুমি যা খেটেছ তাতে তোমাকে কোন অসুবিধায় রাখ্তে আমার ইচ্ছা নেই।"

"অসুবিধা কিছু হবেনা দাদা। কালই আমি সকলকে নিয়ে আস্বো। তবে কি জানেন, সুখুর বিয়েটা সকালেই স্থির করব মনস্থ করেছি; আজকাল মাঝে মাঝে দু একজন লোক আসেন যান, তাই বাড়ীতে সর্ব্বক্ষণ মেয়েরা উপস্থিত না থাকলে চলেনা। যাক্ তবু আমি ওদিগকে নিয়ে আসব।"

"তা বেশ তুমি নিয়ে এসো। মহীন সে দিন খুড়ীমা খুড়ীমা বলে ঘুম হতে ডেকে উঠেছিল। খুড়ীমাকে দেখলে নিশ্চয়ই তার শান্তি আস্বে তোমার বৌদিও খুব খুসী হবেন।"

পরের দিন রামনারায়ণ বাবুর স্ত্রী ভাগিনী গিরিবালাকে গৃহকর্ম্ম সকল বুঝাইয়া দিয়া কন্যাদিগকে লইয়া মহীনকে দেখিবার জন্য বিনোদ বাবুর বাড়ীতে আসিলেন।

মহীনের রোগজীর্ণ চেহারা দেখিয়া এখন আর তাহাকে মহীন বলিয়া চেনা যায় না। কাঁচা সোণার মত সেই রং, সেই রূপ, সেই লাবণ্য কিছুই তাহার শরীরে ছিলনা। শুধু বড় বড় দুটা চোক ও শুভ্র

প্রশস্ত ললাট তাহার সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এত বড় কঠিন রোগের পরেও তাহার চক্ষু ও ললাট দেখ হইতে প্রতিভার জ্যোতিঃ একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায় নাই। বি, এ পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল; এবৎসর এম এ দেওয়ার কথা। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠিবে কিনা সে এখন ভগবানের হাত। এই শক্ত রোগের পর শরীর শোধ রাইতেই বোধ হয় দীর্ঘকাল কাটিয়া যইবে। এ সময় মানসিক খাটুনী প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

(৪)

বাসায় ফিরিয়া আসা অবধি সুখদার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর সে সকালে বিকালে বসিয়া আপন মনে গান ও হারমনিয়মে তাল ধরে না; এসরাজ খানা টেবিলের উপর পড়িয়া থাকিয়া ব্যবহারের অভাবে মৌনবেদনা প্রকাশ করিতেছে। বাঙ্গালা ও ইংরেজী পুস্তকগুলি অযত্নে ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে। ভাবনার একটা তীব্র উৎকট তাড়না সুখদার প্রতি কার্য্যে প্রকটিত। বিষাদের কালো ছায়া তার পাছে পাছে অনুক্ষণ যেন ঘুরিয়া ফিরিতেছে। ছোট ভগিনীর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন গিরিবালার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইতে পারিলনা। একদিন সে কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল—মহীনের সঙ্গে বিবাহ হইলে এবার আর সুখুর অপছন্দ হইবেনা। কথাটা ক্রমে ক্রমে গৃহিণীর কাণে এবং অবশেষে ডাক্তার বাবুর কাণে পর্য্যন্ত পৌঁছিল।

(৫)

"বিনোদ দাদা! আমার একটা কথা রাখ্‌তে হবে।"

"কি কথা রামনারায়ণ! এযাত্রা তুমি আমার যে উপকার করেছ—মহীনকে বাঁচিয়ে তুমি আমার শুষ্ক প্রাণে অমৃতের সঞ্চার করেছ, আত্মীয় ব'লে একটী পয়সা নেওনি—তাতে তোমার কথা রাখ্‌বনা? কি তেমন কথা ভাই?"

"কথা বেশী কিছুই নয়। মহীনের খুড়ীমা মহীনকে দেখে বড়ই দুঃখ করলেন। তেমন চাঁদপানা ছেলে ব্যারামের প্রখর তাপে শুক্‌নো একটা কাঠি হ'য়ে গিয়েছে। তবে এখন আর কোন রকম আশঙ্কা কারুর মনেই নেই। ভগবানের অনুগ্রহে মহীনের শরীর এখন দিন দিন ভালর দিকেই চলেছে। তা আসছে মাসে তার একটা বিয়ের জোগাড় দেখ্‌লে হয় না?"

"ফাল্গুন মাসে একটা সম্বন্ধের কথা হ'য়েছিল বটে; সম্বন্ধটাও ভাল। আমাদেরও অমত ছিলনা। মহীন জানালে যে এত তড়াতাড়ি বিয়েতে দরকার নেই, তাই চুপ করে আছি।"

"এবার তার পরীক্ষার বৎসর ছিল কিনা, তাই সে তখন সম্মতি প্রকাশ করেনি। দৈবাধীন এবার যখন পরীক্ষাটা বন্ধই রইল তখন এই আষাঢ় শ্রাবণের ভিতর বিয়ে হ'তে বাধা কি আছে?"

"কেনহে, তোমার জানা শুনায় কোন ভাল মেয়ের খবর আছে বুঝি! কেমন সম্বন্ধ? দেখ্‌তে মেয়েটী কেমন?"

ছেলের বিবাহে পিতার মন বুঝি এতই আগ্রহান্বিত হয়!

"তা দাদা, আপনি নিজেই সে মেয়ে দেখেছেন। সুখদাকে আপনি বেশ স্নেহের চক্ষেই দেখে থাকেন।"

"ওঃ হরি! তোমার মেয়ে! এতক্ষণ তুমি বলনি কেন? তোমার বউদিও যে একদিন তার কথা বলেছিল। তা বেশতো আমাদের সেই পুরাণো কুটুম্বিতে আরও পাকা হবে। আমিও ভাই বুড়ো হয়েছি, কখন কি হয় কে বলবে? তবে মহীনের একটা মতামত জানতে না পারলে তোমাকে ধা করেই সঠিক সংবাদ দেওয়া যায় কি করে? পুরুত ঠাকুর ও একদিন বলেছিলেন এ বছর তার শুভ গ্রহের জোর নেই।"

"রেখে দিন্‌ ও সব বাজে কথা! যত সব গ্রহ পূজার ফন্দী, টাকার শ্রাদ্ধ। অত সব গ্রহ নক্ষত্র মানলে ছেলে মেয়ের আর বিয়েই হয় না।"

কন্যাদায় গ্রস্তের মনে ধর্মের ব্যাখ্যা এমনই শুনা যায়।

বিনোদ—"তা ভাই তোমাকে আমি ঠিক সময়ে সংবাদ দোব।"

রামনারা—"মেয়ের বিয়ে নিয়ে মুস্কিলেই পড়েছি দাদা। আপনি যদি দয়া করে কন্যাদায় হ'তে আমাকে উদ্ধার করেন, চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

বিনোদ—"আমিও তোমার নিকট কৃতজ্ঞ আছি ভাই!"

(৬)

আশ্বিন মাস। ২৫শে আশ্বিন ৺শারদীয়া পূজা। দুইদিন আগে হইতেই দিকে দিকে মায়ের আগমনী—বাজিয়া উঠিয়াছে। দিগন্ত বিস্তৃত হরিৎ প্রান্তর আচল পুরিয়া মায়ের সেবার জন্ত শস্য জোগাইয়া রাখিয়াছে। নদীর নির্ম্মল জল জননীর মহাস্নানে আত্ম "জীবন" সার্থক করিবে ভাবিয়া কুলু কুলু নাদে বহিয়া যাইতেছে, শুভ্র বালুকাময় তট ভূমি স্থানে স্থানে কাস গুচ্ছ সজ্জিত রাখিয়া শারদা রাণীর কোমল অঙ্গে চামর ব্যজনের লীলা প্রকাশ করিতেছে। পাতায় পাতায় শাখায় শাখায় গোপন কথার কাণাকাণি আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিগের প্রকৃতি আনন্দের শিহরণে মাতিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু মহীনের মনে আনন্দের লেশ মাত্র নাই।

আষাঢ় মাসের মধ্য ভাগে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে আজ পূর্ণ তিনমাস; এই তিন মাসের মধ্যে সুখদার সঙ্গে মহীনের সাক্ষাৎ খুব কমই হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে কোন দিন হয়ত সে টেবিলে মাথা রাখিয়া চেয়ারেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আবার কোন দিন হয়ত ইচ্ছা করিয়াই ভিতর বাড়ীতে না যাইয়া একা একা বৈঠকখানায় শুইয়া রহিয়াছে। ভিতর বড়ীর সঙ্গে তার যে একটা কোনরূপ আকর্ষণের সম্বন্ধ আছে, সে রূপ চিন্তা তাহার নিরুদ্বেগ চিত্তকে আজ পর্য্যন্তও দমিত করিতে পারে নাই।

দিন গুলি তার এই ভাবেই কাটিতে লাগিল। সে তাহার নির্দ্দিষ্ট শয়নস্থান পরিত্যাগ করিয়া এখন—যেখানে সেখানে নিদ্রা যায়। বিবাহ করিয়া অবধি তাহার মনে সুখ নাই। যে ভাবিতে ছিল, বাঙ্গালার লোক গুলা কি কুসংস্কারাপন্ন! চিরকাল তাহাদিগকে সমাজের কঠোর শাসনে এবং সঙ্কীর্ণতম একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর আবেষ্টনে আবদ্ধ থাকিতে হয়, পরের যথেচ্ছ ইচ্ছার উপর নিজের মূল্যবান ইচ্ছাকে বাধ্য হইয়াই সপিয়া দিতে হয়, স্বেচ্ছায় কোন কিছু কাজ করা যায়না, নিজের নিজস্ব কোথাও অব্যাহত থাকে না। যেখানে নিজের ইচ্ছা বহাল রাখিতে প্রয়াস পাওয়া সেখানেই শত মুখের সহস্র প্রতিবাদ। তাই আজ তাহাকে নিজের একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও বাঙ্গালীর ঘরের একটা অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধ শিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ করিতে হইয়াছে। পিতা মাতার পীড়নে, আত্মীয় কুটুম্বের কথার তাড়নায়, সমাজের কঠোর শাসনে, তাহাকে আজ ঠেকিয়া পড়িয়া নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ে, যোটেই কয়খানা ছোট ছোট বাঙ্গালা ও ইংরেজী বই পড়িয়াছে, তাহার সঙ্গে আবার প্রণয় চলে? তার সঙ্গে আবার হৃদয়ের ভাব বিনিময় চলিতে পারে? কথার মর্ম্মই যে বুঝিতে পারিবেনা, বিনিময় হওয়াতো দূরের কথা। ইংরেজী ভাষায় কথা বলিতে পারিবেনা, স্বাধীনচেতা রমণীদের মত পুরুষের সহিত মটরে চড়িয়া মুক্ত বাতাসে নির্জ্জন বিহার করিতে পারিবেনা, সাহস করিয়া মুখ তুলিয়া অপরের সঙ্গে দুটো বিজ্ঞানের আলাপ করিতে পারিবেনা, কোনও সভা সমিতি উপলক্ষে সসম্মানে সকলের সহিত মেলা মেশা করিতে পারিবেনা, এ সমস্ত কি অসভ্যতার পরিচায়ক নয়? বি, এ তে যে ফার্ষ্ট হইয়াছে, এম, এ দিয়াই বিলাত যাইবে, তার কি সাজে বাঙ্গালীর মেয়ে বিবাহ করা? এই প্রকারের বহু ভাবনায় মহীনের মনে শান্তি নাই, হৃদয়ে সুখ নাই।

* * * *

এর দিন কয়েক পরে হঠাৎ একদিন শুনাগেল মহীন্দ্রনাথ নিরুদ্দেশ! হায় একি কথা! শিক্ষিত ছেলে, সোমত্ত বয়স, সে কিনা কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

দীর্ঘকাল অনুসন্ধান চলিল; কিন্তু কোথাও খবর মিলিল না। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইল, জিলায় জিলায় সংবাদ দেওয়া হইল—মাতা কান্দিয়া অস্থির, পিতা ভাবিয়া আকুল! কা কস্য পরিদেবনা। সব বৃথা। মহিনের কোন খোজই কিন্তু পাওয়া গেল না।

সুখদার আর কষ্টের সীমা নাই। বিবাহ হইয়াছে অবধি একদিনের তরেও সে স্বামীর ভালবাসা পায়নাই। কোন দিন স্বামীর দেখা পাইলেই সে পায় ধরিয়া কত কান্না কাঁদিয়াছে, কত প্রার্থনা জানাইয়াছে, কত কথা খুলিয়া বলিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই ফল হয় নাই; মহীনের কানে সে সমস্ত কথা প্রবেশই করে নাই।

সুখুর এমন বিপদের সময় একদিন সুখুর মাতা তাহাকে নিজের কাছে আনাইলেন। সুখুর আকৃতি দেখিয়া সকলেই স্তব্ধ ও বিস্মিত! রামনারায়ণ বাবু মনের খেদে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, স্নেহময়ী জননীর বক্ষঃ ভরিয়া তপ্ত অশ্রু শতধারে ছুটিয়া চলিল। হায় অভাগিনী স্নেহের পুত্তলি, কোন্ নিঠুরা নিয়তির কঠোর তাড়নে তোর নবনীত কোমল দেহযষ্টি এমন ক্ষীণ হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে রে?

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, মহীনের কোন সংবাদ নাই। আশায় আশায় এখনো সুখদার দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপাখী উড়িয়া যায় নাই। শরীর কঙ্কালসার, চক্ষুঃ কোটরগত, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশকলাপের অপার সৌন্দর্য্য অকালে ঝরিয়া যাইতে বসিয়াছে। পুরাতন সেই বাস্তবস্ত্রগুলি তাহার উদাসমনে বিকার জন্মাইয়া দিতেছে। হায় কাহার জন্য এই শিক্ষা, কাহার জন্য এই রূপ! মাঝে মাঝে সে গিরিবালার নিকট বসিয়া মনের সকল কথা খুলিয়া বলে। তখন ক্ষণকালের জন্য হৃদয়টা হালকা হয় বটে, কিন্তু পোড়া মন যে বুঝেনা! গিরিবালাও তাহাকে যথাসাধ্য প্রাবোধ দেয় কিন্তু "সকলি নিরর্থক।

দেখিতে দেখিতে তিনটী বৎসর কাটিয়াগেল; আর কত সহ্য হয়? একদিন ভাদ্রমাসে সুখদার ভয়ানক জ্বর হইল; ক্রমে সে জ্বর বিকারে পরিণত হইল। একেতো দুর্ব্বল শরীর তার উপর প্রবল জ্বর। জ্বরের বিকারে যে ক্ষণে ক্ষণে প্রলাপ করিয়া উঠে। মানুষ কাছে আসিলে মারিতে যায়, সময় সময় বিছানা হইতে সটান দাঁড়াইয়া উঠে, এই ভাবে চৌদ্দদিন চলিয়া গেল। ডাক্তার বাবু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা ভিন্ন চিকিৎসক ডাকা হইল। তথাপি কোন ফল হইল না। গিরিবালা সর্ব্বদাই কাছে বসিয়া আছে। একদিন শাশুড়ীও আসিয়া বৌমাকে চোখের দেখা দেখিয়া গেলেন, অনুরোধ সত্বেও দুইদিন সেখানে রহিলেন না। ছেলের অভাবে বধুর মূল্য কি?

(৭)

লণ্ডন সহরের এক প্রকাণ্ড বাড়ীতে মহীনবাবু এবং তাহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে পরস্পর তীব্র কঠোর উগ্র ভাষায় দ্বন্দযুদ্ধ চলিতেছে। বাদানুবাদ ইংরেজী ভাষায় চলিতেছে। আমরা বাঙ্গালা ভাষায় উহার যৎসামান্য অংশের স্থূলমর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। কর্কশ কণ্ঠে বন্ধু বলিতেছেন। "ভবিষ্যতের জন্য সাবধান থাকতে হবে, বলছি তোমাকে।"

"সাবধান থাকতে হবে? আমাকে? কেন তায়া কি তেমন ব্যাপার?"

"ফের, ওমুখে কথা বলছ?"

"আজ্ঞে বাধা দেবার কে? কথা বলতে টেক্স নেইতো?"

"তবু বলছি সাবধান"

"অপরাধ?"

"অপরাধ আবার জানিয়ে দিতে হবে, বদমায়েস্।"

"মুখ সামলে কথা বলো বলছি।"

"তোমার মত ইতরকে দু'চার কথায় শাসিয়ে দেবো তাতে আবার মুখ সামলাতে হবে কেন হে? জানো তুমি এই কদিন কি ভাবে চলা ফিরা করেছ? আমাদের চোখেও ধূলি ছুড়তে চায় তোমার মত একটা নীচ প্রকৃতির পশু! লেখাপড়া শিখতে এসেছ, উচ্চপ্রবৃত্তি ল'য়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে এসেছ, তাই তোমাকে বন্ধুভাবে আমাদের সঙ্গে ঠাঁই দিয়েছি। তারই কি এই প্রতিদান? ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে আত্মমর্য্যাদার অপলাপ? কুৎসিৎ কার্য্যের উন্মুক্ত অভিনয়...?"

"কুৎসিৎ কার্য্য কাকে বলছ বন্ধু? এমেলিয়ার সঙ্গে বেড়ানো? এ-ই যদি কুৎসিৎ কাজ হবে ভায়া, তবে সমগ্র ইংলণ্ডে এর অভাব আর কোথাও খুজে পাবে না। জাননা তুমি নিজের দেশের বিন্দুমাত্র বিবরণ, শেখনি তুমি এখনো তোমার জাতীয় সভ্যতার রীতি! পুরুষ নারীর সঙ্গে চলবে ফিরবে, দরকার হ'লে নারী পুরুষের সঙ্গে মেলা-মিশা করবে—এ যে তোমাদেরই দেশের উন্নত শিক্ষা সভ্যতা! হাঁ, আমাকে ভারতবাসী ব'লে সন্দেহের চক্ষে দেখছ, এই না? এটা তোমার মহাভুল বন্ধো! ভারতবাসী আপন দেশের মর্য্যাদা জানে; সে নিজের জাতীয় পদগৌরবের মাহমা প্রতিপদেই বুঝতে পারে। তোমাদের দেশে এসে তোমাদেরই আচার ব্যবহার প্রতিপালন করবো তাতে আবার চোখ্ রাঙাবার হেতু কি আছে? জানো তুমি—তুমি যাকে কুৎসিৎ কার্য্য ভাবছ, সে কাজের প্রধান উদ্যোক্তা কে? এমেলিয়ার প্ররোচনা না পেলে আমার মত একজন বিদেশী শিক্ষার্থী

তার সঙ্গে প্রথম আলাপ কত্তেও সাহস পেত না। তাই ভেবেই সে আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখেছে,আমিও তাকে বোনের মত আদর করছি। এতে তায়া তোমার এমন অগ্নিশর্ম্মা হবার কারণটা কি, এতগুলো কর্কশ ভাষাতেই বা কি দরকার ছিল ? সভ্য তোমরা, তোমাদের মুখে এহেন ইতরের ভাষা শোভা পায় কি ?"

তারপরও দীর্ঘকাল রুক্ষভাষার আদান প্রদান চলিয়াছিল।

(৮)

পরের দিন বেলা ৪টার সময় এমেলিয়া ও মহীম বাবু বেড়াইতে বেড়াইতে কিউপিড্ গার্ডেনের এক প্রান্তদেশে আসিয়া স্থান নিয়াছেন। মুখ দেখিয়া উভয়কেই বিমর্ষ বলিয়া মনে হয়। মহীম বলিলেন "এই সুদূর বিদেশে এসে আমি শুধু মিছি মিছি কতগুলা শত্রু সৃষ্টি করবো, তা কখনও মনে করিনি এমি !"

"কে তোমার শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল ভাই ! দাদার কথা বলছ ? তা কাল আমি সব শুনতে পেয়েছি। দাদা ঐ এক মেজাজের লোক। তার জন্যে তোমাকে ভাব্তে হবে না।"

"আর আমার এ বাড়ীতে থাকা চল্‌ছে না। শুধুই কেন লোকের সন্দেহ বাড়িয়ে বিষ নজরে পড়ে থাক্‌ব ?"

"আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস্ করব ; সত্যি সত্যি উত্তর দিতে হবে।"

"কি কথা এমি !"

"শুনলুম নাকি তুমি বিবাহিত।"

"হাঁ, তাই বটে ?"

"কথাটা এতদিন গোপন রাখা ভাল হয়নি"

"কৈ কেউত আমার নিকট একদিনও জান্‌তে চায়নি আমি বিবাহিত কিনা ! তবে কি আমার গায়ে পড়েই সহরময় বলে বেড়ান উচিত ছিল—ওগো সাবধান, আমি কিন্তু বিবাহিত।"

"তামাসা রাখ ভাই ; কথাটার অর্থ আছে। দাদা কিন্তু এরি জন্যে বেশী চটে গেছেন।"

"তা হ'তে পারে। কিন্তু বিবাহিত হলেই যে তার উপর মানুষের চটতে হবে তেমন কোন আইন কানুন কোথাও এ পর্য্যন্ত প্রচলিত নেই।"

"বল ভাই তোমার স্ত্রীসম্বন্ধে দুটো কথা। শুনতে বড়ই ভাল লাগচে। কত বয়স তার, দেখ্‌তে কেমন, শিক্ষিতা কিনা, এরি মাঝে দু'একখানা চিঠি পেয়েছত ?"

"এত প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গে দেওয়া চলে না। শুধু এক কথায় জেনে রাখ—পত্নীর সঙ্গে আমার সর্ব্বসংস্রব ত্যাগ হয়েছে।"

"এর মানে ?"

"এর মানে আর কিছুই নয়, আমাদের দেশের মেয়েরা এখনো সভ্য হ'তে শিখেনি।"

"ও' বুঝলুম বটে, লেখাপড়া তেমন শিখেনি, কেমন নয় ?"

"ভুল বুঝেছ এমি, লেখাপড়ার সঙ্গে সভ্যতার বেশী কিছু সম্পর্ক নেই। যাক্ সে সব কথা। ও সকল পুরাণো স্মৃতি আমি আর ঘাঁট্‌তে চাইনে।"

"তুমি তবে চিরকাল এই উদাস জীবন বহন ক'রে অনুতাপে দগ্ধ হবে ?

সে সব কাহিনী তোমায় শুনিয়ে এখন আর কোন লাভ নাই, কালই আমাকে এবাড়ী ছাড়্‌তে হবে।"

(৯)

সুখদার ব্যারাম সময় সময় বৃদ্ধি পাইতেছে, সময় সময় কিছু উপশম দেখা যাইতেছে। বেলা দ্বিতীয় প্রহর। ভাদ্রমাসের অসহ রৌদ্র বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। গিরিবালা সুখদাকে বাতাস করিতেছে। আজ তার অবস্থা একটু ভাল। সুখদা বড়ই ক্ষীণকণ্ঠে কথা বলিতেছিল "কি পাপ করেছি দিদি ! একদিনও তিনি মুখটা তুলে আমার সঙ্গে কথা কৈলেন না। বড় সাধ ক'রে লেখাপড়া শিখেছিলুম, তিনি কোথায় আছেন, চিঠি দিয়েও সংবাদ দেন্ না। কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা ছিল সবই অপূর্ণ রয়ে গেল...।"

গিরিবালা—"ছিঃ বোন্, ও সব অলক্ষুণে ভাবনা কি ভাব্‌তে আছে ? বেটা ছেলে, নিজের তাগিদ জন্যই হয়ত কোথাও চলে গিয়েছেন। কাজ শেষ হলেই ফিরে আসবেন ; তার জন্যে এত ভাবনা কিসের। আগে তুমি ভাল হও।"

"না দিদি, আর আমার ভাল হ'য়ে সুখ নাই। যার জন্ত এই শরীর রাখ্‌তে বলছ তিনি একদিনও আমার প্রতি সুনজরে চাইলেন না। বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলেন। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)।"

"সকলের মন সমান নয় বোন্; মাঝে মাঝে এমন একটা দুঃসময় এসে পড়ে, যাতে ক'রে মানুষের মন সবটাই ওলট্‌ পালট্‌ হ'য়ে যায়। একেই বলে অদৃষ্ট বা নিয়তি। আজ সেই নিয়তির চক্রে যতীন বাবুর মত সোণার মানুষ তোমার মত শিক্ষিতা যুবতী পত্নী ঘরে রেখে ও গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। নিয়তিকে পায়ে ঠেল্‌বার কারুর এক্তার নেই বোন্। তুমিও একদিন বাপ্‌ মার কথা অমান্য করেছিলে, পাজী পুথির কথায় অবিশ্বাস করেছিলে। সে সকলই নিয়তির খেলা, বেঁচে থাক বোন্ বেঁচে থাক, সুসময় ফিরে আস্‌লে আবার সব হবে, সব পাবে।"

"এমন দিন কি হবে দিদি ?"

"হবে বৈকি। এই বেদানাটুকু মুখে দাও।"

গিরিবালা ও সুখদা পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমন সময় সুখদার মাতা ভিন্ন প্রকোষ্ঠে হা হাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। লণ্ডন হইতে বিনোদ বাবুর নিকট একখানা টেলিগ্রাম আসিয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই—

"আপনার পুত্র ব্যারিষ্টার যতীন্ বোস্‌ কোনও আত-তায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। তাঁহার অন্তিম কালের অনুরোধে আমি আপনাকে এই মর্ম্মভেদী সংবাদ না জানাইয়া পারিলাম না।

আপনার ছেলের জনৈক বন্ধু।"

কি কুক্ষণে আসিয়া সংবাদটা বাতাসের সঙ্গে সুখদার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। নিমেষ মধ্যে মুমূর্ষু-দেহ হইতে ক্ষীণ অন্তরাত্মা আকাশে উড়িয়া গেল।

তখন অদূরে এক পথিক গাহিতেছিল—

"মনরে আমার সমঝে চল।
আপন-সুখের ভাবনা ছেড়ে মুখে হরি হরি বল।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

দুর্ভাগীর দুঃখ।

(১)

তোমরা কি কেউ শুনবে মাগো দুর্ভাগীদের গান!
ছিলাম আমি মায়ের মেয়ে, বাপের অভিমান!
রূপটি ছিল বয়েস কালে, আগুন লাগে তাই কপালে,
ধনের লোভে ধরা পড়ে' আজকে খাঁচায় পাখী!
হৃদয় খুলে' বলতে গিয়ে বুকটা চেপে রাখি!

(২)

পুরাণো সব প্রাণের কথা কি জানি কি বলে!
চোখ দুটো তাই ভরে' আসে বিষম লোণা জলে।
হায়রে মানুষ, বুদ্ধিবলে—বা'র করেছো কতই ছলে,
তুমি তো, হায়, তেমনি আছ, আজ পতিতা আমি!
তুষের আগুন জলছে প্রাণে সারাটি দিন যামি!

(৩)

এমন কি, হায়, অভাব ছিল ছোট্ট কুড়ে ঘরে!
পুণ্য প্রেমের আদান প্রদান চল্‌তো পরস্পরে।
মাচার ওপর স্বামীর সাথে, কত কথা জ্যোৎস্না রাতে,
নিদ্ আসিত চোখের পাতায় বুক-ভরা সুখ নিয়ে;
কতই আরাম জড়িয়ে গলা কাঁথাটি গায় দিয়ে!

(৪)

বাড়ীর পাশের বাঁশের বনের পাখীর মিঠে গানে—
ননদিনীর জাগ্‌বার আগে উঠতাম মানে মানে।
পায়রার খোপ খুলে দিয়ে, ডোবার ঘাটে বাসন নিয়ে,
মেজে ঘসে মনের সুখে গেরস্তালীর কাজ'
হেসে খেলে করে' যেতাম সকাল দুপুর সাঁজ।

(৫)

এখন আমার মনে পড়ে সেদিনের সব কথা!
বুঝ্‌ছি এখন আজ অভাগীর বৃথা ব্যাকুলতা!
স্বামী কি আর করবে ক্ষমা, ডাক্‌বে কি আর 'মনোরমা'
থুঁতি নেড়ে করবে কি আর সোহাগ শতবার!
হায় ভগবান্, জুড়াও আমার প্রাণের হাহাকার!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ভদ্রলোক ও ছোটলোক।

বহুদিন হইতে সমাজে ভদ্রলোক ও ছোটলোক এই দুই কথা প্রচলিত এবং ইহাদের দুইটী শ্রেণী বিভাগও রহিয়াছে। আমরা সাধারণ জ্ঞানে ভদ্রলোক বলিলে শিক্ষিত সদ্বংশজাত ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি অথবা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই উপলব্ধি করিয়া থাকি, আর ছোট লোক বলিলে যাহারা লেখাপড়া জানে না, চাষবাস করিয়া খায় কিংবা মুটে মজুরি করিয়া খায় সেই সকল নিম্ন শ্রেণীর লোককেই বুঝি। কিন্তু শব্দ গত অর্থে তাহা বুঝায় না। ভদ্র শব্দের অর্থ মঙ্গল. যিনি আত্মার ও সর্ব্বভূতের কিংবা দেশের বা সমাজের মঙ্গলদায়ক,

যাহার চেষ্টা মঙ্গলময়ী, কার্য্য মঙ্গলময়, স্বভাব মঙ্গলময় তিনিই বাস্তবিক ভদ্র। ইহাতে দেশের অপেক্ষা করে না, জাতির অপেক্ষা করে না, শিক্ষা অশিক্ষারও অপেক্ষা করে না। যে দেশের শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে জাতিই কেন হউক না তাহার ভদ্রস্বভাব ভদ্রব্যবহার থাকিলেই তিনি ভদ্র। স্বভাব ব্যবহার প্রকৃতি ভদ্র না হইলে তিনি শত শিক্ষিত হইলেও উচ্চবংশজাত হইলেও ভদ্রশব্দ বাচ্য হইতে পারেন না। যেহেতু শব্দগত অর্থে তাহা বুঝায় না। পক্ষান্তরে আমরা অশিক্ষিত নিম্ন স্তরের লোককে যে ছোট লোক মনে করি তাহাও শব্দের অর্থে বুঝায় না। চাষা মুটে মজুরেরা প্রচলিত ভদ্রলোক অপেক্ষায় কোন্ অংশে ছোট? বলে নয়, তাহারা এক এক জনে শিক্ষিতাভিমানী ৫। ৭ জনকেও দ্বন্দে যমের দক্ষিণ দ্বার দেখাইয়া দিতে পারে। স্বাস্থ্যেও তাঁহারা ছোট নয়, তাহারা শাক ভাত খাইয়া সুস্থ সবল দেহে যেরূপ রৌদ্র বৃষ্টি শীত বাত সহ্য করিয়া থাকে, শিক্ষিত বাবুরা শত চেষ্টাতেও সেরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন না; দেহের আয়তনেও তাহারা ছোট নয়, শিক্ষিতাভিমানীর কৃশ দুর্ব্বল রুগ্নদেহ তাহাদের ভীমকায়ের সমকক্ষ নহে। তবে আমরা ছোটলোক পাইব কোথায়? বাস্তবিক আমরা এভাবে অনুসন্ধান করিলে ছোট লোক দেখিতে পাইব না। ভদ্রলোক ও ছোটলোক শব্দ মনুষ্যের পক্ষেই প্রযুজ্য, যে মানুষ মনুষ্যত্বে ছোট অর্থাৎ যাহার ভিতরে মনুষ্যের লক্ষণ নাই অথবা অতি অল্প পরিমাণে আছে, যাহার অন্তঃকরণ মনুষ্যোচিত নয়, তিনিই বাস্তবিক ছোট লোক অর্থাৎ ছোট মানুষ। বাহিরে হাত পাও চক্ষুঃ কর্ণ মানুষের মত থাকিলেও ভিতরে মানুষের লক্ষণ নাই, ছোট খাট রকমের একটু মাত্র আছে বলিয়াই তিনি ছোট লোক। ইহাতেও দেশ জাতি কুল শিক্ষা ও বাহ্যাবস্থার অপেক্ষা করে না। যে দেশের যেরূপ অবস্থার লোকই হউক না যাহার ভিতরে মনুষ্যোচিত ভাব ছোট, তিনিই বস্তুতঃ ছোট। যখন দেশীয় শিক্ষায় লোকের রীতি নীতি ধর্ম্মভাব দয়া দাক্ষিণ্য আত্মত্যাগ বিশ্বপ্রেমেরভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত, আর্য্যগণ শিক্ষার বলে ঐ সকল সদগুণ লাভ করিয়া দেবচরিত্রে গঠিত হইয়া উঠিতেন, তখন শিক্ষিত লোককে ভদ্রলোক, অশিক্ষিতকে ছোট লোক বলিলে কথাটা এক প্রকার খাটিত। এখন আর সেদিন নাই, এখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় রীতি নীতি ধর্ম্মভাব দয়া দাক্ষিণ্যাদির গন্ধমাত্রও অনুভব করা যায় না। এখন কেবল কয়েকটা বাঁধাগদে পাশ করিতে পারিলেই সে শিক্ষিত। সুতরাং এখনও আমরা যে শিক্ষিত সদ্বংশজাত লোককে ভদ্রলোক ও অশিক্ষিত শ্রমজীবি লোককে ছোট লোক মনে করি ইহা আমাদের ঘোরতর কুসংস্কার ও বুঝিবার ভ্রম মাত্র। অশিক্ষিত শ্রমজীবিদিগের মধ্যে ও ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক বিদ্যমান রহিয়াছেন, আবার সুশিক্ষিত সদ্বংশজাতদিগের মধ্যেও অনেক ছোট লোক দেখিতে পাই।

তাই বলি শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ ও কুলীনমহোদয়গণ! শিক্ষা ও কুলের অভিমানে বুক ফুলাইয়া ধরাকে শরার মত দেখিও না। তুমি যাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেছ তাহাদের মধ্যে অনেকের অন্তরে মনুষ্যত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। তাহাদের দয়া ধর্ম্ম, দেশহিতৈষিতা পরোপকারিতা স্বাধীনতা অনেক শিক্ষিত অপেক্ষায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তাঁহাদের কপটতা নাই প্রবঞ্চনায় শিক্ষা পায় নাই, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সত্যবাদী, কুটীল নীতির ধার ধারে না, সরল ও বিশ্বাসী, তাঁহাদের যৌথ কারবার চিরস্থায়ী। আর তোমাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা ইহার বিপরীত।

ভদ্রলোক ছোট লোক যখন অন্তঃকরণের অবস্থা ভেদে সম্ভূত তখন জাতি কুল শিক্ষার দিকে তাকাইলে চলিবে না।

যদি প্রকৃতভাবে দেখিতে চাঁও, তবে যাহার ভিতরে ভদ্রতা নাই, কার্য্যে ও ব্যবহারেও ভদ্রতা নাই তাহাকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখ, ইহাতে তাহার দোষের সংশোধন হইবে, সমাজের উপকার হইবে আত্ম সম্মান রক্ষিত হইবে। আর যাহার ভিতরে ভদ্রতা আছে দয়া ধর্ম্ম কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি মানব ধর্ম্ম আছে শিক্ষা ও কুল-গৌরব না থাকিলেও তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিও না। তাহাকে আদর কর, সম্মান কর শ্রদ্ধা কর সমাজের মঙ্গল হইবে, দেশের কল্যাণ হইবে। যতদিনে সমাজের সমস্ত লোককে নিজের ভ্রাতার মত আদরের চক্ষুতে দেখার অভ্যাস না হইবে, যতদিনে সম্প্রদায়িকভাব বিদূরিত না হইবে, যতদিন্ আমরা কপটতা স্বার্থপরতা কুটিলতা পরিত্যাগ করিতে না পারিব, যতদিনে আমরা হৈ চৈ না করিয়া নীরবে নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিব, এক কথায় বলিতে গেলে যতদিনে আমরা "ভদ্র" অর্থাৎ মানুষের মত মানুষ হইতে না পারিব, ততদিনে দেশ রক্ষাই বল আর স্বরাজ স্থাপনই বল সবই দুরাশা।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

১৫ই আশ্বিন আশ্বিনের সৌরভ বাহির হইবে।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, Dacca
and Published by Kedar Nath Mojumdar Research House, Mymensingh.

সৌরভ

নবম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩২৮। | দ্বাদশ সংখ্যা।

সাংখ্য দর্শন।

(৩)

আমারা যে শুধু নিজের পরমাত্মীয় পিতৃপুরুষদিগকে তর্পিত করিয়াই বিরত হই তাহা নহে; এই সংসারে যাহাদের বন্ধু বান্ধব নাই, যাহাদের পুত্র পৌত্র দৌহিত্র নাই, যাহাদের বংশে বংশধর বলিতে কেহই নাই তাদৃশ পরলোকগত ব্যক্তিদিগের তৃপ্তি সাধনার্থও আমরা দুই গণ্ডূষ জল ও সভক্তি তিল প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নহি।

"যেঽবান্ধবা বান্ধবাশ্চ যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিনঃ॥"

আরও দেখুন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের উদ্দেশেও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কোন বাধা নাই। ব্রাহ্মণ হইয়াও আমরা চন্দ্রবংশাবতংস ভীষ্মদেবের তর্পণ করি, সূর্য্যবংশগৌরব রাম লক্ষ্মণের তর্পণ করি। এমন কি পরমব্রহ্ম অবধি কীটানুকীট, তৃণগুল্মকে পর্য্যন্ত তৃপ্ত রাখিতে যত্নবান্ হই। "আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু স্বাহা।" ইহা কি হিন্দুধর্ম্মের উদারতার লক্ষণ নহে। (উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্) আর্য্যগণ যে সমগ্র বসুধাকেই আপন কুটুম্বের ন্যায় মনে করিবেন তাহাত কখনও অনুদারের লক্ষণ হইতে পারে না। কে বলে হিন্দুধর্ম্ম সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ? কে বলে ইহা আত্মপক্ষপোষণকারী স্বার্থপর ও অনুদার? ধর্ম্মোদ্দেশে হিন্দুর প্রাণ সমগ্র জগৎকেই যুক্ত দেখিলে তৃপ্ত হয়; পক্ষান্তরে অধঃপতিত, নিগৃহীত ও উচ্ছৃঙ্খল দেখিলেই দুঃখী হয়। সেই উচ্ছৃঙ্খলা নিবারণের নিমিত্তই একই মানবজাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত ব্যবস্থা কিন্তু শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ভিন্ন অচাক্ষুষের (অ-ঋষির) অব্যবস্থা নহে।

কপিলের সমসাময়িক অপর কতিপয় দার্শনিক

কপিলের সমসাময়িক প্রাচীনতম অপরাপর যে সকল দার্শনিকের নাম আমরা জানি তন্মধ্যে (১) আসুরি, (২) পঞ্চশিখ, (৩) সনাতন ও (৪) সনন্দন প্রভৃতি কতিপয় মনীষীর নাম উল্লেখযোগ্য। উঁহাদের মাতা-পিতার বিবরণ দুই একটী স্থানে পাওয়া যায় সত্য কিন্তু উহা সর্ব্বত্র একরূপ নহে। ব্রহ্মার মানসপুত্র হিসাবে তাঁহারা সকলেই পরস্পর ভ্রাতা, একথা অস্বীকারে কোনও আপত্তির কারণ দেখা যায় না। কেহ হয়ত বলিবেন উঁহারা ধর্ম্ম ও হিংসার সন্তান।

(১) আসুরি। ইনি স্বয়ং কপিলের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার রচিত মোটেই দুইখানি পুস্তক পাওয়া যায়। উভয়ই সাংখ্যদর্শন বিষয়ক।

(২) পঞ্চশিখ। ইনি আসুরির শিষ্য বলিয়া কথিত অথচ কপিল হইতেও উপদেশ লাভ করিয়াছেন। ইনি যে সাংখ্যদর্শনের মতবাদ অতি সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে অতি অল্পই প্রমাণ পাওয়া যায় তবে ইহা সুবিদিত ও অবিসংবাদিত যে ইনি সাংখ্যশাস্ত্রেরই প্রবর্ত্তক ছিলেন অথচ পতঞ্জলি মুনির অনুসৃত যোগ-দর্শনেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(১, ২, ৩, ৪) কপিলায় মহামুনয়ে মুনয়ে শিষ্যায় তস্য চাসুরয়ে।
পঞ্চশিখায় তথৈবেশ্বরকৃষ্ণায়ৈতান্নমস্তাম্যঃ॥

(৩) সনাতন; শুধু যোগ নিয়াই ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্তু ইঁহার কোন রচনাপ্রণালী বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

(৪) সনন্দনকে কিংবদন্তীর অনুরোধেই খ্যাত-নামা দার্শনিকরূপে জানা যায়। স্বকীয় শাস্ত্রালোচনার বৎ কিঞ্চিৎ নিদর্শন যদিইবা ইনি কিছু রাখিয়া গিয়া থাকেন আমরা কিন্তু সেই সকলের কিছুই পাইতেছি না।

(৫) ঈশ্বরকৃষ্ণ ও কপিলের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতটুকু তাহা অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া যথার্থতঃ কিছুই বলা যায় না। অন্ততঃ পক্ষে ইনি যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ইহা নির্ব্বিবাদেই স্বীকার করা যাইতে পারে। যাদৃশ অহংজ্ঞানের সহিত ইনি সাংখ্যকারিকা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা দ্বারা, অথচ গ্রন্থের অন্তর্গত লিখন-ভঙ্গীদ্বারা ইঁহাকে অতি প্রাচীন বলিয়াই অনুমিত হয়। "অহংজ্ঞানের সহিত" বলিবার তাৎপর্য্য এইযে, গ্রন্থারম্ভে ইনি কোনও দেবতার স্মরণ না করিয়াই অথবা কোনও পূজনীয় গুরুকে অভিবাদন না করিয়াই একে বারে স্বকীয় বক্তব্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন; যথা "দুঃখত্রয়াভিঘাতা জিজ্ঞাসা—ইত্যাদি।" কোনরূপ শিষ্টাচারের লক্ষণ নাই বা বাক্যের মধ্যে কোনরূপ বিনয় বাক্য ব্যবহার নাই। ইনি যে কে ছিলেন, বসতি কোথায় ছিল? এই প্রশ্ন চির-কালই বোধ হয় অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে। ইঁহার নিজের প্রদত্ত বিবরণদ্বারা এবং বাচস্পতি মিশ্রের নমস্কার প্রণালীর দ্বারা ইঁহাকে পঞ্চশিখের শিষ্যরূপে পরিগণিত করা যায়। * বস্তুত সুদৃঢ় প্রমাণ ব্যতিরেকে ঈশ্বর কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন তথ্যই সত্যরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না।

(৬) অতঃপর যাঁহার বিবরণ উল্লেখ করা হইবে তিনি বহু বহু বিচক্ষণ পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম; অতএব এই প্রসঙ্গ সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। ইঁহার নাম বিজ্ঞান ভিক্ষু। কপিলের মতানুযায়ী প্রচলিত সাংখ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে বিজ্ঞান-ভিক্ষু কৃত ভাষ্য সমূহ অতীব মূল্যবান্। সাংখ্যের মূল বিবরণগুলি সম্পূর্ণাঙ্গে প্রকাশ করিবার কালে ইনি কোথাও এমন কিছুই বাদ রাখিয়া যান নাই যে অংশের আবারও টীকা টিপ্পনী বা ভাষ্যের দরকার হইতে পারে। ভাষাকার হিসাবে কোথাও গ্রন্থের বিস্তৃত ব্যাখ্যা কোথাও বা অতি অল্প কথায় গ্রন্থের সারবত্ত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ইঁহার ছিল। যে-হেতু তাহার সমকালে এতদ্দেশবাসী পণ্ডিতদের মধ্যে কেহও তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ দ্বৈধ ভাব গ্রহণ করেন নাই অথচ তাঁহার মত প্রণালী ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য কিনা এই বিষয়ে বাদী হন নাই, অতএব—উহার মতধারা সর্ব্বতোভাবেই অনুমোদনের যোগ্য। তবে তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে বাচস্পতি মিশ্রের মত বাদের সঙ্গে বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতবাদ অনেক স্থলেই বিসদৃশ আকার ধারণ করিয়াছে। বিস্তার ভয়ে এই স্থলে তাহার উল্লেখ স্থগিত রাখাই সঙ্গত মনে করিলাম। বিজ্ঞান ভিক্ষুর কীর্ত্তিকলাপ পাঁচটী গ্রন্থের ভিতর সুপ্রতি-ষ্ঠিত। তৎসমুদয়ই দর্শনাত্মক। রচনার পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রমে উহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম। ব্রহ্মসূত্র ঋজু-ব্যাখ্যা বা বিজ্ঞানামৃত। ইহা বাদরায়ণ কৃত বেদান্ত সূত্রের টীকা বিশেষ।

২য়। সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য বা ষড়ধ্যায়ী সাংখ্য ভাষ্য। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে।

৩য়। পাতঞ্জল ভাষ্য বার্ত্তিক বা যোগ বার্ত্তিক। ইহা পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস ভাষ্যের বিবৃতি।

৪র্থ। সাখ্যসার। ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৫ম। যোগ সার সংগ্রহ বা জ্ঞান-প্রদীপ। ইহা যোগের প্রক্রিয়ায় পূর্ণ।

পঞ্চম অবধি দ্বিতীয় পর্য্যন্ত প্রত্যেক গ্রন্থেই তত্তৎ পূর্ব্ব গ্রন্থের আভাস রহিয়াছে; কিন্তু সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য ও যোগবার্ত্তিক এই দুই গ্রন্থে পরস্পর উভয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব এতদুভয়ের গ্রন্থকার হয়ত একই সময়ে উভয় গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, নয়ত বা ইনি (বিজ্ঞান ভিক্ষু) কিংবা অপর কেহ এতদুভয়ের এক খানা পুস্তক অপর পুস্তকের সাহায্যে রচনা করিয়াছেন। যতদূর সম্ভব, বিজ্ঞান ভিক্ষুকে ষোড়শ—বা সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াই মনে হয়। তিনি কোন্

* শিষ্যপরম্পরয়াগত মীশ্বরকৃষ্ণেণ চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্ত মার্য্যমতিনা সম্যগ্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্‌। ৭১।

সম্প্রদায়ের লোক অথবা তাঁহার জাতিগত উপাধি কি ইহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে "বিজ্ঞান ভিক্ষু" নামের সঙ্গে যে "ভিক্ষু" শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উপাসক বিশেষের সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা মাত্র। তাঁহার বহু বহু শিষ্যের মধ্যে দার্শনিক জগতে আমরা শুধু তিন জনের নাম দেখিতে পাই।

(১) ভাব গণেশ দীক্ষিত। (২) প্রসাদ মাধব যোগী। (৩) দিব্য সিংহ মিশ্র।

সাংখ্যদর্শন সম্পর্কীয় কতিপয় গ্রন্থ ও টীকা।

সাংখ্যদর্শন সম্পর্কীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা আজ পর্য্যন্ত যতগুলির সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি নিম্নলিখিত তালিকাতে তাহারই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। সাংখ্য কারিকা। ঈশ্বর কৃষ্ণ কৃত।

২। সাংখ্য কারিকা ভাষ্য। গৌড়পাদ কৃত। গৌড়পাদের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ এই—শঙ্করার্য্যের গুরুর নাম গোবিন্দ। গৌড়পাদ এই গোবিন্দেরও গুরুর শিষ্য।

৩। সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদী। বাচস্পতি মিশ্র কৃত। ইনি মার্ত্তণ্ড তিলক স্বামীর শিষ্য। এই সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদী নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহে বিশদী কৃত হইয়াছে।

৪। তত্ত্ব কৌমুদী ব্যাখ্যা। বোধারণ্য যতির শিষ্য ভারতী যতি কৃত।

৫। তত্ত্বার্ণব বা তত্ত্বামৃত প্রকাশিনী। শ্রীমদ্ রাঘবানন্দ সরস্বতী কৃত। ইনি বিশ্বেশ্বরের অন্তেবাসী শ্রীমদ অদ্বয়া নন্দের শিষ্য।

৬। তত্ত্ব চন্দ্র। নারায়ণ তীর্থ কৃত। ইনি বসুদেব তীর্থ ও রাম গোবিন্দ তীর্থ উভয়েরই নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন।

৭। কৌমুদী প্রভা। বাহিনীশ-তনয় স্বপ্নেশ্বরের রচিত।

৮। সাংখ্য তত্ত্ব বিলাস, সাংখ্য বৃত্তি প্রকাশ, অথবা সাংখ্যার্থ সংখ্যায়িকা। ইহা রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃত। ইহার পিতা শিবরাম চক্রবর্ত্তী; তস্য পিতা চন্দ্র-বন্দ্য; তস্য পিতা কাশী নাথ; তস্য পিতা বলভদ্র; তস্য পিতা সর্ব্বানন্দ মিশ্র। এই গ্রন্থে সাংখ্য কৌমুদীর ব্যাখ্যা এবং তত্ত্ব সমাসের ব্যাখ্যা উভয়ই লিপিবদ্ধ আছে।

৯। সাংখ্যতত্ত্ব বিভাকর। গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশ।

১০। সাংখ্য চন্দ্রিকা। নারায়ণ তীর্থ প্রণীত। ইহা কিন্তু তত্ত্ব কৌমুদীর ব্যাখ্যা নহে।

১১। সাংখ্য কৌমুদী। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কৃত। ইনি পূর্ব্বোক্ত (১০) নারায়ণ তীর্থের গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

১২। (সাংখ্যের অপর মূল গ্রন্থ) তত্ত্ব-সমাস। কপিলকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার নিম্ন লিখিত কতিপয় ভাষ্য, ব্যাখ্যা বা বিবৃতি পাওয়া যায়।

১৩। সর্ব্বোপকারিণী। গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশ।

১৪। সাংখ্যসূত্র বিবরণ। " " "

১৫। সাংখ্যক্রম দীপিকা
১৬। সাংখ্যালঙ্কার
১৭। সাংখ্যসূত্র প্রক্ষেপিকা
} এই তিনখানা গ্রন্থ একই ব্যক্তির রচিত।

১৮। তত্ত্ব-যাথার্থ্য-দীপন। ভাবগণেশ দীক্ষিত কৃত। পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে ভাবগণেশ, বিজ্ঞান ভিক্ষুর শিষ্য। ভাবগণেশের পিতার নাম ভাব বিশ্বনাথ দীক্ষিত।

১৯। সাংখ্যতত্ত্ব। বস্তুতঃ পক্ষে এই গ্রন্থের কোন রূপ নামাকরণ হয় নাই। ইহা ক্ষেমানন্দ দীক্ষিতের রচনা। এই ক্ষেমানন্দ রঘুনন্দ দীক্ষিতের নন্দন।

২০। সাংখ্যপ্রবচন বা ষড়ধ্যায়ী সাংখ্য সূত্র নামে স্বতন্ত্র এক খানি গ্রন্থ। ইহা কপিলের রচিত বলিয়া প্রকাশ। ইহার দুইটী টীকা বিদ্যমান।

২১। অনিরুদ্ধ কৃত "অনিরুদ্ধ বৃত্তি।" এবং

২২। বিজ্ঞান ভিক্ষু কৃত "সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য।"

২৩। সাংখ্যবৃত্তি সার। মহাদেব সরস্বতী কৃত। ইনি সাধারণতঃ বেদান্তী মহাদেব বলিয়া কথিত এবং স্বয়ংপ্রকাশ তীর্থের শিষ্য। এই পুস্তকখানা অনিরুদ্ধ বৃত্তিরই সারবস্তু নিয়া সঙ্কলিত বটে; কিন্তু মাঝে মাঝে নিজস্ব কথাও অনেক আছে।

২৪। সাংখ্য দীপিকা। নাগোজী ভট্ট বা নাগেশ চট্টোপাধ্যায় কৃত। ইহা সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের দীপিকা।

২৫। লঘু সাংখ্যবৃত্তি। নাগোজী ভট্ট।

২৬। সাংখ্যতরঙ্গ। বিশ্বেশ্বর দত্ত অথবা দেবতীর্থ স্বামি-বিরচিত। (ইনি সাধারণতঃ কাষ্ঠজিহ্ব আখ্যায় পরিচিত ছিলেন)। সাংখ্যপ্রবচনের অংশ বিশেষ নিয়া স্বকীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তত প্রচলিতও নহে প্রামাণ্যও নহে।

২৭। রাজ বার্ত্তিক। ইহা ধারা-নগরীর অধিপতি ভোজরাজ কৃত বলিয়াই প্রকাশ। ইহা সাংখ্যবাদেরই সম্পূর্ণ বিবৃতি।

২৮। সাংখ্যসার। বিজ্ঞান ভিক্ষুকৃত। ইহা অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইলেও সাংখ্যবাদের সমুদয় তত্ত্বই ইহাতে অন্তর্ভুক্ত আছে। এই পুস্তিকা সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কিছু বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অথচ পরে আরও কিছু লিখিত হইবে।

২৯। সাংখ্যতত্ত্ব প্রদীপ। কবিরাজ যতির কৃত। ইহার গুরু বৈকুণ্ঠ এই পুস্তক পূর্ব্বোল্লিখিত সাংখ্য সারেরই অনুরূপ, কিন্তু তত আদরণীয় নহে।

৩০। সাংখ্যার্থ তত্ত্বপ্রদীপিকা। ভট্টকেশব প্রণীত। পিতার নাম সদানন্দ। সাংখ্যতত্ত্ব প্রদীপের অনুরূপ। পরন্তু প্রতিষ্ঠাপন্ন নহে।

৩১। সাংখ্যসার বিবেক প্রদীপ। শ্রীমদ্ রমেশচন্দ্র দেবশর্ম্ম সাংখ্য বেদান্ততীর্থ কৃত। ইহা বিজ্ঞান ভিক্ষু কৃত সাংখ্যসারের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। গ্রন্থকারের নিবাস বঙ্গদেশান্তর্গত ঢাকা জিলা।

৩২। পূর্ণিমা। শ্রীমৎ পঞ্চানন তর্করত্ন বিরচিত। ইহা বাচস্পতি মিশ্রকৃত সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীর বিশদ ব্যাখ্যা। গ্রন্থকারের নিবাস বঙ্গদেশান্তর্গত ভট্টপল্লী।

ইহা ছাড়া আরও অন্য কতক সাংখ্যদর্শনের টীকা বা ভাষ্য বাহিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ আধুনিক অথচ পণ্ডিতমণ্ডলীতে প্রামাণ্য নহে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সাংখ্য-কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।

খাঁটী বন্ধুলাভ।

দু দিকে দোঁহার ক্ষেত,—মাঝখানে আল,
তাই তায় দুই বন্ধু করে গোলমাল।
এ বলে "এ টুকু মোর,"—ও বলে "আমার"
কিছুতে মিটেনা আর তর্ক সীমানার।
"আমি জানি," বসুন্ধরা কন মৃদু হেসে,—
"কোথায় সে আলি ছিল, কে ফেলেছে চষে।
পাশাপাশি হলে ক্ষেত; তবে সীমানায়
প্রথম ফেটিবে খাঁটী বন্ধু দুজনায়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

স্রোতের ফুল।

৩১

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুশীল কতকগুলি বেত লইয়া আসিয়া দেখিল প্রফুল্লর ঘরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ। বেতের বোঝাটা বারান্দায় রাখিয়া হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে সে উপরে গিয়া দেখিল, পরেশ গায়ে কাঁথা মুড়িয়া বিছানায় শুইয়া আছে—; মাণিক্য একা একা তাহার ঘরের মেঝটা পরিষ্কার করিতেছে। প্রফুল্ল সে খানে গিয়াথাকিবে, ভাবিয়াই সুশীল উপরে উঠিয়াছিল; তাহাকে সেখানে না দেখিয়া সে মাণিক্য কে জিজ্ঞাসা করিল—"প্রফুল্ল কোথায় জান কি?"

মাণিক্য বলিল—"তার দরজা যে আমি বন্ধ দেখিতেছি অনেকক্ষণ—......"

সুশীল নীচে নামিয়া আসিয়া পায়খানার পথে গিয়া প্রফুল্লর নাম ধরিয়া ডাকিল, আঙ্গিনায় দাড়াইয়া ডাকিল, তারপর চিন্তা পূর্ণ চিত্তে পুনরায় উপরে যাইয়া মাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কখন হইতে দরজা বন্ধ দেখিতেছ?"

মাণিক্য—"দুপ্রহর হইতেই আমি নীচে মানুষের সাড়া শব্দ পাই না। সম্ভবত পালাইয়াছে......"

মাণিক্যের এই শেষ মন্তব্যে সুশীল দমিয়া গেল। পরেশ কাতর স্বরে বলিল—"কোথায় গেল তবে? বাহিরের দুই একটা লোক কে জিজ্ঞাসা কর দেখি!"

পরেশ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

সুশীল জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি হইয়াছে?"

পরেশ বলিল—"জ্বরের লক্ষণ; শরীরে খুব বেদনা বোধ হইতেছে, বসন্ত টসন্ত না হইলে রক্ষা। ও পাড়ায় বেজায় বসন্ত হইতেছে—অসময়।"

"তবে তুমি থাক।" বলিয়া সুশীল দৌড়িয়া নীচে নামিয়া গেল।

বাড়ীর ডান পার্শ্বেই ভজহরির মুদী দোকান। সুশীল ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আমাদের বাড়ী হইতে কোন মেয়েকে আজ বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছ?" সুশীলের স্বর কম্পিত ও ভয়ার্ত।

ভজহরি স্থানীয় অপরূপ ভাষায় উত্তর করিল—"তোমাদের মাণিক্য ধনে একটা সুন্দরী মাইয়া লইয়া আজ দুপুরে বেড়াইতে গেছিল, তা ছাড়া আর কারো কথাত জানিনা!"

সুশীল অগাধ জলে তৃণখণ্ডের আশ্রয় পাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"তুমি নিজে দেখিয়াছ? মাণিক্যকে তুমি চিন? মেয়েটাকেও দেখিয়াছ তুমি?"

ভজহরি বলিল—"এইত এহানেবৈয়া এই নিজ জল-জ্যান্ত আখিতে দেখ্‌ছি—আর মাণিক্য! তারে হালার এই ঢাকার সরে না চিনে কে?"

সুশীল দৌড়াইয়া উপরে গিয়া মাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আজ প্রফুল্লকে লইয়া কোথায় গিয়াছিলে—দ্বিপ্রহরে?"

মাণিক্য আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—'ওমা আমি কোথায় যাইব? একি আপদ—'উপরিরেফাঁপরী সাধুরে গরু-চোর'—ভাল আপদ জোঠান গেছে!"

পরেশ বিছানা হইতে মাথা তুলিয়া মাণিক্যের প্রতি জিজ্ঞাসু নেত্রে বলিল—"তুমি তবে আজ কোথাও যাও নাই—এই বাড়ী ছাড়িয়া?"

মাণিক্য চক্ষু তারকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিল—"এক পাও না।"

সুশীল পুনরায় দৌড়িয়া নীচে গেল। রাগে ও ভয়ে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল। সে ভজহরির নিকট যাইয়া বলিল—"ভাই,আমাকে সত্য বল,মাণিক্য বলিতেছে—সে আজ এ বাড়ী হইতে এক পা নড়ে নাই, কি করি বল?"

ভজহরি—"ওহারামজাদী মাগীর কথা কইও না; ওহালিতে তিন দেশ মজাইয়া আইছে, তুমি আহ আমার লগে জাকর গারোয়ানের আস্তবলে, ওই গাড়ী লিয়াইত ও হালি গেছিল......"

ভজহরী সুশীলকে লইয়া গিয়া জাকরের আস্তাবলে সেই গাড়ী ও গারোয়ানকে দেখাইয়াদিল। সুশীল গারোয়ানের নিকট যথা যথ বিবরণ অবগত হইয়া গাড়ী-খানা পুনরায় ভাড়া করিয়াই লইয়া আসিল।

বাড়ীর দরজায় গাড়ী রাখিয়া সুশীল উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া উপরে গিয়া বলিল—"পরেশ, তোমার মাণিক্যই প্রফুল্লকে নিয়া উর্দ্ধু বাজারে রাখিয়া আসিয়াছে। তুমি না গেলে ভাই চলিবে না? তাহাকে দেখা বাড়ীতেই বোধ হয় রাখিয়া আসিয়াছে......"

কথা শুনিয়া পরেশ লাফাইয়া উঠিল।

মাণিক্য গলা পঞ্চমে চড়াইয়া বলিল—"ভাল আপদ আনিয়া জায়গা দিছ......"

সুশীলের হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল; সে রাগের মাথায় মাণিক্যকে প্রচণ্ড ঘুঁসি মারিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া উপরি উপরি পদাঘাত করিল। পরেশ দৌড়াইয়া আসিয়া সুশীলকে ধরিল।

মাণিক্য উচ্চ চীৎকারে কোঠা দালান প্রতিধ্বনিত করিয়া কোমর কাছিয়া সুশীলের দিকে অগ্রসর হইল। সুশীল সবলে মাণিক্যের মুখের উপর মুষ্টাঘাত করিয়া পুন-রায় তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া পরেশকে বলিল—"তুমি যাইবে কি না সত্বর বল, বিলম্বে কার্য্য পণ্ড হইবে।"

মাণিক্যের নাসিকা হইতে প্রবল বেগে রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, দেখিয়া পরেশ বিরক্ত হইয়া বলিল—"যাও তুমি, আমি কোন ফৌজদারী হাঙ্গামার সেফাদে যাইব না—কোথাকার আপদ কোথায় গিয়া পড়ায় দেখ দেখি?"

পরেশের মনের বিরক্তির ভাব সুশীলের উপর অধিক এবং প্রফুল্লর উপর ততোধিক বুঝিয়া সুশীল বলিল "তবে আমি যাই, কিন্তু তুমি সাবধান থাকিও। আমি পুলিশ লইয়া আসিয়া মাণিক্যকে ধরাইয়া দিব। তোমাকে আর এই কুসঙ্গে থাকিতে দিবনা; আগে দেখি মেয়েটার দশা সে কি করিল?"

সুশীল দৌড়িয়া নামিয়া গেল।

সুশীল চলিয়া গেলে পরেশ ক্রুদ্ধ স্বরে মাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যই তুই আজ দ্বিপ্রহরে কোথাও যাস্ নাই?"

মাণিক্য একেবারে পরিষ্কার জবাব দিল—"আজ আমি ঘর হইতে এক পা নড়ি নাই।"

"তবে সুশীল বলে কেন—উর্দ্ধু বাজারে নিয়া তুই প্রফুল্লকে রাখিয়া আসিয়াছিস?"

মাণিক্য জল দিয়া নাক মুখ ধুইতে ধুইতে ফুঁফাইয়া

ফুঁফাইয়া বলিল—"মিছা কথা বলে, বজ্জাত মাগি কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে—এখন আমার উপর আক্রোশ... আমার কেহ নাই বলিয়াই না আজ যে সেই আসিয়া আমাকে অপমান করে।"

মাণিক্য ফুঁফাইয়া ফুঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাণিক্যকে অবিশ্বাস করিবার শক্তি পরেশের ছিল না। সে বলিল—"এ সুশীলের নিতান্ত অন্যায়, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার।"

অনাদরের পর সহানুভূতি পাইলে অভিমান গর্জ্জিয়া উঠে। পরেশের সহানুভূতির আশ্বাস পাইয়া মাণিক্য গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"সে আর কিন্তু এই বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না।"

পরেশ কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তারপর ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়া পড়িল। পরেশ শুইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"দেখ, এখনও ঠিক কথা বল, তুমি প্রফুল্ল সম্বন্ধে কোন কথাই জান না? আজ তাহার সহিত তোমার দেখাই নাই—কেমন সত্য?"

মাণিক্য বলিল—"সত্য, একবারও না।"

পরেশ—"সত্য, একবারও দেখা হয় নাই?"

মাণিক্য—"না, একবারও না।"

"সুশীল কার্য্যটা অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে।" বলিয়া পরেশ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মাণিক্য সহানুভূতি পাইয়া আবার ফুঁফাইয়া উঠিয়া বলিল—"তার কিন্তু আর এখানে স্থান নাই।"

পরেশ মাণিক্যকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"দেখা যাউক।"

৩২

সুশীল এই দারুণ বিপদে পরেশের সহায়তা না পাইয়া প্রথম উদ্যমে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল; হঠাৎ ভগবান তাহার ভিতর শক্তি জাগাইয়া তুলিলেন, সে মিসন হাউসের দিকে গাড়ী চালাইতে গাড়োয়ানকে আদেশ করিল।

এই সময় পাদরী ব্যারো সাহেব ঢাকায় খৃষ্টির মিসনের কার্য্য করিতেন। ব্যারো একজন উৎসাহশীল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। বিপদে পড়িয়া যদি কেহ তাঁহার শরণাগত হইত তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় তাহাকে উদ্ধার করিতেন।

সুশীল একেবারে কাঁদিয়া গিয়া ব্যারো সাহেবের নিকট ঘটনাটী বিবৃত করিয়া তাহার সাহায্য চাহিল। ব্যারো ব্যাপার শুনিয়া আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না, নিজ হইতেই আসিয়া সুশীলের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ী আসিয়া উর্দ্দু বাজারে পঁহুছিল। গাড়োয়ান আপরজান বাইজীর বাড়ী দেখাইয়া বলিল—"মহারাজ, এই বাড়ীতে মাইয়াটা গিয়া ঢুকছিল, ছক্কে ডাক দিয়া দেহেন—ভিতর বাড়ীতেই পাইবেন। মাণিক্য হালায় ঐ গলি ঘুইড়া গিয়া গাড়ীতে উঠছিল—আমি ঐ গলির মুহে আছিলাম.................."

পাদরী সাহেব দরজা ঠেলিতেই গেটের দরজা খুলিয়া গেল। পাদরী সাহেব অগ্রে ও তাহার পাছে পাছে সুশীল প্রভৃতি বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তাহারা সেই বাড়ীওয়ালী বৃদ্ধার সাহায্যে প্রতি কোঠা তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলেন—সুশীল প্রফুল্লর নাম ধরিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল—বাড়ীতে দ্বিতীয় জন মানবের সাড়া পাওয়া গেল না।

পাদরী সাহেবের প্রশ্নোত্তরে বৃদ্ধা বলিল—"মাগো বাবা সাহেব আজ এই বাড়ীতে কোন মাইয়া মানুষ আহে নাই।"

অগত্যা তাহারা নিরাশ হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। গাড়োয়ান বলিল—"হোজা আঙ্গুলে কি ঘি বাইর হয় ছাহেব! লাগাও মাগীরে কিছু, মেরমেরাইয়া হগল কথা কইব..."

সাহেব বেআইন কার্য্য করিতে সাহস করিলেন না। গাড়োয়ান নিরাশ হইয়া বলিল—"তবে আর ভরচা নাই মহারাজ, ও মাইয়ারে কার্ত্তিক বারনিতে কি ঝুলন মেলায় চাটাই খেলতে লিয়া যাইব; মাইয়াটা হাত ছাড়া হৈল!"

ব্যারো মিসন হাউসে আসিয়া এক খানা চিঠি লিখিয়া তাহা সুশীলের হাতে দিয়া বলিলেন—"পুলিস সাহেবকে এখনই এই চিঠি পঁহুছাইয়া আইস। বাড়ী বাড়ী, ঘাটে ঘাটে, নৌকায় নৌকায়—অনুসন্ধান হইবে। কাল ভোরে আমরা পুনরায় বাহির হইব।"

সুশীল বলিল—"আমি এমন দরিদ্র যে আমার হাতে গাড়ী ভাড়াটীও নাই।"

পাদরী সাহেব তাহার পকেট হইতে মনিবেগ খুলিয়া সুশীলের সম্মুখে একটী টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"কাল ভোর বেলায় আসিও।"

সুশীল কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক টাকাটী তুলিয়া লইয়া চলিয়া আসিল। তাহার মন বাসার দিকে ছিল—হয়ত বা প্রফুল্ল কোন প্রকারে আসিয়া বসায় পঁহুছিয়াছে।

সুশীল বাসায় আসিয়া দেখিল প্রফুল্লর দরজা পূর্ব্ববৎ বন্ধ। সে উপরে যাইয়া পরেশকে ডাকিল।

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"পাইয়াছ কি?"

সুশীল নিরাশ ব্যঞ্জক স্বরে বলিল—"না কোথায় পাইব?"

পরেশ বলিল—"অনর্থক তুমি একটা নিরীহ লোককে অত্যাচার করিলে ; এ তোমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। এ বেচারী আজ ঘর হইতেই বাহির হয় নাই........."

সুশীল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল"—তুমিও এ কথা বল পরেশ? তোমার মাণিক্য কিছুই জানে না!"

মাণিক্য চেঁচাইয়া বলিল—"যাও বাহির হইয়া—আমার ঘর হইতে ; তিনি এখন আসিয়াছেন মিতালী চটকাইতে। এবার ঝাঁটা খাইয়া যাইবে!"

মাণিক্যের এইরূপ সম্ভাবণে পরেশ কোন কথা বলিল না দেখিয়া সুশীলের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল ; সে বলিল—"পাদরী ব্যারো নিজে গিয়াছিলেন, তারপর এই দেখ পুলিশ সাহেবের নিকট তিনি চিঠি দিয়াছেন ; আর তুমি স্বজাতীয় হইয়াও অসহায়া চরিত্রবান মেয়েটার অধঃপাতের পথে সহায়তা করিলে ব্যতীত তাহার উদ্ধারের জন্ত কণামাত্রও সাহায্য করিলে না। তোমার মাণিক্য যে মেয়েটাকে বেশ্যার হাতে সপিয়া দিয়াছে, তাহার প্রমাণ এই জাফর গাড়োয়ান। সে ব্যারো সাহেবের নিকট স্পষ্ট বলিয়াছে—মাণিক্য উর্দ্দুবাজারের আগরজান বাইজীর বাড়ীতে আজ দুটার সময় প্রফুল্লকে রাখিয়া আসিয়াছে। গাড়োয়ান আমাদিগকে লইয়া গিয়া সেই বাড়ীও দেখাইয়া আনিয়াছে। আর তোমার বাড়ীর পাশের ভজহরি মুদী বলিয়াছে—প্রফুল্লকে লইয়া মাণিক্য যে আজ বাহির হইয়াছিল তাহা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে—এখন দেখি—পুলিস সাহেব কি ব্যবস্থা করেন?"

পরেশ চক্ষু তারকা উর্দ্ধে তুলিয়া ডাকিল—"মাণিক্য! পরেশ কি বলে?"

মাণিক্য চেঁচাইয়া বলিল—"সোহাগ করিয়া বলিতে দিলে যাহা মুখে আসিবে তাহাই বলিবে।"

"তুমি অধঃপাতে যাও! আর যেন তোমার মুখ না দেখিতে হয়।" বলিয়া সুশীল ক্রোধে অগ্নিস্ফু হইয়া উঠিয়া গেল।

সুশীল গেট পার হইতেছিল, এমন সময় একখানা গাড়ী আসিয়া সেই দরজায় ঠেকিল।

গাড়ীর ভিতর হইতে পুরুষ কণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল—"এই বাড়ীতো?"

প্রফুল্ল বলিল—"হাঁ হাঁ—এই বাড়ী।"

সুশীল প্রফুল্লর স্বর শুনিয়া অধীর কণ্ঠে ডাকিল—"প্রফুল্ল।"

"হাঁ দাদা আমি আসিয়াছি।" বলিয়া প্রফুল্ল মুখ বাড়াইয়া যেন সুশীলের উপর লাফাইয়া পড়িতে চাহিল।

সুশীল গাড়ীর দরজা খুলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে আগে অক্ষয় আসিয়া বাহির হইল, তারপর প্রফুল্ল নামিল।

সুশীলের চিত্ত পূর্ণভাবে প্রফুল্লর চিন্তায় তন্ময় থাকায় সে অক্ষয়কে চিনিয়াও সম্ভাবণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। শুধু প্রফুল্লকে বলিল—"তুমি কোথায় গেছিলে দিদি—না বলিয়া! ছিঃ! আমার কি আর দেহে প্রাণ আছে?"

অক্ষয় বলিল—"সুশীল, ভগবানকে ধন্তবাদ দাও, আজ এ বেচারীকে তিনি যে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তেমন বিপদ হইতে কোন স্ত্রীলোক ধর্ম্ম লইয়া রক্ষা পাইতে পারে না।"

সুশীল জানিত—অক্ষয় মন্মথর মাতুল ভাই বলিয়া প্রফুল্লও তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত। সে বলিল—'দাদারা থাকিতে এমন বোনটীর কি ধর্ম্মহানী হইতে পারে ভাই? তারপর, তুমি এখন কোথায় আছ অক্ষয়?"

অক্ষয় সুশীলের কথার উত্তর না দিয়া গাড়ীওয়ালাকে

পয়সা দিয়া বিদায় করিল। তারপর সকলে আসিয়া কোঠায় বসিল।

অক্ষয় সংক্ষেপে বলিল—"তোমাদের পরেশচন্দ্রের মাণিকাধন প্রফুল্লকে লইয়া ঢাকেশ্বরী দেখাইতে গিয়াছিল; যে কারণেই হউক আমি তাহাদের সঙ্গ লইয়াছিলাম। আমার মনে হইতেছিল মেয়েটাকে কোথায় দেখিয়াছি।... তারপর প্রফুল্ল যখন আমাকে চিনিয়া আমার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল তখন আর কার বাবার সাধ্য তাহাকে সরাইয়া নেয়।...আগরজান আমার পায়ে পড়িয়া গেল। আমি তাহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া প্রফুল্লকে উদ্ধার করিয়াছি।...দেখ ভাই,.এই ব্যাপারের কোন কথা যেন পুলিশে না যায়, আগরজানের নিকট আমি যেন বিশ্বাস ঘাতক না হই।...কিন্তু ভাই তোমার আর এই মেয়েকে লইয়া এই সংশ্রবে এক দণ্ডও থাকা উচিৎ নয়..."

সুশীলও তাহার নিজের চেষ্টা চরিত্রের কথা বলিয়া পুলিশ সাহেবের নিকট লিখা পাদরী সাহেবের চিঠি দেখাইয়া শেষ বলিল—"কালই এ বাড়ী ত্যাগ করিব। কিন্তু আপাততঃ যাই কোথায়?"

অক্ষয়, সুশীল ও প্রফুল্লর মধ্যে এত ঘনিষ্টতার কারণ জানিত না; এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। অক্ষয়ের মনের অবস্থা বুঝিয়া সুশীল তাহার নিকট প্রফুল্ল সম্বন্ধে তাহার অজানিত বিবরণগুলি সংক্ষেপে বলিল।

অবস্থা শুনিয়া অক্ষয় বলিল—"স্থান করিতেই হইবে; না পার, তাহাকে পুনরায় মালঞ্চা পাঠাইয়া দাও। কিন্তু এই সংশ্রবে আর তিলমাত্র সময় থাকিও না। দুর্জ্জনের সংসর্গ তৎক্ষণাৎ ত্যজ্য।"

সুশীল বলিল—"তাহাই করিব। আজ আমার দেহে যেন প্রাণ ছিল না, মনুষ্যত্ব হারাইয়া স্ত্রীবধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" বলিয়া সুশীল মাণিক্য সম্বন্ধীয় ঘটনা বিবৃত করিল।

শুনিয়া প্রফুল্ল বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"তাহাকে আপনি মারিলেন, বাবু কিছুই বলিলেন না?"

সুশীল বলিল—"বাবু আমাদিগকে প্রকারান্তরে এ বাড়ীতে থাকিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

* * * *

পরদিন প্রাতে যাইয়া সুশীল ব্যারো সাহেব কে সকল কথা জানাইয়া তাঁহার চিঠি ফেরত দিল। ব্যারো সাহেবও তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে চাহিলেন। সুশীল সুবিধা পাইয়া নিজের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থী হইল। ব্যারো তাহাকে প্রচুর আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং আপাততঃ থাকিবার একটা স্থান করিয়া দিলেন এবং সেই দিনই সেই পাপ সংসর্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন।

প্রফুল্ল বাসা পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থায় খুব প্রাণের সহিত সম্মতি দান করিল না বটে কিন্তু এই ব্যবস্থা অনুসরণ না করিয়াও উপায় দেখিল না। প্রফুল্লর প্রাণ এই বাড়ীর জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত ব্যথা প্রকাশ করিল, তারপর এক হাতে চক্ষু মুছিয়া, আর একহাতে তাহার অতি যৎসামান্য যে 'যথা সর্ব্বস্ব' তাহা কুড়াইয়া লইয়া দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই বাড়ী ত্যাগ করিল। (ক্রমশঃ)

কেল্লা বোকাইনগর।

কেল্লা বোকাইনগর একটী গ্রামের নাম। এই গ্রামটী অতি প্রাচীন। ইহা ময়মনসিংহ জিলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার অন্তর্গত। ময়মনসিংহ সহর হইতে ১২ মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরে গোলকপুর, দারিয়াপুর, কৃষ্ণপুর, গ্রাম। পূর্ব্বে ইয়ারপুর, গোবিন্দনগর, তারাপুর, কান্দাপাড়া, ফুলহর গ্রাম। দক্ষিণে পশ্চিমপাড়া, কোল্লা, মাইজহাটী গ্রাম। পশ্চিমে বালুয়া নদী।

মোগল সম্রাট শাহ আলমের সময়ে খাজা উসমান বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া, শৈল খাঁ, চাঁদরায় প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারী ও অনেক পদাতিক সৈন্য, কুলি, মজুর সহ বাঙ্গালা দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। বর্ত্তমানে যেরূপ শ্রীহট্ট জেলায় স্থানে স্থানে অনাবাদি ভূমি ও বসত শূন্য স্থান দৃষ্ট হয়, এ অঞ্চলও তখন ঠিক তদনুরূপ ছিল।

সুবাদার সাহেবের সহিত কামার, কুমার, তাঁতি, নাপিত, ধোপা, তেলী, মালী প্রভৃতি আসিয়াছিল। তাহারা সকলেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। সুবাদার সাহেব, এদেশে আসিয়া বোকাইনগর গ্রামটী মনোনিত

করিয়া এই স্থানে ছাউনী করেন। তখন এখানে বোকা কোঁচ নামে এক দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী কোঁচ বাস করিত। তাহার অধীনেও বহু সংখ্যক কোঁচ ছিল। বোকা কোঁচ তাহার দলবল লইয়া, সুবাদার সাহেবকে ছাউনী করিতে বাধা দেয়ায়, সুবাদার সাহেব তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া এখান হইতে বিতাড়িত করেন। সেই বোকা কোঁচের নামানুসারে এই গ্রামের নাম বোকাইনগর ছিল। সুবাদার সাহেব বোকাইনগরের বন, জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া তথায় স্বীয় আবাস নির্ম্মাণ করেন এবং বাড়ীর চারিদিকে পরিখা খনন করান এবং পূর্ব্ব দিকে একটী পুকুর খনন করান। এই সমস্ত কার্য্যের পর পাকা ভাবে বসত করিয়া বঙ্গালার তহসিল কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এই ভাবে এক বৎসর কাল অতীত হইলে পর তিনি নিজকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু এই সংবাদ দিল্লী পৌঁছিতে প্রায় এক বৎসর কাল গত হইয়াছিল; কারণ তখন রেলগাড়ী কি টেলীগ্রাম ছিল না। লোক নৌকা পথে যাতায়াত করিত। তিনি স্বাধীন হইয়াই ১১ হাত প্রস্থে ও ৯ হাত উচ্চে একটী কাঁচা মাটির প্রাচীর গ্রামের চারিদিক ঘেরিয়া নির্ম্মাণ করান। তৎপর এই প্রাচীরের বাহিরে ঐ মাপে আর একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করান। ইহাই এখন "কেল্লা" নামে অবিহিত।

কেল্লা নির্ম্মাণ করাইয়া বালুয়া নদী হইতে, বুড়ুন্দা নদী পর্য্যন্ত যে একটী খাল ছিল, (বর্ত্তমানে ঐ খাল "বড়বিল" নামে খ্যাত) তাহার দুইধারে দুইটী মেটে বুরুজ নির্ম্মাণ করাইয়া যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তিনি সম্রাট সৈন্যের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

সম্রাট, বাঙ্গালার সুবাদার স্বাধীন হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ১৫০০ শত সৈন্য প্রেরণ করেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে সম্রাট সৈন্য, নৌকা পথে না আসিয়া কেল্লা অতিক্রম করিয়া একে বারে সুবাদারের বাড়ী আক্রমন করে। তথায় অতি সামান্য রূপ যুদ্ধের পর সুবাদার সাহেব ধৃত হন, এবং হীরক চূর্ণ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সৈন্যগণ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে ধৃত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করে।

সম্রাটের সৈন্যগণ এখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সম্রাটকে এই সংবাদ প্রদান করে এবং ধৃত ব্যক্তিগণকে সম্রাটের নিকট উপস্থিত করে। বিচারে ধৃত ব্যক্তিগণ নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়ায়,তাঁহাদিগকে ধৃত করার, অবমাননার পুরস্কার স্বরূপ বোকাইনগর গ্রামটী নিষ্কর করিয়া, তাম্র ফলকে এক খণ্ড সনন্দ প্রদান করেন। তাহার পর হইতে ঐ ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের পরবর্ত্তি বংশধরগণ এই নিষ্কর ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। অতঃপর ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই নিষ্কর বাজেআপ্ত করিয়া ৩৩৬৷৷ ৫ পাই বার্ষিক জমায় মুন্সী মহম্মদ হানিপ গয়রহ নামে তালুক বন্দোবস্ত করিয়া দেন, সেই হইতেই কেল্লা বোকাইনগর তালুক হইয়াছে।

খাজা উস্‌মানের পাকা কবর এখনও কেল্লা বোকাই-নগর গ্রামে ভগ্ন দশায় বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। গ্রামে কেল্লাছিল বলিয়াই ঐ গ্রামের নাম, কেল্লা বোকাই নগর হইয়াছে।

খাজা উস্‌মানের দেওয়া একটী মস্‌জিদ এখনও ভগ্না বস্থায় দণ্ডায়মান আছে। এই মস্‌জিদটী নির্ম্মাণের সময় ইহাতে কড়ির চুণ ব্যবহৃত হইয়াছিল, এবং বোতলের আস্তর দেওয়া হইয়াছিল। এই মস্‌জিদের তৈল-চেরাগীর জন্য ২৪ আড়া জমি মৃত নুর মহম্মদ কাজী নামে নিষ্কর আছে। ১২।১৩ বৎসর অতীত হইল এই মস্‌জিদটী কাজী আবদুল রহমান আহাম্মদ সাহেব গ্রাম হইতে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ও নিজ হইতে অবশিষ্ট টাকা দিয়া মেরামত করাইয়াছিলেন। কিন্তু ৫।৬ মাস পরেই মস্‌জিদটী পুনরায় ভাঙ্গিয়া যায়। তৎপর হইতে কাজি আবদুল লতিফ মিঞার বাড়ীতে একটী টিনের চালা করিয়া তাহাতে জুম্মার নমাজ পড়া হইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে এই মস্‌জিদের জন্য ২৪ আড়া জমি নিষ্কর আছে এবং ঐ নিষ্কর কেল্লা বোকাই নগর গ্রামের কাজি সাহেবগণ ভোগ করা স্বত্বেও মস্‌জিদটী মেরামত হইতেছেনা। আশা করি সত্বর কাজি সাহেবগণ এই মস্‌জিদটী মেরামত করাইয়া এই প্রাচীন কীর্ত্তিটী বজায় রাখিবেন।

মস্‌জিদের পূর্ব্বদিকে একটী বড় পুকুর আছে, তাহা এখনও শৈল খাঁর তালাব নামে অবিহিত।

মস্‌জিদের পশ্চিমদিকে আর একটী বড় পুকুর আছে; তাহার নাম চাঁদের তালাব। বোধ হয় এই পুষ্করিণীটী চাঁদরায়ের দেওয়া। ঐ চাঁদের তালাবের পশ্চিম পারে একটী মন্দির আছে; প্রাচীন লোকের মুখে শোনা যায় যে ইহা চাঁদরায়ের শ্মশানের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটীর এখনও কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই; কেবল উপরের চূড়াটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বোকাই নগর গ্রামের মধ্যদিয়া বালুয়া নদী হইতে আর একটী নদী বাহির হইয়া দীঘিরঁ বিল ও বড়বিলা দিয়া বুড়ুঙ্গাতে পড়িয়াছিল; ইহার নাম ছিল, চামার খালি নদী। এই নদীর দুই ধারেই যুদ্ধের জন্য দুইটী, ঘেটে বরুজ করা হইয়াছিল; তাহাও অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে।

চামার খালি নদী হইতে আর একটী খাল দক্ষিণ দিকে গিয়া মাইজকা নদীতে পড়িয়াছিল; তাহার উপর একটী তৎকালীন পাকা সেতু আছে, তাহা এখনও ১২।১৩ হাত উচ্চ, ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া গ্রামের পুরা কালের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই সেতুটী "নাগার পুল" বলিয়া বিখ্যাত। এই সমস্ত নদী এখন শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বোকাইনগর গ্রামে গৌরীপুরের স্বর্গীয় জমিদার যুগল কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্থাপিত একটী ৺কালী স্থাপিত আছেন। ইহার নাম শ্রীশ্রী রাজরাজেশ্বরী মহাদেবী। এইখানে নিত্য নৈমিত্তিক—পূজা মহা আয়োজনের সহিত হইয়া থাকে। ঐ ৺কালীবাড়ীতে ৺কালীর মন্দির ছাড়া আর সব ঘর দরজা খরের ছিল; বর্ত্তমানে গৌরীপুরের দানশীল প্রজাহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় চারিদিকে পাকা দালান করিয়া দিয়াছেন এবং তথায় সংস্কৃত পড়ার জন্য একটী টোল খুলিয়াছেন। সেই টোলের পণ্ডিত ও ছাত্রগণের খোরাকী ও বাসস্থান তিনিই দিয়া আসিতেছেন। ইহা ছাড়া এখানে মায়ের প্রসাদ প্রতিদিন শত শত লোকে পাইতেছে।

৺কালী বাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটী মোহন্তের আখ্‌ড়া আছে, সেই আখ্‌ড়ার ৺শ্রীশ্রী মদন গোপাল নামে বিগ্রহ আছে। ঐ আখ্‌ড়ার মোহন্ত ও সাধুগণ স্ত্রীবর্জ্জিত ও নিরামিষ ভোজী। এখানেও অতিথি সেবা হইয়া থাকে। এই আখ্‌ড়ারও প্রায় ৭।৮ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি আছে। এ সম্পত্তিও ময়মনসিংহ পরগণার জমিদার মহাশয়গণের প্রদত্ত। আখ্‌ড়ার বর্ত্তমান মোহন্তের নাম শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী। আখ্‌ড়াটী চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত ভিতরে ঠাকুরের মন্দির ও আরও দুইটী দালান আছে। একটী নাটমন্দির আছে। এইখানে দোল, রথ, ঝুলন, প্রভৃতি পূজা মহাসমারোহে হইয়া থাকে।

আখ্‌ড়া বাড়ীর অনতি দূরে পূর্ব্বে দিকে একটী দরগা আছে। এই দরগা—শাহ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু শাহ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার (কবর) এখানে নাই। তাঁহার মাজার (কবর) দিল্লীর ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। যখন দিল্লী হইতে খাজা উস্‌মান সুবাদার হইয়া এদেশে আসেন তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে কোথা হইতে এক ফকির আসিয়া এই অরণ্যময় স্থানে "চিল্লা" (চল্লিশ দিন এক স্থানে একাসনে বসিয়া যোগ সাধন করা) স্থাপন করেন। এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং চিল্লা স্থানেই সুবাদার সাহেবের আদেশে তাঁহার "কবর," দেওয়া হয়। এই ফকিরের নাম ছিল "শাহ নিজামউদ্দিন," তাঁহার নামানুসারে এই কেল্লা বোকাইনগরের অন্য নাম—নিজামাবাদ্‌ হয়। শাহ নিজাম উদ্দিন একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।

বহুকাল পরে প্রায় ৭০।৭৫বৎসর হইল কেল্লা বোকাই নগর নিবাসী মৃত রমজান জমাদার নিজ অর্থে কবরটী পাকা করিয়া দিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে প্রাচীর দিয়া দেন এবং ঈদের নমাজ পড়ার জন্য আরও কতকস্থান প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া একটী মিম্বর (বেদী) প্রস্তুত করাইয়া দেন এবং একটী ইন্দারা দেওয়াইয়া দেন। এই দরগার দক্ষিণ দিকে প্রত্যেক বৎসর বৈশাখ মাসে রবিবারে ও বৃহস্পতি বারে মেলা জমে। এই মেলায় বহু হাজতি লোক আসিয়া মানসিক অনুসারে সির্ন্নি দিয়া থাকে। এছাড়া অন্যান্য মাসেও হাজতি (যাহারা মানসিক করে) লোক আসিয়া থাকে। ইহাতেও এই দরগার বহু আয়

হয়। ইহা ভিন্ন এই দরগার জন্য গৌরীপুর ও রাম গোপালপুরের জমিদার মহাশয়গণ ২২ আড়া জমি নিষ্কর দিয়াছেন। এই নিষ্কর এখনও ঐ দরগার খাদেম গণ (সেবাইতগণ) ভোগ করিতেছেন। দরগার যে স্থানে মেলা জমে এইস্থানে বড় বড় আম্র, তেঁতুল, অশ্বথ, কদম্ব, কালাজাম প্রভৃতির বৃক্ষ আছে; তাহাতে ঐ স্থান টী সর্ব্বদাই ছায়াচ্ছন্ন থাকে।

দরগার কিঞ্চিত পূর্ব্ব দিকে সুবাদার সাহেবের পাকা কবর ও তৎ পূর্ব্বে পরিখা বেষ্টিত সুবাদার সাহেবের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। কেল্লা, পরিখা ও বুরুজ—এখনও কতকাংশ বর্ত্তমান আছে।

কেল্লা বোকাইনগর গ্রামে এখন রেল ষ্টেশন হইয়াছে। ঐ রেল ষ্টেশনের উত্তর পশ্চিম কোণে যে জমিদার বাড়ী আছে, এই বাড়ীই ময়মনসিংহের জমিদার গণের আদি বসত বাড়ী। ময়মনসিংহের জমিদারগণের আদি পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় এই স্থানে আসিয়া প্রথম বাসস্থান স্থাপন করেন—তজ্জন্যই এই জমিদার বাড়ীকে এখন পর্য্যন্তও লোকে বাসাবাড়ী বলিয়া থাকে। এই বাসাবাড়ীতে ছনের ছানি, বেতের বাঁধা একটী নাট মন্দির ছিল। এই নাটমন্দিরের নাম ছিল "রংমহল চৌকারী" এই রংমহল চৌকারীটী ছিল বহু প্রাচীন; সুতরাং তাহা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণ লোকে মনে করিত। গত ১৩২৬ সনের আশ্বিন মাসের ঝড়ে এই রংমহল চৌকারীটীনষ্ট হইয়াছে।

কেল্লা বোকাইনগর গ্রামে কয়েকটী মাহাল্লা আছে, তাহা এইঃ—

১। পাঠান টোলা, ২। পাটুয়াটোলা, ৩। কায়স্থ টোলা, ৪। বালু চরা, ৫। মীরাকান্দা, ৬। কাজি পাড়া, ৭। ত্রিশ ঘর ৮। বাজার ত্রিশ ঘর, ৯। আষ্ট ঘর, ১০। গড় পাড়া, ১১। মিরিক পুর, ১২। বাইশ বাড়ী, ১৩। মহম্মদ নগর, ১৪। মমিন পুর, ১৫। সেখু পুর, ১৬। মির্জ্জাপুর, ১৭। ঢুলি টোলা ১৮। নাপিত টোলা, ১৯। ছাতি ধরা, ২০। চক্ পাড়া ২১। খাকান্দর।

পাঠানটোলাতে পাঠানগণ, মিরাকান্দায় সৈয়দগণ, সেখুপুরে সেখগণ, মির্জ্জাপুরে মোগলগণ বাস করিতেন। নাপিতটোলায় নাপিত ও ঢুলিটোলায় ঢুলিগণ বাস করিত।

পাটুয়া টোলার লোকে বকম কাঠের রংদ্বারা রং করিয়া বিক্রি করিত এবং চন্দ্রাতপ, মশারী প্রভৃতির ঝালর বয়ন করিত ও অলঙ্কার গাঁথিত! এই সমস্ত কাজ জানে এরূপ লোক এখনও এখানে জীবিত আছে।

ত্রিশঘরে একটি বড় বাজার ছিল; সেই বাজারে মুসলমান কর্ম্মকারগণ বাস করিত। কর্ম্মকারগণ বন্দুক, কামান, কাটারী তরবারী প্রভৃতি অস্ত্র এবং দা, কুড়াল, খন্তা, সুঁচ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য জিনিষ প্রস্তুত করিত।

এই কর্ম্মকারদের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছে; কিন্তু অল্পদিন হইল জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

ত্রিশ ঘরের বাজারে ও অন্যান্য স্থানে সুবাদার সাহেবের সময়ের দশটি ইন্দারা আছে তাহার জল এখনও ব্যবহৃত হয়।

মমিনপুরে গৌরীপুরের বর্ত্তমান জমিদার মহাশয়ের একটী আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র আছে। এই ক্ষেত্রে ধান্য, পাট, ইক্ষু, সরিষা, কলাই, আলু, মূলা প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হয়। এছাড়া বাঁশ, নারিকেল ও নানা জাতীয় ফলের বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন ফল-বৃক্ষ ফলিত হইয়াছে।

মাহাল্লা গড় পাড়ায় মুনসী মহম্মদ হানিফ সাহেবের বাড়ী ছিল (যাঁহার নামে কেল্লা বোকাই নগর গ্রাম তালুক) তিনি পারসি ভাষায় একজন পণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গালাও ভাল জানিতেন। তিনি খুন করিয়া জেলে যান এবং সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কেল্লা বোকাই নগর গ্রামে সেখ সৈয়দ, মোগল, পাঠান এই চারি জাতির মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ সেই গৌরবময় পূর্ব্ব স্মৃতির তুষানলে দগ্ধ হইবার জন্য এখনও বাঁচিয়া আছেন।

কেল্লা বোকাই নগর বাসীগণ এদেশবাসী লোকের সহিত বিবাহাদি কার্য্য করিতেন না। গ্রামের লোকের সহিতই তাঁহাদের বিবাহাদি হইত। এখন ২।১টী করিয়া গ্রামের বাহিরের লোকের সহিত বিবাহাদি হইতেছে।

পূর্ব্বে এই গ্রামের লোকে হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করিত। অল্পদিন হইল হিন্দী ভাষা কেল্লা বোকাই নগর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছে।

এই গ্রাম এখন কাগজি লেবুর জন্য বিখ্যাত। এই গ্রামে পেয়ারা, কাঁঠাল, ভুবি (কটকল্) টৈপাফল (এক প্রকার টক্ জাতীয় ফল) প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং তাহা খুব সুস্বাদু হয়।

শ্রীআবদুর রহিম খান পাঠান।

বিধবা-বিবাহ-বিষয়ে বর্ত্তমান চিন্তা।

বর্ত্তমান সময়ে, নিজে হিন্দু নহেন অথচ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কোচ মনে করেন্‌না তেমন একটী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে। তাঁহারা অভক্ষ্য ভক্ষণ, অকার্য্য করণ, অগম্য গমন, অবৈধ বিধান প্রভৃতিকে অপরাধ জনক বা অপকার জনক বলিয়া মনে করেন না। তাদৃশ সম্প্রদায়ের অ-স্থিরসিদ্ধান্তে যুবতী বিবাহ, ষোড়শী সপ্তদশী ও অষ্টাদশীর বিবাহ এমন কি বিংশতি চতুর্ব্বিংশতি বর্ষীয়ার বিবাহ, অথচ—বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, অসবর্ণ জাতিক বিবাহ প্রভৃতি নানারকমের অবৈধ বিবাহ দোষ জনক বা অহিতকর নহে। সভা সমিতি গঠন করিয়া, পত্রিকার স্তম্ভে লেখালেখি করিয়া অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া তাঁহারাও আজ সাধারণ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে মনোযোগী হইয়াছেন। বাঙ্গালা মাসিক পত্রের কোন ও ব্রাহ্মনেতর অব্রাহ্মণ সম্পাদক নিজের পত্রিকায় প্রায়শই বিধবা বিবাহ সমর্থন করিতে যাইয়া "বিবিধ প্রসঙ্গ" উত্থাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল দিক্‌ সমান ভাবে আলোচনা করিতে গেলে প্রতীতি হয় যে বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে দুই-দিকেই নানারূপ তর্ক উঠিতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলে যে সকল তর্ক হইত উহার অধিকাংশই শাস্ত্রীয় তর্ক, এখন কিন্তু সেই ধুয়া ধরিয়া শাস্ত্র কথা বাদ দিয়া বহু বহু অশাস্ত্রজ্ঞ, অব্রাহ্মণ ও অপণ্ডিত ও নিজের মন-গড়া দুচারিটী কথা যেখানে সেখানে বলিবার লোভ সামলাইতে পারেন না। বলা বাহুল্য ঐ সমুদয় তর্ক মোটেই শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তাহারা নিজের মনঃ প্রসূত কারণ (reasons) গুলিকেই শাস্ত্র অপেক্ষা অধিক্‌তর আদরের চক্ষে দেখেন। এই নিমিত্ত আমরা আজ এই স্থানে তাদৃশ ব্যক্তিদের বিপক্ষে কয়েকটা অবান্তর কথা বলিতে ইচ্ছা করি, যাহাতে গোড়ামী বা ভণ্ডামীর ভান নাই অথবা "ফল মূল খেকো" ঋষিদের কটু মটে কবিতা ও নাই। বর্ত্তমান কালীন সামাজিক অবস্থা দর্শনে মনে মনে যে সকল সংশয়ের উদয় হয় তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিলে পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলেরই লক্ষ্যে আসিবে।

২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু বাল-বিধবার পুনর্ব্বিবাহ অবলম্বনে দুই দলে যে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল সেই আন্দোলনের সাজ সরঞ্জাম অবশ্যই শাস্ত্র-সাগর হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু কিকারণে জানিনা শাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরস্থায়ী অমর-সুধা লাভ করিতে পারিলেন না। সকলের মধ্যে একটা সামায়িক উত্তেজনা ও প্রেরণা তুলিয়াছিলেন বটে কিন্তু সেই প্রেরণা সর্ব্বত্র, সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা ফল প্রসব করিতে পারে নাই। মধ্যে মধ্যে এদিকে সেদিকে দুই একটী ক্ষীণ বর্ত্তিকা জ্বলিয়া উঠে আবার ক্ষণ পরেই তাহা ক্ষণ প্রভার ন্যায় অলক্ষিতে লোক চক্ষুর অন্তরাল হইয়া যায়। মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে বিধবা বিবাহের বিপক্ষের দলটাই প্রবল ছিল বেশী, এই নিমিত্তই প্রতি-পক্ষের পক্ষ সমর্থন করিতে অনেকেই শাস্ত্রের ভয়ে (বা শাসনের ভয়ে) কেহবা অধর্ম্মের ভয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রথমতঃ সকলকেই মনে রাখিতে হইবে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ ও শাস্ত্রের দেশ। ধর্ম্ম বিগর্হিত অশাস্ত্রের বা অশাসনের দেশ নহে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিয়া ভারতবর্ষে যে রূপ সংগ্রাম ও লোকক্ষয় হইয়া গিয়াছে অন্যকোন বিষয় নিয়া তত নহে। স্বয়ং ভগবান্‌ ও যুগে যুগে ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই অবতার স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বিপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্য সামন্ত গড়িবার উদ্দেশ্যে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার কোন রূপ অবৈধ উপায় ভারতবাসী কোনও দিন উদ্ভাবন করিয়াছে কিনা তেমন ইতিহাস আমরা অবগত নহি। পরের উপর প্রভুত্ব করিতে যাহাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহারা নানাবিধ অনৈসর্গিক উপায়ে জাতীয় দল বল বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত হন্‌, এমন কি সেই সকল অপ্রাকৃত উপায় স্বকীয় প্রজা বর্গের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত আইন কানুন পর্য্যন্ত গঠিত হয়। শুনা যায় ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় কোন কোন রাজা নাকি নিজের রাজ্যের মধ্যে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দেন যে প্রত্যেক পুরুষেরই ষোল বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ করিতে হইবে পত্নীর বয়স ষোল হোক্‌ বিশ হোক্‌ বা তদপেক্ষা বেশী হোক্‌ ক্ষতি নাই, পরন্তু সেই পত্নীতে

প্রতি দেড় বৎসর অন্তর এক একটী সন্তান উৎপাদন করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী কদাচ তেমন অধর্ম্ম কর ও অহিত কর আইনের প্রবর্ত্তন করিতে যান নাই। প্রবর্ত্তন করা দূরে থাকুক চিন্তাও করেন নাই, স্বপ্নও দেখেন নাই। তেমন একটা নিয়ম খোলা থাকিলে আজ ভারতবাসীকে জনসংখ্যায় এত কম দেখা যাইতনা; বিধবা, অধবা, সধবা সকল ক্ষেত্রেই যথেষ্ট আগাছা জন্মিত। কিন্তু তাদৃশ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ভারত হইতে জাতীয়তার ভাব, ধর্ম্মের প্রণোদনা ও শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস কমিয়া যাইত এবং তৎফলে সমগ্র জাতির জাতিত্ব হারাইত সবই এক হইয়া পড়িত। বিধবার বিবাহ প্রচলিত থাকিলে এবং এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির বৈবাহিক সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ থাকিলে আজ আমরা নিজকে হিন্দু বলিয়া গৌরব করিতে পারিতাম না; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বিভিন্ন বর্ণও থাকিতনা।

বিধবা-বিবাহ অবাধে কেন সমাজে চলিতেছে না তৎপ্রতি শাস্ত্র-ব্যবস্থা ভিন্ন আর ও কয়েকটা অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে হিন্দু সমাজে বরের পণ প্রথা অন্যতম। ছেলের বাপ মেয়ের বাপকে নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত না করিয়া, হাজার দু'হাজার কবুল না করাইয়া নিজের গোমূর্খ পুত্রটীরও বিবাহ দেননা। এই কুপ্রথার বিষময় ফলে কেরোসিনের বাজার মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, সপ্তাহে সপ্তাহে দুই চারিটী অবলা কুলবালা ইহলীলা সংবরণ করিতেছে। তাহাদের মর্ম্মব্যথায় ও তাহাদের বিভীষিকাময় হাসিতে কাহার ও ভ্রূক্ষেপ নাই, কর্ণপাত নাই। গিরিশ ঘোষের 'বলিদান' বা অমৃত বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট' তাহাদের মতি গতিতে মহাবিভ্রাট জন্মায় না। তবে কিরূপে আশা করা যায় যে অধুনাতন নব্যশিক্ষিত যুবকদল গৌরী, রোহিনী, ও কুমারী কন্যা পরিত্যাগ করিয়া বিনামূল্যে বালবিধবাদিগকে ভাল-বাসার সামগ্রীরূপে বরণ করিতে রাজী হইবে। যেক্ষেত্রে অর্থাভাবে পরমা সুন্দরী শিক্ষিতা কুমারী কন্যার বিবাহ দেওয়াই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে সেইক্ষেত্রে বাল বিধবার পুনর্ব্বিবাহ কল্পনা দীনদুঃখীর দুরাশার ন্যায় "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে।"

সম্পাদক মহাশয় নিজেও একস্থানে লিখিয়াছেন যে ইদানিং "বিধবার পাণিপ্রার্থীর অভাব"। কথাটা অপর একটী কারণেও সত্য। হেতু এইযে যিনি বিধবাকে বিবাহ করিতে যাইবেন তাহার সেই নব পরিণীতা (?) পত্নি যদি নিজের মন্দভাগ্য বশতঃ (বা রাশিচক্রের বৈগুণ্য বশতঃ) আবারও বিধবা হইয়া পড়ে তবে সেই বেচারা স্বামীর সুখশান্তি ও ইহকাল পরকাল সকলই এককালে নষ্ট হইয়া গেল। অথচ সেই দ্বিতীয় বারের বিধবা রমণীর আবারও বিবাহিত হইবার সুযোগ রহিয়া গেল। বিধবার বিবাহ বিধান যদি একবার বৈধরূপে বিধিবদ্ধ হয় এবং সমাজেও চলিয়া যায় তবে রজোদর্শনের পূর্ব্বে বা পরে যদি সেই কন্যা চার পাঁচ বারও বিধবা হইয়া যায় তবু কিন্তু তাহার জন্য নুতন স্বামী অনুসন্ধান করা দরকার হইবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে নারী-সুলভ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় নরহত্যা ও বরহত্যার আশঙ্কা কম নহে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-স্ত্রীবুদ্ধি কত কি কাণ্ড করিতে পারে তাহার প্রমাণ উপন্যাসেতো বহুল পরিমাণে রহিয়াছেই, কার্য্য ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তখন দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার বুদ্ধিতেও প্রাণারাম মনোভিরাম স্বামিগ্রহণে নব নব আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে! বিধবা বিবাহের যদি প্রচলনই হয় তবে অপছন্দের পুরাণো পতিকে সরাইতেও বাধা বিপত্তি জন্মিবেনা। অন্ততঃ কন্যার সুখের নিমিত্ত জননীরাও সেই সকল কার্য্যে সহায়তা করিতে ত্রুটি করিবেননা। কেরোসিনে আত্মহত্যার বৃত্তান্ত যে-দেশে মাসে মাসে দশেবিশে শুনা যায় সে দেশে পুরাণো পতি পরিত্যাগ করিয়া নুতন গ্রহণে কাহারও প্রয়াস হইবে কি?

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পুরুষ তিনবার স্ত্রী মরিয়া গেলে সত্তর বৎসর বয়সেও চতুর্থবার দার পরিগ্রহ করিতে বিরত হননা, অতএব তুলনা মূলকক্ষেত্রে স্ত্রীলোকগণ কেন সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে বহুদূর যাইতে হইবে না। যিনি একগুঁয়েমী ছাড়িয়া নিজের অন্তঃকরণে এই বিষয়ের সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা করিবেন তাহার বিবেকই তাহাকে সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে। স্ত্রীদিগকে যাহারা সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা

প্রদান করিতে ব্যগ্র, অবশ্য তাহাদের নিকট এমন একটা উস্তর মেজাজ-সই হইবেনা। তাঁহারা চান্ অবলা স্ত্রীলোককে সবলা করিয়া স্বয়ং গৃহিণীর অঞ্চলাগ্র ধরিয়া দুর্ব্বলভাবে নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিতে। এমন ধারা "তাজ্জব ব্যাপার" ও"পাশকরা মাগের" প্রহসন যদি বাস্তব জগতেও নিজের অস্তিত্ব ফলাইতে চায় তবে শিক্ষিত হইলেও বাঙ্গালীর ভাগ্যে শান্তি ঘটিবেনা বরং শাস্তি ঘটিবে। শিক্ষিতা স্ত্রী বিবাহ করিয়া কত কত শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত স্বামীকে আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কত কত অস্বাভাবিক কুৎসিৎ ঘটনার স্রোত বহিয়াছে-লক্ষ্য করিয়াছি। শিক্ষার যদি এই ফল হয় তবে বিধবা-বিবাহেও ভাল ফল ফলিবে কি মন্দফল ফলিবে বলিতে পারিনা।

স্ত্রীলোকের সঙ্গে বহুপুরুষ-সংসর্গ ঘটিলে তাহার "পতিব্রতা" ধর্ম্মে কুঠার পড়ে। কিন্তু পুরুষের বহু স্ত্রী সংযোগেও পুরুষের পুরুষত্ব হানি হয়না বা এক পত্নীত্ব ধর্ম্মে পাতক স্পর্শ করেনা। এই নিমিত্তই বোধ হয় আমরা বাজারে স্ত্রীজাতিদ্বারাই বারবনিতাবিপনি দেখিতে পাই; পুরুষের বাজার কোথায়ও দেখিনা।

তারপর বক্তব্য এই—বিধবা বিবাহ যদি একবার চলিতে থাকে তবে তাহা অচিরেই দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে; কারণ. ক্ষণিক সুখের কামনায় অনেকেই হুজুগে মাতিয়া পড়ে। তৎফলে দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার দেখাদেখি ষোড়শী সপ্তদশীরও পুনর্ব্বিবাহ চলিতে থাকিবে রজোঽদর্শন কারিণীদের সঙ্গে সঙ্গে রজোদর্শন কারিণীদের প্রতিও সর্ব্বসাধারণের স্বাভাবিক সহানুভূতি আসিয়া পড়িবে *। তারপর কয়েক বৎসর পরে যদি অষ্টাদশীর প্রতিও মাতাপিতার স্নেহধারা দরদর ধারে ঝরিতে আরম্ভ করে তবে ক্রমশঃ একসন্তানা বিধবা রমণীর জন্যও নিজের খেয়ালমত একটা ব্যবস্থা গঠন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। সেই সন্তানটী যদি কন্যা সন্তান হয় তবেত বোধ হয় কোন আপত্তিই থাকিবেনা; এই ভাবে দ্বিতয় ত্রিতয় কন্যা সহিতা বিধবা রমণীর বিবাহ অবাধে চলিবে। সপুত্রার বিবাহ চলিবে, যুবক যুবতীর বিধবা বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া বুড়ো বুড়ীর রসের সায়রে বান ছুটিবে। প্রৌঢ় অবস্থায় নাকি কাম-প্রবৃত্তি অধিক বাড়িয়া উঠে!

আরও একটা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে এই যে, বিধবা-রমণীর পুনর্ব্বিবাহকালে সম্প্রদানকর্ত্তা কে হইবেন? পিতা একবার স্বস্বত্বধ্বংস পূর্ব্বক মেয়েকে পরের হস্তে সম্প্রদান করিলেন, কালক্রমে সেই গ্রহীতা-ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে তখন সেই দুর্ভগা বিধবা 'পত্নীর' মালিক কে? মালিকানা স্বত্বের হিসাবে এইস্থলে সেই দানীয় জিনিষটী কি নিয়মলঙ্ঘন করিয়া পিতার অধিকারে আসিবে অথবা শ্বশুরের দখলে থাকিবে? অর্থাৎ মেয়েটীকে দ্বিতীয়বার সম্প্রদান করিবেন কে? পিতা যদি সম্প্রদান করিতে যান তবে তাহা অবৈধও হইতে পারে যে হেতু সেই দানের সামগ্রীতে তাহার অধিকারিত্বই নাই। অধিকারিত্ব থাকিলেও. একই ভূমি পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন মালিকের হস্তান্তর করিতে গেলে কতলোক যে সেই ভূমিতে চাষ আবাদ করিবে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা থাকেনা। তবে যদি মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিয়া অবৈধ প্রথাও সমাজে চালাইবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে মহাজনের মহাজন স্বয়ং বিধাতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। ভগবানের আইন মানুষে পরিবর্ত্তন করে কি সাধ্য? ভগবানের বিধানের নামই শাস্ত্র, এবং উহাই শ্রুতি-স্মৃতি। সেই স্মৃতির ব্যবস্থা কি এত সত্বরই বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যাইবে?

তবে কথা এই যে, প্রাণের টান ও অন্তরের স্নেহ কেহও লুকাইতে পারে না। এই নিমিত্তই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শোকসাগর উথলিয়া উঠিয়াছিল এবং শাস্ত্র-বাচস্পতি মহাশয়েরও শাস্ত্র বিশ্বাস ক্ষুন্ন হইয়াছিল। বস্তুতঃ নিজেরপরিবারে না হউক নিজের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যদি কোন একটী নিকট সম্পর্কীয়া বালিকা অকালে বিধবা হয় তবে তাহার ভবিষ্যৎ

---

* 'রজোদর্শন' শব্দটীকে দুইদিকেই সন্ধি করা যায়। রজঃ+দর্শন=রজোদর্শন। এবং রজঃ+অদর্শন=রজোঽদর্শন। শাস্ত্রতর্কের মজা কিন্তু সন্ধি ও সমাসে। কেহ বলেন ক্লীবে চ পতিতে পতৌ; কেহবা সন্ধি করেন—ক্লীবে চ পতিতে+অপতৌ।

বৈধব্যদশা চিন্তা করিয়া কার না হৃদয় শোকে শতধা বিদীর্ণ হইবে? তেমন অবস্থায় পড়িলে নেহাৎ একটা নীরস পাষাণের হৃদয়েও স্নেহও সহানুভূতির প্ররোচনায় বাল্য-বিধবার পুনর্ব্বিবাহ কল্পনা জাগিয়া উঠে; শিক্ষিত ও উদারপ্রকৃতি ব্যক্তিদের হৃদয়ে যে তেমন কল্পনাকে বস্তুবে পরিণত করিতে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে নিজের মেয়েটীর সুখের জন্য কখনও যেন ভবিষ্যৎ সমাজের অত্যাচারের দ্বার উন্মুক্ত করা না হয়। অত্যাচার ও অনাচার একদিক দিয়া প্রশ্রয় বা ছিদ্র পাইলেই উহাতে বাধা দেওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। শাস্ত্রের বিধানে যদি একটু খানি ফাঁক থাকে তবে চারিদিক হইতে আরও নানা রকমের ফাঁক ও ফাঁকি বাহির হয় অথচ সেই সকল ফাঁকের মধ্য দিয়া অনিষ্ট প্রবেশের সম্ভাবনাই বেশী।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ।

তামাদী আরজী।

চৌকি—নিশ্চিন্তপুর ইনসাফী আদালত

বাদী ম্যালেরিয়া সিংহ বর্ম্মা, পিতা এনোফিলি মশা,
জাতি-ব্যাধি ক্ষেত্র, নিবাস সর্ব্বত্র, মানব-ক্ষয়-ব্যবসা।
বিবাদী কাঙ্গাল, অভাগ্যদিগর, মা বাপ নাহিক কেহ,
জাতি দীন দাস, পেসা-উপবাস, নিবাস-দুর্ব্বল দেহ।
সরিক বিবাদী বিসূচিকা ব্যাধি, বসন্ত ও নিমোনিয়া,
যক্ষ্মা কাস ক্ষয়, রক্ত আমাশয়; উপদংশ, গণোরিয়া।
অন্নবস্ত্রাভাব, ডাক্তারের চাপ, মেয়ের বিয়ের পণ,
জলে ডুবে মরা, কেরোসিনে পোড়া, আরো আছে কতজন।
দাবী পরিমাণ—গরীবের প্রাণ, কড়ার অধিক নয়,
বাবত খাজনা। বাদির বর্ণনা—নিয়ে দিনু পরিচয়—
(১) এই আদালত এলাকাস্থিত ডিবিজান মরঘাটী,
পরগণে ঝিল, তরফ মুস্কিল, মৌজে বাঁশ-বাঁধা পাটী।
নিম্নের লিখিত চৌহদ্দিস্থিত স্বনামে লিখিত তার,
চৌদ্দ পোয়া জমি জীবন জমার বিবাদী দখিলকার।
(২) পূর্ব্বোক্ত মৌজায়, পনের আনায় মৌরসিদার বাদী,
সরিকগণের এক আনা অংশ স্বত্ব শুধু মেয়াদী।
বাদীর অংশের খাজানাদি সব পৃথক আদায় হয়,
(ক) তফসিল মত বাদীর অংশে বাকী আছে সমুদয়।
তলব তাগাদা সত্বেও নষ্টামী করে বিবাদী,
দিবে বলে ফাঁকি, রাখিয়াছে বাকী মায় সেস খাজনাদি।
(৩) আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র আদায়ের প্রথা মতে,
উক্ত মৌজার নালিসের হেতু ঘটিয়াছে কিস্তি গতে।
(৪) সরিকগণও বিবাদীর কাছে চেষ্টা করিয়া বিবাদী।
জানিতে পারেনি সরিকের বাকী সঠিক সংবাদাদি।
১৪৮ (ক) ধারার মতে সরিক বিবাদীগণে
মোকাবিলা করি হুজুরাদালতে এ নালিশ সে কারণে।
(৫) বাদীর প্রার্থনা—(ক) বাদীর খাজানা ডিক্রী হয় সুবিচারে।
মুলতবী কালের সুদসহ যেন উক্ত ধারা অনুসারে।
(খ) মোকাবিলা পণ বাদী হয়ে যদি হিসাব দাখিল করে,
অতিরিক্ত কোটফি দিতে রাজী বাদী সংশোধিত দাবি ধরে
(গ) সম্পূর্ণ খরচার ডিক্রি পাইতে বাদী হন হক দার
আইন ইকুইটি মতে যেন পায় অন্য সব প্রতিকার;

তফসিল হিসাব (ক)

খাজানা—জীবন-ধন সে—পুত্র-পরিজন
সুদ তার যা কিছু সঞ্চিত।

চৌহদ্দী

উত্তরেতে রুক্ষ কেশ, দক্ষিণে পায় দেশ
পূর্ব্বে প্লীহা পশ্চিমে যকৃত।

সত্যপাঠ—

আমি ব্যাধি ম্যালেরিয়া প্রকাশ করিনু এই—
আর্জির লিখিত যত তথ্য—
জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সাক্ষরিনু আদালতে
সব মিথ্যা কতকাংশ সত্য।

জঙ্গীপুর সংবাদ

দুর্ভিক্ষ-চিত্র

"জোয়ান বেটাছেলে তুমি, এখনো কোন্ প্রাণে ঘরে ব'সে রয়েছ? না খেতে পেয়ে বৃদ্ধ পিতা কঙ্কালসার হ'য়ে গেছেন, শিশু দু'টির বুকের হাড় একটী একটী ক'রে গণা যাচ্ছে; ছেলে হ'য়ে বুড়ো বাপের খাদ্য জোগাতে পারবে না, জ্যেষ্ঠ হ'য়ে কনিষ্ঠ শিশুভাইদের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারবে না? —আর আমি? আমার কথা ভেবে কিছু দরকার নেই। যা করেন ভগবান্।"

"কি করবো রঙিয়া, দেশ জুড়ে যে কাজ মিলছে না; কোথায় মজুরী খাট্‌বো বল? কি কুক্ষণে ব্রহ্মাণীতে বান ডাক্‌ল, দেশের জমি পাথর সব ভাসিয়ে নিলে; তারপর দু'মাস ধরে অনাবৃষ্টি——"

"ও সব কথা বার বার নতুন ক'রে শোনাতে হবে না। দেশে অনাবৃষ্টি হ'য়েছে, দুর্ভিক্ষ লেগেছে কোথাও কেও মুটে মজুর খাটায় না, টাকা মিলেত ভাত মিলে না, এ সকল কাহিনী সকাল বিকাল মুখে মুখে গেয়ে বেড়ালেই বুড়ো বাপের মুখে ভাত আস্‌বে না। দেখ্‌তে পাচ্ছনা তুমি শিশু দুটির চেহারা! দিন দিন তারা কি হ'য়ে যাচ্ছে! —আহা মর্‌বার সময় মায়ি আমার চোখের জলে ভেসে ভেসে ননীর পুতুল দুটিকে আমারি হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন; আজ তাদের ভাবি * তাদের শুষ্কমুখের এক বেলার জন্যেও দু'মুঠো ভাত তুলে দিতে পারছেনা (অশ্রুমোচন ও ছিন্ন মলিন বসনাঞ্চলে মুখাচ্ছাদন) এখনো বল্‌ছি—বেড়িয়ে পড়, বাছা দুটির প্রাণ বাঁচাও।"

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কুড়্‌মনালা নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে স্বামী ও স্ত্রীতে কথোপকথন হইতেছিল। স্বামীর নাম গয়ারাম মণ্ডল, স্ত্রীর নাম রঙিয়া, জাতিতে মাল। সেবার বাঁকুড়ায় ঘোরতর দুর্ভিক্ষ। উপযুক্ত সময়ে জল না হওয়াতে মোটেই ধান হয় নাই। নিম্নশ্রেণীর লোক সাধারণতঃ আপন আপন জমির ধানের উপর নির্ভর করিয়াই বৎসর কাটায়। কিন্তু এ বৎসর ধানের গোলা সকলেরই শূন্য। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, কৃশককুল আকুল নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অনেকদিন এবং অনেক রাত্রি কাটাইয়াছে। কিন্তু সকলি নিষ্ফল যাদের একটু সচ্ছল অবস্থা তারাও আজ ভাবী বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। মুটে মজুরগণ খাট্‌বার সুযোগ পাইতেছে না। ক্ষেতে জল নাই খাট্‌বে কোথায়?

স্ত্রীর মর্ম্মঘাতী বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া গয়ারাম বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। সঙ্গে তার তিনটী নূতন মাদুর। পার্শ্ববর্ত্তী 'জগ্‌ধরী' হাটে যাইয়া দেখিল কোথায়ও কেহ খরিদ্দার নাই। শুধু জন কতক ধাঙ্গর সামান্য কিছু বিক্রেয় জিনিষ সম্মুখে রাখিয়া তীর্থের কাকের মত বসিয়া আছে। বেলা শেষ হইতে আর বাকী নাই, কিন্তু গয়ারামের মাদুর বিক্রী হইল না। এই সময় বাজারের বিঠলদাস কাপড়ওয়ালা সেই তিনখানা মাদুর আঠার পয়সায় কিনিয়া লইল। সুসময়ে উহার দাম দেড় টাকার কম নহে। যাহ'ক, গয়ারাম দু'হাত তুলিয়া বিঠলদাসকে আশীর্ব্বাদ করিল এবং মনের আনন্দে চা'ল কিনিবার জন্য চলিল।

যেই কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছে অমনি বাজারের নিতাই চাঁদ সাহ বুভুক্ষু ব্যাঘ্রের মত গয়ারামের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার হাত হইতে পয়সাগুলি ছিনাইয়া লইয়া দন্তে দন্তে নিষ্পেষণপূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে রূঢ়স্বরে বলিল—"এখন যাবে কোথা মহাজনের পো! আচ্ছা বাগে পেয়েছি এবার,—পয়সা আদায় না করে ছাড়ছিনে।—বাকী পয়সার চাল ধার নেওয়া, তারপর আর দু'মাসের ভেতর পয়সা দেওয়ার নামটী নেই। এখন আর কিছুতেই রেহাই পাবে না!"

দুর্ব্বল গয়ারামের হস্ত হইতে নিতাই চাঁদ সাহু অনায়াসে পয়সা কয়টী ছিনাইয়া নিল। ক্রোধে ক্ষোভে জ্ঞানশূন্য গয়ারাম অজ্ঞানের মত নিতাই চাঁদকে পাল্টা আক্রমণ করিতে যাইয়া নিজেই জ্ঞানশূন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

(২)

কুড়্‌মনালা গ্রামে গয়ারামের অতিবৃদ্ধ পিতা পুত্রবধূকে শোধাইতেছে "মা রঙিয়া! গয়া যে কোন্ ভোরের বেলা মাদুরগুলি নিয়ে চলে গেল, এখনো যে ফিরল না মা।" বৃদ্ধের স্বর করুণা-জড়িত।

* বর্দ্ধমান বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বড় ভাইর বৌকে "বৌদিদি না বলিয়া অনেক সময় "ভাবি" সম্বোধন করা হয়! বিশেষতঃ ক্ষত্রী, ছত্রী ও বৈশ্য পরিবারের।

"আসবে বাপ আসবে, এখনি ফিরবে। মনে লয় মাদুরগুলি এখনো বেঁচা হয়নি তাই বিলম্ব হচ্ছে। — এই ধরুন খানিকটা ভুট্টার ছাতু, বাকীটুকু নসী খুসীকে খাইয়েছি। ওরা এখন ঘুমুচ্ছে।"

"বলিস্ কি মা, তুই যে এখন পর্য্যন্ত কিছু মুখে দিস্‌নি তুই খাবিনে—আর আমি সবগুলো ছাতু একা খাব?"

"ও আর সবগুলো নয় বাপ। খানিকটা মাত্র রয়েছে। তাতে আপনারই কুলোবে না।—ভাগ্যিস্ কাল্‌কে একটা হাস বেঁচে এক সের ছাতু জুটেছিল..."

"যা আছে মা, তা-ই ভাগ করে খেতে হবে। তোকে না খাইয়ে আমার এই মরাপ্রাণে সবগুলা ছাতু কিছুতেই..."

এমন সময় বাহির হইতে ডাক শুনা গেল "ভোলানাথ বাড়ীতে রয়েছ হে?"

"কে বটে?"

"আমি রামতারণ সরকার বাবুজির তলপ হয়েছে।"

"বাবুজির তলপ্ হয়েছে? আমার উপর?"

"তোমার উপর নয়হে, তোমার বড় ছেলের উপর।"

"কি কারণ বটে?—বসুন ওই মাদুর খানা বিছানো রয়েছে।—কিছু যে বুঝ্‌তে পারছিনে।"

"কাল গয়ারাম গিয়েছিল বাবুর বাড়ীতে চা'ল ধার আন্‌তে। এ দুর্দ্দিনে কি কেউ কাকে চা'ল ধার দেয়? কিন্তু বাবুর আমাদের দয়ার শরীর; বলেছিলেন বুঝে শুনে দেখ্‌বেন। তাই আজ আমায় ব'লে পাঠিয়েছেন। তোমার ছোট ছেলে দুটীকে যেন সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। যাই বল ভোলানাথ, বাবুর আমাদের দয়ার শরীর। হাতে যা কিছু দিবেন একেবারে দান।"

তারপর পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রঙিয়া নিকটে দাঁড়ানো। সরকার মহাশয়ের লোলুপ দৃষ্টি বৃদ্ধ ভোলানাথের সরল চক্ষু অতিক্রম করিয়া ঘন ঘন রঙিয়ার উপর বর্ষিত হইতেছিল। রঙিয়ার গায়ে গোলাপ ফুলের মত কাঁচা সোনার রং নাই বটে কিন্তু রূপ আছে বয়স আছে। এই দারুণ দুর্ভিক্ষেও রঙিয়ার দেহে যৌবন লহরীর অচঞ্চল লীলা খেলা চলিতেছিল।

খানিক পর সরকার মহাশয় আসন ত্যাগ করিলেন।

এদিকে সারারাত্রি গয়ারাম গৃহে আসিল না। পরের দিন ভোরের বেলায় উঠিয়া রঙিয়া শ্বশুরকে বলিল "বাবুজি যখন দয়া ক'রে খবর দিয়াছেন, অবশ্যই ছেলে দুটীকে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করা সঙ্গত। পোড়ারমুখো মিন্সে এখনো ঘরকে এলনা। তোমারও বাপ্ নড়বার শক্তি নেই। এখন আমিই নসী-খুসীকে নিয়ে যাবো মনে করেছি, কি বল তুমি?"

বৃদ্ধ কোন আপত্তি করিল না। এ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পর্দার বাঁধ নাই। কাজেই ভোলানাথ বা রঙিয়া কাহারই মনে কোনরূপ দ্বিধা বা সঙ্কোচ আসিল না। রঙিয়া চলিল। তার দক্ষিণে ও বামে নসী-খুসী দুই শিশু দুই হাত ধরিয়া চলিয়াছে। দু'দিনের উপবাসে রঙিয়ার অবশ পা দু'খানা আর ত বশ মানিতে চাহে না। শুধু সে শিশু দুটীর মুখপানে চাহিয়া দ্বিগুণ বল সংগ্রহ করিয়া মায়া পুত্তলির মত হাঁটিয়া চলিয়াছে।

(৩)

বেলা এক প্রহর চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ভোলানাথ ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ক্ষণে রঙিয়ার ভাবনা, ক্ষণে গয়ারামের ভাবনা ভাবিতেছে। নিজে প্রায় চলচ্ছক্তি-শূন্য। এমন সময় মাতালের মত টলিতে টলিতে জীর্ণ দীর্ণ গয়ারাম বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। হাতে পয়সা নাই, অথচ ঘরেও খাবার নাই। গতকল্য সারারাত্রি সে জগ্‌ধরী বাজারের মধ্যস্থলে উন্মুক্ত আকাশ-চন্দ্রাতপের তলে শুইয়া কাটাইয়াছে? গায়ে একটু জ্বরের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ঘরে আসিয়াই সে ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়া শয়ন করিল এবং পিতার মুখে শুনিতে পাইল নসী-খুসীকে সঙ্গে লইয়া তাহার স্ত্রী বামাপদ বাবুর সাহায্য আনিতে গিয়াছে। ইহাতে গয়ারাম মনে মনে অশান্তি বোধ করিল।

অতৃপ্ত ক্ষুধার জ্বালায় পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার স্ত্রীটী আজকাল বড় মুখরা হইয়াই পড়িয়াছে। সে বাড়ীতে থাকিলে গয়ারামকে অবশ্যই দু'চারিটি চোখা চোখা বাক্যবাণে জ্বালাতন হইতে হইত। কেননা আজিও যে গয়ারাম পরিবারের জন্য কণামাত্র খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে নাই।

বেলা অবসান প্রায়। রঙিয়া ফিরিয়া আসিল না। বৃদ্ধের পেটেও দানা পড়িল না। গয়ারাম প্রায় অচৈতন্য ও বাক্যহীন। ধীরে ধীরে রজনী পোহাইল। অপর দিন যেমন ভাবে পোহায় আজিও তেমনি ভাবে পোহাইল। সারারাত্রি ভোলানাথের ভাবনা-দুর্ব্বল চক্ষুতে নিদ্রাদেবীর স্থান হয় নাই। বৃদ্ধের মানসিক অবস্থা বর্ণনাতীত।

ভোরের বেলায় সরকার মহাশয় আসিয়া নসী-খুসীকে বৃদ্ধ ভোলানাথের কাছে পঁহুছাইয়া দিল এবং কাপড়ের আঁচলে বাঁধা আধসের আন্দাজ চাউল বৃদ্ধের হাতে দিয়া কহিল "এই লও ভোলানাথ! বাঁকুড়া রিলিফ্ ফাণ্ড

হইতে তোমাদের বাড়ীর জন্য আজকে এই আধসের চা'ল ভাগে পড়েছে। দরখাস্ত কর্‌লে পর আরো কিছু চা'ল পাওয়া যাবে। তার জন্য তোমাদের কোনো ভাব্‌তে হবে না, আমিই তোমার হয়ে দরখাস্ত লিখে পাঠাবো।"

বৃদ্ধের দৃষ্টি চালের দিকে ছিল না, কাণও সরকারের কথার প্রতি ছিল না। যুগবৎ শঙ্কা ও বিস্ময়ের সহিত সে সরকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল "হাগা বাবু, আমাদের রঙিয়া..."

"রঙিয়া আজ থেকে বাবুদের বাড়ীর ঝি। সেখানেই থাক্‌বে খাবে কাজ করবে; সন্ধ্যার আগে বাড়ী চলে আসবে। এতে ক'রে তোমাদেরই একজনার খোরাক বেঁচে গেল। মাঝে মাঝে শিশু দুইটিরও খাওয়া চলবে।"

তপ্ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বৃদ্ধের মনের ভিতরের গভীরতম শেয়ান্তি জানাইয়া দিল। যুবতী স্ত্রীর যুবক স্বামী এখনও শয্যাত্যাগ করে নাই; সে এখন সংসারের সুখ দুঃখে উদাসীন। তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত জোয়ান শরীর মাটির সঙ্গে এলাইয়া পড়িয়াছে। সে এখনো গভীর নিদ্রা মগ্ন। সরকার মহাশয় চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরে নসী-খুসীর কোলাহলে গয়ারামের নিদ্রা ভাঙ্গিল। উঠিয়া শুনিল রিলিফ্‌ ফণ্ড্‌ হইতে কিছু চাউল সাহায্য আসিয়াছে। আনন্দে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল; দুর্ব্বল দেহে বল সঞ্চার হইল, জ্বর পালাইয়া গেল। গৃহিণী বাড়ীতে নাই, পিতা বৃদ্ধ, সুতরাং স্বহস্তেই রান্না শেষ করিতে হইবে। পাকক্রিয়ার ব্যাপারটা তাহাকে মাঝে মাঝে এমন অনেক দিনই করিতে হইয়াছে। উনুনে ভাত বসিয়াছে, শিশু দুইটী আজ হাপুষ নয়নে ভাতের হাঁড়ীর দিকে চাহিয়া আছে, কখন ভাত নামিবে। কাল রাত্রিতে বামাপদ বাবুর বাড়ীতে যে কি কি খাইয়াছে, অথবা সত্য সত্যই খাওয়া হইয়াছে কিনা সেই খবর ভোলানাথ বা গয়ারাম কেহই এই পর্য্যন্ত নেয় নাই। শিশুদের প্রত্যেকের হাতে চারিটী করিয়া পয়সা। তাই তাহাদের মুখ বন্ধ ছিল; কিন্তু মুখ-বন্ধ থকিলেই নগদ পয়সায় কখনও পেটের ক্ষুধা দূর হয়না। আজ আর উহারা উনুনের ধার হইতে এক পা দূরে নড়িতেছেনা। তার পর দুই ভাইতে বিবাদ আরম্ভ হইল কে আজ বেশী পেট ভরিয়া খাইবে। হায় পোড়া দুর্ভিক্ষ! হায় সোণার বঙ্গদেশ! ছোট ভাইদের ঝগড়া শুনিয়া বড় দাদার অন্তরে আঘাত লাগিল; চক্ষুতে আর উচ্ছ্বসিত জল রাশি বাধা মানিতে চায়না। এই সামান্য চাউলের ভাতে কিরূপে যে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে তাহা ভাবিয়া গয়ারাম মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। অবশেষে ভাত নামিল, শিশুদের সম্মুখে ভাত পরিবেশন করা হইল। একমাত্র লবণ ও কচুসিদ্ধ সহযোগেই দুই ভাই অর্দ্ধেকের বেশী ভাত নি-শেষ করিয়া দিয়াছে। অনশন ক্লিষ্ট, রোগ পীড়িত ও মর্ম্মাহত গয়ারাম অবশিষ্ট ভাত বৃদ্ধ পিতার সম্মুখে রাখিয়া ক্ষোভে দুঃখে চুপি চুপি বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পেটে জঠরাগ্নি দাউ দাউ জ্বলিতেছে। সারাটা গ্রাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া মজুরী খাটবার ব্যর্থ প্রয়াসে গয়ারামের রুগ্ন মস্তিষ্ক আরও রুক্ষতর হইয়া উঠিল। কোথাও আহারের সুযোগ ঘটিলনা। দুর্ভাবনার চিহ্ন সকল তাহার প্রতি অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়া অন্তরের গভীরতম বেদনা জানাইয়া দিতেছিল। অভাবের তাড়নায় তাহার যুবতী স্ত্রী এখন পরের বাড়ীতে চাকরাণী। বৃদ্ধ পিতার কাল কি ব্যবস্থা হইবে স্থিরতা নাই, শিশু দুইটী কাহার গলগ্রহ হইবে—ভগবান জানেন্‌। নিজের উদরে ও আজ তিন দিন যাবৎ দানা নাই। আর কত সহ্য হয়! এই সমস্ত দুশ্চিন্তা গয়ারামকে ক্ষিপ্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছে। সারাদিন সে বাহিরে কাটাইয়া এখন কি করিবে ভাবিতে লাগিল। একবার ভাবিল বাড়ীতে আর কাহাকেও মুখ দেখাইবেনা যে পর্য্যন্ত না সে খাওয়া পরার একটা বন্দোবস্ত করিতে না পারে। কিন্তু নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় রাত্রি কাটাইব কোথায়? দারুণ দুর্ভিক্ষে চারি দিকে চুরী ডাকাতির ধূম পড়িয়া গিয়াছে, কত নির্দ্দোষ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইয়া নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে। সে ধীরে ধীরে বাড়ীতে পৌছিয়া গোপনে নিজেদের শূন্য গোয়ালঘরেই রাত্রি কাটাইতে স্থির করিল।

(৪)

বামাপদ বাবুর কর্ম্মচারী রামতারণ সরকার রঙ্গিয়াকে প্রবোধ দিতেছেন "শোন্‌ রাঙিয়া তোর ভালর জন্যই বল্‌ছি; বাবুর বাড়ীতে গিয়ে আর দরকার কি? পেটে ভাতে খাট্‌নী বৈতনয়—তা—বাবুর বাড়ীতে যা আমার বাড়ীতেও তা। বরং বাবুর বাড়ীতে কাজ করিলে তোকে ভাল মন্দ দু'কথা কেউ জিজ্ঞেস্‌ করে তেমন লোক খুঁজে পাওয়া দায় হবে। আর আমার বাড়ীতে থাক্‌লে সে দুঃখ নেই, আমি আদরের চক্ষে দেখ্‌ব-সকলেই তোকে ভালবাস্‌বে।"

"আপনি রাত দিন ওসব কি বক্‌ছেন আমার কাছে? কাল সন্ধ্যা থেকে আজ পর্য্যন্ত আপনার কোনো কথারই যে মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারিনে। ছেলে দুটী সঙ্গে ছিল, ফাঁকী দিয়ে কেড়ে নিয়েছেন; বাবুর বাড়ীতে যাবার কথা ছিল, জোর করে আমায় আবদ্ধ করে বাড়ীর সকল দরজা বন্ধ রেখেছেন। ঘরে জন মানবের সাড়া শব্দ নেই—আর আপনি বল্‌ছেন কিনা আমাকে এখানে সকলেই আদরের চক্ষে দেখ্‌বে-ভাল বাস্‌বে! কি অভিসন্ধি আপনার?"

"অভিসন্ধি আর বুঝ্‌তে পারছ না চাঁদ! তোমাকে আমারই বাড়ীতে ঝি হয়ে থাক্‌লে মানাবে ভাল। এই ধর আগামো টাকা-আর কাপর খানা।"

পদ মর্দ্দিতা ফণিনীর ন্যায় রঙিয়া রোষে গর্জ্জন করিয়া উঠিল "ভেসে যাক্ তোমার টাকা কাপড়, চোলোয় যাক্ তোমার আদরকরা। পিশাচ তুমি! তোমার মাথায় শয়তানের আজ্ঞা হ'য়েছে। এখনো বল্‌ছি ভাল চাওত দরজা খুলে দাও।

পাপিষ্ঠ রামতারণের কাণে এসমস্ত স্তুতিবাক্যের ঠাঁই হইল না। তাহার মনে দৃঢ় ধারণা শিকার যখন খাচায় ঢুকেছে তখন আজ হো'ক কাল হো'ক বশে আস্‌বেই। সে নির্ব্বিকারচিত্তে ঘরের কুলুপ আটিয়া চলিয়া গেল।

রঙিয়া এখন মহা ফাঁপড়ে পড়িয়াছে; এতক্ষণ শুধু সদর দরজাটাই বন্ধ ছিল এখন যে ঘরের দরজায়ও কুলুপ পড়িল। পলাইবার আর কোন ভরসা নাই। নির্জ্জন বাড়ী, চীৎকার শুনিবার লোক নাই অথচ নিকটে আর কোন ঘর বাড়ীও দেখা যায় না। খাঁচাবদ্ধ বাঘিনীর ন্যায় ফুলিতে ফুলিতে সে ঘরের ভিতর ঘন ঘন পাইচারী করিতে লাগিল। কোন দিকেই পলাইবার সুযোগ নাই। দেখিতে পাইল ঘরের এক কোণে এক কলসী জল; আর তাহারই পাশে একটা পিতলের গামলা উপর হইয়া আছে। তাকের উপর কড়াই ভরা দুধ। কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া সে গামলা খানা তুলিয়া দেখে নীচে একথালা ভাত ও ডাল তরকারী। রঙিয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না এই সমস্তই কামুক রামতারণের সাজানো প্রলোভন। তাহার মনে হু' হু' এই দুই সংশয়ের মধ্যে তর্ক উঠিয়াছে দুর্ব্বৃত্তের প্রদত্ত অন্নে উদরপূর্ণ করিবে কিনা? কিন্তু এই দুঃসময়েও তাহার দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। শরীরে শক্তিলাভের অনুরোধে শুধু সে তাকের উপর হইতে খানিকটা কাঁচা দুধ পান করিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে রামতারণ সরকার আসিয়া বাহির হইতে কুলুপ খুলিল। তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত, মুখে তরলমিক তীব্রগন্ধ ও অসংযত ভাব, পদদ্বয় একস্থানে স্থির থাকিতেছে না। ভঙ্গী দেখিয়া রঙিয়ার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিলেও আশু বিপদের আশঙ্কায় রঙিয়ার সাহস দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দুগ্ধপানে শরীরেও একটু শক্তি বাড়িয়াছিল। রঙিয়ার সর্ব্বপ্রকার কাকুতি মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া যেই মাতাল সরকার তাহার দিকে অগ্রসর হইল অমনি রঙিয়া গৃহকোণ হইতে ভাঙ্গা কুড়ালিখানা দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া মাতালের মাথায় সজোরে বসাইয়া দিল। ভীষণ চীৎকারে সরকারের রক্তাক্ত দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া রঙিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। রাত্রির অস্পষ্ট আলোকে আপন গৃহাভিমুখে ছুটিল।

বাড়ীর সীমানায় পা দেওয়া মাত্রই কি যেন এক অজানা আশঙ্কায় রঙিয়ার হৃদয় দুরুদুরু কাঁদিয়া উঠিল, সর্ব্বশরীরে আতঙ্কের শিহরণ খেলিয়া গেল। বাড়ীর গোশালা হইতে কি যেন একটা অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ তাহার কাণে প্রবেশ করিল। গোয়ালে গরু নাই অথচ এ কিসের শব্দ? রঙিয়ার মনে দারুণ সংশয় জন্মিল। গোশালার পশ্চিম দিকে কোন আবরণই ছিল না, বাহির হইতে তাকাইতেই সে দেখিতে পাইল—একটা মানুষ যেন গলায় ফাঁসি বাঁধিয়া ঝুলিতেছে, পা দু'খানা এখনও এদিক্ ওদিক্ নড়িতেছে। একে রাত্রিকাল, তাহাতে জনমানবের সাড়াহীন, তার উপর রামতারণের পৈশাচিক ব্যবহার, সর্ব্বোপরি দেশ ভরিয়া দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল ছবির কল্পনা; সবগুলি একত্র জড় সড় হইয়া রঙিয়ার মন প্রাণ আতঙ্কিত করিয়া তুলিল। বিকট চীৎকারে সে উঠানের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সে চীৎকারে বৃদ্ধ ভোলানাথ সাড়া দিল, শিশু দুইটী কাঁদিয়া উঠিল।

প্রতিবেশীরা আসিয়া আলো সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই গয়ারামের ক্ষীণ প্রাণ-পাখী মুক্ত আকাশে উধাও হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সান্ত্বনা।

(অগ্রহায়ণ সংখ্যা সৌরভে শ্রীমতীর আক্ষেপ পাঠে।)

সখি বলে রাই, দুঃখিত হ'লেম,
লাভ কি এখন কেঁদে ?
তখনি ভাবা উচিত ছিল,
যখন গেল সে সেধে,
মানিনী তুমি এতই হ'লে
মুখ তুলে না কথা ক'লে,
কথায় বলে নিজের পাগল—
নিজে রাখ্‌তে হয় বেঁধে,
তখনি ভাবা উচিত ছিল—
শ্যাম গেল যবে সেধে!

(২)

কত যে তোমায় বুঝানু, ও সই,
কইলে কি কথা থাকে ?
কোপের তোপে উড়িয়ে দিতে
চাও বসুধাটাকে!
তুমি ভাব তুমি ভূপের বালা
গোপের সুত সেই নন্দলালা,
কসুর করলেই কঠিন সাজা
দিবে তুমি তাকে,
কোপের তোপে উড়িয়ে দিতে
চাও বসুধাটাকে!

(৩)

নারীর আড়ি এত কি ভাল,
এত কি ভাল তেজ ?
এত কি আর করলে চলে
সব সময় আখেজ ?
গেছে কি না গেছে চন্দ্রার ডাকে—
মুখেত যন্ত্রনা দিলেই তাকে
অবশেষে দিলে যমুনার জলে
ভাসা'য়ে কুল শেজ,
এত কি আর করলে চলে
সব সময় আখেজ ?

(৪)

জান রাধে, কই-প্রেমের ধারা
যে পথে উধাও ধায়,
নিম্ন ভূমির জলের মত
নীচের দিকেই যায়;
যে ব্যক্তি না পারে বাঁশের মত
আপনারে সই, করতে নত,
সে যেন আর পরের সাথে
প্রেম করতে না চায়,
নিম্ন ভূমির জলের মত
(প্রেম) নীচের দিকেই যায়।

(৫)

মান অপমান সমান সমান
হয়নি লো যার জ্ঞান,
সে যেন সই, সঁপতে না যায়
পরকে মনঃ প্রাণ;
মানকেই অঙ্গের ভূষণ ক'রে
সে বসে থা'ক আপন ঘরে,
আপন সুখে মজে করুক
আপন সুরে গান,
সে যেন সই, সঁপতে না যায়
পরকে মনঃ প্রাণ।

(৬)

দিবেত পরাণ দিবেই তারে
ফিরে না লওয়ার ভাবে,
আপনার সুখ, আপনার দুঃখ
দেখতে নাহি চাবে;
তারি' স্থান এই ভুবন জু'ড়ে
তারি' বাঁশী বাজাবে জোরে,
তারি' নিবিড় গভীর সুরে
ডু'বিয়া সখি, যাবে,
আপনার সুখ, আপনার দুঃখ
দেখতে নাহি চাবে।

(৭)

আঁধিয়ে পরাণ দিয়ে কি তারে
বাঁধিয়ে রাখা যায় ?
প্রেম সাগরে ডুবলে কি আর
কূল সখি কেউ পায় ?
তোমায় কি আর বলবো রাধা,
এ সুর ছিল আগেই সাধা,
এখন জীবন যাপ্‌তেই হবে
এই হাসি কাঁদায়,
প্রেম সাগরে ডুবলে কি আর
কূল সখি, কেউ পায় ?

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, DACCA